আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিনকাল

(ব্রিটিশ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ)

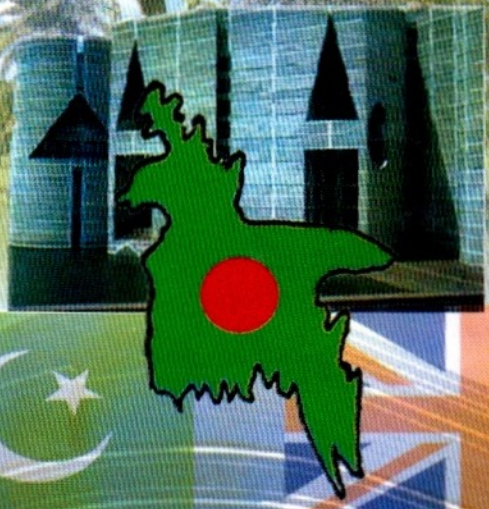

সা'দ আহমদ

সিনিয়র এ্যাডভোকেট

আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিনকাল

(বৃটিশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ)

সা'দ আহমদ

এম. এ; বি.কম; এলএল.বি (আলিগড়)
সিনিয়র এ্যাডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান রিজিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার, কুষ্টিয়া।
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আলহাজ্জ ডাঃ মনির উদ্দিন ট্রাষ্ট।
ও
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হালিমা বেগম একাডেমি, ভেড়ামারা
প্রাক্তন সদস্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিল
প্রাক্তন চেয়ারম্যান অবিভক্ত কুষ্টিয়া জেলা বোর্ড
প্রাক্তন ডাইরেক্টর পাকিস্তান ইনডাষ্ট্রিয়াল ফাইনান্স করপোরেশন।

EX-1
www.pathagar.com

আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিনকাল

প্রকাশকঃ **রিজিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার**
১০০ ঝিনাইদহ রোড, পোঃ ও জেলা- কুষ্টিয়া।
ফোন নং- ০৭১-৫৩৬১৮

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী, ২০০২ সন।

প্রকাশক কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
মহসিন কম্পিউটারস
থানাপাড়া, কুষ্টিয়া।
ও
ইউনিক মাল্টি সিষ্টেমস
হাসপাতাল মোড়, কুষ্টিয়া।

প্রচ্ছদ ও ডিজাইনঃ ফয়সাল মাহমুদ

মুদ্রনঃ **আল হেলাল প্রিন্টিং প্রেস**
ইসলামীয়া কলেজ রোড, কুষ্টিয়া।

হাদিয়াঃ ১৪০.০০ টাকা
৪ পাউন্ড
৬ ডলার

Amar Dekha Shamaj O Rajnitir Tin Kal written by Sa'ad Ahmad.M.A; B.Com; LL.B(Alig), Senior Advocate, Supreme Court Bangladesh. Published by Rijia Sa'ad Islamic Center, 100.Jhenidah Road, P.o.& Dist-Kushtia,Bangladesh.
Printed by : Al-Helal Printing Press, Islamia College Road , Kushtia P.o.& Dist-Kushtia,Bangladesh

Price: Taka 140.00
4 P.Sterling
6 U.S.Dolar

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী সম্মিলিত চার দলীয় জোটের শ্রদ্ধেয় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, সর্বস্তরের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, সম্মিলিত কাফেলার দূর্জয় ও অকুতভয় কর্মীবৃন্দ, শহিদী মওতে গর্বিত মুজাহিদবৃন্দ যাদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সীমাহীন ত্যাগ, কোরবানী ও ঝরানো রক্তে এদেশের বুকে আওয়ামী দুঃশাসনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অমানিসার ঘোর অন্ধকার অপসারিত হয়ে পূর্ব দিগন্তে ঊষার আলো নিয়ে, প্রভাতের স্নিগ্ধতা নিয়ে, ফুলের পাপড়িতে জমে থাকা ভোরের শিশিরের পবিত্রতা নিয়ে নতুন দিনের সুত্রপাত হয়েছে------ তাদের উদ্দেশ্যে।

সা'দ আহমদ

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

ভূমিকা

পরম করুনময় আল্লাহ রব্বুল আলামীনের যাবতীয় প্রশংসা যিনি একটি সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর এক নগন্য বান্দাকে এই সুদীর্ঘ বইটি লিখবার তাওফিক দিয়েছেন। ২০০০সালের জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে গোপালগঞ্জ সেশন আদালতে একটি হত্যা মামলা পরিচালনার জন্য কাদিরদি ডিগ্রী কলেজ অতিক্রম করাকালে ঘটনা চক্রে সাক্ষাৎ হল কলেজের প্রিন্সিপাল জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন সাহেবের সঙ্গে যিনি সরকারী কলেজ থেকে অবসর নিয়ে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ডিগ্রী কলেজ স্থাপন করেছেন যার শেষোক্তটি হচ্ছে ফরিদপুর জেলার কাদিরাদি ডিগ্রী কলেজ। তাঁর অফিস কক্ষে চা ও মুড়ি দিয়ে অভ্যার্থনা জানালেন, সরলতায় মুগ্ধ হলাম। রয়সের ভারে ভারাক্রান্ত অথচ বিদ্যার মশাল নিয়ে আলো ছড়াতে সদা ব্যস্ত এই প্রতিভার সঙ্গে কিছুক্ষনের আলাপচারিতায় উপলব্ধি করলাম তার কর্মের প্রতি অনুরাগ নিষ্টা ও আন্তরিকতা, দেশ ও দেশের মানুষ বিশেষ করে তরুন ও যুবকদের প্রতি ভালোবাসা মমত্ববোধ, নীতি আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার এবং সব কিছুর বিনিময়ে জীবনের মূল্যবোধ সংরক্ষনে তার প্রচন্ড আবেগ ও অনুভূতি। আমাদের সাক্ষাৎ নতুন হলেও মনে হলো আমি তার নিকট অজানা ছিলাম না। বিদায় কালে তিনি একটি কঠিন দাবী রাখলেন আমার কাছে 'জীবনের অনেকটা পথ অতিক্রম করেছেন, কিছু লিখে রেখে যান।' কথাটি হালকা ভাবে গ্রহন করলাম বটে কিন্তু বার বার স্মরণের পথে উদয় হওয়ায় মনে প্রেরনার স্তুপ জমা হয়ে 'সৃষ্টির' আকাংখায় মেতে উঠলাম। এর মধ্যে দ্বিতীয় মিলেনিয়ামের আবির্ভাব জীবনের অজনা বাকী দিন গুলোর স্বল্পতা সম্পর্কে সজাগ করে দিল । তাইতে শুরু হলো কঠিন পরিশ্রম এবং দেড় বৎসরাধিক কালের মধ্যে সম্পন্ন হল আমার নির্বাচিত বিষয়বস্তু ইতিহাসের পতায় ধরে রাখার প্রচেষ্টা ।

দ্বিতীয় মিলেনিয়ামের শুরুতেই জীবন ও মৃত্যুর মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অপার করুনায় বয়সের মাপকাঠিতে পৌনে এক শতাব্দিতে পদার্পন করেছি। মহাকালের হিসাবে এসময়টি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও ব্যাক্তির জীবনে আদৌও কম নয়। ঘটনা বহুল সমাজে প্রতিনিয়ত যে অগনিত ঘটনাবলী উদ্ভব হচ্ছে তার মধ্যে যে গুলির সংগে আমার জীবন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িত, যে গুলি আমার মনমানস চিন্তা ধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে, হাঁসি কান্না আনন্দ বিরহ বেদনার জন্ম দিয়েছে, যে সব সৃষ্টিধর্মী ঘটনা আমার মনে উল্লাশ সৃষ্টি করেছে, সমাজের যে ভাঙ্গন আমার জীবন জোয়ারে বাধার সৃষ্টি করেছে সেই সব বৈচিত্রময় ঘটনারাজি এই বই-এর পৃষ্ঠায় ধারা বাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। জীবনের এই মেয়াদে তিনটি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। বেনিয়া ব্রিটিশ জাতীর অধিনস্থ ভারতের পরাধীন নাগরিক হিসাবে ২০ বছর, বেনিয়াদের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে

www.pathagar.com

স্বাধীন . পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ট অঞ্চলের নাগরিক হিসাবে ২৫ বছর এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে ৩০ বছর।

'সময়' বা 'কালই' হচ্ছে যুগের সাক্ষী, সময় ইতিহাস হয়ে তার বিশাল গ্রন্থাগারে সব কিছু ধারন করে রাখে। এই গ্রন্থাগারের ধারনকৃত ভান্ডার থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আমার জীবনের একান্ত ব্যাক্তিগত কথা ও কাহিনীসহ যে সব বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছি তার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই পৌনে এক শতাব্দি অর্থাৎ তিন কালের সমাজ ও রাজনীতির অবস্থা-ই প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যাক্তি পরিবার মিলেই সমাজ গড়ে, সমাজের সর্বাত্মক রূপ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনেই রাজনীতি। মানুষের মঙ্গল কামনাই হচ্ছে রাজনীতির লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে একটি সুন্দর, সু-সংবদ্ধ, মানবতার উৎকর্ষ সাধনকারী সঠিক জীবন ব্যবস্থা গড়াই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। কোন সে রাজনীতি, কোন সে আদর্শ যা একটি সুন্দর সুশৃঙ্খল ও যাবতীয় মৌলিক মানবীয় অধিকার নিশ্চিত করে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়তে পারে?

বর্তমান ঘুনেধরা ও ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর অনুসন্ধানই ছিল আমার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। তাইতে সুদীর্ঘ পৌনে একশত বছরের দেখা তিন সমাজের অনিয়ম অনাচার জুলুম শোষন নির্যাতন নিষ্পেষন ও মানবতা বিরোধী কার্যকলাপের ইতিহাসের সংগে পরিচয় ঘটিয়ে বইয়ের শেষ প্রান্তে এসে ঐশী জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (দঃ) এর হাতে গড়া সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার একটি নকশা পেশ করেছি কেননা শুধুমাত্র এই সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই মানবতার মুক্তি নিহিত।

যারা সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন এবং একটি আদর্শবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার জন্য সঠিক পথের সন্ধানে রয়েছেন তাদেরকে হয়ত এই বই কিছুটা খোরাক জোগাবে। তবে দেশের তরুণ ও যুবশক্তির কাছেই থাকবে আমার বিশেষ আবেদন। মূলত একটি প্রত্যাশা নিয়ে তাদের জন্যই আমার এই বই লিখা। শুধুমাত্র প্রচার প্রোপাগান্ডা বা গলার আওয়াজে বিভ্রান্ত না হয়ে আগামী দিনে আমদের যুবক ও তরুনরা, আমাদের সন্তানেরা নীতি আদর্শ ও সহিষ্ণুতার উপর রাজনীতির ভিত্তি স্থাপন করে একটি শোসন বিহীন , ইনসাফ ভিত্তিক, কল্যাণকামী সমাজ গড়বে যেখানে মানুষ মানুষের দাসত্ব না করে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে-- এই আমার দৃঢ় আশা ও প্রত্যয়।

সা'দ আহমদ
সিনিয়র এ্যাডভোকেট, সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ
১০০ ঝিনাইদহ রোড, পোঃ ও জেলা- কুষ্টিয়া।
ফোন- ০৭১-৫৩৬১৮

www.pathagar.com

সূচীপত্র

অধ্যায়-১ পৃথিবীর মাটির পরশ -১সামাজিক অবস্থা মুসলমানরা পিছিয়ে-৩ শিক্ষাজীবন শুরু-৮ ভারতের রাজনীতিতে পরিবর্তনের সূচনা-১০।

অধ্যায়-২ অভূতপূর্ব মুসলিম জাগরণ-১১মুসলমানের জীবনে শান্তি এল, স্বস্তি এল-১৩ বর্নহিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষ-১৫ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও পটভূমি-১৬ জীবনের প্রথম দীর্ঘ সফর-১৮ পাকিস্তান আন্দোলনের দূর্বার গতি-১৯

অধ্যায়-৩ আলিগড় মুসলিম বিশ্বাবদ্যালয়ে ভর্তি-২১ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বছর-২৪ অপ্রত্যাশিত ঘট-নায় জীবন নদীতে বহুমুখী স্রোতের আবির্ভাব-২৫ উন্নতির জোয়ার জীবনের খাল বিলগুলো ভরে দিল-২৭পাকিস্তান আন্দোলনে ছাত্র কর্মী-২৯আলিগড়ের শেষের দুটি বছর -৩০

অধ্যায়-৪ স্বাধীন থেকে সমাজের কাজে আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত-৩৩ জীবন পথে বাঁক-৩৪

অধ্যায়-৫ দাম্পত্য জীবনের শুরু-৩৮শিক্ষকতা জীবন-৩৯ শেখ মজিবের সঙ্গে পরিচয়-৪১ বাংলা ভাষা আন্দোলন-৪২ রাষ্ট্রভাষা নিয়ে শাসকদের অবিমিষ্যকারীতা-৪৪

অধ্যায়-৬ আইনজীবী হিসাবে নিজের জেলায় ফিরে এলাম -৪৫আওয়ামী মুসলিমলীগে যোগদান ও প্রথম কারাবরণ-৪৭ যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন-৪৯০দেশের রাজনীতিতে কলংকজনক অধ্যায়-৫০ অবিভক্ত কুষ্টিয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান-৫২ সরকারের দুটি বিভাগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন-৫৬ করাচিতে প্রথম সমুদ্র দর্শন-৬০

অধ্যায়-৭ সক্রীয় রাজনীতির ময়দানে-৬১ দ্বিতীয় বার কারাগারে৬২ কারাগারে আলকোরানের স্পর্শে এলাম-৬২ তৃতীয় বার কারাগারে-৬৪ রাজনীতির উত্তপ্ত ময়দান-৬৪ জেলায় সরকার বিরোধী সমস্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান-৬৭ কেন প্রচলিত রাজনীতি পরিহার করে ইসলামী আন্দোলনে যোগদিলাম?৬৮পিডিএম পন্থী ও ছয়দফা পন্থী আওয়ামীলীগ-৭২ মানব জীবন সম্পর্কে প্রচলিত চারটি মতবাদ-৭৩

অধ্যায়-৮ রাজনীতির ময়দানে ঝড়োহাওয়া-৭৭ জামায়াতের জনসভায় আঃ লীগের হামলা-৭৮ সংঘাত ও সংঘর্ষ-৮০ শহর ছেড়ে গ্রামে-৮১ শহরে ফিরে এলাম-৮২ সন্ত্রাসমুলক কার্য-কলাপের খবর-৮৪ ভারতীয় প্রচার প্রোপাগান্ডা-৮৫ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার পথ-৮৬ দূর্যোগের বছর: আমি মা হারালাম-৮৯ ইসলামাবাদ যাওয়ার প্রস্তুতি-৯১

অধ্যায়-৯ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ-৯২ নতুন সরকার যন্ত্র কায়েম-৯৪ হত্যা ও নির্যাতনের ভয়াবহ খবর-৯৫ আমি হাইজ্যাক হয়ে গেলাম-৯৫মৃত্য দুয়ার হতে ফিরে এলাম-৯৭ সৈয়দার সঙ্গে সাক্ষাৎঃ কুষ্টিয়ার খবর বিনিময়-৯৭ শেখ মুজিব ফিরে এলেন-১০০ শাসন যন্ত্রে পরিবর্তন-১০১ পুনঃরায় হাইজ্যাকের সম্মুখীন হলাম-১০৩ চতুর্থবার কারাজীবনে প্রবেশ-১০৪ পুলিশ অফিসার বন্ধুর সাহায্য পেলাম-১০৫কারাগারে আভ্যন্তরীন আবহাওয়া বিষাক্ত-১০৬ মুক্তিবাহিনীরা জেলে আসছে-১০৮কারাগারে সংঘর্ষ, পাগলা ঘন্টা, গুলি-১০৯

অধ্যায়- ১০ ২৫ বছর মেয়াদী ভারত বাংলাদেশ চুক্তি-১১১ ছাত্রশক্তির ভাঙ্গন-১১৩ রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও ঘেরাও নিষিদ্ধ-১১৫ হাজারও লাডিকোটাল সৃষ্টি-১১৫পিও ৫০ জারি হলো-১১৬ অস্ত্র জমাদানের মহড়া-১১৭ দালাল আইন আরো কঠোর হলো-১১৮ খসড়া সংবিধান গৃহীত হলো-১১৯ শ্রমিক সংগঠনে ভাঙ্গন-১২২ বন্ধুজনের মধ্যে ভাঙ্গন-১২৩

অধ্যায়-১১ ইনসাফের কাঠগড়ায়-১২৪ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ-১২৭ আমার জবাব-১২৮স্বাক্ষ্য গ্রহন শুরু হলো-১২৯ আমার জবানবন্দি-১৩৬ রায় ঘোষণা-১৪১ রায়ের প্রতিক্রিয়া-১৪৬

অধ্যায়-১২ জাতীয় সংসদের নির্বাচন-১৪৭

অধ্যায়- ১৩কারাগারে কয়েদীর জীবন-১৫১ যশোর কারাগারে এলাম-১৫৩ কারাভ্যন্তরে ব্যবস্থাপনা-১৫৪ খাদ্য-১৫৫ চিকিৎসা-১৫৬ সাক্ষাতকার-১৫৬ শাসনের নামে বর্বরতা-১৫৭

অধ্যায়- ১৪রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন-১৫৮ অর্থনৈতিক ভাঙ্গন-১৫৯ শিক্ষক ধর্মঘট-১৬০ রক্তের আখরে লিখা শাসনতন্ত্রের সংশোধন-১৬১

www.pathagar.com

লেজ ও লেজুড়ের আঁতাত-১৬২ হত্যা ও পাল্টা হত্যা-১৬২ সেনাবাহিনী নিয়োগ-১৬৩ দালাল আইনের সমালোচনা তীব্রতর হচ্ছে-১৬৭ দেশে বিদেশে প্রতিক্রিয়া-১৬৮দেওয়াল ঘেরা জীবনে মুক্তির পয়গম এলো-১৬৯ মুক্তিপ্রাপ্তদের তালিকায় আমার নাম-১৭১ প্রহর গুনা শেষ হলো-১৭১ আহ! আমি মুক্ত-১৭২

অধ্যায়- ১৫নিজের আবাস স্থলে ফিরে এলাম-১৭৩ বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ-১৭৫ আর্মি অফিসারদের ক্ষোভ ১৭৫ রক্ষী বাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ-১৭৬ শেখ মুজিবের ক্ষমতার মোহঃ দুঃখজনক পরিনতি-১৭৭ খন্দকার মোস্তাক প্রেসিডেন্টর গদিতে-১৭৮ খন্দকার মোস্তাকের সঙ্গে সাক্ষাতকার-১৭৯ জিয়াউর রহমান সপ্তম প্রেসিডেন্ট-১৭৯ সংবিধান সংশোধন-১৮০ নতুন দলগঠনের চিন্তাভাবনা-১৮২ মওলানা আব্দুর রহীমের চিন্তধারা-১৮২ সুপ্রিমকোর্টে যোগদান ও দলগঠন তৎপরতা-১৮৩ আই.ডি.এল প্রতিষ্ঠা-১৮৪ করাচিতে রাবেতার বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনে যোগদান-১৮৫ মওলানা মৌদুদীর সঙ্গে সাক্ষাতকার-১৮৬

অধ্যায়- ১৬ দুবাই, ইরান, পাকিস্তান সফর-১৮৭ দুবাইতে বিরতি-১৮৮বিশ্বের প্রথম ইসলামিক ব্যাংক ১৮৯ তেহরান বিমান বন্দরে উপস্থিতি-১৯০ জুম্মার নামাযের মধ্য দিয়ে সফর প্রোগ্রাম শুরু ১৯১ বাংলাদেশী শ্রমিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-১৯৪ শাহী প্রাসাদ সমূহে কিছুক্ষন-১৯৪ ইমাম খোমেনীর সঙ্গে সাক্ষাতকার-১৯৬ ইমাম খোমেনীর অসাধারণ ব্যাক্তিত্ব -১৯৮ ইমাম খোমেনীর বিজয় কিভাবে সম্ভব হলো-১৯৯মওলানা মওদুদীর মৃত্যু ও পাকিস্তান সফর-২০১ ইসলামী পুনঃর্জাগনের ক্ষেত্রে মওলানা মওদুদীর অবদানের স্বীকৃতি-২০২

অধ্যায়- ১৭জেনারেল জিয়া নিহত হলেন-২০৪ দালাল আইনে শাস্তির বিরুদ্ধে আপিলের রায় ২০৪ সস্ত্রীক হাজ্জ পালন-২০৫জেনারেল এরশাদের মার্শাল ল জারী-২১০ ৩৩ বছরের জীবন সাথী সৈয়দা কে হারালাম-২১২ জামায়াতে ইসলামির পুনঃথান-২১৬ ইসলামী রাজনীতির ময়দানে উলামাদের তৎপরতা-২১৭ ইসলামী আন্দোলনে যুবশক্তির অভ্যুত্থান২১৭দুই দশকের রাজনীতির হালচাল-২১৯ আব্দুর রহিম (রঃ) এর জীবন প্রদীপ নিভে গেল-২২৪

অধ্যায়- ১৮বাংলাদেশের নারী সমাজের অবস্থান-নারী মর্যদা কি হওয়া উচিৎ ছিল?২৩১ আল কোরআনে নারী সম্পর্কে দৃষ্টি ভঙ্গি-২৩২ নারী প্রগতিবাদীরা নারীকে কি দিয়েছে?২৩২ রসুল (দঃ) প্রতিষ্ঠিত সমাজে নারী কি পেল-২৩৩ নারী সত্ত্বার জঠিলতা-৩৪ নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক সচেতনতা-২৩৭ বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের পথে শিক্ষিতা মহিলাদের পদচারনা শুরু-২৩৮

অধ্যায়- ২০ আওয়ামীলীগের পুনঃথান-২৪৪ আঃলীগের দ্বিতীয় মেয়াদে দুঃশাসন-২৪৮ ইসলামী মূল্যবোধের ভাঙ্গন প্রচেষ্টা ও ভন্ডামী-২৫০ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত-২৫১ সর্বত্রই নৈরাজ্য, ভাঙ্গন ও বে-ইনসাফী-২৫৪ শেখ হাসিনা ও রেহানার আজীবন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা-২৫৫নিরাপত্তা আইন বাতিল-২৫৬ হাসিনার পতনের কারণ-২৫৭

অধ্যায়- ২১আমার বিরুদ্ধে আওয়ামী বিদ্বেষ-২৬০ সাংবাদিক অসাধুতার চরম বহিঃপ্রকাশ-২৬১ জনকণ্ঠ প্রত্রিকার মিথ্যাচার-২৬২ সম্পাদকদের বিরুদ্ধে সমন জারী-২৬৫

অধ্যায়-২২ সুষ্ঠু সমাজ গড়ার পথ-২৬৬ দেশের সাধারণ পরিস্থিতি, সামাজিক অবস্থা, মহিলা সমাজ-২৬৭ শিক্ষাঙ্গন, বর্তমান শাসনতন্ত্র-২৬৮ অর্থনৈতিক অবস্থা,বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট, রসূল (সঃ) এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-২৬৯ রসূল (সঃ) এর জীবনে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কি কোন প্রয়োজন ছিল?২৭০ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার জন্য কি রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিহার্য্য-২৭১ রসূল (সঃ) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য-২৭২ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রভাব-২৭৪

অধ্যায়-২৩ এ যুগে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়া কি সম্ভব? ২৭৫ বাংলাদেশে কি ইসলামী সমাজ গড়ার পরিবেশ বিদ্যমান?২৭৬ রাষ্ট্রনায়কদের তাওহিদী জনতার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করতে হবে-২৭৭ বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বিশ্ব মুসলিমের কর্তব্য-২৭৮পরাশক্তির আস্ফালনের বিরুদ্ধে নয়া জিহাদ শুরুর ওসামা বিন লাদেনের যুগান্তকারী আহবান-২৭৯

www.pathagar.com

অধ্যায়-১

পৃথিবীর মাটির পরশ

অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভেড়ামারা থানা সদরের উত্তরে অবস্থিত প্রমত্ত পদ্মা বিধৌত বিশাল চর অঞ্চলে হার্ডিঞ্জ সেতু থেকে মাত্র ১ মাইল পশ্চিমে আমার দাদা আলহাজ্ব মেছের উদ্দিন অন্য স্থান থেকে হিজরত করে এসে বৃদ্ধ কালে নিজের ও ৪ পুত্রের জন্য নতুন বসতি গড়ে তোলেন। রেললাইন সম্প্রসারণের কারণে যারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উচ্ছেদ হন আমার দাদাও ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। হার্ডিঞ্জ সেতু নির্মাণের প্রয়োজনে পদ্মার পশ্চিমে যে স্থানে প্রকৌশলী ও অন্যান্য কারিগরদের বাংলো গড়ে ওঠে এবং হাজারো দক্ষ অদক্ষ শ্রমিকের ভীড় জমতে থাকে তার মাত্র কয়েক শত গজ দূরে আমার দাদা বৃদ্ধকালে তার ও তার সন্ত ানদের জন্য ৩০ বিঘা জমির উপর পুষ্করিণী, বাগিচা সহ পাকা ইমারত গড়ে নতুন বসতি স্থাপন করেন। দাদার দেখাদেখি তার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও বসতি স্থাপন করতে শুরু করেন যার ফলশ্রুতিতে বিরাণ চর অঞ্চলে একটি নতুন গ্রাম গড়ে ওঠে। জনবসতির বাইরে থাকায় বাহিরচর নামে এই অঞ্চল পরিচিতি লাভ করে এবং সেটেলমেন্টের দাগে বর্ণিত দাগ নম্বর হিসাবে এই নতুন গ্রামের নামকরণ করা হয় ষোলদাগ। আজও মানুষের মুখে মুখে, সরকারি কাগজপত্রে এই গ্রামের নাম হিসাবে দুইটি শব্দই অর্থাৎ 'বাহিরচর ষোলদাগ' ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমার আব্বা আলহাজ্ব ডা. মনিরউদ্দিন আহমদ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ দিকে কোলকাতা'য় লেখাপড়া শেষ করে ডাক্তারী পেশা গ্রহণ করেন। আমার দাদার দ্বিতীয় জামাতা (আমার ছোট ফুফা) ভেড়ামারা'র পার্শ্ববর্তী মিরপুর থানার গোদাপাড়া গ্রামে ডাক্তারী পেশায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায় মারা গেলে আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে আব্বা তার ভগ্নিপতির শূন্যস্থান পূরণের উদ্দেশ্যে গোদাপাড়া-তে বসতি স্থাপন করেন এবং নবীন চিকিৎসক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। ইতিমধ্যে ১৯২৭ সালের ১লা মে পিতামাতার ২য় সন্তান ও ১ম পুত্র হিসাবে আমি পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করি এবং কাংখিত ১ম পুত্রের জন্য পিতামাতার সঞ্চিত সবটুকু ভালবাসা, স্নেহ ও আদর নিয়ে গ্রাম্য পরিবেশে গড়ে উঠতে থাকি।

শহর বাজার ও বন্দর থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় ঐ নিভৃত পল্লী থেকে আমার আব্বা শুধুমাত্র আমার জন্য ঐ বসতি উঠিয়ে নেন। আমার বয়স যখন ৪ বছর তখন আমার আব্বা ছেলের লেখাপড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন এবং সব কুল বজায় রেখে ভেড়ামারা থানা সদরে এসে একমাত্র মুসলিম এলএমএফ ডাক্তার হিসাবে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তার পেশা শুরু করেন।

www.pathagar.com

ভেড়ামারা শুধু থানা সদরই ছিল না, সেই সঙ্গে ৩ থানার সার্কেল অফিসার হিসাবে সেখানে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর অফিসও ছিল। ভেড়ামারা ছিল ৩ থানার ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। স্থলপথ, জলপথ ও রেলপথের সংযোগ ছিল ভেড়ামারা'র সঙ্গে। রেলওয়ে জংশন হিসাবে এবং কোলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ রেল যোগাযোগ থাকায় ভেড়ামারা সমৃদ্ধশালী বাজার ও বন্দর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ভেড়ামারা-তে বসতি স্থাপন করে মাত্র ৩ মাইল দূরে অবস্থিত গ্রামে বসবাসকারী বিধবা মাতার খেদমত করার সুযোগ পান আমার আব্বা। আমার আম্মার মাতুতালয় ছিল পাবনা জেলা শহরের সাধুপাড়া-তে। ভেড়ামারা থেকে রেলপথে ঈশ্বরদী হয়ে পাবনা'র সঙ্গে যোগাযোগ আমার আম্মার জন্য সহজ হয়। আমাদের ভাই-বোনদের জন্য দাদী-নানীর স্নেহ আদরে অবগাহন করার সুযোগও ভেড়ামারা-তে বসতি স্থাপনের জন্য বৃদ্ধি পায়। আর যে জন্য এই নতুন বসতি স্থাপন তাও সহজলভ্য হয়। প্রাইভেট পাঠশালা, জেলা বোর্ড পরিচালিত প্রাথমিক স্কুল, সরকারি স্বীকৃতি প্রাপ্ত হাইস্কুল কোনটিরই অভাব ছিল না এখানে।

এই বিশাল পৃথিবীর বক্ষে বাংলার নদীয়া জেলার অধিবাসী হিসাবে আমার স্রষ্টা আমার বসতি নির্ধারণ করেছিলেন। শৈশবে মায়ের কোল ও পিতার বক্ষ ছিল আমার ঠিকানা। তখন এই ঠিকানাটুকুই আমার পরিচয়ের জন্য ছিল যথেষ্ট। ক্রমান্বয়ে এই ঠিকানা সম্প্রসারিত হয়। মাটি বা দেশ শুধু একটি ঠিকানাই দেয় না, কিছু ঘটনারও জন্ম দেয় যা স্মৃতি হয়ে, ইতিহাস হয়ে অনন্তকালের জন্য চির স্মরণীয় হয়ে থাকে। এরই মধ্যে নিহীত থাকে জাতির ও সমাজের উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস। কৈশোরে স্কুল জীবনে যখন ইতিহাস পড়তে শুরু করেছি, নিজের জেলাকে জানতে চেষ্টা করেছি তখন ইতিহাসে ভরপুর হাজারো ঘটনার মধ্যে দুইটি ঘটনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। স্মৃতির ভান্ডার উন্মুক্ত করে যখন পিছনে ফিরে তাকাই তখন মনে হয় আমার চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, কর্ম, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি সব কিছুর উপরই ঐ দুইটি ঘটনার প্রভাব পড়েছে। ক্ষণিকের জন্য কখনও বিচ্যুতির লক্ষণ প্রকাশ পেলেও ঐ দুইটি ঘটনা আমাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও কর্তব্য পালনে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে।

ঐ দুইটি ঘটনার মধ্যে একটি আনন্দের, গর্বের ও প্রেরণার; অন্যটি দুঃখের, হতাশার ও অপমানের। হেরা'র গুহা থেকে তাওহীদের যে আলোকরশ্মি প্রজ্জ্বলিত হয়ে বিশ্ব মানবতার মুক্তির পথ দেখিয়েছিল তার কিছু কিছু ছটা মাঝে মাঝে সমুদ্রপথ ও স্থলপথে বাংলার জমিনে আলো বিকীরণ করতে শুরু করেছিল। তখন আউলিয়া, দরবেশ, সুফী, মুজাহিদ, ব্যবসায়ীগণ প্রধানত ইসলামের বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। কিন্তু ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন ছিল তা গড়ে ওঠেনি।

www.pathagar.com

১২০৪ সনে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কতৃক বাংলার শাসক লক্ষণ সেন-এর রাজধানী নদীয়া আক্রমণ ও বিজয়ের ফলে এই দেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে বাংলার জমিনে মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ হয় নদীয়া'র মাধ্যমে। হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর-এর কূল পর্যন্ত যত জেলার অবস্থান তার মধ্যে নদীয়া জেলা এই গর্বের দাবিদার। নদীয়া ছিল ইসলামী রাষ্ট্রশক্তির প্রবেশ দ্বার।

দ্বিতীয় ঘটনাটি দুঃখের, হতাশার ও অপমানের। বাংলায় সাড়ে পাঁচশত বছরের অধিককাল মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তুর্কী, আফগান ও মোগল সম্রাট, সুলতান ও নবাবগণ এই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করেন। গোপাল রাজার পুত্র ইসলাম গ্রহণকারী জালাল উদ্দিন এবং নবাব মুর্শিদকুলী খান-এর ন্যায় এদেশীয় কয়েকজন শাসক কিছু সময় বাংলাদেশ শাসন করেন। এই সাড়ে পাঁচশত বছরের মধ্যে দুই/আড়াইশত বছর স্বাধীন সুলতানদের রাজত্ব ছিল। বাংলার সুলতানগণই তখন এই দেশ শাসন করতেন। কার্যত দিল্লী'র কোন আধিপত্য ছিল না। ১৭৫৭ সনের ২৩শে জুন বিদেশী বেনিয়া ইংরেজদের পদলেহী কিছু সংখ্যক দেশদ্রোহী ও ইসলাম বিদ্বেষী হিন্দু এবং ইংরেজ ও তাদের পদলেহী বর্ণ হিন্দু উভয়ের নিকট অত্যন্ত নগণ্য মূল্যে ঈমান বিক্রয়কারী কিছু সংখ্যক মুসলিম নামধারী উচ্চাভিলাষী কীটের বিশ্বাসঘাতকতায় নদীয়া জেলার পলাশীর আম্রকাননে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা'র পতনের মধ্যে দিয়ে এই দেশে মুসলিম শক্তির সূর্য অস্তমিত হয়। যে জেলা দিয়ে মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রবেশ সেই একই জেলা দিয়ে প্রায় ৫৫৩ বছর পর এই দেশে মুসলামনদের রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রস্থান হয় এবং তার পরবর্তীতে চেপে বসে ২০০ বছরের এক দুঃসহ গোলামী আর সেই সঙ্গে ইংরেজ বেনীয়া ও এদেশীয় বর্ণ হিন্দুদের শাসন ও শোষণের কালো অধ্যায়।

সামাজিক অবস্থা: মুসলমানরা পিছিয়ে

১৯৩১ সালের দিকে আমার আব্বা ভেড়ামারা বাজার ও তার পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদী সংলগ্ন স্থানে বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকেই নীল চাষ শুরু হয়েছিল নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে। নীল চাষের ব্যাপকতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উনিশ শতকের কোন এক সময়ে পদ্মা থেকে খাল কেটে দৌলতপুর, ভেড়ামারা, মিরপুর অঞ্চলে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। কালক্রমে বর্ষা মৌসুমে বন্যা ও বৃষ্টিপাতের কারণে খালটি একটি ছোট নদীর রূপ গ্রহণ করে। নীল চাষ তদারকীর জন্য ভেড়ামারা বাজারে বিদেশী নীলকরদের বাসপোযোগী ভবন নির্মাণ করা হয়।

www.pathagar.com

স্বার্থের পরিপন্থী শর্তে চাষীদেরকে নীল চাষে বাধ্য করার হয় এবং তাদের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ নীলকরগণ নামমাত্র মূল্যে চাষীদের নীল খরিদ করে তাদের সর্বস্ব লুটে নিত। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল সহ নদীয়া'র নীল চাষীদের উপর ইংরেজ ও তাদের অনুগ্রহপুষ্ট 'বাবু'দের অমানুষিক অত্যাচার, শোষণ ও উৎপীড়নের লোমহর্ষক কাহিনী বয়স্কদের মুখে শোনা যেত এবং সেসব কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। নীল বিদ্রোহের কারণে ভেড়ামারা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায় এবং বিদেশীদের জন্য ভেড়ামারা বাজারে নীলকুঠি হিসাবে নির্মিত ভবনটি পরবর্তী আমলে ক্রয়সূত্রে স্থানীয় বাবুদের দখলে চলে যায়।

এই ভবনের সম্মুখে বাজারের কোল ঘেষে ও পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদী সংলগ্ন স্থানে আব্বা স্থায়ী বসতি গড়েন। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল এবং থানায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বাস হলেও থানা সদরের এই বাজার বা বন্দর এলাকায় মাত্র পাঁচ/ছয় ঘর মুসলিম বসতি ছিল। তার মধ্যে আমার আব্বা ছিলেন চিকিৎসক আর কয়েকজন ছিলেন মাঝারী মানের ব্যবসায়ী। মুসলমানদের মধ্যে একজন মাথা উচুঁ করে উপরে উঠার চেষ্টা করেছিলেন। পাট ব্যবসায়ে চোখে লাগার মত সাফল্যও তিনি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু মাড়োয়ারী ও হিন্দুদের ষড়যন্ত্র ও তৎপরতায় তার অগ্রগতি চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। মিরপুর থানার স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, সমাজ দরদী, কল্যানমূলক বিভিন্ন কাজের মধ্যে গড়াই নদীর ভাঙ্গন থেকে ও বর্ষার প্লাবন থেকে কুষ্টিয়া, মিরপুর ও ভেড়ামারা'র একাংশ এলাকার জনসাধারণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নির্মিত 'মোবারক বাঁধ'-এর প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী মোবারক হোসেন ভেড়ামারা বাজারে পাট ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসায়ে তিনি হিন্দু মাড়োয়ারীদের শুধু প্রতিদ্বন্দ্বিই ছিলেন না, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং শোষিত মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন। তিনিই একমাত্র মুসলিম ব্যবসায়ী ছিলেন যিনি সরাসরি কলকাতা-তে পাট রফতানী করতেন। একবার গুদাম ভর্তি পাট খরিদ করা ছিল পরের দিন রেল ওয়াগনে বোঝাই করার জন্য। কিন্তু রাতের অন্ধকারে কে বা কারা পাটের গুদামে আগুন ধরিয়ে দিল। বিশাল আগুনের লেলিহান শিখা ভেড়ামারা বাজারকে হয়তো প্রচন্ডভাবে আলোকিত করেছিল, কিন্তু চৌধুরী সাহেবের জীবনে নেমে এল অন্ধকার, সূচীভেদ্য অন্ধকার। সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গেলে চৌধুরী সাহব বাকি জীবন কাটানোর জন্য গ্রামে ফিরে গেলেন। একচেটিয়া পাট ব্যবসায়ীদের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না।

বাজার এলাকায় যে কয় ঘর মুসলমানের বাস ছিল তারা সবাই আশেপাশের গ্রাম থেকে মূলতঃ ব্যবসার জন্যই বাজারে ঠাঁই নিয়েছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে এমবিবিএস ডাক্তার সহ কয়েকজন চিকিৎসক, কয়েকজন কবিরাজ, প্রায় ১৫ ঘর ধনী মাড়োয়ারী পাট ব্যবসায়ী ছিল যারা পাট খরিদ করে কলকাতায় রপ্তানী করতো, পাট-ধান-চাউল ও অন্যান্য দ্রব্যের মাঝারী ব্যবসায়ী ছিল ২০/২৫ ঘর।

www.pathagar.com

এছাড়াও ছিল মুদিখানা, স্টেশনারি, গহনা তৈরী, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, মিষ্টান্ন দ্রব্য ইত্যাদির মাঝারি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যাদের শতকরা একশত জনই ছিল হিন্দু। হাই স্কুলের মৌলভী শিক্ষক বাদে সমস্ত শিক্ষক ও পাঠশালা বা প্রাইমারি স্কুলের একশত ভাগ শিক্ষক ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত। রেলওয়ে স্টেশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি অফিসের অফিসার, কেরানী, পিওন ইত্যাদি সবাই ছিল হিন্দু। অবশ্য বিভিন্ন বড় ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মুটে ও কুলীর কাজে নিয়োজিত ছিল মুসলমানরা। তবে ওজনদার থাকত হিন্দু। ইউনিয়ন বোর্ড থেকে শুরু করে স্কুল কমিটি, বাজার কমিটি ইত্যাদি সর্বস্তরেই ছিল হিন্দুদের নেতৃত্ব। এক কথায় বলতে গেলে সর্বত্রই ছিল হিন্দুদের একচেটিয়া আধিপত্য। প্রশাসনে হিন্দু কর্মকর্তা, হিন্দু ধনী জমিদার, জোতদার, ব্যবসায়ী, শিক্ষিত হিন্দুসমাজ সর্বত্রই হিন্দু সমাজের উপর ছায়া দানকারী ছাতার মত কাজ করত এবং সর্বত্রই মুসলমান জনসাধারণের স্বার্থ ছিল উপেক্ষিত।

হিন্দুদের এই আধিপত্যের কারণে তাদের আশ্রিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দাপটও ছিল বেশি যা শুধু বাজার এলাকায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলেও মাঝে মাঝে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করত। নীচ বর্ণের হিন্দু যারা 'বুনো' (এ্যাবরজিনাল) নামে পরিচিত ছিল তাদেরও প্রচন্ড দাপট ছিল মুসলামানদের উপর। ভেড়ামারা বাজার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছিল ভাগ্যকুল ও নড়াইল হিন্দু জমিদারদের যৌথ মালিকানার সম্পত্তি। জমিদাররা তাদের লাঠিয়াল হিসাবে ভেড়ামারা বাজার সংলগ্ন স্থানে 'বুনো'-দের বসতি স্থাপন করে দেয় যা পরবর্তীতে বুনোদের বংশবৃদ্ধির কারণে বুনোপাড়া হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল বন্য জন্তুর গোশত। হিন্দু জমিদারদের অনুগ্রহে পুষ্ট ও জমিদার প্রদত্ত জমিতে তাদের সাহায্যে কাচা বাসস্থান তৈরী করে ও উপসত্বাদি গ্রহণের মাধ্যমে জীবন যাপন করে তারাও মুসলমানদের চরম ঘৃণার চোখে দেখত। আমাদের বসতবাড়ীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীতে আমরা যেমন গোসল করতে যেতাম, ওরাও তেমনি 'স্নান' করতে আসত এবং ওদের মেয়েরাও কলসী এনে 'জল' ভরে নিয়ে যেত। যদি কোন কলসিতে মুসলমানদের স্পর্শ বা পানির ছিটা লাগতো বা ছিটা না লাগলেও যদি ওরা বলতো 'জলের কলসিতে মুসলমানদের পানির ছিটা' লেগেছে তবে সঙ্গে সঙ্গে তারা কলসি ভেঙ্গে মূল্য আদায় করে নিত। ঐরূপ ঘটনার শিকার আমিও একাধিকবার হয়েছি। ঐসব বিবাদ এড়ানোর জন্য মুসলমানরা হিন্দুদের ব্যবহৃত ঘাট থেকে কিছুটা নিরাপদ দুরত্বে নিজেদের জন্য স্থান করে নিত।

হিন্দু জমিদাররা শুধু বুনো লাঠিয়ালদের জন্যই বসতি স্থাপন করেনি, বেশ্যাপাড়া নির্মাণও ছিল তাদের কৃতিত্ব। বাজার সংলগ্ন একটি স্থান বেশ্যাপাড়া হিসাবে চিহ্নিত ছিল। ভাগ্যকুল বা নড়াইল থেকে জমিদার বা জমিদার তনয়রা ভেড়ামারা কাচারি পরিদর্শনে এলে ঐ হতভাগ্য নারীরা নতুন কাপড় পড়ে, পরিপাটি হয়ে, এক হাতে কাসাঁর থালায় উপহার সামগ্রী ও অন্য হাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্ধ্যার

www.pathagar.com

দিকে মিছিল করে উলুধ্বনিতে চলার পথ মুখরিত করে কাচারিতে হাজিরা দিত। জমিদারের কোন কাজে বা আচরণে হিন্দু-মুসলমান কারও কোন আপত্তি করার বা সমালোচনা করার কোন অধিকার ছিল না। জমিদার, জমিদার তনয়রা কাচারিতে অবস্থানকালে নির্দিষ্ট সময়ে 'প্রজাকূল'দের সাক্ষাৎ দিতেন। হিন্দু-মুসলমান প্রজাদের 'দর্শন লাভ'-এর মূল্য স্বরূপ জমিদারের হাতে নজরানা দিতে হত। এর কোন বিকল্প ছিল না। শৈশবকালে আব্বার হাত ধরে ঐরূপ একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে উপস্থিত সবাইকে ও আমার আব্বাকে জমিদারের হাতে নগদ রূপোর টাকা দিতে দেখেছি। স্মৃতির ভান্ডারে ঐসব চিত্র কিছুটা মলিন হলেও মুছে যায়নি।

ভেড়ামারা বাজার ও ইউনিয়ন এলাকার বাইরে অন্যান্য ইউনিয়ন ও গ্রামগুলোতে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কোন কোন গ্রামে মুসলমানদের আবাস ছিল শতকরা একশত ভাগ। আমাদের পৈত্রিক গ্রাম বাহিরচর ষোলদাগ-এর বাসিন্দারা ছিল শতকরা একশত ভাগ মুসলমান। ঐ কারণে সেখানকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ছিল ভিন্নতর। হিন্দু সমাজের প্রভাব ঐ গ্রামে ছিল না। সামাজিক নেতৃত্ব ছিল মুসলমানদের হাতে। প্রাইমারি স্কুলগুলোতে ছিল শতকরা একশত ভাগ মুসলমান ছাত্র। শিক্ষকও ছিলেন মুলসমান। ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী জীবন যাপনে এমনকি গরু কোরবানিতেও কোন বাধা ছিল না। হার্ডিঞ্জ সেতু নির্মাণে যে হাজার হাজার অদক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন ছিল তার উল্লেখযোগ্য অংশ ঐ গ্রাম থেকে গ্রহণ করার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের স্বচ্ছলতা আসে। পদ্মার বিস্তৃত চরের দখলে ও আবাদে তাদের ছিল প্রাধান্য। বর্ষা মৌসুমে পদ্মার ভরা নদীতে ছোট ডিঙ্গী করে ইলিশ মাছ ধরা ছিল তাদের নেশা। গ্রামে মসজিদ ছিল। পেশোয়ার থেকে হাফেজ এসে প্রতি বছর তারাবি'র নামাজ পড়াতেন। ফসলের একাংশ দিয়ে গড়া ধর্মগোলা থেকে অভাবী লোকদের সাহায্য করা হত। কোরবানি'র গোশত অভাবী লোকদের বাড়িতে পৌছিয়ে দেওয়া হত। সামাজিক ক্ষেত্রে খোদাভীরু বয়জ্যেষ্ঠদের হাতে অলিখিত নেতৃত্ব থাকায় কঠোর শাসন ব্যবস্থার কারণে অপরাধের তালিকা ছিল শূন্যের কোঠায়। ১৯৫৮ সালে গ্রামে গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনার কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে সামান্য চুরির ঘটনাও শোনা যায়নি।

আমাদের গ্রাম ছাড়া থানার অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে কিন্তু ঐরূপ অবস্থা বিদ্যমান ছিল না। এমন কোন গ্রাম ছিল না যেখানে শুধু হিন্দুদের বাস ছিল। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত গ্রামগুলোতে যদিও মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল কিন্তু তারাই ছিল পশ্চাৎপদ। শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বে হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল। হিন্দুদের বাড়িঘরগুলো দেখলেই পার্থক্য বোঝা যেত। অবস্থাপন্ন হিন্দুদের ঘরগুলো ছিল কিছুটা উন্নত, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। মাটির দেওয়ালেও হিন্দু মেয়েদের হাতে প্রত্যহ ভোরে কাদামাটির প্রলেপ পড়ত।

www.pathagar.com

বাড়িতে ফলবান বৃক্ষের সমারোহ ছিল। বিশেষ করে বাড়ীর আঙ্গিনায় যত ছোটই হোক না কেন ফুলের বাগানে থাকত সযত্নে রক্ষিত তুলসী গাছ। গ্রামের অবস্থাপন্ন হিন্দুরা যারা বাজার-বন্দরে ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল অথবা সরকারি চাকরিতে কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলা, মহকুমা ও থানা সদরে নিয়োজিত ছিল, তাদের উপার্জনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রামে খরচ হত যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবাহ বৃদ্ধি পেত। ঐসব অবস্থাপন্ন হিন্দুরা বিভিন্ন পূজা-পার্বণে অবশ্যই পরিবার-পরিজন নিয়ে গ্রামে আসত এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনকে জড়ো করত ও বিভিন্ন বিনোদনমূলক কাজে তাদের ব্যবহার করত। দুঃখের বিষয় অজ্ঞতা ও অশিক্ষার কারণে দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলমানরাও ঐসব অনুষ্ঠানের জৌলুসে নিজেদের ঐতিহ্যকে ভুলে যেত। মুসলমানরা নিজেদের অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে বিজাতীয় রঙে রঙ্গিন করে ফেলেছিল। হিন্দুদের অনেক অনুষ্ঠানেও তারা শ্রোতা ও দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকত। হিন্দুদের বহু মন্দিরের সামনে যাত্রা গান, রাধাকৃষ্ণ-এর প্রেম লীলা, কীর্তণ ও বিভিন্ন ধরনের নাটক অনুষ্ঠিত হতো যেখানে মুসলমান দর্শকের ভীড় আদৌ কম ছিল না। এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না যেখানে সরস্বতী পূজার জমকালো অনুষ্ঠান হতো না। হিন্দু শিক্ষক, ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে অর্থ সংগ্রহ করে খুব ধুমধামের সাথে 'দেবীর ভোগ'-এর নামে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করত। শিশুদের পক্ষে সম্ভব ছিল না ঐসবের মূল উদ্দেশ্য অনুধাবন করা। মুসলিম শিশুদের মনেও প্রচলিত পরিবেশে কোন প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক ছিল না। হেড পন্ডিত ও অন্যান্য শিক্ষকরা সব শিশুদের ক্লাসে আসার আদেশ দিয়ে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তাদের মুখে ঐ ভোগ তুলে দিতেন। আমার মুখেও একবার সেই ভোগের অংশ দেওয়া হয়েছিল। বাড়িতে ফিরে পন্ডিত মহাশয়দের এরূপ আদর যত্নের কথা প্রকাশ করলে আমার আব্বা-আম্মা পুনরায় তা গ্রহণ করতে নিষেধ করে দেন দেব-দেবী, প্রতিমা ইত্যাদির নামে উৎস্বর্গীকৃত কোন কিছু খেতে নাই। ঐ শিক্ষা পাওয়ার পর দ্বিতীয়বার আমার জীবনে তেমন ঘটনা আর ঘটেনি। ঐ ঘটনা থেকে আমার কচি মনে সমাজ চিত্রের একটি বৈপরিত্ব ধরা পড়ে। মুসলমান কোনদিন কোন হিন্দুকে মসজিদে যাওয়ার জন্য জোর জবরদস্তীতো দূরের কথা, প্রলোভনও দেয় না, অনুরোধও করে না। কিন্তু একজন হিন্দু তার পরিচিত মুসলমানকে প্রলোভন দিয়ে, অনুরোধ করে পূজা মন্দিরে পূজার ভোগ খেতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র থাকে।

শহর, বাজার, বন্দরে সাধারণ মুসলমানদের কোন ঠাঁই ছিল না। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না, ব্যবসার পুঁজি ছিল না, হিন্দু মাড়োয়ারীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকার মত যোগ্যতা ছিল না। তাই রুজির তালাশে তাদের গ্রামের মাটি আঁকড়িয়ে ধরে থাকতে হয়েছে। মুসলমানদের বেশিরভাগই ছিল কৃষিজীবি যারা পৈত্রিক পেশা হিসাবে ঐ কাজে নিয়োজিত ছিল। উন্নত চাষাবাদের ব্যবস্থা না থাকায় ফসল ভাল হত না। খরা ও বন্যায় অনেক সময় চাষীর দুর্গতি বৃদ্ধি পেত।

www.pathagar.com

সামান্য সংখ্যক গ্রামীণ মুসলমানের চাষাবাদের নিজস্ব জমি ছিল। বেশিরভাই ছিল বর্গাদার যারা হিন্দু মালিকদের জমি চাষ করত। কোন কোন গ্রামে মুসলমান তাঁতীরা বাস করত যারা গামছা বোনার উর্দ্ধে উঠতে পারেনি। মুসলমানদের মধ্যে যাদের আদৌ কোন জমি ছিল না তারা বর্গা চাষ করে, অবসর সময়ে শ্রম বিক্রয় করে, শহরে কুলি-মজুরের কাজ করে জীবিকা অর্জন করত। সামান্য কিছু জমির মালিক যারা ছিল তাদের অনেকেই অভাবে পড়ে হিন্দু মহাজনদের কাছে চড়া সুদে টাকা নিয়ে আর পরিশোধ করতে পারত না। তখন ঋণের দায়ে গরিব মুসলমানদের জমি হিন্দু মহাজন, জোতদার, জমিদাররা গ্রাস করে নিত। ক্রমান্বয়ে ধনী ও মধ্যবিত্ত হিন্দুরাই সেখানকার বেশিরভাগ জমির মালিক হয়ে বসে। নদীয়া জেলা বা কুষ্টিয়া মহকুমা বা ভেড়ামারা থানার যে কোন অঞ্চলেই গ্রাম এলাকার এটাই ছিল প্রকৃত চিত্র।

শিক্ষাজীবন শুরু

ভেড়ামারাতে আমার শিক্ষাজীবন শুরু হয়। আমি ও আমার বড় বোন দুলালী বুবু একসঙ্গে পাঠশালায় ভর্তি হই। তখন পাঠশালার হেড পন্ডিত বা হেড মাস্টার-এর নামেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হত। ভেড়ামারা বাজারে অবস্থিত 'বিনয় বাবু'র পাঠশালাতেই আমার আব্বা আমাদের শিশু শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন। বিণয় বাবু'র পুরা নাম বিণয়কৃষ্ণ দেবনাথ। তিনি আমাদের গৃহশিক্ষক-ও নিযুক্ত হলেন। স্লেট, পেন্সিল, কলমির কলম, পানিতে বড়ি গোলান কালি ও বিদ্যাসাগর-এর বর্ণমালা ধারাপাত পুঁজি করেই শিক্ষা অর্জনের পথে আমার যাত্রা শুরু হল। কলকাতা'র ওয়াছেল মোল্লা'র দোকানের হাফ প্যান্ট ও শার্ট পরে পাঠশালায় যেতাম। তখন এখনকার মত পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজন শিশুদের পাঠশালায় পৌঁছে দেওয়া বা বিকালে নিয়ে আসার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না। রাস্তায় কোন ভীড় ছিল না, রিক্সার কোন অস্তিত্ব ছিল না, দুর্ঘটনার ভয় ছিল না। তাছাড়া বাড়ি থেকে পাঠশালার দুরত্বও বেশি ছিল না। বিণয় বাবু'র পাঠশালায় পড়াশুনা ভাল হত। অনুপস্থিত বা অমনোযোগী ছাত্রদের জন্য ছিল প্রচন্ড শাস্তি। কেউ অনুপস্থিত থাকলে ৩/৪ জন বয়স্ক ছাত্রকে দিয়ে তাকে ধরে আনা হত। তারপর পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে গাছের ডালের বেত তৈরী করে তাকে বেদম প্রহার করা হত। অনান্য ছাত্রদের মনে ভীতি সৃষ্টি করার জন্য কাজটা প্রকাশ্যে করা হত। এছাড়া দুই কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা, উঠবস করা, টেবিলের নিচে মাথা গলিয়ে দেওয়া ছিল নিম্ন পর্যায়ের শাস্তি। আমার শিশু মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়ায় আমি কোনদিন পাঠশালায় অনুপস্থিত থাকিনি। প্রতি বছরই গুড এ্যাটেনডেন্সের পুরস্কার পেয়েছি। পাঠশালায় আমি ভাল ছাত্র ছিলাম। তার প্রমাণ হল ১৯৩৭ সালের জানুয়ারিতে আমি ভেড়ামারা হাইস্কুলে ভর্তি হই। ৬৫ জন হিন্দু ও ৫ জন মুসলিম ছাত্রের মধ্যে বাৎসরিক পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করে চমক সৃষ্টি করি।

www.pathagar.com

পাঠশালা ছেড়ে হাইস্কুলে ভর্তি হলেও বিনয় বাবু আমার গৃহশিক্ষক রয়ে গেলেন। দশম শ্রেণী পর্যন্ত তিনি ঐ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বিনয় বাবু ও আমার আব্বার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। একই সঙ্গে দুই পরিবারের মধ্যেও হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। বিনয় বাবু আমাদের বাসায় খাওয়া দাওয়া করতে কোন জড়তা বোধ করেননি। মুরগি ও খাসির গোসত ছিল তার প্রিয় খাদ্য। তেমনি বিনয় বাবুর বাড়ির আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, বেল, নারকেল ও অনান্য ফলমূল আমাদের জন্য অবধারিত থাকত। বিনয় বাবু সফল শিক্ষক ছিলেন। সারা জীবন তিনি শিক্ষকতা করেছেন। শিক্ষকতা ছাড়াও তিনি ঘড়ি মেরামত করতে পারতেন। এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। বাজার থেকে তার গ্রামের বাড়ি ছিল ১ মাইল দূরে। কয়েক বিঘা জমির উপর অবস্থিত বাড়ির উঠানে তিনি একদিকে ফুলের চাষ করতেন, অন্যদিকে কলকাতা থেকে বীজ এনে বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, পালং, বেগুন ও অন্যান্য শাক-সবজির আবাদ করতেন। শাক-সবজীর চারাও বিক্রি করতেন। উনার পানের বরজও ছিল যা থেকে প্রচুর অর্থ রোজগার হত। উল্লেখ্য, পান চাষ ছিল হিন্দুদের একচেটিয়া বিষয়। ভেড়ামারা বাজারের ২ জন মাড়োয়ারী ঐসব পান খরিদ করে, বোঁটা ফেলে, ঝুড়িতে প্যাক করে কলকাতা-তে রফতানী করত। বিভিন্ন কারণে আমার আব্বার সঙ্গে বিনয় বাবু'র যেমন সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়, তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধও তেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিনয় বাবু'র মৃত্যু পর্যন্ত তাকে একইভাবে শ্রদ্ধা করেছি। পরবর্তী জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক হিসাবে বা প্রতিষ্ঠিত এ্যাডভোকেট হিসাবে বা কুষ্টিয়া জেলা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান হিসাবে কখনও চলার পথে ট্রেনের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলে তখনই জায়গা ছেড়ে দিয়ে তাকে পরম যত্নে বসিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু একটি দিকে আমি পিছিয়ে পড়ে যাই। পাঠশালার হেড পন্ডিত হিসাবে বিনয় বাবু সফল শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু হাইস্কুলের একজন মেধাবী ছাত্রের দায়িত্ব নেবার মত প্রয়োজনীয় যোগ্যতা তার ছিল না। ১০/১১ বছর বয়সে সেটা বোঝার মত বোধশক্তি আমার ছিল না। আমার আব্বাও খুব স্বল্প সময়ে একজন ব্যস্ত চিকিৎসক হয়ে যান। তখন বর্তমান যুগের মত চেম্বার প্র্যাকটিস ছিল না। সাইকেলে চড়ে বাড়ি গিয়ে রুগী দেখতে হত। তাইতে আমার দিকে নজর দেওয়ার মত সময় উনার আদৌ ছিল না। বিভিন্ন গ্রাম ও ইউনিয়ন থেকে প্রত্যেক দিন গরিব মুসলমানরা চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার কারণে সাহায্যের জন্য আসতে থাকায় পরিস্থিতির চাপে আব্বাকে মুসলমানদের নেতৃত্ব দিতে হচ্ছিল যার পরিধি দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছিল। পরবর্তীতে ইউনিয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান, জেলা বোর্ড সদস্য, হাইস্কুল সেক্রেটারি, মুসলিম লীগ-এর ট্রেজারার ইত্যাদি অনেক দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়েছিল। পঞ্চম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করলেও তারপর আমার শিক্ষাজীবনে ভাঁটা আসে।

www.pathagar.com

ইংরেজি ও গণিতে আমি খুবই খারাপ প্রমাণিত হতে লাগলাম। আমার স্বভাব আমাকে অঙ্কে আরও পিছিয়ে দিল। আমি সব কাজ দ্রুততার সঙ্গে করি - এটা আমার ফিতরাত। এই কারণে অঙ্কে চরম ভুল হতে থাকে। পরীক্ষার হলে মনে হত আমি একশ নম্বর পাব কিন্তু হল থেকে বের হয়ে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে উত্তর মেলানোর সময় দেখতে পেতাম যোগ-বিয়োগে ভুল হয়েছে। বাড়ি পর্যন্ত পৌছানোর আগে দেখা যেত ত্রিশ নম্বর ধরে রাখাটাও কঠিন হয়ে যাচেছ। এজন্য আমি সব সময় অঙ্ক পরিহার করতে চেয়েছি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ক্লাস পর্যন্ত অঙ্ক আমাকে ছাড়েনি। প্রতি বছরই আমার ফলাফল খারাপ হতে থাকায় ক্লাসে প্রথম হওয়ার যে প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক মনোভাব দশ/এগার বৎসর পর্যন্ত ছিল তা ক্রমান্বয়ে লোপ পেয়ে গেল। ক্লাসের বইয়ের প্রতি আকর্ষণ কমে গেলেও সিলেবাসের বাইরের বইয়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল। হাইস্কুল জীবনের শেষ হতে ২/৩ বছর আমি শরৎচন্দ্র, রবী ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, বনফুল সহ আরও অনেক কবি সাহিত্যিকের ছোট গল্প ও উপন্যাস পড়েছি। বঙ্কিম চন্দ্রের অনেক বই হাইস্কুলের লাইব্রেরিতে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের কেন এত আকর্ষণ তা বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা সবারই তা জানা রয়েছে। বঙ্কিম সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের প্রতি বিষোদগার করা হয়েছে, মুসলমানদের নামের পুর্বে 'নেড়ে', 'পাতি নেড়ে', 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে, আল্লাহ, কোরআন মজিদ, নামাজকে উপহাস করা হয়েছে, ইতিহাসে সুশাসক মুসলিম বাদশা ও শাসক হিসাবে পরিচিতদের এবং তাদের ভগ্নি, কন্যাদের প্রতি মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করে চরিত্র হনন করা হয়েছে। একই সঙ্গে বন্দে মাতরম সঙ্গীতের মাধ্যমে হিন্দু রাজ্য স্থাপনে হিন্দু জাতির মধ্যে পুনর্জাগরণের প্রেরণা সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হয়েছে। বঙ্কিম ঐতিহাসিক ঘটনাকেও বিকৃত করেছে বখতিয়ার খলজী'র নেতৃত্বে মাত্র সতের জন অশ্বারোহী সৈন্যের হাতে লক্ষণ সেনের পরাজয়ের লজ্জা ও গ্লানি মুছে ফেলার ব্যর্থ প্রচেষ্টায়। বঙ্কিমের সাহিত্য যতই পড়েছি ততই তার প্রতি আমার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, আমার কিশোর মন ব্যাথাতুর হয়েছে এবং তাওহীদের পতাকাবাহি মুসলিম কওমের জন্য অনুন্নত ও অপমানজনক অবস্থা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে এক দুর্দমনীয় আকাংখা সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতের রাজনীতিতে পরিবর্তনের সূচনা

খবরের কাগজ পড়ার প্রতিও তখন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। কোলকাতা থেকে মওলানা আকরাম খাঁ'র মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা নিয়মিত আসত। পরবর্তীতে মওলানার সম্পাদনায় বাংলা ও আসাম-এর মুসলমানদের একমাত্র মুখপত্র দৈনিক আজাদ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তখন আমার আব্বা নিজেই এজেন্ট হয়ে পত্রিকা আনাতেন ও শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে বিলি করতেন। মুসলিম সমাজের অবস্থা খবরের কাগজে যা প্রকাশিত হত তা শৈশব থেকে আমার নিজের চোখে দেখা।

www.pathagar.com

আমার স্কুল জীবনে ভারত-এর রাজনীতিতে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয় যার সমাপ্তি ঘটে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে। ঐ সময় মুসলমানদেরও জাগরণের সূচনা হয়। মুসলমানদের যেসব সমস্যার কথা এপর্যন্ত আলোচিত হয়েছে তা সবই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কার্যকর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের ইতিহাস। ঐ আইনটি ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকর করা হয় যার ফলশ্রুতি স্বরূপ প্রত্যেক প্রদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয় ১৯৩৭-এর ফেব্রুয়ারি ও মার্চে এবং এপ্রিল মাসে শের-ই-বাংলা ফজলুল হক-এর নেতৃত্বে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। পরবর্তীতে শের-ই-বাংলা ফজলুল হক তার দল সহ কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ'র অনুরোধে মুসলিম লীগ-এ যোগদান করলে বাংলার জমিনে মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন বলিষ্ঠ রূপ গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। দেশের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের হাওয়া যেভাবে আমাদের সমাজ জীবনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিপ্লবাত্মক ধারার সূচনা করে তা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। বাংলার নির্যাতিত, পিছিয়ে পড়া মুসলমানরা অভিভাবক পায়। ভেড়ামারা থানার প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিভাগে মুসলমান অফিসার ও কর্মচারীর আর্বিভাব ঘটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়, মুসলামন শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, আমরা জাকজমকের সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নবী (সা.) দিবস উদযাপন শুরু করি, হিন্দুদের মারমুখী আচরণে ভাঁটা পড়ে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একচেটিয়া সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠান চিরতরে বন্ধ হয় মুসলমান ছাত্র-শিক্ষকদের আধিক্যের কারণে, ব্যবসা ক্ষেত্রে মুসলমানদের পদচারণা শুরু হয়। প্রাদেশিক রাজধানীতে ভেড়ামারা'র মুসলমানদের মধ্যে ও আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অনেকেই চাকরিজীবী হিসাবে নিয়োগ পান। তখন স্কুলে আমরা ধুতি পরতাম, নামাজের সময় কাছা খুলে নামাজ পড়তাম। কিন্তু মুসলিম জাগরণের যাদু স্পর্শে আমাদের পোষাকেও পরিবর্তন আসে। মুসলিম লীগ কর্তৃক মন্ত্রীসভা গঠনের উল্লাসে মুসলিম জনতার মিছিলে আমরাও শামিল হই। পলাশী'র বিপর্যয়ের পর ঐ প্রথম বাংলার মুসলমানরা স্বস্তির নিঃশাস ফেলে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্বার তাদের জন্য উম্মোচিত হয়।

অধ্যায়-২

অভূতপূর্ব মুসলিম জাগরন

শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বে প্রদেশে মুসলিস লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ায় সারা দেশে মুসলসানদের মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হয়। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ'র আদেশে সর্বত্রই মুসলিম লীগ-এর শাখা স্থাপিত হয়ে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়।

www.pathagar.com

ভেড়ামারা, দৌলতপুর, মিরপুর - এই ৩ থানার সমন্বয়ে ভেড়ামারা সার্কেল মুসলিম লীগ গঠিত হয় ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি। দৌলতপুর থানার আড়িয়া ইউনিয়নের বর্ষীয়ান জননেতা আব্বাস আলি বিশ্বাস-কে সভাপতি, আমার মেজ চাচাজান জসিমউদ্দিন আহমদ-কে সেক্রেটারি, আমার আব্বা ডাক্তার মনিরউদ্দিন আহমদ-কে ট্রেজারার করে অন্যান্যদের নিয়ে শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। ৩ থানা থেকে আগত প্রায় দুই হাজার কর্মী সমর্থক সমাবেশে আমার আব্বা হারমোনিয়াম নিয়ে আল্লামা ইকবাল-এর তারানা 'চিন-ও আমার, আরব-ও আমার, ভারত-ও আমার নহে গো পর, মুসলিম আমি সারাটি বিশ্বে বেঁধেছি ঘর' গেয়ে ইসলামী ঐক্যের আহ্বান জানান। তারপর প্রায় ছয় দশক পার হয়ে গেছে তবুও জাতির মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারকারী ঐ তারানার সুরের ঝঙ্কার আজও আমার কানে বাজে।

বাংলার ঐ রাজনৈতিক পরিবর্তনে একটি মৃতপ্রায় কওমের জন্য পুনরুত্থানের কত দুয়ার খুলে গিয়েছিল তার একটি সুন্দর বর্ণনা পাই এদেশের ইসলামী আন্দোলন বীর সেনানী, বর্ষীয়ান নেতা মরহুম আব্বাস আলি খাঁন-এর 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' নামক গবেষণামূলক বইতে। তিনি লিখেছেন, "ফজলুল হক সাহেবের সাড়ে চার বছরের (১৯৩৭-১৯৪১) প্রধানমন্ত্রীত্ব তার জীবনে এবং অবিভক্ত বাংলার মুসলিমদের রাজনৈতিক শক্তিতে এক নবজোয়ার এনে দেয়। তার মন্ত্রীসভা জনগণের মধ্যে বিরাট আশার সঞ্চার করে এবং মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তাদের এতদিনের হীনমন্যতা দূরীভূত হয়ে হিন্দুদের তারা সমকক্ষ মনে করে। সংসদে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী'র ভাষণ, প্রতিপক্ষের কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দান এবং তাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা নেতৃবৃন্দের তুলনায় অধিকতর উচ্চমানের ছিল। তাদের প্রাণশক্তি ও প্রজ্ঞা, জানবুদ্ধির প্রখরতা, অনর্গল বাগ্মীতা, সাংগঠনিক যোগ্যতা, কঠোর পরিশ্রম ও ধীশক্তির দ্বারা তারা সংসদে হিন্দু সদস্যদের উপর তাদের শ্রেষ্টতা প্রমাণ করেন।"

"বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যে নবজীবনের সঞ্চার হয় তা সংসদ ভবনের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমিত ছিল না। মানবীয় কর্মশীলতার সকল ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংগঠন, সাহিত্য, শিল্প, সাংবাদিকতা, খেলাধুলা প্রভৃতিতে তা দৃষ্টিগোচর হয়। মুসলিম লীগ একটি শক্তিশালী জীবন্ত সংগঠনে পরিণত হয়ে মুসলমানদের মধ্যে এক নূতন জীবন ও আস্থার সঞ্চার করে।"

"প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ যে বাংলা সাহিত্যের ওপর হিন্দু কবি, সাহিত্যিকরা তাদের প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিল, সাহিত্য গগনে কাজী নজরুল ইসলাম-এর উদয়ের ফলে তার অবসান ঘটে। শুধু তিনি একা নন, কাব্য জগতে কবি জসিমউদ্দিন, গোলাম মোস্তাফা, বেনজীর আহমদ প্রমুখের অমর অবদানও অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

সঙ্গীত সম্রাট আব্বাস উদ্দিন-এর মন মাতানো সুরে গাওয়া ইসলামী, মুর্শেদী, ভাটিয়ালী সঙ্গীত মুসলমানদের মনে ইসলামী প্রেরণা সঞ্চার করে।"

"ঐ মুসলিম নব জাগরণে নুতন মুসলিম প্রেসের উত্থান বিরাট অবদান রেখেছে। সাংবাদিকতার জগতে কোলকাতা থেকে কতিপয় মাসিক ও সাপ্তাহিক প্রকাশিত হলেও নিয়মিত কোন দৈনিক পত্রিকা ছিল না। ১৯৩৬ সালে মওলানা আকরাম খাঁ দৈনিক আজাদ প্রকাশ করে মুসলমান জাতির বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেন এবং ফজলুল হক মন্ত্রীসভাকে সক্রিয় সমর্থন দান করেন। ঐ সময়ে আবদুল করিম গজনবী কর্তৃক প্রকাশিত 'দৈনিক স্টার অব ইন্ডিয়া' এবং খাজা নূরুদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত 'দৈনিক মর্নিং নিউজ' মুসলমানদের আশা-আকাংখার প্রতিনিধিত্ব করে।"

"ফজলুল হক এই সত্য উপলব্দি করেন যে মুসলিম জাতির উন্নতি, অগ্রগতির চাবিকাঠি হচেছ শিক্ষা। ঐ কারণেই তিনি নিজে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের উন্নতির জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন যথা লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ কলকাতা, ইডেন গার্লস কলেজ ঢাকা, কৃষি কলেজ তেজগাঁ ঢাকা, ফজলুল হক মুসলিম হল ঢাকা, ফজলুল হক চাখার কলেজ, বরিশাল ইত্যাদি।"

"প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেরে বাংলা ফজলুল হক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হল, প্রদেশের সকল চাকরিতে হিন্দু ও মুসলমান সমান সুযোগ লাভ করবে। অর্থাৎ চাকরির শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হিন্দু ও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মুসলমান লাভ করবে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের চিরাচরিত একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের প্রতি যে চরম অবিচার করা হচ্ছিল, উপরোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে মুসলমান শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে জীবন ক্ষেত্রে বিরাট আশা ও আনন্দের সঞ্চার হয়। মুসলমান জাতির জন্য সেটা ছিল এক বিরাট খেদমত।" (বাংলার মুসলমানের ইতিহাস ঃ আব্বাস আলি খাঁন: পৃষ্ঠা ৩৭৭-৩৮০।)

মুসলমানের জীবনে শান্তি এল, স্বস্তি এল

ঘটনাপ্রবাহে বাংলার মুসলমানদের জীবনে কিছুটা শান্তি, স্বস্তি এল। রাজনীতি, অর্থনীতি, কর্ম, শিক্ষা, চাকরি, সামাজিক অধিকার ইত্যাদি সব দিকেই তাদের জন্য অনুকুল পরিবেশ গড়ে ওঠে। কিন্তু ভারত-এর অন্যান্য প্রদেশগুলোতে মুসলমানরা কি পেল? জনসংখ্যার ভিত্তিতে যে নিম্নতম অধিকার পেতে তারা হকদার ছিল তা কি তাদের ভাগ্যে জুটেছিল? ভারত-এর এগারোটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। সেগুলো হল বোম্বে, মাদ্রাজ, ইউপি, মধ্য প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা। সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করে।

www.pathagar.com

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার শাসন মুসলমানদের জন্য ছিল এক অভিশাপ। ভারতীয় মুসলিম জনসাধারণের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে মুসলিম লীগ-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, কংগ্রেস ভারতীয় মুসলমানদের ও জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে এসব দাবি বার বার উচচারণ করলেও এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত হিসাবে নিজেদের স্বপক্ষে প্রচারণার ঢেউয়ে প্লাবন সৃষ্টি করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার এক সর্বনাশা খেলায় মেতে ওঠে। মুসলমানদের জীবন হয়ে ওঠে দূর্বিষহ। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং পৃথক জাতিসত্ত্বা বিলুপ্তির চরম আশঙ্কা দেখা দেয়। প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের উৎখাত করার অভিযান শুরু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তার আনন্দমঠ উপন্যাসে মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের রণধ্বনি হিসাবে যে 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীত রচনা করে তা অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে আক্রমণাত্মকভাবে পুনরায় হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও নামাজের আজানে বাধা দান, মসজিদে নামাজীদের উপর আক্রমণ, মসজিদের পাশ দিয়ে বাদ্য সহ দেব-দেবীর মুর্তি নিয়ে শোভাযাত্রা, গো মাতা রক্ষার নামে গরু জবেহ নিষিদ্ধকরণ, মুসলমান চাকরিজীবীদের সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করা, তাদের পদচ্যুত করা, নুতন চাকরির দরজা বন্ধ করে দেওয়া, শিক্ষাঙ্গনে মুসলমান সন্তানদের অধিকার কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি নানাভাবে মুসলমানদের উপর শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন ও নিস্পেষণের এক স্টিম রোলার চালিয়ে দেওয়া হয়। শিশুদের মধ্যে হিন্দু পৌরাণিক মনিষীদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্য তালিকায় সেসব সংযোজন করা হয় এবং মুসলমান শিশুদের নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে ঐসব কাহিনী পড়তে বাধ্য করা হয়। ঐসব নির্যাতনের মুখে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগ ঐসব নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুললেও হিন্দুরাজ্যের স্বপ্নে বিভোর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাতে আদৌ কর্ণপাত করেনি। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ঐসব সুপরিকল্পিত, ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ লক্ষ্য করে তাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ ব্যক্ত করে ঘোষণা করেন, "উপমহাদেশের এগারোটির মধ্যে সাতটি প্রদেশে আড়াই বছরের কংগ্রেস শাসন একথাই প্রমাণ করে যে এখানে কংগ্রেস শাসনের অধীনে সংখ্যালঘু মুসলমানদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সহ অস্তিত্বই মুছে ফেলার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।" তিনি ঐ সময় ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত জোরালো ও খোলাখুলিভাবে বলেন, "যে কেউ ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত সময়কালে ভারত-এর রাজনৈতিক দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাবেন কংগ্রেস-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এদেশ থেকে অন্য সকল সংগঠন নির্মুল করে একটি অতি নিকৃষ্ট ধরনের ফ্যাসিবাদী সংগঠন কায়েম করা। এমতাবস্থায় ভারত-এ একটি সরকার পরিচালনা করা অসম্ভব। এখানে গণতন্ত্রের অর্থ হচেছ হিন্দুরাজ্য। এই অবস্থা মুসলমানগণ কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।"

www.pathagar.com

(আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রফেসর জামিলউদ্দিন আহমদ সংকলিত কায়েদে আযম-এর বক্তৃতা ও লিখন থেকে সংগৃহিত)। ঐ কথার মধ্যে কায়দে আযম-এর মুখ দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের যে দাবি উচচারিত হয় তা হল ভারত-এ একটি সরকার চলতে পারে না। মুসলমানদের জন্য, তাদের অস্তিত্বের জন্য, কংগ্রেস ও হিন্দুদের নির্যাতন থেকে মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্য পৃথক সরকার প্রয়োজন। পরবর্তীতে পৃথক সরকারের দাবি মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবিতে পরিণত হয়।

বর্ণহিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষ

সুদুর অতীত থেকে হিন্দুদের মুসলমান বিদ্বেষ একটি ঐতিহাসিক সত্য। এর মূলে রয়েছে তাদের সমাজের মনগড়া বর্ণ ও শ্রেণী বিভাগ যা একজনকে অন্যদের নিচ জাতি, অস্পৃশ্য বলে গালি দেওয়ার, মানুষকে জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার দেয়। ভারতে যাদের নীচ বর্ণের হিন্দু বলে আখ্যায়িত করা হয় তাদের উপর নির্যাতন, অধিকার থেকে বঞ্চিত করা থেকে শুরু করে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হাজার বছর পূর্বেও যেমন সত্য ছিল তেমন আজও বর্ণ হিন্দু শাসিত ১০০ কোটি মানুষের দেশ ভারত-এ তা মহা সত্য। মুহম্মদ বিন কাসেম অত্যাচারী, মানবতার দুষমন, হিন্দুরাজ দাহির-কে পরাজিত করে যেদিন ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন, সেদিন থেকে শুরু হয়েছে বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচার থেকে মুক্তির তালাশে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী নীচ বর্ণের হিন্দুদের, ছোট জাতদের, অস্পৃশ্যদের মুসলমানরা বুকে তুলে নিয়েছে; ভাইয়ের মর্যাদা দিয়েছে, সমাজের উচচস্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্ণ হিন্দুদের কাছে এটাই হল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রথম ও প্রধান অভিযোগ। আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হল তারা প্রায় ৬০০ বছর ভারতের বুকে রাজত্ব করেছে, চন্দ্র তারকা খচিত পতাকাকে উড্ডীন রেখেছে। তাই হিন্দুরা প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কুটিলতার আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছে, নিজেদের নারীদের দিয়ে মুসলিম রাজা, বাদশা, সুলতানদের বিছানা দখল করেছে, মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের মনমগজ খরিদ করেছে এবং নিজের দেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়েও মুসলমানদের রাষ্ট্রশক্তি ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছে। মীরজাফর-এর আসল পরিচয় সিরাজউদ্দৌলা'র সিপাহসালার নয়, বরং তার প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে সে হিন্দু বেনিয়া, জমিদার, আমলা ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে তুচ্ছ মূল্যে ঈমান বিক্রয়কারী আত্মমর্যাদাহীন ভাড়াটিয়া কীট। হিন্দু কবি, সাহিত্যিকগণও উগ্র জাতীয়তাবাদের আগুনে ঘৃতাহুতি করে মুসলিম বিদ্বেষকে আরও তীব্রতর করেছে। বঙ্কিম চন্দ্রের সমস্ত সাহিত্যই এই উদ্দেশ্যেই রচিত। মুসলমাদের মনে আঘাত দেয়াই ছিল তার একমাত্র সাধনা।

www.pathagar.com

ভারত থেকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে পৌত্তলিকতার পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা কল্পে একচ্ছত্র হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান আবিষ্কার করে। বন্দে মাতরম গানটির কথা হল -

"বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে
ত্বংই দূর্গা দশ প্রহর ধারিনী ..."

রবীন্দ্রনাথ-ও এই মনোভাবের উর্দ্ধে উঠতে পারেনি। 'বিশ্বকবির' মুখ দিয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণী বের হয়নি, সাম্য, মৈত্রী ও মানবতার গান শোনানো হয়নি। তিনিও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের পক্ষে আহ্বান জানিয়েছে শতমুখে। তিনি তার শিবাজী উৎসব কবিতায় লিখেছেন -

"এক ধর্মরাজ্য পাশে খন্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দেব আমি
এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে, এ মহাবচন
করিব সম্বল।"

প্রায় ৬ শত বছরের মুসলিম শাসন ভারত-এ রামরাজ্য সৃষ্টির পথে ছিল অন্তরায়। মুসলমানরা মৌসুমী পাখীর মত সাইবেরিয়া থেকে এসে পেট ভর্তি করে শীতের শেষে নিজ আবাসস্থলে ফিরে যায়নি। আলেকজ্যান্ডার-এর মত দেশ জয় করে সম্পদের ভান্ডার লুঠ করে নিজ দেশে ফিরে যায়নি। মুসলমানরা এদেশ জয় করেছে। এদেশ ও দেশের মানুষকে আপন করে নিয়েছে। ভাষা ও বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে দেশের মানুষের সাথে মিশে গিয়েছে। অধিকৃত ভূখন্ডে দৃষ্টান্তমূলক ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা কায়েম করেছে যা সাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রজাদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে যার ফলে বিরাট সংখ্যক অমুসলিম প্রজা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে নিজেদের নৈতিক অবক্ষয়, অধঃপতন, চরম অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মুসলিম রাজশক্তিতে ভাটা পড়ে। সেই সুযোগে হিন্দু রাজারা মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ইংরেজদের আগমনে বিদেশীদের সহায়তায় মুসলিম শাসনকে নির্মূল করার নেশায় তারা মেতে ওঠে। সিরাজউদ্দৌল্লা'র পতন, টিপু সুলতান-এর বিপর্যয় সবই হিন্দু রাজন্যবর্গ, গাদ্দার মুসলমান নামধারী কতিপয় উচ্চাভিলাষী নবাব ও কুচক্রী ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, শঠতা ও নিমকহারামীর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব ও পটভূমি

মুসলমানদের পরাজয়ে হিন্দুদের স্বাধীনতা আসেনি, রামরাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে যেহেতু মুসলমানদের ক্ষমতাচ্যুত করে হিন্দু নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের হাতে রাজদন্ড তুলে দিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সেহেতু ইংরেজদের নিকট থেকে

www.pathagar.com

তারা পেয়েছে দাক্ষিণ্য ও অযাচিত পুরস্কার। ভারতীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ ইংরেজ শাসনের জন্মলগ্ন থেকে তাদেরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। মুসলমানরা অত সহজে ঐ নূতন প্রভুদের মেনে নিতে পারেনি। ইতিহাসের চাকা গড়িয়েছে, ভারতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জেগেছে। স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। চিন্তাশীল হিন্দু ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঐক্য গড়ার পথে অগ্রসরও হয়েছেন। একক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভূক্ত হয়ে তারা মুক্তির পথ বেছে নেওয়ার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু বর্ণ হিন্দুদের উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম স্বার্থের কঠোর বিরোধিতা ভারতের মুসলমানদের পৃথক প্ল্যাটফর্মে জমায়েত হতে বাধ্য করে। মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালী হওয়ার ফলে কোন কোন প্রাদেশিক পরিষদে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জিত হয় এবং তাদের দলীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কিন্তু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানদের উপর ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত যে তান্ডবলীলার ঝড় বয়ে যায় তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমানদের জানমাল আবরুর নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদের ভারত-এর বুকে দুইটি পৃথক সরকারের দাবি পৃথক আবাসভূমির দাবিতে পরিণত হয়। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোর-এ অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ-এর অধিবেশনে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী শের-ই-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক দশ কোটি মুসলমানের সর্বসম্মত দাবি নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করেন যা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে খ্যাত। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ ঃ-

"নিখিল ভারত মুসলিম লীগ-এর এই অধিবেশনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, এই দেশে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই কার্যকর কিংবা মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যদি বর্ণিত মূলনীতির ভিত্তিতে তা পরিকল্পিত না হয়ঃ যথা - ভৌগলিক নৈকট্য সম্বলিত ইউনিটগুলো প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় রদবদল পূর্বক সীমানা চিহ্নিত করে অঞ্চল গঠন করতে হবে এবং মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল যেমন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল সমন্বয়ে অবশ্যই স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে যেখানে অন্তর্তুক্ত ইউনিটগুলো স্বায়ত্বশাসিত ও সার্বভৌম হবে।"

"ইউনিট ও অঞ্চলগুলোতে সংখ্যালঘুদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত সংবিধানে পর্যাপ্ত, কার্যকর ম্যান্ডেটরি নিরাপত্তার সুনিশ্চিত বিধান সংযোজন করতে হবে এবং ভারত-এর যে সকল অংশে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে তাদের সাথে পরামর্শক্রমে তাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত কার্যকরী ও বাধ্যতামূলক নিরাপত্তার সুনিশ্চিত বিধান সংযোজন করতে হবে।"

www.pathagar.com

"এই অধিবেশন ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরূপ অঞ্চলগুলোর যাবতীয় ক্ষমতা যেমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বৈদেশিক বিষয়, যোগাযোগ, শুল্ক এবং প্রয়োজনমত অন্যান্য বিষয়ের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে উল্লেখিত মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে একটি সংবিধানিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আরও ক্ষমতা দিচ্ছে।"

জীবনের প্রথম দীর্ঘ সফর

ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সময় আমি হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। জীবনের প্রথম চার বছর শৈশব অবস্থায় গ্রাম্য পরিবেশে, তারপর ভেড়ামারা-তে বসবাস করা ছাড়া কোন বড় শহরে এমনকি নদীয়া জেলা সদরে যাওয়ার সুযোগও আমার তখনও পর্যন্ত হয়নি। মোল্লার দৌড় যেমন মসজিদ পর্যন্ত তেমনি আমার দৌড়ও সীমাবদ্ধ ছিল দাদীর বাড়ি ও পাবনা জেলা শহরে নানীর বাড়ি পর্যন্ত। বড় বোনের বিয়ে হলে বাইরে যাওয়ার সুযোগ হয়। বিহার-এর সিংহভূম জেলার চক্রধরপুর শহরে আমার বড় বোনের বিয়ে হওয়ায় বরপক্ষের সঙ্গে কয়েকজন মুরুব্বী সহ যেতে হল আমার বোনকে ভেড়ামারা-তে নিয়ে আসার জন্য। সেটাই ছিল জীবনের প্রথম দীর্ঘ সফর। কোলকাতা নেমে গঙ্গাতে ভাসমান ব্রিজের উপর দিয়ে হাওড়া স্টেশনে এসে নাগপুর এক্সপ্রেসে চড়ে ২০০ মাইল পার হয়ে চক্রধরপুর পৌঁছালাম। বাংলার দক্ষিণে বিরভূম জেলা সংলগ্ন বিহার-এর সিংভূম জেলার গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহর চক্রধরপুর একটি স্বাস্থ্য নিবাসও বটে। পথে পড়ে উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ যাওয়ার জন্য খড়গপুর রেলওয়ে জংশন যার প্লাটফর্ম ভারত-এর মধ্যে দীর্ঘতম। পথে পড়ে জামসেদপুর টাটা নগর যেখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সম্রাটের কর্মস্থল। পথে আরও পড়ে অপূর্ব বৃক্ষমালা শোভিত পাহাড়ের সারি এবং কৃষ্ণবর্ণের কোল, ভিল, সাঁওতাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন চেহারা ও রংয়ের হাজারো মানুষের বাসস্থান ও বিচরণ। তাদের কেউ ছিল সমতল প্রান্তরে, কেউবা ছিল পাহাড়ের নিচে, গায়ে ও চূড়ায়। আমাদের পাকশী'র মত চক্রধরপুর শহরেও রেলওয়ের একটি ডিভিশনাল অফিস ছিল। চক্রধরপুর শহরটি ছিল প্রায় চারদিকেই পাহাড় দিয়ে বেষ্টিত এবং ঐ পাহাড়ের মধ্য দিয়ে তৎকালীন ভারতের বৃহত্তম মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্র রাঁচি'র সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। পাহাড়গুলো দেখলে মনে হত খুবই কাছে কিন্তু হাঁটতে শুরু করলে পথ ফুরাতো না। আমরা যারা কনের পক্ষে গিয়েছিলাম তাদের জন্য আমার ভগ্নিপতি পাহাড় ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন। সেটাই ছিল আমার জীবনের প্রথম পাহাড় দর্শন এবং প্রথম পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা। পাহাড় কেটে তৈরী পাকা রাস্তা দুই ধারে শাল, সেগুন বৃক্ষরাজি। পূর্ব দিক থেকে পাহাড়কে পেঁচিয়ে রাখা রাস্তা দিয়ে উপরে উঠে আবার ঘুরে ঘুরে পশ্চিম দিক দিয়ে নেমে সমতলে এসে রঁচি'র পথ। পাহাড়ের চূড়ায় সাঁওতালদের একটি ছোট গ্রামে আমরা যাত্রাবিরতি করি। সেদিনের কৈশোর জীবনে বিচিত্র রংয়ের মানুষ ছাড়াও যে বিষয়টি আমাকে মুগ্ধ করেছিল তা হল

www.pathagar.com

সাঁওতালদের পাড়ায় অনেক স্থানে ক্ষুদ্র থেকে কয়েক হাত পর্যন্ত উচু পাথর যা মাটির নিচ থেকে চারাগাছের মত বের হয়ে গাছের মত বেড়ে চলে। জানা গেল ঐসব পাথর গাছের মত আস্তে আস্তে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বিছিন্ন গাছের মত সেগুলোরও উচচতা প্রাপ্তির সীমা থাকে। উপলব্ধি করলাম পাথরেরও প্রাণ আছে। পরিণত বয়সে ঐশী কিতাব আল-কোরআন পড়ে, বিজ্ঞান ভিত্তিক বস্তুর আলোচনা শুনে অবশ্য জেনেছি সব কিছুই জীবন্ত, সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে জীবনের স্পন্দন, আমার স্রষ্টা জীবন্তকে মৃত করেন, মৃতকে জীবন্ত রূপ দেন। কিন্তু কৈশোরে এসব জ্ঞানতো ছিল না, শুধু ছিল বিস্ময়ে চেয়ে থাকা এবং শোনা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা।

পাকিস্তান আন্দোলনে দূর্বার গতি

বাংলার প্রতিটি অঞ্চলে মুসলিম লীগ-এর সাংগঠনিক তৎপরতা বেড়ে চলল। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর আন্দোলনে জোয়ার এল। ভারত-এর অনান্য এলাকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের চাইতে বাংলাদেশ-এর সাধারণ মুসলিম জনতা, ছাত্র, কৃষক, মেহনতী মানুষ, বুদ্ধিজীবি সবাই পাকিস্তান আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিল প্রচন্ড আবেগ নিয়ে, ঐক্যের অস্ত্র নিয়ে, ঈমানী বলিষ্ঠতা নিয়ে এবং যে কোন কোরবানী ও ত্যাগ স্বীকারের প্রচন্ড আকাংখা নিয়ে। ভারত-এর অনান্য প্রদেশের মুসলমানরা ১০০ বছরের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ ছিল। বাংলার মুসলমানরা গোলাম ছিল ২০০ বছর। ১৭৫৭ সালের পর বাংলার মুসলমানরাই সবচাইতে বেশি নিগৃহীত হয়েছে। ইংরেজ ও তাদের প্রদত্ত সুবিধা ভোগকারী বর্ণ হিন্দুদের হাতে সম্পদ হারা হয়েছে, নিঃস্ব হয়েছে, চাকরিচ্যুত হয়েছে, মান-সম্ভ্রম খোয়া গেছে। মানুষের অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত , নীচ বর্ণের হিন্দুদের হাতেও প্রতি পদে পদে অপমানিত হতে হয়েছে। এর প্রতিকার নিহীত ছিল ভারতের বিশাল মানচিত্রে একটি নুতন স্বাধীন রাস্ট্রের অভ্যুদয়, নিজেদের দর্শন ও আদর্শ অনুযায়ী একটি ইনসাফ ও ভারসাম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবীর দেশসমূহের তালিকায় একটি নুতন নাম সংযোজন। তাই তিরিশ দশকে যে আন্দোলন ব্যাপ্তি পেয়েছিল, মুসলিম জনতার মন-মস্তিকে ঠাঁই পেয়েছিল, চল্লিশ দশকের শুরুতে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহিত হওয়ার পর সেই আন্দোলন দুর্বার গতি পেয়ে শুধু এগিয়েই চলেছে, পিছনে ফিরে তাকানোর প্রয়োজন হয়নি।

অনান্য স্থানের মত ভেড়ামারা সার্কেলে অর্থাৎ ভেড়ামারা, দৌলতপুর ও মিরপুর থানায় মুসলিম লীগ-এর সাংগঠনিক কাঠামোকে জোরদার করার জন্য কায়েদে আযম-এর নির্দেশে প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ সফর শুরু করেন। ভেড়ামারা সার্কেল মুসলিম লীগ-এর নেতৃবৃন্দও নিজেদের এলাকায় ব্যাপক সফর করে থানা ও ইউনিয়নে মুসলিম লীগ-এর শাখা গঠনে তৎপর হন।

www.pathagar.com

সেসময় দাবি উত্থিত হয় প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানের জন্য। ১৯০৬ সনে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলেও তখনও পর্যন্ত কোন জাতীয় বা প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ ঐ অঞ্চল সফর করেননি। তাছাড়া সংগঠনের শাখা-প্রশাখাও গড়ে ওঠেনি। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪১ সালের প্রথম দিকে দৌলতপুর থানার মথুরাপুরে মুসলিম লীগ-এর এক বিরাট জনসভায় যোগদানের জন্য মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁন ও তৎকালীন যুবক নেতা ও অনলবর্ষী বাগ্মী সৈয়দ বদরুদ্দোজা কলকাতা থেকে তশরিফ আনেন। ভেড়ামারা থানা যদিও সার্কেল হেডকোয়ার্টার ছিল কিন্তু দৌলতপুর থানা আয়তনে ও জনসংখ্যায় ভেড়ামারা থানার চারগুণ বড় হওয়ায় ঐ সভা দৌলতপুর থানার মথুরাপুরে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। কোলকাতা থেকে ভেড়ামারা-তে আসলে আমাদের বাড়িতেই মেহমানদের রাতভর বিশ্রামের আয়োজন করা হয়েছিল এবং মেহমানদারীর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা আমার আব্বার উপর ন্যস্ত ছিল। আমার মনে পড়ে মেহেমানদের জন্য সেদিন বাজারের সেরা ইলিশ মাছটি আমি দশ পয়সায় খরিদ করেছিলাম। পরদিন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে নিপীড়িত ও নির্যাতিত অথচ ঈমান দৃপ্ত তাওহিদী জনতার গগন বিদারী আল্লাহু আকবর, পাকিস্তান আন্দোলন জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে আগামী দিনের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। ঐ অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া মুসলমান, হিন্দু জমিদার, জোতদার ও বাবুদের শোষণে জরাজীর্ণ মুসলমান, অক্ষর জ্ঞানহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান, ইসলামী সংস্কৃতি ভুলে যাওয়া মুসলমানের মধ্যে ১৯৩৯ সালে যে জাগরণের বুদবুদ সৃষ্টি হয়েছিল তা ঢেউয়ের রূপ নেয় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের আগমনে। সেই আগুন ছড়িয়ে যায় শহরে, বন্দরে, বাজরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। সেই অন্দোলন শুধু মুরুব্বিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ছাত্র যুবকরাও সেই আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। ১৯৪২ সালের কোন এক সময় কুষ্টিয়া মহকুমা মুসলিম ছাত্রলীগ-এর সভাপতি ও সম্পাদক ভেড়ামারা হাইস্কুলে এসে মুসলিম ছাত্রলীগ-এর সংগঠন গড়েন এবং স্থানীয় সভাপতির দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেন। এখনও মনে পড়ে সেই উপলক্ষে ১০/১২টি শব্দে জীবনের প্রথম বক্তৃতায় আমার পা কেঁপেছিল, চেহারায় পরিবর্তন এসেছিল এবং কণ্ঠের আওয়াজ প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। ইতিপূর্বে বড়দের মিছিলে পাটখড়ির আগায় সবুজ পতাকা লাগিয়ে সঙ্গে চলা ও সবার সঙ্গে শ্লোগান উচচারণ করা ছাড়া আমার আর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না।

হাইস্কুলে পূর্বের চাইতে মুসলিম ছাত্রসংখ্যা বেশ কিছু বৃদ্ধি পেল। ভেড়ামারা বাজারে মুসলিম বসতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মুসলিম সরকারি কর্মচারী বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের সন্তানদের নিয়ে মুসলিম ছাত্রলীগ-এর দল ভারী হতে লাগল। বড়দের সাহায্য নিয়ে কলকাতা থেকে কবি, সাহিত্যিক ও গায়ক এনে আমরাও একমাত্র হাইস্কুলের ময়দানে জমকালোভাবে নবী (সা.) দিবস ,উদযাপন করতে শুরু করে দিলাম।

www.pathagar.com

ভারতের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে ও তাদের মধ্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব গড়ে তুলতে কলকাতার ফুটবল মাঠ বিজয়ী মোহামেডান স্পোর্টিং-এর অবদানও কম ছিল না। লীগ ও শিল্ডের খেলায় তাদের উপর্যপুরী বিজয় এই উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে আসাম থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত এমন গৌরবজনক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল যা তাদেরকে কংগ্রেস-এর বিরুদ্ধে সীসা ঢালা প্রাচীরের মত দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। খেলাধুলা থেকে শুরু করে লেখাপড়া, চাকরি, সাহিত্য, সাংবাদিকতা এমনকি প্রাদেশিক পরিষদে বলিষ্ট বক্তব্য প্রদান ও বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণাত্মক বক্তব্যের বিরুদ্ধে দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান ইত্যাদি সর্ব ক্ষেত্রে মুসলমানরা হীনমন্যতা পরিহার করে একটি জীবন্ত ও ঐতিহ্যবাহী জাতি হিসাবে ভারতের বুকে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে।

অধ্যায়-৩

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

সময় ও কাল থেমে থাকে না। আমার ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম ছিল না। ১৯৪৩ সালে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কোন রকমে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করি। আগেই বলেছি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসে প্রথম হওয়ার যে প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব ছিল ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে তাতে ভাঁটা এসেছিল এবং পরবর্তীতে সেই প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক মনোভাবও হারিয়ে গিয়েছিল। তখন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে গড়ে উঠার কোন বয়স, পরিবেশ বা শিক্ষাও আমার ছিল না। মিছিলের পিছনে হাঁটা আর অগ্রভাগের নেতা কর্মীদের শ্লোগানের প্রতিধ্বনি করা ছাড়া আমার আর কোন যোগ্যতা ছিল না। মুসলিম ছাত্রলীগ-এর নিম্ন পর্যায়ের সংগঠনে আমাকে সভাপতি করা হয়েছিল বটে তবে মহকুমা বা জেলা শহরে বা প্রাদেশিক রাজধানীতে ম্যাট্রিক পর্যন্ত আমার কোন যোগাযোগ হয়নি।

ষোল বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই আমি ম্যাট্রিক পাশ করি যদিও ফলাফলে গর্ব করার মত কিছু ছিলনা। পাশের পরই হঠাৎ আব্বা প্রকাশ করলেন আমাকে অলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়-এ অধ্যয়ন করতে হবে। কোলকাতায় ডাক্তারি পড়া আমলে আলিগড় থেকে পাশ করা তৎকালীন বাংলার জনৈক নেতার বক্তৃতা শুনে আমার আব্বা তার বিবাহের পূর্বেই মনের গভীরে একটি সৎ বাসনার স্থান করে রেখেছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রথম পুত্রকে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাঠাবেন। তিনি অনুমতি চেয়ে ভাইস চ্যান্সেলর-এর নিকট টেলিগ্রাম পাঠালেন। ত্বড়িৎ জবাব এল, "আপনার সন্তানকে অবিলম্বে পাঠিয়ে দিন"। সময়টা ছিল ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাস। পিতামাতা, ভাইবোনের পরিবেশ ছেড়ে, নিকট আত্মীয় ও স্বল্পসংখ্যক বন্ধুদের সান্নিধ্য ছেড়ে প্রায় ৯০০ মাইলের দূরত্বের এক লম্বা

www.pathagar.com

সফরে একদিন বাড়ি থেকে বের হলাম। আমার মেজ চাচাজান সার্কেল মুসলিম লীগ-এর সেক্রেটারি এবং তিনি উর্দু ও ফার্সী ভাষায় দক্ষ ছিলেন, আব্বা তার হাতে আমাকে সোর্পদ করলেন। সেটাই ছিল আমার জীবনের সবচাইতে কষ্টকর, ক্লান্তিদায়ক ও বিরক্তিকর সফর যা সম্পন্ন করতে লেগেছিল ৪ দিন ও ৪ রাত্রি। সফরের বেশিরভাগ সময় কেটেছিল প্ল্যাটফর্মের উন্মুক্ত স্থানে ট্রেনের অপেক্ষায় যা গন্ত ব্যস্থলের শেষ সীমা পর্যন্ত যাবে না তবে কিছুদূর হয়ত এগিয়ে দেবে আমাদের কামরার মধ্যে মাল বোঝাই বস্তার মত পুরে নিয়ে।

১৯৪২ সালে জাপান বার্মা দখল করে ভারতের আসাম প্রদেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ঐ সময় গান্ধী সহিংস পন্থা অবলম্বন করে ইংরেজদের বিরূদ্ধে ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন ব্রিটিশ-এর শত্রু জাপান তাদের বন্ধু হবে এবং ভারত জয় করে জাপানীরা সেটা তাদের হাতে তোহফা হিসাবে দান করবে। তাই তার পরামর্শ অনুযায়ী ১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ইংরেজদের বাধ্য করার জন্য 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার গান্ধী, জহুরলাল নেহেরু, মওলানা আজাদ থেকে শুরু করে বহু নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন কারাগারে নিক্ষেপ করে। সারা ভারত-এ উগ্রবাদী কংগ্রেস কর্মীরা 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব কার্যকরী করতে রেললাইন উপড়িয়ে, ব্রিজ ধ্বংস করে, রাস্তা ভেঙ্গে, সরকারি ভবনে আগুন জ্বালিয়ে হিংসার প্লাবনে সমগ্র দেশে তান্ডব সৃষ্টি করে। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন করতে বহু সময়ের প্রয়োজন ছিল। আমি যখন আলিগড় যাত্রা করি তখন হাওড়া-দিল্লী পথে সেখানে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাইতে রাজশাহী, আমনুরা, কাটিহার, লক্ষ্ণৌ, কানপুর হয়ে আলিগড় যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কাটিহার-এ ২৪ ঘন্টা প্ল্যাটফর্মে থাকতে হয়েছিল ট্রেনের অপেক্ষায়। এভাবে ৩ দিন পর লাক্ষ্ণৌ পৌছাই। আরও ২৪ ঘন্টা লেগেছিল আলিগড় পৌছতে। নুতন ব্রিজ, কালভার্ট ও রেল স্থাপনা বৃষ্টির কারণে বহু জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ও পার্শ্বের কাচা মাটি ধ্বসে যাওয়ায় ট্রেনের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। কিছুটা 'লাখে লাখে মারে সৈন্য কাতারে কাতার, শুমার করিয়া দেখে মাত্র কয়েক হাজার' প্রবাদটির মত। যাই হোক ৪ দিন পর রাত ১০ টার দিকে আলিগড় স্টেশনে পৌছে নিকটবর্তী এক সরাইখানায় আমি ও চাচাজান আশ্রয় নিই।

পরদিন সকাল ৮টার দিকে পাজামা ও শার্টের উপর কোর্ট চড়িযে লোকমুখে জিজ্ঞাসা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভবন স্যার সৈয়দ হল-এর সামনের দিক মেইন গেটে না গিয়ে টোঙ্গাওয়ালা আমাদের বিশাল হলের পিছনের দিকে নামিয়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা দশ বর্গমাইলের মত। কোথায় কোন অফিসের অবস্থান তা আমাদের আদৌ জানা ছিল না। চাচাজান উর্দুভাষায় একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে কি কোন বাঙ্গালী ছাত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে?"

www.pathagar.com

ছাত্রটি অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র ভাষায় উত্তর দিলেন, "অবশ্যই পাওয়া যাবে। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।" প্রায় ৪/৫টি ফুটবল মাঠের সম পরিমান জায়গা জুড়ে স্যার সৈয়দ হল প্রতিষ্ঠিত। সেখানে উত্তর অংশের দোতালায় ইউনির্ভাসিটি অফিস, বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বিভাগের ক্লাসরুম ও অবশিষ্ট স্থানগুলোতে ছাত্রবাস, স্ট্রাচে হল, লাইব্রেরি এবং দিল্লী'র শাহী জামে মসজিদের আদলে গড়া সুন্দর একটি জামে মসজিদ। মসজিদের এক পাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ চিরনিদ্রায় শায়িত।

ছাত্রটি আমাদের ইউনিভার্সিটি অফিসের নিচতলায় হোস্টেলের একটি কামরায় নিয়ে হাজির করলেন এমন একজন ব্যক্তিত্বের সামনে যিনি বাস্তব ক্ষেত্রে আমার মুরব্বি ও অভিভাবক হয়ে গেলেন। তার জিজ্ঞাসায় উত্তর দিলাম বাড়ি নদীয়া জেলায়। তিনি বললেন আমার বাড়িও নদীয়া জেলায়। মহকুমার কথা জিজ্ঞাসা করলে বললাম কুষ্টিয়া মহকুমা। তিনি বললেন আমার বাড়িও কুষ্টিয়া মহকুমায়। উপস্থিত অন্যান্য বাঙ্গালী ছাত্ররা সবাই ঐ প্রশ্নোত্তরে আনন্দ পাচ্ছিল দেশের মানুষের নৈকট্য লাভ করে। সবাই আমার চাচাজানকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে বসতে দিল। আমাদের সফরের উদ্দেশ্য জানতে পেরে যিনি এতক্ষণ প্রশ্ন করছিলেন তিনি চাচাজানকে বললেন, "আপনার কোন চিন্তা বা দুশ্চিন্তার কারণ নাই। সমস্ত দায়িত্ব আমাদের। যা করার আমরা করব। যিনি ঐ পুরো দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন যথারীতি অত্যন্ত আন্ত রিকতার সঙ্গে তা পালন করেছিলেন, পরবর্তীতে আমার বড় ভাই ও অভিভাবক হিসাবে আমাকে বিভিন্ন সময় সহায়তা দিয়েছিলেন এবং যার প্রতি আমি সবসময় শ্রদ্ধাশীল ছিলাম, তিনি ছিলেন কর্মজীবনে বাংলাদেশ হাইকোর্ট-এর প্রধান বিচারপতি, পরে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট-এর এ্যাপিলেট ডিভিশনের বিচারপতি মরহুম জাস্টিস বুহুল ইসলাম। কামরায় আরও যারা ছিলেন তাদের মধ্যে প্রাক্তণ স্পিকার শামসুল হুদা চৌধুরী'র কথা মনে পড়ে। পরদিন জনাব বুহুল ইসলাম সাহেব আমাকে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর-এর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর জনাব এ. বি. এ. হালিম উচচতায় মনে হল ৫ ফুটের অধিক হবেন না তবে গাম্ভীর্যে, ব্যক্তিত্বে ও আচরণে অতি উচ্চ শ্রেণীর। আসসালামু আলাইকুম বলে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অত্যন্ত দরদ মাখা সুরে তিনি বললেন, "তাশরীফ রাখিয়ে জনাব।" অর্থ বুঝতে না পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে ছিলাম। বসতেও সাহস হচ্ছিল না কেননা আমাদের দেশে ভাইস বা প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর দূরের কথা, একজন প্রফেসর-এর সামনেও ছাত্ররা চেয়ারে বসে না। পুণরায় একই বাক্য উচ্চারণ করায় আমি ভাঙ্গা গলায় অত্যন্ত নম্রস্বরে, অনেক কষ্ট করে শিখে আসা ইংরেজিতে বললাম, "অনুগ্রহ করে ইংরেজিতে বলুন আমি উর্দু জানি না।" উনি তাড়াতাড়ি বললেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত।" তারপর নামধাম জিজ্ঞাসা করলেন, ভর্তির অনুমতি দিলেন, ভর্তির সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরও উনি টেলিগ্রামের উত্তরে যে অনুমতি দিয়েছিলেন তার প্রেক্ষিতেই

www.pathagar.com

আদেশ দিলেন ভর্তি করে নেওয়ার জন্য। তারপর যা কিছু করার জনাব রুহুল ইসলাম সাহেব করেছেন। নাম করা হলগুলোতে কোন সিট না থাকায় আমার জন্য বরাদ্দ হল প্রায় ১ মাইল দূরে একটা ভাড়া করা বাড়িতে। কিন্তু জনাব রুহুল ইসলাম মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে আমাকে স্যার সৈয়দ হলে তার পাশে মাত্র ৩/৪ কামরা দূরত্বে নিয়ে আসলেন। আলিগড়-এ আমার ৬টি বছর ঐ কামরাতেই কেটেছে। আমার পোষাক তৈরীর জন্য জনাব রুহুল ইসলাম বিখ্যাত দরজি মোহাম্মদ আলি'র কাছে নিয়ে গেলেন। অনান্য পোষাক ঠিকই ছিল। শুধু দুইটা শেরওয়ানীর অর্ডার দিলেন। ওখানকার সেরা দরজি মোহাম্মদ আলি মজুরি নিলেন সেরওয়ানী প্রতি চার টাকা। মাপ নেওয়ার পর উনি ট্রায়াল দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বছর

পরদিন ক্লাসে গেলাম। ভারত-এর বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা ছাত্ররা বিভিন্ন ভাষাভাষী। তবে ইংরেজি ও উর্দু সাধারণ ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। অনেক পূর্ব থেকেই ক্লাস শুরু হওয়ায় আমি পিছিয়ে পড়লাম। উর্দু জানি না, ইংরেজি বলার অভ্যাস কোনদিন ছিল না। ম্যাট্রিকে ইংরেজি বই ছাড়া আর সব কিছু বাংলায় পড়েছি। অথচ সেখানে শিক্ষার পুরো মাধ্যম হল ইংরেজি। ব্রিটিশ ভারত-এ ফার্সি বন্ধ হয়ে ইংরেজি চালু হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানদের যে অবস্থা হয়েছিল আমার অবস্থাও সেরূপ হয়ে গেল। নিজের অযোগ্যতার কথা কাউকে বলতেও পারতাম না। ক্লাসেও কোন বাঙ্গালী ছাত্র নেই যে তার কাছে মনের কথা বলতে পারি। আমি ছিলাম সর্বত্রই শ্রোতা, বক্তা নই। তবে শুনতে শুনতে আমার মুখেও শিশুদের মত অশুদ্ধ উচচারণে কিছু কথা ফুটতে লাগল। আমার রুমে একজন বিহারী, একজন উত্তর প্রদেশী ও একজন পাঠান ছিল। রুমের কাজগুলো মিলেমিশে করার ট্র্যাডিশন ছিল। কমন ব্যবহার্য সবকিছু সবাই মিলে কেনা হত। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করা হত এবং কারও বাড়ি থেকে কিছু আসলে সবাই ভাগ করে খাওয়া হত। বাড়ি থেকে মাসের টাকা এলে সবাইকে একদিন ক্যাফেতে চা খাওয়ানো হত। ঐ মেলামেশায় আমার জড়তা ভাঙ্গতে সময় বেশি লাগলো না। অশুদ্ধ উর্দু অনেকটা শুদ্ধ হলো এবং ইংরেজিতেও কিছুটা উন্নতি হতে শুরু হল। নুতন পরিবেশ, কামরায় বাংলাভাষী কেউ নেই, জনাব রুহুল ইসলাম ও আরও যারা বাংলাভাষী হিসাবে অনান্য রুমে ছিলেন তারা প্রায় সবাই আমার মুরুব্বি ও ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। তাদের সঙ্গে খোশগল্প করার মত পরিবেশ ছিল না। অশুদ্ধ উর্দু বা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে ক্লাসেও উর্দুভাষীদের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথাবার্তা বলা যেত না। তাছাড়া পরিবেশকে নিজের পক্ষে গড়ে নিতে যে উদ্যম ও সাহসের প্রয়োজন ছিল তারও অভাব ছিল। ম্যাট্রিকে আমার এমন কোন ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট ছিল না যে সাধারণ ছাত্রদের দৃষ্টি আমার দিকে পড়বে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছিল না, ছিল একটি আন্দোলন।

www.pathagar.com

পলাশীর পতন ও সিপাহী বিদ্রোহের অসফলতার ফলে ইংরেজ ও হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের অক্টোপাশে ভারতীয় মুসলমানগণ যখন সম্পূর্ণ নিঃশেষিত ও চরম দুর্দিনের সম্মুখীন, তখন সময়োপযোগী ঐ আন্দোলনের দ্রষ্টা, দুরদর্শী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, আইনবিদ স্যার সৈয়দ আহমদ খান অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়া জাতির সামনে কান্ডারী হিসাবে আবির্ভূত হন এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে তাদের পথ দেখান। স্বাধীনতা রক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পরিচালিত দুইটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর আলিগড় আন্দোলনের ফলে কিছু সময়ের জন্য ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব স্তিমিত হলেও পরবর্তীতে ভারত-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং বিশেষ করে মুসলিম পূর্ণজাগরণে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় বহু সৈনিক ও সিপাহশালার উপহার দিয়েছে যারা বাংলাদেশ ছাড়া ভারত-এর সর্বত্র পাকিস্তান আন্দোলনের মর্মকথা মুসলিম জনতার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। বাংলাদেশ নিজেই একটি ইতিহাস সৃষ্টি করে যা ভাষার পার্থক্যের কারণে উর্দুভাষী আলিগড় ছাত্রদের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আলিগড় ছিল একটি গর্ব। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতীয় মুসলমানদের হৃদয়ের স্পন্দন তুল্য। পাকিস্তান আন্দোনের জন্য আলিগড় ছিল একটি উঁচু মিনার সদৃশ্য যেখান থেকে উত্থিত আওয়াজ ইথারে ভেসে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত।

এরূপ একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সাধারণ বুটিনে আমার প্রথম বর্ষের দিনগুলো ফুরিয়ে গেল। সকালে উঠে প্রস্তুত হয়ে ৭টায় ক্লাসে যাওয়া, ক্লাস থেকে ফিরে এস খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম শেষে হল কমনরুমে খবরের কাগজ পড়া, রেডিও শোনা, হলের পাশে অত্যন্ত দর্শনীয় চোখ জুড়ানো পার্কে বেড়ানো। কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের দশ বর্গমাইলের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন দুর্গ, এয়ারপোর্ট, বিজ্ঞান ভবন, আবাসিক এলাকা, মার্কেট, সুইমিং পুল, ঘোড়দৌড় মাঠ, খেলার মাঠ ইত্যাদি দর্শন করা ও রাতে ক্লাসের পড়াটা কিছুটা দেখে রাখাই ছিল আমার কর্মসূচী। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে প্রতিদ্বন্দ্বীতামূলক মনোভাব ছিল তা ফিরে এল না। নুতন উদ্যমও সৃষ্টি হল না। আমার মনে তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ করা একজন সাধারণ ছাত্রের চেয়ে বেশি বড় হওয়ার কোন আকাংখা সৃষ্টি হল না। প্রথম বর্ষ শেষে ৩ মাসের ছুটিতে তুফান মেলে হাওড়া কলকাতা হয়ে দেশে ফিরে আসলাম।

অপ্রত্যাশিত ঘটনায় জীবন নদীতে বহুমুখী স্রোতের আবির্ভাব

ছুটির শেষে ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস শুরু হলে আলিগড়-এ ফিরে গেলাম। ছুটিতে বাংলাদেশ-এর বিভিন্ন জেলায় আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্র হিসাবে সবাই আমাকে পূর্বের চাইতে কিছুটা বেশি গুরুত্ব দিল।

www.pathagar.com

বন্ধু-বান্ধবও উল্লাসিত হল। মুরুব্বি ও গুরুজনরা আমার ভবিষ্যত সম্পর্কে আশান্বিত হলেন। তখনও পর্যন্ত আমি পিতামাতার একমাত্র পুত্রসন্তান। তার একবছর পর আমার ছোট ভাই সৈয়দ আহমদ জন্মগ্রহণ করে। পিতামাতার মনে দারুন প্রত্যাশা। কিন্তু আলিগড়ে প্রথম বর্ষের দিনগুলো হেলায় কেটে গেছে। পড়াশুনার প্রতি আমি মনোযোগী হতে পারিনি এটা তাদের জানা ছিল না। তাছাড়া ৯০০ মাইল দূরত্বে আমার প্রথম বর্ষের দিনগুলো কিভাবে কেটেছে তা খোঁজ নেওয়াও সম্ভব ছিল না তাদের পক্ষে।

ছুটি কাটানোর শেষ পর্যায়ে আমার বয়স কৈশোর পার হয়ে যখন যৌবনের দ্বারপ্রান্ত ছুঁই ছুঁই করছে, তখনই ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। আমার অন্তরের গহীন কোণে নুতন ধরনের স্পন্দন শুরু হল যা আর কেউ জানল না। একমাত্র আমিই তা অনুভব করলাম। এখানে এসে আমার কলম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। জড়তা, সংকোচ আমার কলমকে বাধাগ্রস্থ করছে। আমার বংশধর বর্তমান প্রজন্ম আমার সম্পর্কে কি ধারণা করবে এসব চিন্তা দুঃশ্চিন্তা আমার কলমের গতিকে থামিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ঐ বয়সে আমার জীবন নদীতে যে বহুমুখী স্রোতের আবির্ভাব হয়, যে সুপ্ত প্রতিভা ঝিমিয়ে পড়া রকেটের বিস্ফোরণ হয়ে আমাকে ক্রমোন্নতির পথে ধাবমান করে তা অস্বীকার করি কি করে? আল্লাহ মেহেরবান যাকে তুলতে চান, কোন একটি উপলক্ষের মাধ্যমে তার মনে বড় হবার বাসনা সৃষ্টি করেন। বাসনার সঙ্গে যখন উদ্যম, ক্লান্তিহীন শ্রম, প্রতিদ্বন্দ্বতামূলক মনোভাব ও জয়ের নেশা মিলিত হয় তখন বিজয় দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র হিসাবে আমি আলিগড়-এ ফিরে যাই। তবে একাকী নয়, ভোরের শিশিরস্নাত গোলাপের পাঁপড়ীর মত এক কিশোরীর ছবিকে আমার মনের এ্যালবামে বেঁধে নিয়ে এলাম। যমুনা'র পূর্ব প্রান্তে একটি বড় শহরে সফরের কোন পরিকল্পনা না থাকলেও নিজের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সাথী হয়ে এক দূর সম্পর্কীয় সরকারী চাকরিজীবী আত্মীয়ের বাড়ি পৌছে রাতভোর ট্রেন সফর করে শেষ রাতে মেহমান হয়ে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাতভোর জাগার কারণে কিছুটা বেলা করেই ঘুম ভেঙ্গেছিল। চোখে ঘুমের জড়তা নিয়ে জেগে ওঠে প্রথম যার উপর দৃষ্টি পড়েছিল সে ছিল এক কিশোরী, কামরায় তার টেবিলে পাঠরতা। যে বয়সে 'লাজের' অলঙ্কার কিশোরীর দেহ ও মনে সঙ্কোচের আবরণ পরিয়ে দেয় সেই বয়সেরই একটি চিরস্মরণীয় মুহূর্তে আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হয়, তবে তা ক্ষণিকের জন্য। ঐ কিশোরী আমার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়া হলেও সেটাই ছিল আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। যে সময় আমাদের পরিবারের মেয়েদের উচচ শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না, সেই সময়ে ঐ কিশোরী ও তার বড় ভগ্নিরা বড় শহরের পরিবেশে উচচ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়ে শিক্ষা-দিক্ষায় অনেক পথ অতিক্রম করেছিল। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ দরজা অতিক্রম করবে ভাবাটা অচিন্তনীয় কোন ব্যাপার ছিল না।

www.pathagar.com

ক্ষণিকের দেখাটুকু শুধু চোখ দিয়েই দেখিনি, অন্তর দিয়েও দেখেছিলাম এবং মনের এ্যালবামের এক বিশেষ পৃষ্ঠায় ছবিটি বেঁধে ফেলেছিলাম। কৈশোর ও যৌবনের সেই সন্ধিক্ষণে এসে আমার হৃদয় মনে যে প্রতিক্রিয়া হল তা অন্যান্য সাধারণ ক্ষেত্র থেকে ব্যতিক্রমধর্মী। স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর পর আমার ক্রমোন্নতির পথ যেভাবে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও যার কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি, সেই রুদ্ধ দুয়ার, সেই মরিচা ধরা আগল ভেঙ্গে ফেলার এক দূরন্ত আকাংখা আমার মধ্যে জাগ্রত হল। আমার সমস্ত অনুভূতি প্রতি মুহূর্তে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল মনের এ্যালবামে সযত্নে রক্ষিত সেই ছবিটিকে জীবন্ত করে ধরে রাখতে হলে আমাকে বড় হতে হবে। শৈশবে হারিয়ে যাওয়া প্রতিভাকে চাঙ্গা করে ছাত্রজীবনেই উজ্জল চিহ্ন রাখতে হবে যা আমাকে সবার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। ইতিহাসের পাতায় দিগ্বীজয়ী রাজা বাদশাহদের মত বাহু বা অস্ত্রের বলে নয়, আমার সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করেই ঐ কিশোরীকে জয় করতে হবে। শুরু হল এক অন্তহীন সাধনা, বড় হবার এক দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রচেষ্টা।

দ্বিতীয় বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে শুরু হয় কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও পরিশ্রম। পিছনের যে দিনগুলো পড়াশুনায় মনোযোগী না হয়ে হেলায় কাটিয়েছি সেইসব পাঠ নুতন করে শুরু হল অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। ইংরেজি আয়ত্বের জন্য খবরে কাগজের সাহায্য নিলাম। ফাইনাল পরীক্ষার মাত্র কয়েক মাস বাকি ছিল। এর মধ্যে ২ বছরের কোর্স মোটামুটি তৈরী করতে সক্ষম হলাম। এত পিছিয়ে পড়েছিলাম যে গ্যালপিং স্পীডে প্রচেষ্টা চালিয়েও প্রথম শ্রেণী অর্জন করতে পারলাম না। উচচতর দ্বিতীয় বিভাগ পেলাম। তবে উদ্যম ও ইচছাশক্তি আরও বৃদ্ধি পেল। বি. কম. শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে প্রথম থেকেই মনেযোগী হলাম এবং ২ বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আমার বন্ধু মুরতজা যিনি আই. কম. শ্রেণীতে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন তাকে এক ধাপ পিছনে ফেলে আমি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করলাম। তারপর ক্রমাগত মই বেয়ে উপরের দিকে উঠেছি। এম. এ. অর্থনীতি-তে প্রিভিয়াস ও ফাইনালে প্রথম শ্রেণী এবং যোগফলে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলাম। এম. এ. অর্থনীতি'র সঙ্গে ডবল কোর্স হিসাবে এলএল. বি.-তে ভর্তি হয়ে একই সময়ের মধ্যে প্রিভিয়াস ও ফাইনালে দুইটা প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলাম।

উন্নতির জোয়ার, জীবনের খাল-বিলগুলোও ভরে দিল

উন্নতির জোয়ার শুধু বড় গাঙ্গে প্লাবন সৃষ্টি করল না, জীবনের খাল-বিলগুলোও পানি দিয়ে ভরে দিল। আমি শ্রোতা ছিলাম, বক্তা ছিলাম না। উর্দু বা ইংরেজিতে গুছিয়ে, শুদ্ধ উচচারণে কথা বলতে পারতাম না। কঠিন পরিশ্রম করে রুদ্ধদ্বার কক্ষে, খোলা ময়দানে ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস করলাম।

www.pathagar.com

১৯৪৫-৪৭ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটখাট পুরস্কার পেলাম। ১৯৪৯ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষে স্বাধীন ভারতের লাক্ষৌ এবং আলিগড়ে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বির্তক প্রতিযোগিতায় যোগদান করে জয়ের মালা কুড়ালাম। ১৯৪৯ সালে লাক্ষৌ-তে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিষয়ক বক্তৃতায় প্রথম স্থান, একই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মাস বিষয়ক বক্তৃতায় দ্বিতীয় স্থান এবং আলিগড়ে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজী বক্তৃতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলাম। উর্দুভাষীদের মধ্যেও ঐ ভাষাতে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন করলাম। আলিগড় ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের প্রথম সারির বক্তাদের মধ্যে আমার নামও স্থান পেল।

ভোরে উঠার অভ্যাস ছিল না। ভোর ৪ টায় ঘুম থেকে উঠে অনান্য কাজ সেরে নামাজ আদায় করে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য পার্কের মাঠে প্রত্যেক দিন ১ মাইল করে দৌড় অভ্যাস করা শুরু করলাম। নামাজে গাফেল ছিলাম। সেদিকেও আমার রব, প্রভু, মালেক আমাকে হেদায়েত দানে ধন্য করলেন। ভোর থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেশিনের মত জীবনটা অতিবাহিত হত। ঐসব অভ্যাস এখনও শক্তি সামর্থ অনুযায়ী চালু রেখেছি।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্রদের ইউনিয়ন হল ছিল একটি ঐতিহাসিক ও মর্যাদা মন্ডিত স্থান। চ্যান্সেলর থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবীদ, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, জননেতা যারাই বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসতেন তারা অবশ্যই ইউনিয়ন হলে ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ দান করতেন যার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়াও থাকত জীবনে বড় হওয়ার পথে প্রেরণা। ১৯৪৫ সাল থেকে ঐ ধরনের এমন কোন অনুষ্ঠান হয়নি যেখানে আমি যোগদান করিনি। ছাত্রদের ডাকার জন্য চিঠি বা নোটিসের প্রয়োজন হত না। ইউনিয়ন হলের শীর্ষে ঝুলানো ঘন্টার আওয়াজে সবাই বুঝে নিত কোন একটি বড় অনুষ্ঠান হতে চলেছে। অনুষ্ঠান যত বড় বা গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, ছাত্র প্রতিনিধি ইউনিয়ন ভাইস প্রেসিডেন্ট সভাপতিত্ব করতেন, অন্য কেউ নয়। পার্লামেন্টের স্পিকারের মত ছিল তার মর্যাদা। তার আসনটাই ছিল সবচাইতে বড়। ঐসব অনুষ্ঠানের শিক্ষা ও পরিবেশ আমাকে অযুত ধারায় প্রেরণা জুগিয়েছে। ঐ ইউনিয়নের প্রথম সারির বক্তাদের মধ্যেও আমার স্রষ্টা, প্রভু তার এই নগণ্য সৃষ্টির নাম লিপিবদ্ধ করে দিলেন। ঐ ইউনিয়ন থেকেই বিভিন্ন আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় আমাকে নির্বাচিত করে পাঠানো হত। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিয়েছিলেন। স্যার সৈয়দ হল-এর একটি অংশের জন্য আমাকে খাদ্যমন্ত্রী, একই হলের ডিবেটিং সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগের সেক্রেটারি হিসাবে নিয়োগ করা হয়।

www.pathagar.com

সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমি ঐসব দায়িত্ব পালন করেছি। প্রসঙ্গক্রমে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। খাদ্য বিভাগের প্রধানমন্ত্রী'র জন্য পৃথক ডেকচিতে স্পেশাল খাওয়ার তৈরী হচেছ দেখে ভিজিটিং বুকে এক কড়া মন্তব্য লেখেছিলাম। ফলে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঐসব দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যায়।

পাকিস্তান আন্দোলনের ছাত্র কর্মী

পড়াশুনা ও তার বাইরে বিভিন্ন ব্যস্তার মধ্যেও কিন্তু দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নিজের দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হই নি। পাকিস্তান আন্দোলনের একজন কর্মী হিসাবে নিজেকে গড়ার জন্য ১৯৪৫ সালের শুরুতেই বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর নিয়মিত পাঠক হিসাবে ভর্তি হয়ে নিজের শূন্য পাত্রকে ভরপুর করার চেষ্টার নিযোজিত হলাম। লাইব্রেরীতে বসে ইসলামের স্বর্ণযুগের কথা, ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস, পতনের কারণ, পাকিস্তান আন্দোলনের অপরিহার্যতা ইত্যাদি জানবার জন্য প্রচুর বই পড়েছি। ১৯৪৫ সালের প্রথম থেকে নিজের হলে ও ইউনিয়নে বক্তৃতার মঞ্চে পদচারণা শুরু করি। প্রতি বছর ৩ মাসের ছুটিতে দেশে এসে বিভিন্ন থানায় মুসলিম লীগ ও মুসলিম ছাত্রলীগ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতা করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করেছি।

ভারতে নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল ২৯শে আগস্ট (১৯৪৫) তারিখে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ভারত সরকার ঘোষণা করল ১৯৪৬ সালের প্রথম ৩ মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ভারতীয় উপমহাদেশে স্বতন্ত্র, স্বাধীন, সার্বভৌম আবাসভূমি 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার দাবিতে দশ কোটি ভারতীয় মুসলমানের নিকট শান্তিপূর্ণ রায় দানের সুযোগ গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান। ঐ সাধারণ নির্বাচনে আলিগড়-এর ৬০০০ ছাত্র বসে থাকেনি। ট্রেনিং নিয়ে বাংলাদেশ ছাড়া ভারত-এর সর্বত্র তারা ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তী আমলে পাকিস্তান-এর ডেপুটি স্পিকার মরহুম আলহাজ এ. টি. এম. আব্দুল মতিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠি ছিলেন। আমরা দুই জন চাঁদপুর-এর মতলব থানার মুসলিম লীগ প্রার্থী জনাব আব্দুস সালাম-এর কেন্দ্রে প্রচারভিযানে অংশগ্রহণ করি এবং ৩ সপ্তাহ অবস্থান করে প্রতিদিন গড়ে ৩/৪টি করে জনসভায় বক্তব্য রাখি। মুসলিম লীগ-এর বিপক্ষে ছিলেন বন্ধু মতিন সাহেবেরই চাচা জনাব শাহেদ আলি যিনি ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের ডেপুটি স্পিকার হিসাবে কার্যরত অবস্থায় আওয়ামী লীগ সদস্যদের দ্বারা নিহত হন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী জয়যুক্ত হয়েছিল। ঐ সময় আমি বি. কম. প্রথম বর্ষের ছাত্র।

সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের পর কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ দিল্লী'র জামিয়া মিল্লি কলেজ-এ ৭, ৮ ও ৯ই এপ্রিল (১৯৪৬) মুসলিম লীগ লেজিসলেচার'স কনভেনশন আহব্বান করেন ।

www.pathagar.com

৯ই এপ্রিল ছিল উম্মুক্ত অধিবেশন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাঙ্গালী মুসলিম ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা কয়েকজন উম্মুক্ত অধিবেশনে যোগদান করেছিলাম। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের বিশিষ্ট মুসলিম নেতাদের একই স্থানে সাক্ষাৎ পাওয়া ও তাদের তেজদীপ্ত জেহাদী বক্তব্য শ্রবণ করার সুযোগ ছিল আমার জীবনে একটি বিরল ঘটনা। বিশাল ডায়াসের উপর একক আসনে উপবিষ্ট কায়েদে আজম-এর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব এবং দশ কোটি মুসলমানের নিজস্ব স্বাধীন আবাসভূমি অর্জনের জীবন মরণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য কায়েদে আজম-এর উদাত্ত আহবানের বজ্রকণ্ঠের আওয়াজ আমার অন্তরে আজও শিহরণ জাগায়।

আলিগড়ে শেষের দুটি বছর

আলিগড়-এর শেষের দুইটি বছর কেটেছে ব্রিটিশ ভারতে নয়, হিন্দু ভারতে। ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলোকে মেনে নিয়ে ধৈর্য ধরে প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করি। আলিগড় ছিল ভারতের মুসলিম আন্দোলনের ঘাঁটি এবং ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের চারণ ক্ষেত্র। পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্ব থেকেই কোন হিন্দু নেতা বা কংগ্রেসপন্থী মুসলিম নেতা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেননি যদিও প্রচুর হিন্দু ছাত্র সেখানে অধ্যয়ন করত। ভারত বিভাগের পর সেখানে প্রথম শ্রেণীর উচচ মর্যাদা সম্পন্ন রাজনীতিবিদদের আগমন শুরু হয়। সেই সঙ্গে তাদের সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা গড়ার সুযোগ পাই। ইতিহাসে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অবদান সম্পর্কে পড়তে গিয়ে এমন কিছু হিন্দু নেতার সন্ধান পাই যারা ছিলেন উদার, হিন্দু মুসলিম ঐক্য ও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার মঙ্গলে বিশ্বাসী। কোন কোন হিন্দু নেতা ভারতে একচছত্র হিন্দু রাজ্য স্থাপনে বিশ্বাসী হলেও বুদ্ধি ও কূটকৌশল প্রয়োগে নিজেকে উদারপন্থী নেতা হিসাবে চিহ্নিত করতো। কিছু হিন্দু নেতা ছিল যারা মুসলমানদের আরব সাগর পার করে দিয়ে খেজুর ও মরুভূমির দেশে পাঠাতে চাইতো এবং কিছু হিন্দু নেতৃত্ব রয়েছে যারা মুসলমানকে হিন্দুতে রূপান্তরিত করতে না চাইলেও মুসলমানদের প্রভাবিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমান নেতাদের মুখ দিয়ে তাদের কথাগুলো প্রকাশ করাতে চাইতো। ঐ ধরনের নেতৃবৃন্দ ভারত স্বাধীন হবার পর আলিগড়ে এসেছিলেন। কেউ কনভোকেশনে, কেউ পরিদর্শনে। প্রথম এলেন স্বাধীন ভারত-এর প্রথম গভর্ণর জেনারেল রাজা গোপালাচারিয়া। কনভোকেশনে প্রধান অতিথি'র বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বললেন, "The founder of this great Institution carried the torch of education towards every nook and corner of this great country. First graduate of your Alma Mater was a Hindu..." এই সুবিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষার আলোকবর্তিকা এই বিশাল দেশের প্রতিটি কোণে কোণে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আপনাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট ছিলেন একজন হিন্দু।" কি এক সুদূরপ্রসারী অর্থবহ ঘোষণা! প্রতিষ্ঠাতার অনন্য সাধারণ উদারতা, সব সম্প্রদায়ের প্রতি তার ভালবাসা আমাদের ও জানা ছিল না। সমাবর্তনে যোগদানকারী কয়েক হাজার ছাত্র, শিক্ষক, সুধী সবাই অভিভূত হলাম প্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল-এর উদার মনের শ্রদ্ধা মিশ্রিত বক্তব্য শুনে।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরু এর কয়েক মাস পরেই এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর জাকির হোসেনের (পরে ভারত-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন) আমন্ত্রণে। উন্মুক্ত ময়দানে বর্ণিল সামিয়ানার নীচে সুসজ্জিত ও বর্ণাঢ্য লাল গালিচা সংবর্ধনার উত্তরে তার বক্তবে তিনি বলেন, "I have come back to Aligarh after a long interval. There was not only distance of space and time but there was distance of outlook also. I do not like to call Aligarh University as Muslim University as I do not like to call Banaras University as Hindu University" "এক দীর্ঘ বিরতির পর আমি আলিগড় এসেছি। এই (বিরতির) মধ্যে শুধুমাত্র সময় ও স্থানের দূরত্বই ছিল না, দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যান-ধারণারও দূরত্ব ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে অভিহিত করতে চাই না, যেমন করতে চাই না বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়কে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে।" ভারত-এ মুসলিম জাগরণে আলিগড়-এর ভূমিকায় নেহেরু'র যে ক্রোধ ছিল, আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের চারণভূমি হওয়ার কারণে তার যে বিদ্বেষ ছিল, তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে স্বল্প বাক্যে ইংরেজি ভাষায় সাবলীল ভঙ্গীতে তা প্রকাশ করলেন। নেহেরু তার কীর্তি Discovery of India-তে ইংরেজি ভাষায় যে পন্ডিত্য দেখিয়েছিলেন তার কিছু নমুনা আমরা আস্বাদন করলাম বটে কিন্তু স্বাধীন ভারতে তার মনের উদারতার সন্ধান পেলাম না।

তারপর আসেন স্বাধীন ভারত-এর কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী, প্রসিদ্ধ আলেম ও বাগ্মী, রাসুল (দ.)-এর জন্মস্থান মক্কা'র এক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষিত বংশের সুসন্তান, ভারত-এর আবহাওয়ায় লালিত পালিত মওলানা আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্বাচিত স্থানেই বর্ণাঢ্য আয়োজনে লালগালিচা সংবর্ধনার উত্তরে পিন পতন নিস্তব্ধতায় আল-কোরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ভারতের এককালীন কংগ্রেস সভাপতি বক্তব্য রাখলেন "হাম পহলে হিন্দি হ্যায়, উসকে বাদ হাম মুসলমান হ্যায়" "আমি প্রথমে একজন হিন্দি, তারপর আমি মুসলমান। সমাবর্তন শেষে ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী'র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেন্ট (ছাত্রদের নির্বাচিত প্রতিনিধি) বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "মোহতারাম মওলানা, আপনে আজ ফরামায়া হাম পহেলে হিন্দি হ্যায়,

www.pathagar.com

উসকে বাদ হাম মুসলমান হ্যায়, লেকিন ইসলাম হামকো এ শিখায়া হ্যায় কে হর বাচচা মুসলমান হো কর পয়দা হোতা হ্যায় লেকিন উনহুকো ওয়ালিদ উনহুকো ইয়াহুদি, ইসায়ী, মাজুসী বানাতা হ্যায়"- "শ্রদ্ধেয় মাওলানা, আপনি আজ বলেছেন যে আপনি প্রথমে ভারতীয় তারপর আপনি মুসলমান কিন্তু ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে যে, প্রতিটি শিশু স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তার পিতামাতা তাকে খৃষ্টান, ইয়াহুদী বা মাজুসী বানিয়ে দেয়।" মাওলানা ঐ বক্তব্যে এত উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে মাত্র আধ মিনিট বক্তব্য রেখে সংবর্ধনার অনান্য অনুষ্ঠানে যোগদান না করে তিনি পিছনের দরজা দিয়ে হল পরিত্যাগ করেন। মাওলানা তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, "আপ মুজকো ইসলাম শিখাতা হ্যায়, মুঝে মালুম হ্যায় আবতক ইহা হিন্দুস্তানকি দুষমন মওজুদ হ্যায়"- "আপনি আমাকে ইসলাম শেখাচেছন? আমি বুঝতে পারছি এখানে এখনও হিন্দুস্থান-এর দুশমন মওজুদ রয়েছে।" ঐ বক্তব্যে শ্রদ্ধেয় মাওলানা নিজেকে ছোট করলেন না বড় করলেন,তা বুঝতে পারা কারও জন্য আদৌ কষ্টকর ছিল না।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী আমলে ৮ বছর পর মওলানা আজাদ-এর একটি বেদনা ভারাক্রান্ত মনের উক্তি মনে পড়ে যায় যা ছিল শ্রদ্ধেয় মওলানার পরিবর্তিত চিন্তাধারার কথা। আবুল মনসুর আহমদ তার লেখা 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' বইয়ের ৩৪২ পৃষ্ঠায়, পাকিস্তান-এর কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী হিসাবে ভারত-এর শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদ-এর সঙ্গে ১৯৫৭ সালের ১৮ই জানুয়ারি তারিখে একান্ত সাক্ষাৎকারে যে হার্ট টু হার্ট কথাবার্তা হয়ছিল সেই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "পরদিন গেলাম মওলানা আজাদ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। বন্ধুবর হুমায়ুন কবির আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আর থাকিলেন সেখানে মওলানা সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি মি. খোরশেদ। আলাপ তিনজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় খুব প্রাণখোলা হইল যাকে বলে হার্ট টু হার্ট। প্রায় এক ঘন্টা থাকিলাম। কাজেই অনেক কথা হইল। পাক-ভারত সম্পর্ক, ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা, পাকিস্তান-এর ভবিষ্যত ইত্যাদি ইত্যাদি। অত বড় পন্ডিত, অত বড় আলেম, বিশ্ব রাজনীতির এত সূক্ষদর্শী বিচারক যেসব কথা বলিলেন, তার সবই শুনিবার ও চিন্তা করিবার বিষয়। সুতরাং গোগ্রাসে গিলিলাম। কিন্তু আমাদের নিজেদের আশু বিচার্য ও কর্তব্য সমন্ধে তিনি যা বলিয়াছিলেন, সেটাই মাত্র সংক্ষেপে স্মরণ করিতেছি। তিনি যা বলিলেন তার সারমর্ম এই ঃ আমি সারা অন্তর দিয়া, সমস্ত শক্তি দিয়া পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধীতা করিয়াছি। আজ তেমনি সারা অন্তর দিয়া পাকিস্তান-এর স্থায়িত্ব ও সাফল্য কামনা করিতেছি। শক্তি থাকিলে একাজে সহায়তাও করিতাম। পাকিস্তান না হইলে ভারতীয় মুসলমানদের ক্ষতি হইত, এটা আমি আগেও বিশ্বাস করিতাম না, এখনও করিনা। কিন্তু পাকিস্তান যখন একবার হইয়া গিয়াছে তখন ওটাকে টিকিতেই হইবে এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র হইতে হইবে।

www.pathagar.com

না হইলে শুধু পাকিস্তান-এর মুসলমানদের নয়, ভারত-এর মুসলমানদেরও ভবিষ্যত অন্ধকার। তোমরা পাকিস্তানীরা সর্বদা একথা মনে রাখিও। এজন্য দরকার পাক-ভারত-এর মধ্যে, বাস্তব বুদ্ধিজাত সন্মানজনক সমঝোতা। তার জন্য তোমরা তৈয়ার হও। আমি যতদিন আছি, নেহেরু যতদিন আছেন, এদিকে সহানুভূতির অভাব ততদিন হইবে না। চিন্তা ভারাক্রান্ত মনে মওলানা সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।" মনে হয় এতদিন হাজারো ঘটনা প্রবাহে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি'র বক্তব্যে মওলানা যে গোস্বা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন তা হয়ত স্তিমিত হয়েছে স্বাধীন ভারত-এর অভিজ্ঞতা থেকে।

অধ্যায়-৪

স্বাধীন থেকে সমাজের কাজে আত্মনিয়েগের সিদ্ধান্ত

আব্বা চেয়েছিলেন আমাকে চার্টার্ড এ্যাকাউনট্যান্ট বানাতে। সেজন্য তিনি আমাকে আই. কম. শ্রেণীতে ভর্তি করান। এই ব্যাপারে তখন আমার কোন চিন্তা-চেতনা ছিল না। বি. কম. ২য় বর্ষে যখন আমি ভাল ছাত্র হিসাবে অধ্যাপকদের কাছে প্রমাণিত হই, ক্লাসে প্রশ্ন করা বা প্রশ্নের উত্তর দানের ব্যাপারে আমার শিক্ষকদের মনে আমার দক্ষতা সম্পর্কে আস্থা স্থাপন করতে সক্ষম হই, তখন একদিন হাবিব ব্যাংক-এর বোম্বে হেড অফিস থেকে কমার্স বিভাগের প্রধান প্রফেসর এস. এম. শফির কাছে একটি চিঠি আসে। তারা প্রথম শ্রেণীর কমার্স গ্র্যাজুয়েট চায়। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালে যখন লেকচারার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ যোগদান করি, তখন যে বেতন নিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম তার ৩ গুণ বেতন হাবিব ব্যাংক ঘোষনা করে। প্রফেসর শফি আমাকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। তিনি বললেন, "সা'দ তুমি প্রথম শ্রেণীতে পাশ করার চেষ্টা কর, তুমি খুব মোটা বেতনের একটি চাকরি পাবে।" তখনকার সস্তার যুগে ৪৫০-৩২০০ টাকার বেতন স্কেলে চাকরি সোনার হরিণ। সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম প্রথম শ্রেণী পেলে হাবিব ব্যাংক-এ যোগদান করব, পড়াশুনা আর করব না। পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলাম। নিজের দেশে ছুটির মধ্যে ফলাফল জানতে পেরে চাকরির দরখাস্ত করি। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দেশ ভাগ হয়ে যায়। ভারত-এর বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি আরও একমাস বেড়ে নতুন সেশন সেবার অক্টোবর মাস থেকে শুরু হল। চাকরির দরখাস্ত করে ৩ মাস অপেক্ষা করার পরও কোন উত্তর এল না। অথচ ব্যাংকের চাকরি নিশ্চিত জেনে বোম্বে যাওয়ার জন্য সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিয়োগপত্রের অপেক্ষায় ছিলাম। এর মধ্যে হায়দারাবাদ (দক্ষিণাত্য) থেকে আমার অত্যন্ত দরদী বন্ধু (যার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের ৫০ বছর উদযাপন করেছি ১৯৯২ সালে তার করাচি'র বাড়িতে) মোস্তফা ইবনে ইব্রাহিম জানায় সে ব্যাংকের চাকরি পেয়ে বোম্বে রওনা হচেছ, বিশ্ববিদ্যালয়ে আর ফিরে যাবে না। আমার বন্ধু মোস্তফা ছিল জনৈক রাষ্ট্রদূতের নাতি।

www.pathagar.com

তাই সে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেও চাকরি পেল। কিন্তু আমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েও দরখাস্তের উত্তর পেলাম না। জীবনে চলার পথে আরেকটি বাঁক সংযুক্ত হল। সিদ্ধান্ত নিলাম কোন চাকরি করব না, এমন এক পেশা গ্রহণ করব যার মাধ্যমে স্বাধীন থেকে রুজী সংগ্রহ করা যায়, আবার একই সাথে সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করা যায়। পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে জনগণের সঙ্গে মিশে, তাদের সঙ্গে কাজ করে, বিশেষ করে কায়েদে আযম, কায়েদে মিল্লাত থেকে শুরু করে, প্রদেশে ও জেলা পর্যায়ে আইনজীবীদেরই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন দেখে চাটার্ড একাউনট্যান্ট হওয়ার ইচছা পরিত্যাগ করে আইন পড়ার সিদ্ধান্ত নিই সম্পূর্ণ এককভাবে কারও পরামর্শ না নিয়ে। পুনরায় আলিগড় ফিরে গিয়ে এম. এ. (অর্থনীতি) ও এল. এল. বি. ক্লাসে ভর্তি হই। আব্বার ইচছা পূরণ না হলেও তিনি এই ভেবে সন্তুষ্ট হন যে আমি বি. কম. পাশ করে চাকরিতে যোগদান না করে উচচতর বিদ্যার্জনের দিকে অগ্রসর হয়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষের দুইটি বছরে যে যশ, খ্যাতি কুড়িয়েছি এবং আমার উপর স্রষ্টার করুণা যেভাবে অঝরে বর্ষিত হয়েছে তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বি. কম. প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ায় বাংলা ও আসাম-এর মুসলমানদের একমাত্র মুখপত্র দৈনিক আজাদ পত্রিকায় আমার ছবি সহ 'আলীগড়ে বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব' শিরোনামে খবরটি প্রকাশিত হওয়ায় আমার পরিচিতি ব্যাপ্তি পেল। দেশ বিভাগ হলেও কয়েক বছর পাসপোর্ট, ভিসা চালু হয়নি। তাই আলীগড়-এ আমার শিক্ষাজীবন সম্পন্ন করার সুযোগ পেলাম। আমার বয়স ২২ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই শিক্ষা ও প্রবাস জীবন শেষ হল। এবার আমার জীবন সংগ্রামে নামার পালা। হৃদয়ের নিভৃতে রক্ষিত ৫ বছরের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পালা। মনের এ্যালবামে রক্ষিত ছবিটির জীবন্ত অবয়বকে সংগ্রামী জীবনের সাথী করে পাওয়ার পালা।

জীবনপথে বাঁক চড়াই ও উৎরাই

কিন্তু মানুষের জীবনের রাস্তা রাজপথের মত সরল নয়। এখানে রয়েছে প্রচুর বাঁক, চড়াই ও উৎরাই। এখানকার ট্রাফিক রুলস সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। এখানে মানুষের বুদ্ধি, পরিকল্পনা কোন নির্দিষ্ট আইন নিয়ে পথ চলা ইত্যাদি কোনটাই শেষ কথা নয়। এক মহা পরিকল্পনাকারী সবার অলক্ষে গড়ছেন ও ভাঙ্গছেন, ভেঙ্গে গড়ছেন আবার গড়ে ভাঙ্গছেন, নদীকে শুকিয়ে চর বানাচেছন, আবার চরকে নদীগর্ভে বিলীন করছেন, অসম্ভবকে সম্ভব করছেন আবার সম্ভাবনাকে নিমিষে ধুলিস্যাৎ করছেন, আলোকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচেছন, আবার অন্ধকারকে আলোকছটা দিয়ে দূর করছেন, আশু প্রাপ্য থেকে কাউকে বঞ্চিত করছেন, আবার দুষ্প্রাপ্যকে সহজলভ্য করছেন। এই খেলা চিরন্তন।

www.pathagar.com

কেন তিনি এমন করেন, কোন মুহূর্তে করেন, মানুষের বুদ্ধি, জ্ঞান, চিন্তা তার আদৌ কোন নাগাল পায় না।

পত্রিকায় আমার ছবি সহ সাফল্যের সংবাদ প্রচারে আমার পরিচিতি ব্যপ্তি পেল বটে কিন্তু আমার জীবন সাথী নির্বাচনে যেখানে আদৌ কোন ভীড় ছিল না সেখানে ট্রাফিক জ্যামের মত অবস্থার সৃষ্টি হল। বি. কম. রেজাল্টের কারণে তখনকার ম্যারেজ মার্কেটে আমি একটি ভাল পণ্য হিসাবে গণ্য হলাম। ২ বছর পর আরও দুইটি ডিগ্রী যোগ হওয়ায় রেজাল্টের পর জামাতা ক্রেতাগণ নিজেদের মধ্যে দর কষাকষি করে আমার অজান্তে পণ্য হিসাবে আমার মূল্য আরও বাড়িয়ে দিলেন। আব্বার সাথে পরিচিত সম্মানী উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দূর ও নিকটের আত্মীয়-স্বজন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরতা তাদের কন্যাদের জন্য প্রস্তাব পেশ করতে লাগলেন। সেই সাথে পণ্যের মূল্য হিসাবে একটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও ইনিয়ে বিনিয়ে পেশ করতে কসুর করলেন না। তারা অবশ্য কোন অন্যায় করেননি। সমাজে কমবেশি যা চালু রয়েছে তাই করেছেন। কিন্তু আমার হৃদয়, মন, চিন্তা-চেতনা অর্ধ দশক ধরে অন্যত্র আটকিয়ে ছিল। তাই কারও আবেদনে সাড়া দিতে পারি নি। আমি কোন ক্ষেত্রেই আগ্রহ প্রকাশ না করায় আব্বা মনক্ষুন্ন হলেন। কোথায় আটকিয়ে ছিলাম তাও তিনি জানতেন না। কেননা আমি শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করার অপেক্ষায় ছিলাম।

পত্রিকায় ছাপানো ছবি ও সাফল্যের সংবাদ আরও একজনের মনে ঝড় তুলেছিল যা আমি ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে জেনেছিলাম। আমার ১ বছরের সিনিয়র বন্ধু ডক্টর নিজামউদ্দিন যিনি আলীগড় থেকে এম. এ., এলএল. বি. করে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ. ডি. করেছিলেন, তার ছোট ভগ্নি সৈয়দা'র সাথে আমার বিয়ের প্রস্তাব দেন। সেখানে অবশ্য কোন নিলাম ডাক ছিল না বা আমাকে তারা পণ্য মনে করেননি। বন্ধু জানান খবরের কাগজে ছবি ও সাফল্যের খবর দেখে এবং ভাইয়ের নিকট থেকে মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমার কৃতিত্ব অর্জনের গল্প শুনে তার ভগ্নি উদাসী হয়েছে। সৈয়দা'র বাক্সে গোলাপের পাপড়ি সহ অতি সযত্নে আমার ছবি সহ খবরের পেপার কাটিং রক্ষিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে সৈয়দা'র মাতা মেয়ের মনের অবস্থা বুঝে ছেলের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আমি এক ব্যাথার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি, তাইতে তাদের মনের অবস্থা বুঝতে আমার কষ্ট হয়নি। আমার বন্ধুকে মনের অবস্থা খুলে বলেছি এবং অপারগতা প্রকাশ করেছি। শিক্ষাজীবন শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা দ্বিতীয়বার এ সম্পর্কে কোন কথা বলেনি।

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে আমি কুষ্টিয়া বার সমিতিতে শিক্ষানবীস হিসাবে যোগদান করি এবং স্থানীয় ডিগ্রী কলেজের প্রিন্সিপাল-এর অনুরোধে ২/১টি করে অর্থনীতি'র ক্লাস নিতে রাজী হই।

www.pathagar.com

চারিদিকে নিলাম খরিদ্দারদের ভীড় দেখে সিদ্ধান্ত নিই পছন্দের সাথীকে ঘরে তুলে এনে নিলাম খরিদ্দারদের ভীড় বন্ধ করে দিই। ইতিমধ্যে সফর উপলক্ষে কোন এক স্থানে স্বনামধন্য রাজনীতিবীদ, বাংলাদেশ প্রাদেশিক পরিষদের প্রাক্তন সদস্য, জেলা বোর্ড চেয়ারম্যান, সৈয়দা'র একমাত্র মামার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি তার ভাগ্নির জন্য বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমি তার কাছে আমার দুর্বলতার কথা ব্যক্ত করি। একজন দক্ষ রাজনীতিবীদ হিসাবে তিনি আমার ইচছা পূর্ণতা প্রাপ্ত হোক সেই আশা প্রকাশ করেন, আতিথেয়তার চরম প্রকাশ ঘটান এবং যাত্রার প্রাক্কালে একটি দাবি পেশ করেন। তিনি বলেন যদি কোন কারণে আমার ইচছা পূর্ণ না হয় তাহলে তিনি আমার সম্মতি পাওয়ার আশা করেন। আমি আবেগতাড়িত হয়ে বলি ৫ বছরের লালিত স্বপ্ন পূর্ণ না হওয়ার আমি কোন কারণ দেখি না, তবে যদি আল্লাহ তায়ালা তার কলমে মিলন লেখে না রাখেন তাহলে আমি না দেখেই আপনার ভাগ্নীকে জীবন সাথী হিসাবে গ্রহণ করব শুধু এই কারণে যে একটি নারী না দেখে ৪টি বছর আমাকে তার হৃদয়ে স্থান দিয়ে রেখেছে এবং এ পর্যন্ত মুরব্বিদের আনীত সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।

কিশোরীর আব্বা ও বড় ভগ্নিপতির তরফ থেকে আব্বার কাছে প্রস্তাব পেশ করা হল। প্রথমে কিছুটা সম্মতি প্রকাশ করে আব্বা পরে বেঁকে বসলেন এবং কোনক্রমেই তার সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হল না। আমার কাছে সেটা ছিল অকল্পনীয়। যে কঠোর শ্রম ও অধ্যাবসায়ের দ্বারা আমি আমার বংশের সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি করেছিলাম তাতে বিনা বাধায় ঐ পুরস্কার অবশ্যই আমার হাতে তুলে দেওয়া হবে সেই আত্মবিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু কিসে কি হয়ে গেল তা বোঝার বা জানার মত মনের জোর হারিয়ে ফেললাম। একটি চরম সিদ্ধান্তের জন্য আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন ছিল। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভাইস-চ্যান্সেলর-এর কাছে আমার ক্যারিয়ার উল্লেখ করে একটি চাকরির জন্য অনুরোধ করে চিঠি দিলাম। এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর আসল 'অবিলম্বে অর্থনীতি বিভাগে লেকচারার হিসাবে যোগদান করুন।' ১৯৫০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে বিভাগীয় প্রধান মি. আয়ার-এর কাছ থেকে আমার দায়িত্ব বুঝে নিলাম। সেদিন থেকেই অনার্সের ক্লাস নিতে শুরু করলাম। সৈয়দা'র চতুর্থ ভ্রাতা মতিঝিল-এর জেড. শাহ হাউসের মালিক মি. জাহাঙ্গীর শাহ সৌজন্য মূলক সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আমার আলীগড়-এর বন্ধুর ভাইও বটে সেদিক দিয়েও তিনি আমার সম্মানের পাত্র ছিলেন।

আমার মনে তখন প্রচন্ড অস্থিরতা। একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে অগ্রসর হলাম। কিশোরির পিতাকে দীর্ঘ চিঠি লেখে প্রথম দর্শনের দিন থেকে ঐ সময় পর্যন্ত সব কিছু জানালাম। আরও জানালাম মুরব্বিদের আপত্তি সত্ত্বেও নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে আমি আমার লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চাই। চিঠির উত্তর চাই 'হ্যাঁ' অথবা 'না'।

www.pathagar.com

উত্তর এল বিমর্ষ ভাষায় 'তোমাকে আমাদের মাঝে পাওয়া গৌরবের কথা। তোমার মুরব্বিরা আত্মীয় বিধায় তাদের অমতে হ্যাঁ বলতে পারছি না, আবার নাও বলতে পারছি না। আমি একটি নির্দিষ্ট উত্তর চেয়েছিলাম। কিন্তু তারা সৎ সাহস দেখাতে ব্যর্থ হলেন। সরাসরি এবং শেষ পদক্ষেপ হিসাবে আমি কিশোরীর মতামত চাইলাম। পিতার কাছ থেকে সুস্পষ্ট কোন উত্তর না পেয়ে তার উত্তরও অস্পষ্ট রয়ে গেল। আমার মনের এ্যালবামের ছবিটি ছবি হয়েই রইল। জীবন্ত হয়ে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য সামান্য সৎ সাহসটুকু প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হল। আমার সামনে তখন সূচীভেদ্য অন্ধকার। জীবনের এই পরিস্থিতিতে এসে মানুষ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। জীবন সাথী নির্বাচনের পালাটা সেই মুহূর্তে সমাপ্ত করে আমি আমার অস্থিরতাকে দূর করতে চাইলাম। সেই মুহূর্তে একটি না দেখা বিকল্প চেহারা, একটি উদাসী বালিকার চেহারা আমার হৃদয়ের আয়নায় মূর্ত হয়ে উঠল। মনে হল যে বালিকা ৪ বছর ধরে আমার ছবিকে সম্বল করে অন্যান্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে চলেছে, যে শুধু আমার আশায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে হয়ত সেই বালিকাই আমার মনের ঐ অস্থিরতা দূর করে তার দরদ ভরা মন ও সহনশীলতা দিয়ে আমার মনে শান্তির প্রলেপ মাখিয়ে দিতে পারবে। জেড. শাহ্ হাউজে খবর পাঠালাম সৈয়দা'র সঙ্গে আমার বিয়ে ১ সপ্তাহের মধ্যে আড়ম্বরহীনভাবে সেরে ফেলুন।

১৯৫০ সালের ৩রা মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়ে বিকালে নিজের অস্থায়ী আবাসে ফিরলাম। খবর পেলাম সৈয়দা-কে ফরিদপুর থেকে আনা হয়েছে। ঢাকা-তে তার মামার বাড়ি সন্ধ্যার পর অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। আমাকে বিয়ের স্থান চেনানোর জন্য একজন আত্মীয় এসেছেন। বিকালে ঘুমে এসে কিশোরীর বড় মামার লিখিত একটি চিঠি পেলাম যা ডাকপিয়ন বিকালে ডেলিভারি দিয়েছিল। কিশোরির মামা লেখেছিলেন, "দুলাভাই ভুল করেছেন। আমি থাকলে হয়তো এই ভুল হত না। সবাই রাজী, তুমি চলে এস। তোমার কিশোরীকে নিয়ে যাও।" চিঠি পড়ে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আত্মীয়টি বাহন নিয়ে আমার অপেক্ষায় ছিলেন। জীবনের আরেকটি চরম মুহূর্ত উপস্থিত হল। মনের মধ্যে হাজারো ব্যাথা তোলপাড় করছিল। ক্রমশঃ একটি নিরাপরাধ বালিকার চেহারা আমার মানসচক্ষে ভেসে উঠল। যে ৪ বছর অপেক্ষার পর আমার কথায় আশা-নিরাশার মাঝে দুর্বল চিত্ত নিয়ে ফরিদপুর-এর দিগনগর থেকে ঢাকা-তে পদার্পণ করেছে শুধুমাত্র তার ভাইয়ের মাধ্যমে শোনা আমার কথার উপর নির্ভর করে। হয়ত তার আত্মীয়রা তাকে সাজিয়ে দিয়েছে, বিয়ের আসনে বসিয়েও দিয়েছে। আড়ম্বরহীন বিয়ের মজলিসে হয়ত ক্ষুদ্র একটি সামিয়ানা টাঙিয়ে তার নিচে আমার বসার জায়গাও করা হয়েছে। হয়ত বর আগমনের অপেক্ষায় সবাই উৎকণ্ঠিত। মন কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে এগিয়ে এল। জবানের মূল্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিলাম। কিশোরীর মামাকে লেখলাম আপনার চিঠি আমার কাছে প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে দপ করে জ্বলে ওঠার সামিল। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে সৈয়দা'র পিতা তার কন্যার

www.pathagar.com

হাত আমার হাতে তুলে দিলেন। উভয়ে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে ছিলাম, উভয়ের চোখে ছিল অশ্রুর ফোটা। তার কোনটা ছিল আনন্দের, কোনটা নিরানন্দের, কোনটা সুখের, কোনটা দুঃখের, কোনটা পাওয়া, কোনটা না পাওয়ার অভিব্যক্তি তা অন্তর্যামীই জানেন।

অধ্যায়-৫

দাম্পত্য জীবনের শুরু

পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিতে গেলাম। এ বিয়েতে ছুটি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। হানিমুনেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিবাহোত্তর বিরাট কোন সম্বর্ধনার আয়োজনও ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮০ টাকা মাসিক বেতনে তাৎক্ষণিক সংসার পাতারও কোন সিদ্ধান্ত ছিল না। কিন্তু সেয়দা'র অশ্রুভেজা আবদারে ১৮০ টাকায় সংসার যন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে চালু করতে প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসে আমার সিদ্ধান্তকে পুনঃ বিবেচনা করতে হল। সৈয়দা স্বল্প শিক্ষিতা, সংসার জীবনে অনভিজ্ঞা বালিকা হলেও সামান্য কিছুদিনের মধ্যে অত্যন্ত নিকট থেকে উপলব্ধি করলাম লেখাপড়া কম জানলেও সংসারের হিসাব মেলাতে যেটুকু অঙ্ক জ্ঞানের প্রয়োজন তা সৈয়দা'র রয়েছে, নতুন সংসার সাজাতে যে সৌন্দর্যবোধের প্রয়োজন তাও তার রয়েছে, মিতব্যয়িতার জন্য যে অর্থনীতি জ্ঞানের প্রয়োজন তার ভিতরে সেটুকুর কোন কমতি নেই, সুগৃহিনী হওয়ার জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের যে পাঠ নিতে হয় সৈয়দা তাও পুরোমাত্রায় অর্জন করেছে তার পারিবারিক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে, ভাঙ্গা হৃদয়কে জোড়া লাগাতে যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও মনস্তত্ব জ্ঞানের প্রয়োজন তাও তার ভান্ডারে পুরোমাত্রায় বিরাজমান এবং পুরো সংসারকে শান্তির প্রলেপ মাখাতে সেবার প্রকৃতি দিয়ে গড়া যে দরদী মনের প্রয়োজন তা তার জীবনের একটি অমূল্য সম্পদ। ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে যদিও দাগের চিহ্নটুকু মুছে যায় না ভাঙ্গা মনও জোড়া লাগে যদিও চিহ্নটুকু বিলীন হয় না তবুও জীবনের বাস্তবতা, কর্তব্যের তাগিদ, বিকল্প হাতের স্নেহের পরশ মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়, ব্যাথার উপশম হতে, ব্যাথাকে ভুলিয়ে দিতে সহায়তা করে। প্রেম, ভালবাসা, বিরহ, জ্বরা, মৃত্যু সর্বক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। এছাড়াও পৃথিবী নামের এই গ্রহে মানুষের আগমনের উদ্দেশ্য, তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি, সংসার, পরিবার ও সমাজের প্রতি তার অঙ্গীকার সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা, এসব যাবতীয় না পাওয়া ও হারানোর বেদনাকে গুরুত্বহীন করে দেয়। আলীগড়-এর জীবন, বিভিন্ন ভাষাভাষীর সঙ্গে একত্রে বসবাস, সবার হাসি কান্নায় অংশগ্রহণ, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিতি, ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতার আন্দোলনের অন্যতম বারুদাগার মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশ সবকিছুই আমাকে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ ও গন্ডির সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে সমাজ সেবকের উপযোগী করে আমার মনকে তৈরী করতে সহায়তা করল।

www.pathagar.com

শিক্ষকতা জীবন

বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তাহে মাত্র ৫টি ক্লাস থাকায় অফুরন্ত অবসর ছিল। ঐ অবসর কাজে লাগিয়ে তৎকালীন দৈনিক অবজারভার পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখতে শুরু করলাম। লেখা প্রকাশের কয়েকদিন পর জনাব হামিদুল হক চৌধুরী'র বাসায় চায়ের দাওয়াত পেলাম। তিনি লেখার প্রশংসা করে আরও লিখতে বললেন। সেই সূত্রে অনেক সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় হল। কুষ্টিয়া জেলার ৩ মহকুমার প্রচুর পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তি ঢাকা-তে চাকরি, ব্যবসা ও অন্যান্য প্রয়োজনে বসবাস করতেন। কিন্তু তারা ছিলেন বিচ্ছিন্ন। কুষ্টিয়া জেলা ছিল সব দিক দিয়ে অনুন্নত। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে কুষ্টিয়া জেলা সমিতি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হল। ঐ ব্যাপারে যাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে পাওয়া গেল তারা সবাই আজ এই নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমার সিনিয়র এ্যাডভোকেট জনাব জহুরউদ্দিন, নারায়নগঞ্জ-এর পাট ব্যবসায়ী জনাব ময়েনউদ্দিন, চুয়াডাঙ্গা'র এ্যাডভোকেট আয়ুব আলি, মেহেরপুর-এর এ্যাডভোকেট প্রাক্তন এমপি আবুল হায়াত, কুষ্টিয়া'র এ্যাডভোকেট আব্দুল কাউয়ুম সহ আরও অনেকের সম্মিলিত উদ্যোগে ১৯৫০ সালে ঢাকা'র উকিল বার লাইব্রেরিতে কুষ্টিয়া জেলা সমিতি গঠন করা হয়। জনাব এ্যাডভোকেট জহুরউদ্দিন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও আমি প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি হিসাবে নির্বাচিত হলাম। কুষ্টিয়া জেলার (অবিভক্ত) নানাবিধ সমস্যা সরকারের কাছে তুলে ধরা, দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য জনমত গঠন করা, গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করা, মাঝে মাঝে প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করে নিজেদের পরিচিতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি নানাবিধ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে সম্পাদক হিসাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সামান্য কিছুদিনের মধ্যে পরিচিতি পেলাম। ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করলাম। মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা - প্রথম ক্লাসে যোগদান করার পূর্বে মি. আয়ার উপদেশ দিলেন "ক্লাসে কাউকে প্রশ্ন করতে দেবেন না। টিউটোরিয়াল ক্লাসে প্রশ্নের উত্তর দেবেন।" বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য আগত তরতাজা ছাত্র (শিক্ষকতার প্রথম দিন) হিসাবে ঐ উপদেশ আমার মনঃপুত হল না। পিওন গিয়ে আমাকে ক্লাসের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। আমি ডায়াসে উঠতেই প্রায় ৬০ জোড়া চোখ আমাকে বিভিন্ন এ্যাঙ্গেল থেকে ক্যামেরা ছাড়াই চোখের লেন্স দিয়ে ছবি তুলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল introduction please. আমি তখন ২২ বছরের যুবক। পরনে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষাক, বিদেশে পড়াশুনার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই অপরিচিত। তাছাড়া পদ্মা-যমুনা পার হয়ে ঢাকাতে আমার অবস্থান জীবনে ঐ প্রথম। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিলাম, "I have come here to play the role of Mrs. Mukherjee". আমার পোষাক ও

www.pathagar.com

বক্তব্যের বৈপরিত্য দেখে হাসির রোল উঠল। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি ১৯৫০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি। তার ২/৩ দিন পূর্বে ঢাকাতে আসি। তখন একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হওয়ায় ডিপার্টমেন্টের অন্যতম লেকচারার মিসেস মুখার্জী পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারত চলে যান। তার শূন্যস্থান পূরণ করার জন্যই মি. আয়ার আমাকে পাঠান ক্লাস নিতে। প্রথম দিন ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে গল্প করে, আমার নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সময় কেটে গেল। পরের দিন থেকে পড়ানো শুরু হবে এবং আমার পদ্ধতি কি হবে তাও জানিয়ে দিলাম। বললাম, "শিক্ষকের কর্তব্য হচেছ যে বিষয়টা পড়ানো হবে তা ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যেন ছাত্র-ছাত্রীদের জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং পরে বই পড়ে ঐ বিষয়ে পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করা যায়। আমি পুরো বিষয় ক্লাসে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। কেউ বুঝতে না পারলে বারবার প্রশ্ন করবে। জানা থাকলে উত্তর দেওয়া হবে আর জানা না থাকলে পরদিন দেখে এসে উত্তর দেওয়া হবে। 'তোমরা যত ইচছা আমাকে প্রশ্ন করতে পার, তবে আমার মেরিট টেস্ট করার জন্য প্রশ্ন করো না। আমাকে প্রশ্ন না করলে আমিই তোমাদের প্রশ্ন করব তোমরা বিষয়টি বুঝলে কিনা জানার জন্য।" প্রথম ২/১ দিন লেকচার দেওয়ার পর মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতাম, "বুঝতে পেরেছ?" যদি কেউ বলত 'হ্যাঁ স্যার বুঝেছি," তখন তাকে পাল্টা প্রশ্ন করতাম, "কি বুঝেছ বল।" কেউ না বুঝেই আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলত, 'হ্যাঁ স্যার বুঝেছি।" তাদের জন্য পরিস্থিতি করুণ হত। ক্লাসে সবার মধ্যে লজ্জিত হতে হত। সেজন্য সবাই বুঝল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চাইতে প্রশ্ন করাই ভাল। এতে আমারও লাভ হল। কেননা বিষয়টির কিছু না জানলে প্রশ্ন করা যায় না। শিক্ষক প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারেন ছাত্রের মনযোগীতা ও গ্রহণ করার ক্ষমতা কোন পর্যায়ের। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ক্লাসগুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। অন্য ক্লাস থেকেও ছাত্ররা এসে ভীড় জমাতে লাগল। আমার অভ্যাস ছিল গোটা সিলেবাস সম্পর্কে ২/৩টি লেকচারের মাধ্যমে একটি সামগ্রিক ধারণা দিয়ে পরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়া।

ইচছা ছিল আইন পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করা কিন্তু হয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। ৬ মাস পর মানসিক অবস্থা শান্ত হল। মনের তাগিদ এল সাময়িক বিচ্যুতিকে শুধরে নেওয়ার এবং সেই সুযোগও আসল নাটকিয়ভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পে স্কেলে পরিবর্তন আসল। প্রারম্ভিক বেতন তিন গুণ হল। তবে সেই সঙ্গে ৫ বছরের বাধ্যতামূলক চাকরির কড়াকড়ি আরোপ করা হল যা আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। জুলাই মাসে পদত্যাগ করে জগন্নাথ কলেজ-এর অর্থনীতি বিভাগের প্রধান হিসাবে অগাস্ট মাসের ১ তারিখে যোগদান করলাম। বেতন বৃদ্ধির মুখে পদত্যাগ শুনে সবাই আশ্চর্য হলেন। ডিন ডক্টর শাহদানী'র ভাইপো আমার সঙ্গে আলীগড়-এ পড়ত। ডক্টর শাহদানী নিজেও ইউপি'র বাসিন্দা ছিলেন। তিনি আমাকে পুত্রের মত স্নেহ করতেন।

www.pathagar.com

তিনি স্বয়ং বাসায় ছুটি এসে প্রশ্ন রাখলেন, "আরে ভাই বাত কিয়া হ্যায়, তুমনে কেউ রিজাইন দি?" আমি বুঝিয়ে বললাম, "কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ নয়, কাজটা করেছি পেশা পরিবর্তনের জন্য, আইন পেশা গ্রহণের জন্য।" তিনি সন্তুষ্ট হলেন, দোয়া করলেন। ছাত্র-ছাত্রীরা দৌড়ে এল। তাদেরও ঐ একই প্রশ্ন। একই উত্তর শুনে তারা সন্তুষ্ট হল বটে তবে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা আমাকে বিদায় দেওয়ার অঙ্গীকার করল। মাত্র ৬ মাসের মধ্যে ছাত্রছাত্রী ও আমার মধ্যে যে বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল তার স্বীকারোক্তি পেলাম অনুষ্ঠানে তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে। বেশ কিছু বই ও সোনা দিয়ে গড়া একটি স্মরণিকা তারা তাদের হৃদয়ের নির্যাস হিসাবে আমার হাতে তুলে দিল। সামান্য কয়টা দিনের চাকরিতে যেসব ছাত্রছাত্রীকে পেয়েছিলাম তাদের অনেকের সঙ্গেই পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ও কুষ্টিয়া'র মাটিতে সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের কেউ হয়েছেন সিএসপি, কেউ হয়েছেন হাইকোর্ট-এর বিচারপতি, কেউ হয়েছেন আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ইত্যাদি।

জগন্নাথ কলেজে এসে সন্ধ্যার পর রীতিমত ক্লাস নিতে শুরু করলাম এবং দিনের বেলায় সিনিয়র এ্যাডভোকেট জনাব জহুরউদ্দিন সাহেবের অধীনে শিক্ষানবিশ হিসাবে কখনও তার চেম্বারে ও কখনও তার সঙ্গে বিভিন্ন আদালতে হাজিরা দিতাম। আমার সিনিয়র শুধুমাত্র সেশন কেস করতেন যেটার মধ্যে থ্রিল ছিল, উত্তেজনা ছিল, প্রতিটি কেসের মধ্যে এক একটি নাটক মঞ্চস্থ হত। এসব মানুষের জীবনেরই এক একটি অধ্যায়ের এক একটি ঘটনা যেখানে হাঁসি ও কান্না উভয়ই বিরাজমান। এই নুতন জীবনে প্রথমেই যে ছাপ পড়ল আমি অলক্ষে তাই অনুসরণ করছি বর্তমানে, বলতে গেলে পেশা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে। আমার ৫০ বছরের পেশা জীবনে অন্ত তঃ তিন যুগ শুধুমাত্র সেশন কেসেই নিজেকে নিয়োজিত রেখেছি। শিক্ষানবিশ থাকা আমলে এদেশে আইনের জগতে যারা ছিলেন উজ্জল তারকা সদৃশ, যাদের মোকদ্দমা পরিচালনার কৌশল, সওয়াল জবাব, হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য কিংবদন্তীর মত মানুষের মুখে মুখে, যে কোন কোর্টে তাদের উপস্থিতি আমাকে প্রচন্ডভাবে আকর্ষণ করত। জনাব রেজাই করিম, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব হামুদুর রহমান (পরবর্তীকালে পাকিস্তান-এর প্রধান বিচারপতি), জনাব বি.এ সিদ্দিকী (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান-এর প্রধান বিচারপতি), জনাব আব্দুস সালাম খান কুষ্টিয়ার এ্যাডভোকেট খান বাহাদুর সামসুজ্জোহা, এ্যাডভোকেট মাহতাব উদ্দীন আহমদ, এ্যাড মোঃ মহসিন এবং আরও যারা এদেশের আইন পেশায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাদের অনেক কিছুই আমি অনুকরণ করার চেষ্টা করেছি।

শেখ মুজিবের সঙ্গে পরিচয়

১৯৫০ সালের অগাস্ট থেকে দিনের বেলায় শিক্ষানবীশ হিসাবে কোর্টে অবস্থান, সন্ধ্যার পর জগন্নাথ কলেজ-এর বিভিন্ন শ্রেণীতে ক্লাস গ্রহণ, অবসর সময়ে পাকিস্তান অবজারভার-এ লেখা পাঠান, মাঝে মাঝে কুষ্টিয়া জেলা সমিতির সামাজিক

www.pathagar.com

ও সাংগঠনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং সময় সুযোগ মত আমার ও সৈয়দা'র আত্মীয়-স্বজনের বাসায় গিয়ে কিছু সময় কাটান ইত্যাদি প্রোগ্রামের মধ্যেই জীবন কাটছিল। তখনও কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করিনি বা যোগদান করার কোন তাগিদও অনুভব করিনি। ১৯৫২ সালের কোন এক সময়ে, খুব সম্ভব প্রথম দিকে মি. জাহাঙ্গীর শাহ বাসায় পায়জামা, পাঞ্জাবী পরিহিত এক বলিষ্ঠ যুবককে আমার বাসায় নিয়ে এলেন যার চেহারা কিছুটা বৈশিষ্টতামন্ডিত ছিল। তিনি তার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে সৈয়দা-কে মা বলে সম্বোধন করে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। আমিও কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মিঃ শাহ পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি ছিলেন শেখ মজিবর রহমান, সম্পর্কে আমার মামাশ্বশুর হন। পরিচয় পেয়ে তাকে যথাচিত সম্মান প্রদর্শন করলাম। রাজনীতিতে তার সক্রীয় অংশগ্রহণের কথা খবরের কাগজে প্রকাশিত হলেও ঐ সময় পর্যন্ত আমার আগ্রহ ছিল পাকিস্তান ও পূর্ব-পাকিস্তান-এর প্রথম সারির নেতাদের সম্পর্কে। তাছাড়া সেটাই ছিল আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। আমার মামা শ্বশুর চৌধুরী শামসুদ্দিন আহমদ বাদশা মিয়া'র সঙ্গে শেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। সেই সুবাদে আমিও আত্মীয়ের আত্মীয় হিসাবে তাদের নিকটবর্তী হলাম। শেখ সাহেবের কথাবার্তা, সৈয়দা'র প্রতি তার অত্যধিক স্নেহ, আমার প্রতি তার স্নেহমাখা প্রশংসিত দৃষ্টি এবং তার অত্যন্ত খোলামেলা সহজ সরল ব্যবহার আমাদের উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু আকর্ষণ সৃষ্টি করল। পরবর্তী আমলে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি, রাজনৈতিক ময়দানে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করেছি। পরবর্তীতে অনৈক্য সৃষ্টি হয়ে দুই জনের পথ দুই দিক চলে গেছে, কিন্তু আমাদের সৌজন্য বোধের ঘাটতি পড়েনি এবং সৈয়দা'র প্রতি তার স্নেহেরও কোনদিন কোন কমতি দেখিনি। ,অনৈক্যের দিনগুলোতে তিনি কুষ্টিয়া-তে আমার বাসায় এসে মুচকি হেসে "আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি" বলে আমার পাশ দিয়ে হেঁটে দোতলায় গিয়ে সৈয়দা'র সঙ্গে দেখা করে গেছেন। মানুষ হিসাবে শেখ সাহেবের সেটা ছিল একটি বিশেষ দিক।

বাংলা ভাষা আন্দোলন

শিক্ষানবীশ হিসাবে আদালতে হাজিরা দেবার কাজ আমার ১৯৫১ সালের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। ওকালতি করার জন্য যে সনদের প্রয়োজন তাও বছর শেষে পেয়ে গেলাম। কুষ্টিয়া-তে ফিরে গিয়ে সেখানেই পেশা জীবন শুরু করব এবং পরিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করব সিদ্ধান্ত থাকায় ঢাকা কোর্টে যোগদান না করে ১৯৫২ সালের অগাস্ট মাসের প্রথম দিকে পুনরায় কুষ্টিয়া জেলা সদরে ফিরে যাওয়া সাব্যস্ত হল। ঐ দুই বছর ছিল আমার প্রস্তুতির সময়। তাই রাজনীতির ময়দানে পদচারণা এড়িয়ে গেছি। কিন্তু ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা'র বুকে যে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হল তাতে জগন্নাথ কলেজ-এর

www.pathagar.com

ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে আমিও রাস্তায় নেমে এলাম। বাংলা ভাষার যথাযোগ্য মর্যাদার দাবিতে আমিও সোচচার হলাম। ভাষা আল্লাহ তায়ালার দান। পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় চার হাজার ভাষা রয়েছে। পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের একটি বিশাল অংশ বাংলা ভাষায় কথা বলে। এই ভাষায় গড়ে উঠেছে এক বিশাল সাহিত্য সম্পদ। এদেশের একক রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে অথবা একাধিক রাষ্ট্রভাষা হিসাবে এই ভাষার অবশ্যই গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান-এর সৃষ্টিলগ্নে শাসকরা শুধুমাত্র গোঁড়ামী ও হঠকারিতার কারণে যে প্রচন্ড ভুলটি করলেন এবং বিদ্বেষ ও ভবিষ্যত বিচ্ছেদের যে বীজটি বপন করলেন তাই শেষ পর্যন্ত দুঃখজনক ইতিহাসে রূপান্তরিত হল। পাকিস্তান-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার মাতৃভাষা বাংলাকে একক নয় অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি আদায়ের দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা'র রাজপথে যে রক্ত ঝরে তা হঠাৎ বা আকস্মিক কোন ঘটনা ছিল না। মুসলিম শাসনের অবসানে ইংরেজি ভাষা চালু করার ফলে এদেশের শিক্ষিত ও উন্নত মুসলিম জাতি যেভাবে মুর্খ জাতিতে পরিণত হয়ে সবদিক দিয়ে পিছিয়ে গিয়েছিল সেভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শাসকদের পাকিস্তান-এ উর্দু ভাষাকে একক রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। শিক্ষিত মানুষ ও ছাত্র সমাজের মনের কোণে কালো মেঘের মত জন্ম নেয় ভাষা সচেতনতা যা পরবর্তীতে প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড়ের রূপ গ্রহণ করে।

সরকারি দলের বিভিন্ন মহলের মধ্যে উর্দু-কে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণের একটি প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর তৎকালীন পদার্থ বিভাগের প্রভাষক আবুল কাসেম-এর নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান জন্ম লাভ করে যার প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান-এর রাজধানী করাচী-তে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণ পরিষদের প্রথম অধিবেষনে বাংলা-কে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতির প্রস্তাব বিরোধীতার ফলে বাতিল হয়ে যায়। ঐ সংবাদ ঢাকা'র ছাত্রসমাজ ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, প্রতিবাদের ঝড় ওঠে, গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। শুরু হয় প্রতিবাদ, ধর্মঘট, ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিভিন্ন বৈঠক। এসবের মধ্য দিয়ে পরিবেশকে শান্তিপূর্ণ করার যে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা চলছিল তা সবই ব্যর্থ হলো কায়েদে আযম-এর পাকিস্তান-এর প্রথম গভর্ণর জেনারেল হিসাবে ঢাকায় আগমনের পর ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ জনসভায় ও ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতায় একমাত্র উর্দু-কেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণার মাধ্যমে।

পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে পূর্ব পাকিস্তান-এর প্রধানমন্ত্রী খাজা

www.pathagar.com

নাজিমউদ্দিন-কে পাকিস্তান-এর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান সফরে এসে ঢাকার পল্টন ময়দানে প্রদত্ত ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন পাকিস্তান-এর রাষ্ট্রভাষা একটিই হবে, আর তা হবে উর্দু। নাজিমুদ্দিন সাহেবের ঐ বক্তব্য ছিল জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢেলে দেবার সামিল। ঐ বক্তব্যের প্রতিবাদে শুরু হয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের ধর্মঘট। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা'র সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একযোগে ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত সৃষ্টি হয়। ঐদিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রদের জনসভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলা'র দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র দেশে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র দেশ ধর্মঘটের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এই কারণে যে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশিক পরিষদের অধিবেশন ২০শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সরকার পূর্বেই ঘোষণা করে। সরকার একটির পর একটি ভূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিস্থিতি মোকবিলার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারী হওয়ায় ছাত্রদের মধ্যে ঐ বিধিনিষেধ ভঙ্গ করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মিছিল করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। শুরু হয় ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ও খন্ডযুদ্ধ। বিকেল ৩টার দিকে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। পুলিশের গুলি বর্ষণে ৩ জন প্রাণ হারায় এবং ৬০ জন ছাত্র-জনতা আহত হয়। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার দাবি রক্তের অক্ষরে লিখিত হয়। ঐ গুলি বর্ষণের পর ছাত্র-জনতার মিছিল থেমে যায়নি। হাজারো মিছিলের জন্ম হয়েছে, ঢাকা'র মিছিল ও আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি শহর ও গ্রাম-গঞ্জে সম্প্রসারিত হয়েছে। ছাত্র-জনতার সাথে আমরা ঢাকাস্থ জগন্নাথ কলেজ-এর শিক্ষকগণ মিছিলে সামিল হই, জগন্নাথ কলেজ চত্বরে ছাত্র-জনতার বিভিন্ন সভায় ভাষা আন্দোলনের পক্ষে বক্তব্য রাখি। পরবর্তীতে বাংলা ভাষা পাকিস্তান-এর অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গৃহিত হয়।

রাষ্ট্রভাষা নিয়ে শাসকদের অবিমিষ্যকারিতা

অত্যন্ত মূল্য দিয়ে পাওয়া একটি নতুন রাষ্ট্রে অধিক সংখ্যক জনগণের মুখের ভাষা মাতৃভাষা নিয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশের শাসকবর্গ যে অবিমৃষ্যকারিতা প্রদর্শন করেছেন তাতে এক কথায় বলা যায় তারাই পাকিস্তান সৃষ্টির ৫ বছর মধ্যেই এর ভীত নড়িয়ে দেন। মাতৃভাষার মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় শাসকবৃন্দ গণমানুষের হৃদয়ের মর্মস্থলে আঘাত করেন। জ্ঞান তাপস ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "মা, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার ঋণ কখনও শোধ করা যায় না।" বাংলা ভাষা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষা ও ভাষার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে বিষয়গুলি দৃশ্যমান তা এই দেশের মানুষের জন্য শুভ নয়। প্রথমত ভাষা আন্দোলন কারা করল, কারা ভূমিকা নিল এ নিয়ে ১৯৫২ পরবর্তী আমলের তর্ক বিতর্ক আজও শেষ হয়নি।

www.pathagar.com

যিনি বা যারা প্রথমে সূচনা করেছিলেন তাদের অবদানের কোন স্মৃতিচিহ্ন যেন না থাকে সেদিকে কিছু ব্যক্তি ও দল অত্যন্ত তৎপর। শিক্ষিত সমাজ, সাহিত্যিক, সংবাদপত্র এমনকি জাতিও এই বিষয়ে শতধা বিভক্ত।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন "হীরা কয়লা খনির মধ্যে থাকিয়া যেমন জহুরির আগমনের প্রতিক্ষা করে; শুক্তির মধ্যে মুক্তা লুকাইয়া থাকিয়া যেরূপ ডুবুরির অপেক্ষা করিয়া থাকে, বঙ্গ ভাষা তেমনই কোন শুভদিন, শুভক্ষণের জন্য প্রতিক্ষা করিতেছিল। মুসলমানের বিজয় বাংলা ভাষার সেই শুভদিন, শুভক্ষণের সুযোগ আনয়ন করিল। গৌড় দেশ মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়া গেল। তাহারা ইরান-তুরান যে দেশ হইতেই আসুন না কেন, বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া বাঙ্গালী সাজিলেন ... হিন্দুর নিকট বাংলা ভাষা যেমন আপনার, মুসলমানদের নিকট উহা তদপেক্ষা বেশি আপনার হইয়া পড়িল"। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম শাসকগণ এবং পরবর্তীতে মুসলিম কবি, সাহিত্যিকগণ এই মুক্তাকে উজ্জ্বলতা দান করেছেন। আরবি, ফারসী ও অন্যান্য ভাষা থেকে এত বেশি শব্দের সংমিশ্রণ করেছেন যে সেসব শব্দ বাংলা ভাষার মধ্যে লীন হয়ে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে যার উজ্জল দৃষ্টান্ত নজরুল ইসলাম, কবি ফররুখ ইত্যাদি। কিন্তু সরকারি ও বেসরকারী মহলে ষড়যন্ত্র অত্যন্ত ব্যাপকভাবে চলছে কোলকাতা কেন্দ্রীক সংস্কৃত মিশ্রিত বাংলা ভাষাকে এদেশে প্রবর্তনের জন্য।

বাংলা ভাষার জন্য এসব নব্য দরদী ও এক শ্রেণীর রাজনেতিক নেতৃবৃন্দ, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিদের দরদ উছলিয়ে পড়ে শুধু ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে। রাতের আগমন যেমন সূর্যের আলোকে গ্রাস করে নেয় তেমন একুশের সন্ধ্যায় বাংলা ভাষার প্রতি তাদের দরদও স্তিমিত হয়ে পড়ে। ২১শের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে নুতন সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে তা হিন্দু ও বিজাতীয় সংস্কৃতির নকল ছাড়া আর কিছু নয়। পৌত্তলিকদের পূজার মত ২১শের অনুষ্ঠানগুলোকেও পূজার্সবস্ব অনুষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে।

অধ্যায়-৬

আইনজীবি হিসাবে নিজ জেলায় ফিরে এলাম

নিজের জেলায় ফিরে এলাম। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসের শেষ দিনে জগন্নাথ কলেজ থেকে পদত্যাগ করে কুষ্টিয়া-তে ফিরে এলাম। আইনজীবী হিসাবে কুষ্টিয়া জেলা জজ কোর্টে ১৯৫২ সালের ৮ই অগাস্ট শুক্রবার যোগদান করলাম। ৬ মাস ধরে ঢাকা-তে এর প্রস্তুতি চলছিল। ঢাকা-তে একই মহল্লায় বসবাসকারী পুস্তক ব্যবসায়ী মল্লিক ব্রাদার্স-এর প্রোপাইটার আবুল কালাম আজাদ ভাই যাবতীয় আইন

www.pathagar.com

বই সংগ্রহ করে দিলেন এবং মাস ছয়েকের উপযোগী কিছু সঞ্চয় নিয়ে এমন একটি পেশায় নিয়োজিত হলাম যেখানকার পথ শুধু কুসুমাস্তীর্ণ নয়, পথের আঁকেবাঁকে অনেক চড়াই উৎরাইও রয়েছে, অন্য যে কোন পেশার মত সাফল্য রয়েছে, ব্যর্থতাও রয়েছে। তবে স্রষ্টার করুণার ভিখারী হয়ে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও অধ্যাবসায় সহকারে প্রচেষ্টা চালালে সাফল্য দুয়ার প্রান্তে এসে ধরা দেবে এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজেকে নিয়োজিত করলাম। আইনের জগতে বিভিন্ন সুধীজনের কিছু স্মরণীয় প্রবাদ বাক্য মনে গেঁথে নিলাম। একজন আইনজীবীকে সব বিষয়ে কিছু কিছু জানতে হবে এবং কিছু বিষয়ে সব জানতে হবে। একজন আইনজীবীকে সাধকের মত জীবন যাপন করতে হবে এবং ঘোড়ার মত পরিশ্রম করতে হবে। আইন ব্যবসা একজন ইর্ষাপরায়ণা নারীর মত যে তার প্রেমিকের সঙ্গে অন্য কোন নারীর সাহচর্য বরদাশত করে না। তবে শেষোক্ত প্রবাদ বাক্য সম্পর্কে আমার দ্বিমত রয়েছে। মানুষের জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু তার কাজের চাহিদা ও কর্তব্যের পরিধি ব্যাপক। তাছাড়া আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কিছু ঋণ রয়েছে যা মৃত্যুর নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্বেই পরিশোধ করা উচিত। এই ঋণ স্রষ্টার কাছে যিনি জীবন ও মৃত্যুর মালিক, যিনি আমাদের হায়াত দিয়ে ঐশ্বর্যে ভরপুর এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, সাহস, কর্মক্ষমতা দিয়ে এবং হাজারও নেয়ামত ভোগের সুযোগ দিয়ে ধন্য করেছেন। আমাদের প্রত্যেকেরই ঋণ রয়েছে মাতাপিতার কাছে যাদের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর বুকে চোখ মেলে চেয়েছি। যাদের ত্যাগ, কোরবানী, স্নেহ ও করুনায় সিক্ত হয়ে আমরা দিন দিন বেড়ে উঠেছি। আমাদের ঋণ রয়েছে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও দেশের মানুষের কাছে যাদের সংস্পর্শ, সাহচর্য ও শ্রম জীবনের চাহিদাগুলো কানায় কানায় ভরে দিয়েছে। আমাদের ঋণ রয়েছে দেশের মাটির কাছে যার বুক থেকে জীবন ধারণের সব সম্পদই আমরা আহরণ করছি।

সুতরাং অনেক আইনজীবীদের মত এই 'ইর্ষাপরায়ণা নারী'র কাছে নিজেকে সমর্পণ করলেও অন্যদের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে আড়াল করতে পারলাম না। কুষ্টিয়াতে পেশা শুরুর ৪ মাসের মাথায় শেখ সাহেব কুষ্টিয়াতে এলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর এক জনসভা উপলক্ষে। তিনি আত্মীয় বিধায় আমিও শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। মিটিং শেষে নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে শেখ সাহেব অনুরোধ করলেন কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে। ঐ দায়িত্ব গ্রহণের পিছনে যে সমস্ত কারণগুলো বিদ্যমান ছিল তা হল **প্রথমতঃ** ১৯৪৯ সালের পর থেকে দেশের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও শাসকদের রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন। পাকিস্তান অর্জনে মুসলিম লীগ-এর ছিল গৌরবময় ভূমিকা। সেটা ছিল গণমুখী আন্দোলন যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৬ সালে এবং গতি পেয়েছিল ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে। কিন্তু ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি শিক্ষাজীবন শেষ করে দেশে ফিরে এসে প্রত্যক্ষ

www.pathagar.com

করলাম যে গত ২ বছর মুসলিম লীগ কিছু সংখ্যক হোমরা-চোমরাদের ড্রয়িংরুমের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। সাধারণ মানুষের জন্য এর দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। **দ্বিতীয়তঃ** পাকিস্তান-এর উভয় অংশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে মুসলিম লীগ-এর ব্যর্থতা। উচিত ছিল ইনসাফের মানদন্ডে বিচার করে অনুন্নত অঞ্চলগুলোর দিকে প্রথমেই গুরুত্ব প্রদান। কিন্তু সর্বত্রই ধনীকে আরও ধনী, উন্নত অঞ্চলকে আরও উন্নত করার প্রবণতা সৃষ্টি হল। **তৃতীয়তঃ** কায়েদে আযম ও কায়েদে মিল্লাত-এর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্থলে শক্তিশালী আমলারা প্রাসাদ রাজনীতির মাধ্যমে গদী দখলে মেতে ওঠল এবং তার ফলে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ধারা বিলুপ্ত হল। আমলার শাসনে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে স্বৈরাচারী মনোভাব বৃদ্ধি পেল এবং মুসলিম লীগ জনসমর্থনের তোয়াক্কা না করে শাসকের ভূমিকা থেকে আমলাদের সমর্থনকারী ভূমিকায় নেমে এল। **চতুর্থতঃ** ভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগ-এর মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অগণতান্ত্রিক। শাসককূলের সুরে সুর মিলিয়ে তাদের কথার প্রতিধ্বনি করা ছাড়া মুসলিম লীগ জনগণের অধিকার আদায়ে কোন ভূমিকা রাখে নি। সেসবের আছর কুষ্টিয়া'র সমাজ জীবনেও প্রতিফলিত হচ্ছিল। সর্বত্র প্রয়োজন ছিল এমন একটি দলবদ্ধ আন্দোলনের যা সাধারণ মানুষের পক্ষে কথা বলবে, দেশের শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করবে। ঐসব চিন্তা-ভাবনা আমার মনকেও নাড়া দিচ্ছিল। ব্যক্তিগতভাবে কোন আন্দোলন করা যায় না, তাই সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণের তাগিদে এবং পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিত্বদেরই ঐ নতুন দলে সামিল দেখে শেখ সাহেবের অনুরোধে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করে জেলা সম্পাদক-এর দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। সামান্য কিছুদিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসাবেও নির্বাচিত হলাম।

আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান ও প্রথম কারাবরন

অগাস্ট '১৯৫২ থেকে কুষ্টিয়া-তে আইনজীবী ও আওয়ামী লীগের সম্পাদক হিসাবে আমার যোগদান সরকার বিরোধী মহলে তৎপরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হল। ১৯৫৩ সালের প্রথম থেকেই আইন পেশায় কিছু দক্ষতার চিহ্ন রাখতে সক্ষম হলাম। পেশার ক্ষেত্র কুষ্টিয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হল। জেলা শহরে ও দুইটি মহকুমা শহরে যে প্রভাব সৃষ্টি হল ও পরিচিতি পেলাম সাংগঠনিকভাবে তা কাজে লাগিয়ে জেলার জনগোষ্ঠির মধ্যে নতুন কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হল এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেল দলের জনপ্রিয়তা। সেই সময় দলের সভাপতি ছিলেন কাজী কফিলউদ্দিন আহমদ যিনি পেশায় মুক্তার ছিলেন। বয়সের কারণে তিনি তার কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে জেলা শহর ও আশেপাশের গ্রামগুলোতে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।

www.pathagar.com

জেলা ভিত্তিক কাজের ফলে এবং পেশার কারণেও সরকারি ও বেসরকারী মহলে আমার পরিচিতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বি হিসাবে গণ্য করলেন। তেমন এক সময়ে ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন সাহেব কুষ্টিয়া শহরে সরকারি সফরে আসার প্রোগ্রাম করলেন। অবিভক্ত নদীয়া জেলার অর্দ্ধেক নিয়ে কুষ্টিয়া জেলা গঠিত হয়েছিল। শিক্ষাদীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ইত্যাদি সব দিক দিয়েই এই জেলার মানুষ ছিল অনুন্নত। জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর পক্ষ থেকে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে জনসভা আহ্বান করা হত এবং তাতে লোক সমাগম হত প্রচুর। শাসক হিসাবে দক্ষ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিলেট-এর অধিবাসী জনাব ইয়াহইয়া খান চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী'র সফরকে সবদিক দিয়ে সাফল্যমন্ডিত করার উদ্দেশ্যে অনান্য সাধারণ প্রোগ্রামের সঙ্গে একটি অসাধারণ পরিকল্পনা যোগ করলেন। জনাব নুরুল আমীন আসার ২ দিন পূর্বে তিনি রাত্রে তার সরকারি বাসভবনে আমাদের কয়েকজনকে চায়ের দাওয়াত দিলেন। কুষ্টিয়া জেলার অনুন্নত অবস্থার কথা তিনি দরদ ভরা কণ্ঠে উচচারণ করে শেষে বললেন সরকারি দলের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলও যদি মিলিতভাবে প্রধানমন্ত্রী-কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং একই সঙ্গে ফুলের মালা পরিয়ে দেন তাহলে জেলার উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ভয় ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের রক্তের দাগ তখনও মুছে না যাওয়ায় জনাব নুরুল আমিন সাহেবের সফর হয়ত শান্তিপূর্ণ হবে না। আমাকেই জবাব দিতে হল। বললাম জনাব নুরুল আমিন-এর আগমনে জেলার উন্নতি ও অগ্রগতির কথা চিন্তা করে আমরা কালো পতাকা প্রদর্শন না করতে পারি, বিরুদ্ধ শ্লোগান না দিতে পারি, কিন্তু গলায় মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে হবে সেটা অসম্ভব, অকল্পনীয়। পরদিন ভোরে পুলিশ বাসা ঘেরাও করে ধরে নিয়ে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করল এবং সেখানে ২জন ছাত্র নেতা আমার সাথী হল। জানা গেল জেলার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ-এর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি রাত ২টার সময় মিটিং করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-কে নির্দেশ দেন আমাকে ও দুই জন ছাত্র নেতাকে কারাগারে নিক্ষেপের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। ভোর হওয়ার পূর্বেই ঐ নির্যাতনমূলক আটকাদেশ কার্যকরী হল। সেটাই ছিল কারাগারে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা যার মেয়াদ ছিল ১৫ দিন। সেখানে অনান্য হাজতী কয়েদীর সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর বেশি মর্যাদা দেওয়া হয় নি। কারাগারে তৃতীয় শ্রেণীর হাজতী কয়েদীরা যে কি মানবেতর জীবন যাপন করে, কি বর্বর শাসনে থাকে, খাদ্যের নামে কি অখাদ্য কুখাদ্য খায় তা রাজনীতির ময়দানে গিয়ে সামান্য কিছুদিনে মধ্যেই প্রত্যক্ষ করলাম।

কারাগার থেকে বাইরে এসে আইনজীবী হিসাবে নিজের পেশায় এবং জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর সম্পাদক হিসাবে রাজনৈতিক ময়দানে পূর্বের চাইতে বেশি তৎপরতা নিয়ে কাজ শুরু করলাম।

www.pathagar.com

কিছু ছাত্র, যুবক, শ্রমিক প্রতিনিধি ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের সহযোগিতা পেয়ে জেলার ৩টি মহকুমাতেই সাংগঠনিক কাজের গতি বৃদ্ধি করা হল। ভাষা আন্দোলনের কারণে এবং পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান-এর সর্বত্রই সরকার ও মুসলিম লীগ-এর বিরুদ্ধে মানুষের মন বিক্ষুব্ধ হতে লাগল। ঐ সময় শের-ই-বাংলা ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এ্যাডভোকেট জেনারেল পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করে ১৯৫৩ সালের ২৭শে জুলাই কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি নামে একটি দল গঠন করলেন। জনাব হক সাহেব নিজেই ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান, একটি প্রচন্ড ব্যক্তিত্ব যার আসন ছিল এদেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের হৃদয়ে। তাইতে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি যুক্তভাবে সরকার ও মুসলিম লীগ-এর বিরুদ্ধে দেশের আপামর জনসাধারণের ঐক্য স্থাপন করে স্বৈরশাসনের অবসান হঠানোকে একটি সাধারণ দাবিতে পরিণত করলেন। ঐ দুই শক্তির ঐক্য মুসলিম লীগ-এর স্বৈরাচারী শাসনে আবসান ঘটাতে পারবে কিনা এটা হিসাব কষে দেখার কোন প্রয়োজন ছিল না। ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রধান মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি প্রধান শের-ই-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সম্মিলিতভাবে কয়েকটি ছোট দল যথা পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল, খেলাফতে রব্বানী পার্টি'র সহযোগিতায় ২১ দফার ভিত্তিতে 'যুক্ত ফ্রন্ট' গঠন করেন। ঐক্যবদ্ধভাবে আসন্ন নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকারের মোকাবিলা করাই ছিল ফ্রন্ট গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন

সত্যিকারভাবে কুষ্টিয়া জেলায় বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামী মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। অবিভক্ত কুষ্টিয়া জেলার সব আসনেই প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদে আওয়ামী মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে আমার নামও স্থান পেল। কিন্তু মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য যে দিন নির্ধারিত হল সেদিনে আমার বয়স প্রয়োজনের তুলনায় ৭ দিন কম ছিল। সেজন্য আমি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারিনি। যুক্তফ্রন্ট-এর নামে নির্বাচনে বন্যা এল। বন্যার সময় যেমন বিপুল জলরাশির সঙ্গে আগাছা ভেসে আসে তেমন ঐ নির্বাচনে যাদের রাজনীতির সঙ্গে কোন সংস্পর্শ ছিল না বা যারা বাম রাজনীতির সঙ্গে গোপনে জড়িত ছিল তারা উর্দ্ধতন নেতৃত্বের দোয়া কুড়িয়ে কেউ রাতারাতি আওয়ামী মুসলিম লীগ বা কৃষক শ্রমিক প্রজা পার্টি সদস্য সেজে নমিনেশন নিয়ে এবং বন্যার স্রোতে তাদের নির্বাচনী তরী পার করে নিলেন। তথাকথিত গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের নামে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ঐ কলুষিত দিকটি আমার চোখে পড়ল।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে এদেশের নির্বাচন কোনদিনই কলুষমুক্ত হয়নি বরং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে তা বহু অর্থ দিয়ে নমিনেশনের আশীর্বাদ খরিদ করা এবং অর্থের বিনিময়ে কর্মী ও ভোটার খরিদ করার পর্যায়ে চলে এসেছে। আরও কিছু পরে স্বাধীন বাংলাদেশ-এর ছোট বড় নির্বাচনে সেগুলোর সাথে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা ব্যবহারের উন্মুক্ত সুযোগ যোগ হয়েছে। অবিভক্ত কুষ্টিয়া জেলার ৫টি আসনে আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর তিন জন (তন্মধ্যে একজনের গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ ছিল), একজন কৃষক প্রজা শ্রমিক পার্টির (যিনি নির্বাচনের পূর্বে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বা কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না) এবং আরও একজন কৃষক প্রজা শ্রমিক পার্টির (যিনি মুসলিম লীগ-এর এমপি ছিলেন এবং নির্বাচনের মাত্র কিছু পূর্বে হক সাহেবের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে কৃষক প্রজা শ্রমিক পার্টির আশ্রয়ে নিজেকে ধন্য সোপর্দ করেছিলেন) নির্বাচিত হন। নির্বাচনী প্রচারণার গোটা সময়টাই কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর অঞ্চলে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের পক্ষে প্রচারণা চালাই। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ২৩৭টি মুসলিম কেন্দ্রের মধ্যে ২২৮টি আসন যুক্তফ্রন্ট লাভ করে। মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। অমুসলিম আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৫টি, সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন ২৭টি, সংখ্যালঘু ফ্রন্ট ১৩টি, কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি, ও গণতান্ত্রিক দল ৩টি আসনে জয়লাভ করে। কুষ্টিয়া জেলার ৫টি আসনেই যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল সংখ্যক আসন নিয়ে জয়লাভ করলেও জনগণের আশা পূর্ণ হয়নি। যুক্তফ্রন্ট-এর ২১ দফার কোন রফা হল না। শুরু হল অন্তহীন অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভাঙ্গা গড়ার খেলা। কখনও নিজেদের সাথে, কখনও কেন্দ্রের মুসলিম লীগ শাসকদের গোপন ইঙ্গিতে, কখনও ক্ষমতা দখলের কামড়াকামড়িতে।

দেশের রাজনীতিতে কলংকজনক অধ্যায়

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত পর্যন্ত এদেশের রাজনৈতিক ময়দানের ইতিহাস বড়ই কলঙ্কজনক। দুই শক্তিশালী দল আওয়ামী মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা শ্রমিক পার্টি'র নেতৃবৃন্দ ঐ বিশাল জয়লাভকে ধরে রাখতে পারলেন না। নির্বাচনের পরই শুরু হল কৃষক প্রজা শ্রমিক পার্টি প্রধান ও যুক্তফ্রন্ট-এর পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা শের-ই-বাংলা কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর সদস্যদের বাদ দিয়ে ১৯৫৪ সালের ২রা এপ্রিল প্রথম মন্ত্রীসভা গঠনের মধ্য দিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি। শের-ই-বাংলা নিজের দলের ৩ জন সদস্যকে মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন কিন্তু তার মধ্যে একজন ছিলেন তার ভাগিনা সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া যা ছিল তার স্বজনপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ। তখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ অঙ্গদল আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে কোন মন্ত্রী গ্রহণ করা হয়নি। মাত্র ২৮ দিন পর আসল আরেক ধাক্কা যা বাস্তবিক পক্ষে যুক্তফ্রন্ট-এর নির্বাচনী বিজয়কে বানচাল করে দিল।

www.pathagar.com

শের-ই-বাংলা পূর্ব পাকিস্তান-এর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ১৯৫৪ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে কোলকাতায় এক সম্বর্ধনা সভায় অত্যান্ত আবেগজড়িত ও বাস্তবতা বিবর্জিত বক্তব্য রাখলেন যা কেন্দ্রের মুসলিম লীগ সরকারের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্রের উন্মেষকে বানচাল করে দেওয়ার মওকা সৃষ্টি করে দেয়। তিনি মুসলিম জাতির ইতিহাস ও পাকিস্তান আন্দোলনের দিনগুলোর কথা বিস্মৃত হয়ে নিজের উপস্থাপিত পাকিস্তান প্রস্তাবের যৌক্তিকতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বক্তব্যে বলেন, "রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ বিভক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি আর বাঙ্গালীত্বকে কোন শক্তিই কোনদিন ভাগ করতে পারবে না।" যদিও আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করে শের-ই-বাংলা'র মন্ত্রীসভা ১৯৫৪ সালের ১৫ই মে সম্প্রসারিত হলো কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার শের-ই-বাংলা'র কোলকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে গভর্নর জেনারেল শের-ই-বাংলা মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা জারির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করেন। এরপর যুক্তফ্রন্ট-এর নেতা শের-ই-বাংলা'র বিরুদ্ধে আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন, যুক্তফ্রন্ট-এর মধ্যে বিভেদ ও প্রকাশ্য শত্রুতা, কৃষক প্রজা শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর মধ্যে ৯২(ক) ধারার অবসানে মন্ত্রীত্ব লাভের জন্য পৃথক পৃথক প্রচেষ্টা, গভর্নর জেনারেল-এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উভয় দলের ব্যাপক প্রচেষ্টা ও অসম্মানজনক পন্থা অবলম্বন, ৯২(ক) ধারা অপসারণ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর বিপুল মেজরিটি থাকা সত্ত্বেও শের-ই-বাংলা'র নমিনি আবু হোসেন সরকার-এর প্রধানমন্ত্রীত্বে পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠনে কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতা, আবু হোসেন সরকারের পতন, ১৯৫৬ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর জনাব আতাউর রহমান খাঁন-এর নেতৃত্বে তিনটি হিন্দু দল নিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রীসভা গঠন, শের-ই-বাংলা'র পূর্ব পাকিস্তান-এর গভর্নর হিসাবে নিয়োগ, ফজলুল হক কর্তৃক আতাউর রহমান মন্ত্রীসভাকে পদচ্যুতকরণ ও পুনরায় আবু হোসেন সরকার-কে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানানো, কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গভর্নর শের-ই-বাংলা'র অপসারণ, অস্থায়ী গভর্নর কর্তৃক আবু হোসেন সরকার মন্ত্রীসভার পদচ্যুতি, আতাউর রহমান-এর নেতৃত্বে পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে ৯ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন, আতাউর রহমান-এর সংখ্যাধিক্য হারানোর ফলে পুনরায় আবু হোসেন সরকার-এর ১৯/৬/৫৮তারিখে মুখ্য মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ,২২/৬/৫৮ তারিখে অনাস্থা ভোটে আবু হোসেন সরকারের পরাজয়, ১৯৫৮ সালের ২৫শে জুন পূর্ব পাকিস্তানে পুনরায় প্রেসিডেন্ট শাসন প্রবর্তন, ১৯৫৮ সালের ২২শে জুলাই আতাউর রহমান কর্তৃক নবম সরকার গঠন, ১৯৫৮ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের অভ্যন্তরে ডেপুটি স্পিকার জনাব শাহেদ আলী-কে সদস্যগণ কর্তৃক আক্রমন এবং মারাত্মক জখম, ১৯৫৮ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ- এত দ্রুত পরিবর্তনশীল ও ঘটনাবহুল পরিস্থিতি আমাদের দেশের

www.pathagar.com

রাজনৈতিক ইতিহাস। ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এখানে এসেও থেমে থাকেনি। আওয়ামী লীগ ১৯৫৯ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুন-এর কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন দানের কথা ঘোষণা করে। ১৯৫৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়। আওয়ামী লীগ ২রা অক্টোবর ফিরোজ খান নুন-এর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়। কিন্তু দফতর বন্টন প্রশ্নে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীবর্গ ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পদত্যাগ করেন। বাঘ ওঁত পেতেই বসে ছিল, অপেক্ষা করছিল শুধু মহেন্দ্র ক্ষণের অপেক্ষায়। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর দিবাগত রাত ৮টায় দেশে মার্শাল ল জারি হয়। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করেন, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ বাতিল করেন, সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মো: আউইব খান-কে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা শত কুচক্রের নায়ক রাজনীতিবীদদের মার্শাল' ল পছন্দ না হলে তাদের 'দেশত্যাগ শ্রেয়' বলে যে প্রেসক্রিপশন দিলেন সেই প্রেসক্রিপশনের বড়ি তিনিই সর্বপ্রথম গলধকরণ করলেন। সমস্ত অঘটনের নেপথ্য নায়ককে মার্শাল'ল জারির মাত্র ২০ দিন পর ১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর জেনারেল আউইব খান-এর কাছে সব দায়িত্ব অর্পন করেন দেশ ছাড়তে হয়। কয়েক জোড়া রিভলবার তার বুকে তাক করার কারণে ইস্কান্দার মির্জা প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বের হয়ে বিদেশের পথে পাড়ি জমালেন তা হয়ত দেশবাসী জানতে পারল না, তবে এটা নিশ্চিত He did not find time to react-তিনি গর্জে উঠার আদৌ কোন সময় পেলেন না।

অবিভক্ত কুষ্টিয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান

তিন বছরের মধ্যেই আমি ব্যস্ত আইনজীবীতে পরিণত হলাম। কুষ্টিয়া'র বিভিন্ন মহকুমা ও পার্শ্ববর্তী জেলায় আমার পেশা সম্প্রসারিত হল। যুক্তফ্রন্ট-এর নির্বাচনে নিজের জন্য নয়, পরের জন্য নির্বাচনী প্রচারণা ব্যাপকভাবে চালাতে গিয়ে নিজের পরিচিতির সঙ্গে সঙ্গে সহকর্মী ও বন্ধুত্বের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছিল। আজকে যখন পিছনে ফিরে চাই তখন অনেক বন্ধু ও শুভাকাংখীদের কথা মনে পড়ে যারা পেশা জীবনে ও সমাজকর্মী হিসাবে সততা ও বলিষ্ঠতা নিয়ে গড়ে উঠার পথে প্রচন্ড সহায়তা দিয়েছেন। নিজেরা মইয়ের নিচে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে উপরে তুলে দিয়ে শক্ত হাতে মইয়ের গোড়া ধরে রেখেছেন। তাদের অনেকেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, অনেকে রাজনৈতিক ও আদর্শিক মতপার্থক্যের কারণে ভিন্ন পথে দূরে সরে গেছেন, আবার অনেকে এখনও বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হলেও ভ্রাতৃত্বের ও সৌহার্দের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছেন। মেহেরপুর মহকুমার এ্যাডভোকেট আবুল হায়াত (মরহুম), প্রাক্তন এম পি. মহিউদ্দিন আহমদ (মরহুম),চুয়াডাঙ্গার এ্যাডভোকেট আয়ুব আলি

www.pathagar.com

(মরহুম), প্রাক্তন এম. পি. ওহিদ হোসেন জোয়ার্দার (মরহুম), কুষ্টিয়া'র প্রাক্তন এম. পি. আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি কাজি কফিলউদ্দিন আহমেদ (মরহুম), এ্যাডভোকেট আব্দুল কায়ুম (মরহুম), এ্যাডভোকেট মহম্মদ নুরুল ইসলাম, ১৯৫২ সালের আওয়ামী মুসলিম লীগ কর্মী মোজাম্মেল হক (মরহুম), প্রাক্তন এম. পি. ও আমার ছাত্র এ্যাডভোকেট আহসানউল্লাহ (মরহুম), কুমারখালী'র প্রাক্তন এম. পি. গোলাম কিবরিয়া (মরহুম), ভেড়ামারা'র প্রাক্তন এম. পি. আমার চাচাত ভাই ও মেজ ভগ্নিপতি ব্রিটিশ আমলে রাজশাহী সরকারি কলেজের তুখোড় ছাত্রনেতা জহুরুল হক রাজা মিয়া (মরহুম) মেহেরপুরের এ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন (মরহুম) এবং আরও অনেকে যারা বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আমার চারপাশে থেকে শক্তি যুগিয়েছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। অনেক জয়ের মালা তারা নিজেদের গলায় না পরে আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছেন। এমন একটি বিজয় ছিল আমার ৩০ বছর বয়সে বয়স্কদের সাধারণ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া জেলা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হওয়া।

যুক্তফ্রন্ট-এর নির্বাচনের পর ঢাকা ও কেন্দ্রে রাজনীতির যে ভাঙ্গাগড়ার খেলা ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত চলেছিল তাতে আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ অংশীদার ছিলাম না। কুষ্টিয়া জেলায় আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর সংগঠনকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক কাজে অংশগ্রহণ করার মধ্যে আমার উদ্যম সীমাবদ্ধ ছিল। ঢাকা-তে যখন যুক্তফ্রন্ট-এর ভাঙ্গাগড়া ও রাজনীতিতে ক্ষমতা দখলের মল্লযুদ্ধ চলছিল তখন ঘোষণা এল কুষ্টিয়া জেলায় জেলা বোর্ড নির্বাচনের। পূর্বের মত সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নয়, বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নারী-পুরুষের ভোটে জেলায় ১২ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন এবং ঐ সদস্যগণ চেয়ারম্যান নিযুক্ত করবেন। প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে, আর্থিক বা অন্য প্রকার সহযোগিতা না নিয়ে স্থানীয়ভাবে জেলা ও মহকুমা কমিটির আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ১৯৫৭ সালের জেলা বোর্ড নির্বাচনে আমার নেতৃত্বে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং ১২টি আসনেই প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিলেন। আরও সিদ্ধান্ত নিলেন সাধারণ সদস্যদের নির্বাচনের পর বোর্ড গঠনে আমাকেই চেয়ারম্যান হতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল স্থানীয় প্রভাবশালী মুসলিম লীগ-এর পুরানো ও প্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। তবে আমার বিরুদ্ধে তারা দাঁড় করিয়ে দিলেন ভেড়ামারা'র জনৈক মাড়োয়ারি শেঠ ও জমিদার তনয় আব্দুর রউফ চৌধুরী-কে যিনি পরবর্তী আমলে বাকশাল-এর গভর্নর হিসাবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। ১২টি আসনের মধ্যে ৯টি আসনে আমরা জয়যুক্ত হই এবং ১৯৫৮ সালের জানুয়ারি মাসে আমাকে চেয়ারম্যান করে কুষ্টিয়া জেলা বোর্ড পুনঃগঠিত হয়।

www.pathagar.com

আমিই হলাম বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া জেলা বোর্ড-এর নির্বাচিত প্রথম ও শেষ এবং বয়োকনিষ্ট চেয়ারম্যান। বৃটিশ আমলেই জেলা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ক্রমান্বয়ে জনপ্রতিনিধিদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে থাকে। বিভাগ পূর্ব সময়েই জনগণের প্রতিনিধিকেই চেয়ারম্যান করা হত, আমলারা সদস্য থাকতেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ক্রমান্বয়ে আমলার দূরে সরে যান। ১৯৫৭ সালে শুধুমাত্র জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জেলা বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯৫৮ সালে মার্শাল ল জারি হওয়ার পর থেকে আমলার চেপে বসে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তার কোন পরবর্তন হয়নি। মাঝে কিছু সময়ের জন্য দলীয় এম. পি.-দের নমিনেশন দিয়ে চেয়ারম্যান করা হয়। তবে সদস্যদের মধ্যে আমলারাই বেশিরভাগ আসন জুড়ে থাকে। স্বাধীন দেশে ঐ অবস্থার পরিবর্তন এখনও (২০০১ সাল অবধি) হয়নি।

জেলার ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সাধারণ মানুষের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণ, স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, রাস্তাঘাট সম্প্রসারণ ও উন্নতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জেলা বোর্ডের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সেটা ছিল সরকারের একটি নমুনা যার প্রয়োজনে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থাও গড়ে ওঠে। সরকার পরিচালনার জন্য যে অভিজ্ঞতা ও টেনিংয়ের প্রয়োজন তারও ক্ষেত্র ছিল জেলা বোর্ড। অনেক চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান যারা অতীতে জেলা বোর্ডে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তারা ব্রিটিশ আমলে ও পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে সরকারের মন্ত্রী হিসাবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ঐরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হয়ে প্রথমেই সেই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আইন ও বিধি জেনে নিয়ে ভাইস চেয়ারম্যান-এর মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্ব ভাগ করে জেলা বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার, মেডিক্যাল অফিসার, শিক্ষা ও স্যানিটেশন বিভাগের দায়িত্বশীল ও সিনিয়ার কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে কাজ ভাগ করে দেওয়া হল। বিভিন্ন বিষয়ে জেলার মানুষকে ওয়াকিবহাল করার জন্য, জেলার সমস্যা সম্পর্কে সচেনতনা সৃষ্টির জন্য এবং জেলা বোর্ডের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কাজের তৎপরতা সম্পর্কে জেলাবাসীকে অবহিত করার জন্য দায়িত্ব গ্রহণের কিছু দিনের মধ্যেই 'যোগাযোগ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা জেলা বোর্ড থেকে প্রকাশ করা হল। জেলা বোর্ডের অপ্রতুল সম্পদ ও সরকারের তরফ থেকে প্রাপ্য সামান্য অনুদানের সাহায্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হল। অতীতে ও বর্তমানে সরকারি অর্থের, বিশেষ করে উন্নয়নমূলক কাজের বরাদ্দ অর্থের সিংহভাগ উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পকেটে চলে যায়। কুষ্টিয়া জেলা বোর্ড-ও তা থেকে মুক্ত ছিল না। যাবতীয় দুর্নীতিকে কঠোর হস্তে দমন করা হল যার ফলে হেড ক্লার্ক সহ প্রায় ৩৫ জন স্টাফ চাকরিচ্যুত হল। মোটা অর্থ আত্মসাতের জন্য বৃদ্ধ হেড ক্লার্ক-কে ডিসমিস করা হল। তার শিক্ষিত সন্তানদের আমি খুবই স্নেহ করতাম। আমার নিজের অর্ডারলি খুবই স্নেহের পাত্র ছিল। সেও দুর্নীতির দায়ে চাকরিচ্যুত হল।

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবেই তদবির হল, অনুরোধ এল আমার আপনজনের নিকট থেকেও। কিন্তু এসব ব্যাপারে আমি ছিলাম নির্মম ও আপোষহীন। আমার মনে হত জেলার ১৪ লক্ষ (তৎকালীন সময়ে) লোকের তরফ থেকে জেলা বোর্ডের দায়িত্বকে একটি আমানত হিসাবে আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বিচারাধীন ব্যক্তিকে মাফ করার অধিকার আমার নেই। জেলার ১৪ লক্ষ লোক মাফ করলে আমি মাফ করতে পারি। বৃদ্ধ হেড ক্লার্ক শান্তির বিরুদ্ধে আপিল করলে ইংরেজ বিভাগীয় কমিশনার মন্তব্য করলেন, "He should thank his star that Chairman has not prosecuted him in a criminal court" শাস্তি দিতে আমার কষ্ট হয়েছে কিন্তু আমার কর্তব্যবোধ আমাকে কঠোর করেছে। অসুস্থ স্টাফকে আমার গাড়িতে করে বাসায় পৌঁছে দিয়েছি, প্রায়ই আমার টেবিলের পাশের চেয়ারে বসিয়ে আমাদের স্টাফদের চা পরিবেশন করেছি, বিপদে সাধ্যমত সাহায্য করেছি, যোগ্যতার কারণে প্রোমোশন তরান্বিত করেছি, জনৈক ক্লার্ক পূর্ব পাকিস্তান লোকাল বডিজ ট্রেনিংয়ে প্রথম হওয়ায় তাকে কয়েক ধাপ প্রোমোশন দিয়ে হেড ক্লার্ক করেছি, কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগ পেলে আমি তাদের বিরুদ্ধেই কঠোরতার পরিচয় দিয়েছি। যে সমস্ত ফেরিঘাট মাত্র ৩ সংখ্যার অঙ্কে বিক্রি হত তা আমার প্রত্যক্ষ তদারকিতে ৫ সংখ্যার অঙ্কে বিক্রয় হল। জেলা বোর্ডের বর্ধিত আয় দিয়ে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হল।

জেলা বোর্ডে আমার প্রায় ২ বছরের কার্যকাল অবশ্য শান্তিতে কাটেনি। নির্বাচনে আমরা ৯টি সিট পেলেও বিরোধী ৩ জন সদস্য আমাদের ২ জনকে ভাগিয়ে নিলেন। প্রাদেশিক পরিষদে বা পার্লামেন্টে সচরাচর যা হয় এখানেও সেসব ফ্লোর ক্রসিং হল। কিন্তু আমাদের সংখ্যাধিক্য থাকায় কাজ করতে অসুবিধা হয়নি। একটি ঘটনায় ৫ জন সদস্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর সহায়তায় আরও ২ জন মেম্বার ভাগিয়ে আমাকে অনাস্থার মাধ্যমে অপসারণের চেষ্টা করলেন। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জেড. এ. তেমুরী (সিএসপি) কুষ্টিয়া-তে এসে কিছুদিন ভাল আচরণ করার পর 'কৃষ্ণলীলা' শুরু করলেন। তিনি কিছুদিন পর জেলা বোর্ডের নতুন জীপ গাড়িটি রিকুইজিশন করলেন রাতের বেলায় তার কুঠিতে 'গোপী'দের আনা-নেওয়া করার জন্য। আমি বিল পাঠালাম জীপ গাড়ি ভাড়া বাবদ এবং তার কপি পাঠালাম একাউনট্যান্ট জেনারেল-এর কাছে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি আমার বিরুদ্ধে দলীয় সদস্যদের নিজ বাংলোয় ডেকে নিয়ে চেয়ারম্যান করার টোপ দিয়ে আরও কয়েকজনকে ভাগিয়ে নিলেন। নির্ধারিত দিনে অনাস্থা সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অনাস্থার পক্ষে ভোট না দেওয়ায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হল না। আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গভর্নর-এর কাছে চরিত্রহীনতা ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এনে দরখাস্ত দিলাম। একই সঙ্গে চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলাম। ২ মাস পর আমার পদত্যাগপত্র গৃহীত হল।

www.pathagar.com

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য নোটিস দিলেন। কিন্তু সেই তারিখের পূর্বেই সরকারি আদেশে সমস্ত জেলা বোর্ড বাতিল হয়ে ক্ষমতা আমলাদের হাতে চলে গেল। ইস্তফা দেওয়ার পর সেটা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত আমি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর পূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। সেই সময় আমার ক্ষমতাবলে জেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন সরকারি স্কেলে বাড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যকরী করে দিলাম। সেটা ছিল তাদের জন্য একটা বড় পাওয়া যার কারণে তারা আমাকে সবসময় ভক্তি ভরে স্মরণ করেছে ও দোয়া করেছে। এ দেশের রাজনীতিতে এটা ছিল একটা অন্ধকার দিক যে কিছু কিছু অসাধু জনপ্রতিনিধি নিজেদের স্বার্থে আমলাদের সাথে হাত মিলিয়ে সবকিছু বানচাল করার চেষ্টা করে। পাকিস্তান-এর রাজনীতিতেও একই নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির একটি মহান প্রতিষ্ঠান জেলা বোর্ড এভাবে আমলাদের হাতে চলে গেল।

সরকারের দুটি বিভাগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন

রাজনীতির যে দিকটায় চাণক্য বুদ্ধির প্রয়োজন, ক্ষমতা ও গদি দখলের দ্বন্দ্বে পেশী শক্তি অপরিহার্য্য এবং প্রাধান্য বিস্তারে আলাদিনের চেরাগ সন্ধানই মুখ্য ভূমিকা হয়ে থাকে আমার সেরূপ কোন প্রজ্ঞা ও কর্মকুশলতা আদৌ ছিলনা। কৈশোরে ও বিশেষ করে শিক্ষাজীবনে এরূপ কোন শিক্ষা পাইনি। আলিগড়ে যে ছাত্র রাজনীতি ছিল তাতে অর্থ, বুদ্ধি ও পেশীর মধ্যে বুদ্ধি বা জ্ঞান প্রাধান্য পেয়েছে। ছাত্রদের নির্বাচনে যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল কে কত ভাল ক্লাস নিয়ে পরীক্ষায় পাশ করছে, কে বক্তা হিসাবে বা সাহিত্যিক, কবি লিখক, খেলোয়াড় হিসাবে সুনাম অর্জন করেছে বা জীবনে এই সমস্ত অভিযানে কত বিজয়ের মাল্য ছিনিয়ে এনেছে। ছাত্ররাই যেহেতু দেশের ভবিষ্যৎ হিসাবে গণ্য তাইতে আশা করা যায় তারা শিক্ষাঙ্গন পার হয়ে যখন সামাজিক জীবনে প্রবেশ করবে তখন মানুষ গড়ার কারখানার লব্ধ অভিজ্ঞতা সাথে করে নিয়ে আসবে এবং জীবনে প্রতিফলিত করবে। আমার কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দ অনান্য গুণের সন্ধান পেলেও এদেশের রাজনীতিতে উপরোক্ত যে বিষয়গুলি মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে আমার মধ্যে তার সন্ধান পেলেননা। তবে তাই বলে তাঁরা আমাকে একেবারেই মুল্যায়ন করেননি তা নয়। আমি ছিলাম বাণিজ্য ও অর্থনীতির ছাত্র এবং সে ব্যাপারে সুনামও অর্জন করেছি। তাই জনাব আতাউর রহমান খানের মন্ত্রীত্ব আমলে আমাকে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পাট উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হল।পাট পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির প্রাণ অথচ ডান্ডির একতরফা পলিসির কারণে, ভারতীয় মিল মালিকদের চক্রান্তের কারণে, বর্ডার দিয়ে লক্ষ লক্ষ বেল পাট ভারতীয় পাট মিল মালিকদের আশ্রিত চোরচালানীদের মাধ্যেমে পাচার হয়ে যাওয়ার কারণে পাটের যে দুর্গতি এবং অর্থনীতিতে যে আঘাত তা সবারই জানা ছিল। কিন্তু এই সোনালী আঁশকে আসল সোনায় রূপান্তরিত করার জন্য যে সামগ্রিক ও সমন্বিত

www.pathagar.com

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন ছিল তা হয়নি। সোনালী আঁশ তৈরী করে চাষী কোন দিনই তার শ্রমের মজুরী ও বিনিয়োগের অর্থ ঘরে তুলতে পারেনি। উপদেষ্টা পরিষদের উপদেশ কোনদিনই উচচপদস্থ আমলাদের দ্বারা গৃহিত হয়নি। ডান্ডির ডিকটেশন, ভারতীয় মিল মালিকদের দ্বারা চোরাচালানীদের উৎসাহ প্রদান এবং তাতে ভারত সরকারের মৌন সম্মতি প্রদান, পূর্ব পাকিস্তানের নব্য পাট মিল মালিক ও রফতানীকারকদের অর্থ লালসা ও সরকারের পাট পলিসি নির্দ্ধারণে প্রভাবান্বিত করার অপচেষ্টা - পাট ও পাট শিল্প বিপর্য্যয়ের প্রধান কারণ। পাট উপদেষ্টা পরিষদে আমার অভিজ্ঞতা ছিল নৈরাশ্যজনক। তাছাড়া ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনে কোন উপদেষ্টা পরিষদই একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য কাজ করতে পারেনি।

আর একটি সুযোগ পেলাম পাকিস্তানের শিল্প অগ্রগতির অভিজ্ঞতা অর্জনের। কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার আমলে পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশনের ডাইরেক্টর হিসাবে নিয়োগ পেলাম। আমিই ছিলাম পূর্ব পাকিস্তান থেকে একমাত্র ডাইরেক্টর যা ছিল অবশ্যই দৃষ্টিকটু। হেড অফিস করাচীতে ছিল বিধায় আমাকে প্রায় প্রতি মাসেই ডাইরেক্টরদের সভায় যেতে হত। ১৯৫৮ সনের জানুয়ারীতে করাচীতে প্রথম সফরে করাচী বিমান বন্দরে আমার আলীগড় জীবনের অকৃত্রিম বন্ধু ও সহপাঠী মোস্তফা বিন ইব্রাহিমকে অপেক্ষারত পেলাম। ১১ বছর পর পুনরায় দেখা। দূরত্ব ভালবাসার উষ্ণতা বৃদ্ধি করে তার প্রমাণ পেলাম মোস্তফার চেহারায়, আচরণে, অভিব্যক্তিতে। ২ বছর অর্থ্যাৎ মার্শাল ল জারীর পরও এই পদে থাকাকালীন সময়ে করাচী সফরে মোস্তফার উষ্ণ সান্নিধ্য থেকে সরে থাকতে পারিনি। মোস্তফা তার তিন ভাই, এক বোন ও আম্মা নিয়ে তাদের সংসার। আমি যখন করাচী যেতাম তখন মোস্ত ফাদের ভাইএর সংখ্যা ও মোস্তফার আম্মার একটি সন্তান বৃদ্ধি হত। মোস্তফার আম্মা কোন দিন হোটেলে উঠতে দেননি। পরবর্তী আমলে ১৯৭৮, ১৯৭৯, ১৯৮০, ১৯৮৬, ১৯৯২ যখনই করাচী গেছি বা করাচী হয়ে ইরানের রাজধানী তেহরান যাতায়াত করেছি প্রতিটি সময়ই মোস্তফা, ওর আম্মা ও ভাইবোনদের অতিথেয়তা গ্রহণ করেছি। শেষবার গিয়ে ১৯৯২ সালে মোস্তফা ও আমার বন্ধুত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্ত্তি উৎসব করেছি আনন্দঘন পরিবেশে।

আমার বন্ধু মোস্তফা ভারতের হায়দারাবাদের বাসিন্দা ছিল। পাকিস্তান হওয়ার পর পিতামাতা সহ সবাই হিজরত করে পাকিস্তান চলে আসে। ভারতে ও পাকিস্তানে কিছুদিনের জন্য ব্যাংক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে করাচীতে ইন্ডাস্ট্রীয়াল কনসালট্যান্ট হিসাবে কাজ শুরু করে অল্প কিছুদিনের মধ্যে কনসালট্যান্ট হিসাবে সুনাম অর্জন করে। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের শিল্প সম্পর্কে তার প্রচুর পড়াশুনা ছিল এবং শিল্প উদ্যোক্তরা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তার কাছে ভীড় জমাতো। এক একটি পরিকল্পনা যেন ছিল এক একটি থিসিস যার উপর ডক্টরেট ডিগ্রী দেওয়া যেতে পারে। ইন্ডাস্ট্রীর সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স জড়িত।

www.pathagar.com

তাই মোস্তফার সাহচর্য্য আমার নুতন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হল। জমি, মেশিনারীজ খরিদ করা থেকে শুরু করে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাত করণ পর্যন্ত যাবতীয় খুটিনাটি এই সব প্লানে স্থান পেত এবং এগুলোর বাস্তবায়নও হত কনসালট্যান্টের প্রত্যক্ষ তদারকীতে। এসব দেখে মনে হত পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ আমরা কত পিছিয়ে রয়েছি। শিল্পের চাইতে ব্যবসার প্রতি আমাদের ঝোঁক বেশী। শিল্পে অনেক ঝুঁকি কিন্তু ব্যবসায়ে ঝুঁকি কম। তাছাড়া ব্যবসাটা যদি পারমিটের ব্যবসা হয় তাহলেত সোনায় সোহাগা। কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলের কাপড়ের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পায় পাকিস্তান সৃষ্টির পর। প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা মিল নির্দ্ধারিত মূল্যে কাপড় খরিদ করে খোলা বাজারে বিক্রয় করে সেসময় প্রচুর মুনাফা লুটেছেন। সত্যিকারের ব্যবসায়ীরা মিল থেকে সরাসরি বেল পেতনা, ঐসব নেতা কর্মীর নিকট থেকেই তা খরিদ করতে হত। এসব ব্যবসা যেমন পাকিস্তান আমলেও জমজমাট ছিল এখনও বাংলাদেশে জমজমাট রয়েছে। হাজারো রকমের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে। নব্য কোটিপতিরা এইভাবেই তাদের জীবনে আলাদিন-এর চেরাগের সন্ধান পেয়েছেন।

ডাইরেক্টর বোর্ডের প্রথম সভায় অনেক হোমরা চোমরাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, পরিচয় হল। কর্মকর্ত্তা কর্মচারীদের মধ্যে অনেক আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ ছাত্রও ছিলেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল খুবই মজবুত। শেরওয়ানী ও পাজামার কাটিং দেখে বুঝে নেয়া যেত ইনি আলিগড়ী ভাই। করপোরেশন অফিস ও করাচী শহরে এরূপ পরিচিত বহুজনকে পেলাম। অত্যন্ত সৌহার্দের মধ্যে কাজ শুরু হল। অনেক উদোক্তা প্ল্যান দাখিল করেছেন, প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ চেয়েছেন এবং সেগুলো প্রসেসও হচেছ। তবে দুঃখের বিষয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোন উদ্যোক্তার কোন দরখাস্ত দূরবীন লাগিয়েও পাওয়া গেলনা। পশ্চিম পাকিস্তানে ইন্ডাস্ট্রি গড়ার ক্ষেত্রে কিছু সুবিধাজনক পরিবেশ ছিল। দেশের জমিদার ও ধনিক শ্রেণী ছাড়াও যারা ভারত বিভক্তির পর করাচী ও অনান্য বড় বড় শহরে হিজরত করেন তাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় ছিলেন। বাংলাদেশে যেমন সংখ্যালঘু হিন্দুরা অর্থনৈতিক ও শিক্ষার দিকে অগ্রগতি ছিল তেমনি ভারতের ইউপিতে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ হলেও তারা ছিলেন শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়। ইউপি, সিপি, দিল্লী ইত্যাদি অঞ্চল থেকে বেশীর ভাগ ধনী শ্রেণী পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত না করে পশ্চিম পাকিস্তানে হিজরত করা শ্রেয় মনে করেছেন। পশ্চিম পাকিস্তান রাজধানী হওয়ার কারণে সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়াও এই সমস্ত ভারতীয় ধনী মোহাজের নিজস্ব প্রচেষ্টায় পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। ১৯৫৮ সালে করাচী গিয়ে সর্বত্র উন্নত জীবনের ছোঁয়া লক্ষ্য করেছি। যখন আমাদের দেশে রাজমিস্ত্রি মাত্র ৪ টাকা দৈনিক হাজিরাতে শ্রম দিত, করাচীতে দেখেছি মজুরী কমপক্ষে দৈনিক দশ টাকা।

www.pathagar.com

তাছাড়া অঞ্চলে অঞ্চলে বৈষম্যের পিছনে যে রাজনৈতিক কারণ ছিল, কেন্দ্রের একচোখা নীতি ছিল তা অনস্বীকার্য্য। পরবর্তী আমলে বাংলাদেশের কিছু উদ্যোক্তা ঢাকায় ও করাচীতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করার জন্য যে অনুরোধ রেখেছেন তাতে আমি অবশ্যই সাড়া দিয়েছি। তবে আমার অভিজ্ঞতায় আমি বুঝেছি শিল্প ঋণ প্রাপ্তি তখনকার দিনে ছিল দূরহ ব্যাপার। লাল ফিতার দৌরাত্ম কাটিয়ে ঋণ প্রাপ্তি এমনিতেই কঠিন তার উপর ঢাকা, খুলনা, চিটাগাং থেকে করাচী গিয়ে তদবীর করা, ঋণ প্রসেসিংকে এগিয়ে দেওয়া খুবই দূরহ ব্যাপার ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়ন এর ব্যবস্থা প্রথম থেকেই প্রাদেশিক রাজধানী ভিত্তিক হওয়া উচিত ছিল। কর্পোরেশনের ডাইরেক্টর বোর্ডের কাজ ছিল গতানুতিক। তাইতে মিটিং শেষে ভারতে মুসলমানদের জন্য যে ভূখন্ড প্রতিষ্ঠার পিছনে ছাত্রজীবনে আমারও অবদান ছিল তা চোখ মেলে দেখার জন্য পুরো সময়টুকু ব্যয় করেছি। পূর্ব ও পশ্চিম মিলেই যে দেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম তা ছিল সত্যই বৈচিত্রময়। বিশাল ভারতে যা কিছু রয়েছে, পাকিস্তানের দুই অঞ্চল মিলিয়ে তার সবকিছুই বিদ্যমান ছিল।

১৯৫৮ সনে করপোরেশনের বোর্ড মিটিংএ করাচী গিয়ে পাকিস্তানের রূপকার কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ যার নেতৃত্বে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের সঙ্গে আমিও আন্দোলন করেছি এবং যাকে আলিগড়ের ছাত্রজীবনে অত্যন্ত নিকটে থেকে দেখেছি তাঁর কবর জিয়ারতের জন্য বন্ধু মোস্তফা সহ হাজির হলাম। সবুজে ঘেরা আঙ্গিনায় সুউচচ গম্বুজের নীচে শায়িত কায়েদে আযমের কবরের পাশে প্রতিদিন হাজারো নারী পুরুষের ভীড়ের মধ্যে আমিও মিশে গেলাম। অনতিদূরে শায়িত রয়েছেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তাঁর সিপাহসালার কায়েদে মিল্লাত নওয়াবজাদা লিয়াকত আলি খাঁন যার উদ্দীপনাময় বক্তৃতা আলিগড়ের ছাত্রদেরকে সাময়িকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে দুর্বার গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল।

প্রথম সফরেই মোস্তফা নিয়ে গেল করাচীর শহরতলী মালিরে নুতন প্রতিষ্ঠিত ডিগ্রী কলেজে যেখানে ১১ বছর পর সাক্ষাৎ হল আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মাস বিভাগের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান প্রফেসর এস. এম. শফির কলেজ সংলগ্ন বাসভবনে। প্রফেসর শফির উষ্ণ আলিঙ্গনে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মাস বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে আমিই প্রথম স্থান অধিকার করি আমার এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের স্নেহভরা সান্নিধ্যে থেকে। প্রফেসর শফি আমাকে আলিঙ্গনাবস্থায় পাশে বসিয়ে বললেন - "জীবনে অনেক ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার হতে শিক্ষা শেষে বিদায় দিয়েছি - অনেকেই জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর মধ্যে অনেকেই পাশ দিয়ে চলে যায় ফিরিয়ে তাকায় না। আবার অনেকেই কাছে এসে সম্মান প্রদর্শন করে - কুশল জিজ্ঞাসা করে

www.pathagar.com

এটাই আমার বড় পাওয়া।" সাক্ষাৎটা ছিল ১১ বছর পর - আমি ছিলাম তাঁর মনে রাখার মত একজন ছাত্র তিনিও ছিলেন আমার গৌরবময় ফলাফলের গাইড। তাইতে উভয়েরই অন্তরে ছিল আবেগ আর চোখে ছিল আনন্দাশ্রু।

করাচীতে প্রথম সমুদ্র দর্শন

জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখলাম করাচীতে। প্রতিটি মানুষ শৈশাবস্থা থেকে আকাশ দেখে, আকাশের চাঁদও দেখে কিন্তু আকাশের মত দূর দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র দেখার সুযোগ সবার হয়না। সমুদ্রের কাছে এলে সমুদ্র ও আকাশ দুইই দেখা যায় - সমুদ্র ও আকাশ যেখানে কোলাকুলি করে তাও প্রত্যক্ষ করা যায়। কি অপূর্ব দৃশ্য, কি মনমোহিনী রূপ - কি বিশাল অন্তহীন এর বিস্তৃতি - স্রষ্টার সব সৃষ্টির মত এ দুটোও বিস্ময়কর। আকাশ ও পৃথিবী মানুষকে উদার হতে শেখায়, মানুষের মনের ক্ষুদ্রত্বকে দূর করে নিজের বক্ষকে প্রশস্ত করে অন্যকে আলিঙ্গন করতে শেখায়। ক্লিফটনের সমুদ্র সৈকতে এটাই ছিল আমার মনের অভিব্যক্তি। এ সৈকতও ছিল সুদুর বিস্তৃত - সমুদ্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৃষ্টির বাহিরে নিরুদ্দেশের পথে নিখোঁজ হয়ে গেছে। ক্লিফটনের সৈকতে দাঁড়িয়ে আরব সাগরের নোনা পানির হিমেল হাওয়ায় অবগাহন অবস্থায় দূর দিগন্তে দৃষ্টি ফেরানো মধ্যে একটি আমেজ রয়েছে যে কারণে বিকেলের ক্লিফটনে হাজারো নারীপুরুষের, কচি কাচাদের কলকাকলীতে প্রকৃতি তন্ময় হয়ে ওঠে। ক্লিফটনের সৈকতে আরও এটি বিস্ময়কর সৃষ্টির মত চোখে পড়ল - তা হল মরুভূমির জাহাজ উট। আমার জীবনের সর্বপ্রথম উট দর্শন। আকাশ ও সমুদ্রের মত মরুভূমিও উদার - দিগন্ত বিস্তৃত। মরুভূমি দেখবার সুযোগ তখনও হয়নি কিন্তু যে জাহাজ শুষ্ক বালুকারাশী ভেদ করে, ঝড় ঝঞ্ঝা, দুর্যোগকে অতিক্রম করে মরুচারীকে তার গন্ত ব্যস্থলে পৌছে দেয় সেই উদার, নিরীহ প্রাণী উটকেও দেখলাম। মোস্তফাকে হেঁসে বললাম আমার দাদা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হজ করেছিলেন উটের পিঠে চড়ে, আমার আব্বা হজ করেছেন অনেক পরে নড়বড়ে ৪ চাকার গাড়ীতে। এস দাদা কি আমেজে উটের পিঠে চড়ে হজ করেছিলেন তার একটু স্বাদ নেই। আমরা দুই বন্ধু মাত্র আট আনায় একত্রে উটের পিঠে চড়ে দুই মাইল সফরের সুযোগ পেলাম। ২০ বছর পর করাচী সফরে এলে এসব দৃশ্য আর দেখা যেতনা। সেটাই প্রমানিত হল যখন ১৯৭৮ সালে রাবেতা আলম আল ইসলামীর ওয়ার্লর্ড কনফারেন্সে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে করাচী এলাম মওলানা আব্দুর রহীমের নেতৃত্বে। ক্লিফটনের সৈকত সঙ্কুচিত হয়েছে, প্রশস্ত রাজপথ, হাজারো লাখো ইমরাত গড়ে উঠেছে উচচতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, সমুদ্রের জাহাজের ভিড়ে মরুভূমির জাহাজ বিদায় নিয়েছে, হাজারো চলমান ও নোঙ্গর করা ছোট বড় ও সমুদ্রগামী জলযানে মানুষের দৃষ্টি আর সমুদ্র আকাশের মিলনস্থানে পৌছায়না, কার্বন মনোকসাইডের মিশ্রণে আরব সাগরের পানি

www.pathagar.com

বিধৌত হিমেল হাওয়াও তার স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতা হারিয়েছে। কিন্তু তাই বলে এসব পরিবর্তনকে উপহাস করা যাবেনা। বর্তমান বিশ্ব সভ্যতায় এগুলিই উন্নতির মাপকাঠি এবং এই পথেই সবাই পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

অধ্যায়-৭

সক্রিয় রাজনীতির ময়দানে

মার্শাল ল জারী হওয়ায় রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দ অনেকেই কারাগারে। রাজনীতির ময়দানে কাদা ছোড়াছুড়ি, পদ দখলের উদগ্র বাসনা, মন্ত্রী সভার ঘন ঘন পতন ও পরিবর্তন, রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনায় রাজনীতিবিদদের সুষ্ঠ দিক নির্দেশনার অভাব, নৈতিক মূল্যবোধের ঘাটতি এবং অবশেষে পরিষদের মধ্যে ডেপুটি স্পীকার হত্যা জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতির প্রতি বিতৃষ্ণা জাগিয়ে দেয়। এই বিতৃষ্ণাকে কেন্দ্র করেই জেনারেল আয়ুব মার্শাল ল জারী করে প্রমাণ করতে চাইলেন যে তিনি জাতিকে উদ্ধার করেছেন। সাময়িক ভাবে হয়ত এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে তবে নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতা পেলে মানুষ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, ক্ষমতা কুক্ষিগত করার নেশা তাকে পেয়ে বসে এবং এই নেশা তাকে স্বৈরাচারী বানিয়ে দেয়, শোসক বানিয়ে দেয়, দুর্নীতিগ্রস্থ করে দেয়। মার্শাল ল একটি দেশের শাসন ব্যবস্থা হতে পারেনা এটা মানবতার অপমান। পিতামাতার স্নেহ ও শাসনে সন্তান গড়ে ওঠে যদিও স্নেহই শাসনের উপর প্রাধান্য পায়, সফল রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্নেহ ও শাসন দুই রয়েছে কিন্তু মার্শাল ল তে শুধু শাসন রয়েছে স্নেহ নেই। এখানে শাসককে নির্ভর করতে হয় আমলাদের উপর এবং এই নির্ভরশীলতাই আমলাদের ক্ষুদে শাসক বানিয়ে দেয়। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনের তাগিদে শাসক ক্ষুদে শাসকদের হাতে ধারালো অস্ত্র তুলে দেয় যার দংশন দেশের প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আমিও এরূপ এক অবস্থার স্বীকার হলাম। এবছরটি ছিল আমার শোকের বছর। গোটা বছরটাই আমার আব্বা হাই ব্লাড প্রেসারে ভূগছিলেন। ভেড়ামারার বাড়ীতেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। এপ্রিলে ঢাকায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে এই উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়ায় আমার বাসায় আম্মাকে সহ আব্বাকে আনা হল। কিন্তু কুষ্টিয়ায় আসার ২ দিনের মধ্যে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন এবং এই অবস্থায় ২৪শে এপ্রিল ভোরে তার হায়াতে আল্লাহতায়ালার বরাদ্দকৃত শেষ পানিটুকু আমার হাতে পান করে তিনি ইন্তেকাল করলেন। (ইন্নাল্লিাহ ...) আমি মুরুব্বী হারা হলাম - আমার মাথার উপর ছায়াদান কারী পিতা মাত্র ৬২ বছর বয়সে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। পিতার জেষ্ঠ্য পুত্র হিসাবে ছোট ভাই বোনদের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হল। শোকের ব্যাথা না ভুলতেই, পিতার অবর্তমানে সংসার গুছিয়ে নেবার পূর্বেই আর একটি বিপদ অকস্মাৎ আমার উপর চেপে বসল।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়বার কারাগারে

১৯৫৯ সনের অক্টোবর মাসে জেলা বোর্ড থেকে ভারমুক্ত হবার পর নিজের পেশায় মনোনিবেশ করলাম কিন্তু আমার অলক্ষে অত্যন্ত গোপনে স্থানীয় শাসক বিষাক্ত সাপের মত আমাকে ছোবল মারলেন। জেলা বোর্ড চেয়ারম্যান হিসাবে উর্দুভাষী সি. এস. পি. ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে আমার বিরোধকে কেন্দ্র করে মার্শাল ল এর সুযোগ নিয়ে আমার জেলা পরিষদ ছেড়ে আসার পরপরই তিনি তার অনুগতদের দিয়ে প্রয়োজনীয় রেকর্ড তৈরী করলেন। আমি মার্শাল ল বিরোধী, বার লাইব্রেরীতে মার্শাল ল এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছি, সুইপারদের কলোনীতে গিয়ে তাদের ধর্মঘট করতে উত্তেজিত করেছি, প্রশাসনের কাজে বিঘ্ন ঘটনার চেষ্টায় রত রয়েছি ইত্যাদি সূচালো তীর দিয় আমাকে আঘাত করলেন। ১৯৫৯ সনের নভেম্বর তৃতীয় সপ্তাহের এক ভোরে পুলিশ বাড়ী থেকে গ্রেফতার করে রাজশাহী কেন্দ্রিয় জেলে স্থানান্তর উপলক্ষে কুষ্টিয়া রেলওয়ে স্টেশনে নিয়ে এল। অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম কুষ্টিয়া বারের সিনিয়র আইনজিবী জনাব মাহতাবউদ্দিন আহমদ, যিনি ছিলেন এ দেশের প্রথিতযসা আইনজিবীদের মধ্যে অন্যতম, তিনি গ্রেফতার হয়ে আমার সঙ্গে পুলিশের কড়া পাহারায় রাজশাহী যাচ্ছেন। উনি আমাকে দেখে বিস্মিত হননি কেননা আমি রাজনীতি করি কিন্তু আমি উনাকে দেখে বিস্মিত হলাম এজন্য যে উনি জীবনে কোনদিন রাজনীতি করেননি বা কোন দলে যোগদান করেননি। আমার মুখে হাঁসি ছিল উনার মুখ মলিন, বিমর্ষ। উনার গ্রেফতারের হেতু তখন বুঝতে পারিনি তবে পরে এক চাঞ্চল্যকর ও হাস্যকর ব্যাখ্যা উদঘাটিত হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার আমার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করে এস. পি. এর শরনাপন্ন হলেন কিন্তু এস. পি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র ছিল এবং তার বাসা ছিল আমার বাসা সংলগ্ন তাইতে তিনি রাজী হননি তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে মিথ্যা করে জড়াতে। কিন্তু ডেপুটি কমিশনারের সুযোগ এসে গেল সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে। এস. পির বাসার মালিক ভাড়া বাঁকি বাবদ টাকা প্রদান ও উচেছদের নোটিশ দিলেন জনাব মাহতাবউদ্দিন সাহেবের মাধ্যমে। এস. পি বিরুদ্ধে নোটিশ - আর তাও মার্শাল ল আমলে? এস. পির নিজের স্বার্থে এবার আঘাত লাগল ছুটে গেলেন ডেপুটি কমিশনারের নিকট ফয়সালা হল ফিফটি ফিফটি। ডি. সির ক্যান্ডিডেট আমি এবং এস. পির ক্যান্ডিডেট বেচারা মাহতাবউদ্দিন সাহেব। রাষ্ট্রদ্রোহীদের বিরূদ্ধে পেপার তৈরী হতে দেরী হলনা। দেশের নিরপত্তা বিঘ্নিত হচেছ সুতরাং দেরী করা আদৌ সমিচীন নয়। ডিটেনশন অর্ডার প্রস্তুত হল, কার্য্যকরী হল। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বলি হয়ে গেলেন এস. পির ব্যক্তিস্বার্থের কারণে।

আল-কোরআনের স্পর্শে এলাম

দ্বিতীয় বার কারাগারে এসে সৌভাগ্য বশত আল কোরানের স্পর্শে এলাম। কোরান পড়েছি, সামান্য কিছু সুরা ও আয়াতের অর্থ পড়েছি কিন্তু মাতৃভাষায় পুরো

www.pathagar.com

কোরান পাঠ আমার জীবনে হয়নি। এটা অবশ্যই আমার দৈন্যতা, আমার দুর্ভাগ্য তবে তখনকার সময়ে তেলাওয়াতটাই চালু ছিল অর্থ জানা প্রচলন ছিলনা। নামাজের জন্য কিছু মুখস্ত প্রয়োজন তবে বুঝে পড়ছি কিনা তা তাগিদ দেবার কেউ ছিলনা। এসব আনুষ্ঠানিক ইবাদতের গূঢ় উদ্দেশ্য কি তা জানারও প্রচেষ্টা ছিল না। আল কোরআনকে জানবার এক আকাংখা সৃষ্টি হল নিজের মনের গভীরে। ১৯৪৪ সনের কোন এক ঘুমভাঙ্গা সকালে মনে এক কিশোরীর প্রতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল এটা তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, শুধু পৃথক নয় তুলনাবিহীন। আর একটি উন্নতি হল। ছাত্রজীবন শেষ করে রাজনীতির ময়দানে কাজের মাঝে নামাজে গাফেল হতাম কখনও কখনও কিন্তু এবার রাজশাহী কেন্দ্রিয় কারাগারে পৌছানোর রাত থেকে মনে হয় এ পর্যন্ত আমার জীবনে নামাজ কাজা হয়নি। এ আমার প্রভূ, আমার স্রষ্টা, আমার জীবন ও মৃত্যুর মালিকের করুণা যা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, সবচাইতে বড় পাওয়া,সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

কেন্দ্রিয় কারাগারের উন্নত পাঠাগার থেকে ৩০ পারা বাংলা তরজমা চেয়ে নিলাম। বিশাল সুমদ্রে ডুব দিলাম - আরবী বাদ দিয়ে শুধু বাংলা অর্থ পড়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম কোরআনের এই দরিয়ায় কত লক্ষকোটি মনিমুক্তা ছড়ানো রয়েছে। কোরআন বাংলায় পাঠ করার পর ইমাম গাজ্জালীর সৌভাগ্য স্পর্শমনী ও ইয়াহিয়াউল উলুমের কিছু অংশ পড়লাম। ইমাম গাজ্জালীর আত্মদর্শন পড়ে মনে হল আত্মার উন্নতিই বোধ হয় সবকিছু। চারমাস পর কারাগার থেকে মুক্তি পেলাম - এই স্বল্প পরিসরে আল কোরআনের বাংলা অর্থ শুধু পড়েছি, বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হয়েছে তবে সব কিছুর গভীরে যাওয়া বা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিলনা। এ যেন শুধুমাত্র বই এর সূচীপত্র পাঠ। ১৯৬০ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি কারাগার থেকে মুক্তি পেলাম।

মুক্তি পেয়ে নিজের পেশায় ফিরে এলাম। কোথায়ও কোন আন্দোলনের চিহ্নটুকু নেই - যদিও ধূমায়িত অসন্তোষ ছিল। নিজের দায়িত্বের পরিধি বেড়েছে। ভাই বোনদের দায়িত্বে অংশগ্রহণ করতে হচেছ। নিজের ৪টি সন্তান বড় হচেছ, তারা পড়াশুনায় এগিয়ে চলেছে। দেশে জি. কে প্রজেক্টের কারণে পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া দাদার আমলের জমিজমা, সরকার হুকুম দখলের মাধ্যমে খরিদ করে নিচেছ মাত্র ১৫০ টাকা বিঘা প্রতি দরে - এসব কারণে পেশার দিকে নজর দিতে হচ্ছিল বেশী। এদিকে প্রেসিডেন্ট আয়ুব নিজেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে দেশে বিদেশে প্রমাণ করার জন্য ১৯৫৯ সনের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের উভয় অংশে ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন এবং নির্ধারিত ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যদের নিকট হতে ১৯৬০ সালের ১৪ ই ফেব্রুয়ারী আস্থা ভোট গ্রহণ করেন। সামরিক বিধি অনুযায়ী ভোটারদের 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার ক্ষমতা ছিল মাত্র এবং ভীষণ কষ্টকর (?) এই ভোট

www.pathagar.com

যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট আয়ুব বিশাল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। এর পর তিনি ১৯৬০ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে সংবিধান কমিটি গঠন করে একটি ফরমায়েসী সংবিধান তৈরী করে নিয়ে তাই সংবিধান হিসাবে ১৯৬২ সনের ১লা মার্চ তারিখে চাপিয়ে দেন। এই ভাবে সংবিধান চাপানোর জন্য দেশের কোথায়ও যেন কোন অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থা করলেন তড়িৎ গতিতে।

তৃতীয়বার কারাগারে

ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট আয়ুব এক মরণ কামড় দিলেন। ১৯৬২ সনের ৩১শে জানুয়ারী করাচিতে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে সমগ্র দেশে ষ্টীম রোলার চালান হল। অনেক নামকরা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমাকেও ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে গ্রেফতার করা হল। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বেই আমি পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করি। ১৯৫৯ সনে পাকিস্তান ব্যাপী যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল তাতে আওয়ামী লীগ প্রধান সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ৯ জনের যে পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হয়েছিল আমি তার অন্যতম সদস্য ছিলাম। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে কুষ্টিয়া সফরে এলে আমি তার সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যে ছিলাম। এ কারণে সমগ্র দেশে আ: লীগ নেতা কর্মীদের গ্রেফতার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে নজর দিতে সরকার ভুললেন না। দ্বিতীয় বার জেল থেকে ফিরে এসে ইমাম গাজ্জালীর অনেক বই খরিদ করেছিলাম। নিজের বাড়ীতেও কোরআন শরীফের তরজমা ও অনান্য বই ছিল। এবার নিজের বই ছুটকেস বোঝাই করে জেলের পথ ধরলাম। রাজশাহী কেন্দ্রের জেলের গেটে এসে আমার বাহন থামল। দ্বিতীয় কারাগার জীবনে যে সিলেবাস বেছে নিয়েছিলাম তৃতীয় বার কারাগারে এসে সেই সিলেবাস অনুযায়ী নিজের প্রোগ্রাম গড়ে নিলাম। ৪ মাস জননিরাপত্তা আইনে রাজশাহী কেন্দ্রিয় কারাগারে আটক থাকার পর মুক্ত আবহাওয়ায় ফিরে এলাম।

রাজনীতির ময়দান উত্তপ্ত

এতদিনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির ময়দান উত্তপ্ত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আয়ুবের জারিকৃত সংবিধান অগ্রনীয় ঘোষণা করে পূর্ব পাকিস্তানের ৯ নেতা জনাব নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, শেখ মুজিবর রহমান, ইউসুফ আলি চৌধুরী, মোহন মিয়া, মাহমুদ আলি, সৈয়দ আজিজুল হক ও মওলানা পীর মহসেন উদ্দিন আহমেদ ২৪শে জুন ১৯৬২ তারিখে এক যৌথ বিবৃতিতে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণ পরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

পশ্চিম পাকিস্তানেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ১৯৬২ সনের ২৪শে নভেম্বর তারিখে। ১৯৬২ সালের ৮ই জুলাই ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে ৯ নেতার দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাষানী সহ উভয় অঞ্চলের দেশেবরেন্য নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯শে আগষ্ট (১৯৬২) কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকায় আগমন করলে বিমান বন্দরে লক্ষ জনতা তাকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী নয় নেতার বিবৃতির সহিত একাত্মতা ঘোষণা করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী সহ নয় নেতার পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা সফরে মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব গণ জোয়ার সৃষ্টি হয়। নয় নেতার স্বাক্ষরিত দলিলে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্বাক্ষর না থাকলেও তিনি জনগণ কর্তৃক এই আন্দোলনের অলিখিত নেতা হিসাবে গণ্য হলেন। কুষ্টিয়ার রেনইউক ময়দানে নয় নেতা সহ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতিতে যে ঐতিহাসিক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, তার স্মৃতিচিহ্ন আমার মনে এখনও ভেসে ওঠে। আওয়ামী লীগের জেলা সম্পাদক হিসাবে এই ঐতিহাসিক জনসভা ও নয় নেতা সহ সোহরাওয়ার্দীর সম্বর্ধনার প্রধান দায়িত্বে আমিই ছিলাম। স্মৃতির দুয়ার উন্মুক্ত করে আমার প্রতি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্নেহমিশ্রিত দরদ মাখা মন্তব্য আজও আমার কানে বাজে। আমার বাসায় দুপুরে নেতৃবৃন্দের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। সনাতনী ব্যবস্থা পরিহার করে ব্যতিক্রমধর্মী মেনু পরিবশেন করা হয় - শাক সবজী, চুনো মাছের ছড়াছড়ি এবং স্পেশাল ডিস হিসাবে নুতন গোলআলু ভর্ত্তা ইলিশ মাছ ও ধনিয়া পাতা দিয়ে। টেবিলে মেনুর চেহারা দেখে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বললেন - "সা'দ তোমার বুদ্ধি আছে। এত জায়গায় গেলাম - সব জায়গায় পোলাও কোরমা একদম হয়রান হয়ে গেলাম - তোমার বুদ্ধি আছে।" খাবার টেবিলে বসে আলু ভর্তা নিয়ে নেতাদের কাড়াকাড়ি কামরা ভর্ত্তি সবার জন্য ছিল আনন্দের খোরাক আর দৃশ্যটা ছিল ক্যামেরায় ধরে রাখার মত।

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পাকিস্তানের উভয় অংশে গণজোয়ার সৃষ্টির কারণে নিজস্ব দলীয় প্ল্যাটফরমে থেকে আন্দোলন গড়ে তোলার চাইতে একবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসককে উৎখাত করার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নয় নেতার যুক্ত প্রচেষ্টা এবং পরবর্তী বিভিন্ন নামে যুক্ত আন্দোলন গড়ার পিছনে এই মনোভাবই ক্রিয়াশীল ছিল। তখনকার পরিবেশে একথা অনস্বীকার্য ছিল যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এমন এক দুর্লভ ব্যক্তিত্ব যিনিই কেবল মাত্র পারেন পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতৃবৃন্দকে ও জনগণকে এক সূতোয় বেধে রাখতে। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য তিনি ১৯৬২ সালের ৫ই ডিসেম্বর লেবাননের রাজধানী বৈরুতে স্বজনহারা পরিবেশে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেন। বিদেশের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেও স্রষ্টা তাঁর জন্য দেশেই লাখো কোটি জনতার অশ্রু ভেজা একখন্ড মাটি বরাদ্দ করে

www.pathagar.com

রেখেছিলেন তার আমলনামায়। করাচীতে জানাজা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ৮ই ডিসেম্বর ঢাকার রেস কোর্সের তাঁর জানাজায় লক্ষ লক্ষ শোকাভিভূত ও অশ্রু বিগলিত জনতার এক অবিস্বরণীয় দৃশ্যের অবতারণা হয়। তিনি ছিলেন বাংলার মাটির মানুষের আপনজন। কায়েদে আজম ও কায়েদে মিল্লাতের মৃত্যুর পর জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী রাষ্ট্রের কর্নধার হওয়ার সুযোগ পেলে হয়ত পাকিস্তানের ইতিহাস অন্যভাবে লিখা হত।

জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী আয়ুবের স্বেরাচারী শাসন অপসারণ ও ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র পুনঃজীবনের অথবা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং সেজন্য তিনি তার নিজের দলকেও পুনঃজিবীত করার পক্ষপাতি ছিলেন না। আওয়ামী লীগের মধ্যে দুইটি গ্রুপ ছিল যাদের একগ্রুপ ছিল 'একলা চল' নীতির উপর এবং অন্য দল ছিল যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণকে নিয়ে। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী মৃত্যুর পর আর একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা গড়ে ওঠে জেনারেল আয়ুব ঘোষিত ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। জেনারেল আয়ুব খাঁকি পোষাক ছেড়ে গণতান্ত্রিক নেতার লেবাসে আত্মপ্রকাশ করতে চাইলেন। আয়ুব রচিত সংবিধানে প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক সদস্যদের জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবার কোন বিধান ছিল না। এই নির্বাচনের জন্য নির্বাচক মন্ডলী সৃষ্টি করা হয়েছিল যারা বাস্তব পক্ষে ছিলেন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ। মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), আওয়ামী লীগ, ন্যশনাল আওয়ামী পার্টি, নেজামে ইসলাম ও নিষিদ্ধ ঘোষিত জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য ১৯৬৪ সনের ২০শে জুলাই তারিখে ঢাকায় নয়দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সম্মিলিত বিরোধীদল (COP) গঠন করেন। ১৭ ও ১৮ই সেপ্টেম্বর করাচী বৈঠকে এই সম্মিলিত বিরোধী দল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলি জিন্নার ভগ্নি মোহতারেমা ফাতেমা জিন্নহকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দান করেন। পাকিস্তানের উভয় অংশ জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। প্রতিটি জেলায় কপের কমিটি গঠিত হয়। কুষ্টিয়া জেলাতেও কপের কমিটি গঠিত হয় এবং তার নেতৃত্বের দায়িত্বে আমিই ছিলাম। প্রতিটি ইউনিয়নে ৯ জন করে ভোটার অর্থ্যাৎ ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ছিলেন সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা এবং সরকারের আশীবাদপুষ্ট হয়ে আর্থিক লাভবান হবার সুযোগ ছিল তাদের। ফাতেমা জিন্নার নির্বাচনী ট্রেনে নেতৃবৃন্দ সহ সফরে কুষ্টিয়া, যশোহর, খুলনা জেলার জনগণের মধ্যে যে উচছাস দেখেছি, ফাতেমা জিন্নার প্রতি যে সমর্থন দেখেছি তা ছিল বিস্ময়কর কিন্তু তারাতো ভোটার ছিলনা। নিজ নিজ এলাকায় হাতে গোনা ৯ জন সদস্যদের উপর জনগণের কোন চাপ ছিলনা কেননা সদস্যরা ছিল আয়ুবের বরপুত্র ও সরকারী মোড়কে সুরক্ষিত। আয়ুবের মহাজয় ঘোষিত হল।

www.pathagar.com

জেলায় সরকারবিরোধী সমস্ত আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান

এরপর একইভাবে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও আয়ুব সংখ্যাধিক্য পেলেন তবে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে পরিষদের অভ্যন্তরে স্বৈরাচার বিরোধী আওয়াজ উঠানোর মওকা এল। জাতীয় পরিষদে ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য বিরোধদলের সদস্যগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্মিলিত বিরোধীদল গঠন করেন। পরবর্তী আমলে বিরোধীদল সমূহের নেতৃবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে ব্যক্তি শাসনের শ্বাসরুদ্ধকার পরিস্থিতি হতে পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন নয় - গণ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য পাকিস্তান ডেমোক্রটিক মুভমেন্ট (PDM) গঠিত হয় ১৯৬৭ সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখে। ততদিনে আওয়ামী লীগ পুনঃজিবীত হয়েছে, কপের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে, PDM এ যোগদান করেছে। কুষ্টিয়া জেলায় আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসাবে আমি PDM এর সদস্য ছিলাম এবং সম্মিলিত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম। PDM এর মাধ্যমে যুক্ত আন্দোলনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং তা চরম আকার ধারণ করে। শেখ মুজিবর রহমান ১৯৬৬ সনের ৮ই মে থেকে ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারে বিনা বিচারে আটক ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সনের ১৮ই জানুয়ারী তাঁকে অগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে ১৩ই জানুয়ারী (১৯৬৮) ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগার থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। শেখ সাহেবের অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের মধ্যে এই বিভেদ আরও বৃদ্ধি পেল এবং 'একলা চল' নীতি প্রাধান্য পেল। শেষ পর্য্যন্ত আওয়ামী লীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। পি. ডি. এম. পন্থী যৌথ আন্দোলনে বিশ্বাসীরা ১৯৬৭ সনের ২৩শে অক্টোবর এবং ৬ দফা পন্থীরা ২৭শে আগষ্ট তারিখে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করেন। আমি ছিলাম পি. ডি. এম. পন্থী যৌথ আন্দোলনে বিশ্বাসীদের সাথে। আওয়ামী লীগ দুইভাগে বিভক্ত হলেও এবং শেখ মুজিবের অবর্তমানে একটি গ্রুপ 'একলা চল' নীতিতে বিশ্বাসী থাকলেও কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক পরিষদে সম্মিলিত আন্দোলন থেমে থাকেনি এবং সেখানে শেখ মুজিবের মুক্তি, আগতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার, স্বৈরাচার অপসারণ, গণতন্ত্র পুনঃরুদ্ধারের দাবীগুলি প্রাধান্য পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নে ও আগতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে কোথায়ও কোন দ্বিমত ছিলনা। শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ডেমোক্রটিক এ্যকশন কমিটি (DAC) গড়ে ওঠে যার ফলে শেখ সাহেব সহ রাজবন্দীদের মুক্তি ত্বরান্বিত হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার হয় এবং জেনারেল আইয়ুব পদত্যাগ করেন জেনারেল ইয়াহিয়ার হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু শেখ সাহেব মুক্তি পাওয়ার পর ছয় দফা পন্থী 'একলা চল' নীতির সমর্থকদের সাথেই মিলে গেলেন এবং তাঁর আন্দোলনের নুতন অধ্যায় শুরু হল।

www.pathagar.com

পূর্বেই বলেছি তৃতীয়বার ১৯৬২ সনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আমিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই নিরাপত্তা আইনের বিধানমতে। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ি। ১৯৬৯ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সামরিক শাসন বিরোধী যে সমস্ত সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এই দেশে যথা সম্মিলিত বিরোধী দল (COP), পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন (PDM), ডেমোক্রেটিক এ্যকশন কমিটি (DAC) তার সবগুলোতেই চেয়ারম্যান বা কনভেনর হিসাবে আমি কুষ্টিয়া জেলার নেতৃত্ব দিয়েছি। আন্দোলনের ধারা ও প্রকৃতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ১৯৬৬ সনে আমাদের মতপার্থক্যের উদ্ভব হয় এবং হাইকোর্টের প্রথিতযশা সিনিয়র এ্যডভোকেট প্রাক্তণ মন্ত্রী জনাব আব্দুস সালাম খান সহ আমরা গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করি। আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে আমি একজন সমর্থক হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি। জামায়াতে যোগদানের পরও সেখ মুজিবরের মুক্তির প্রশ্নে ১৯৬৯ পর্য্যন্ত সমস্ত যৌথ আন্দোলনে কুষ্টিয়া জেলায় আমাকে নেতৃত্ব দিতে হয়েছে।

কেন প্রচলিত রাজনীতি পরিহার করে ইসলামী আন্দোলনে যোগ দিলাম ?

মুসলিম ছাত্রলীগের সদস্য হিসাবে আমার রাজনীতিতে হাতে খড়ি। তবে ছোটকাল থেকেই মুসলিম লীগের রাজনীতি ও পাকিস্তান আন্দোলনের শুভ সূচনায় মুসলিম লীগের পতাকাতলে মুরুব্বীদের কার্য্যক্রম দেখেছি, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রীয় অংশগ্রহণ করেছি - এসব কিছু কৈশোরে ও যৌবনের প্রারম্ভে অবশ্যই মনে রেখাপাত করেছে। ১৭৫৭ সনের পর ভারতীয় মুসলমানদের যে দূরাবস্থার সূচনা হয় এবং পরবর্তী ১৮৩ বছরে (১৯৪০ সনে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহিত হবার বছর) ইংরেজ ও তাদের আশ্রিত বর্ণ হিন্দুদের নিপীড়ন ও শোষণে মুসলমানদের অধঃপতিত অবস্থা চরমে পৌছে তা ছিল শুধু মুসলমান হবার কারণে, ইসলামের পতাকাবাহি হওয়ার কারণে। এর পিছনে ছিল ইংরেজদের লুন্ঠন ও শোষণের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, বর্ণ হিন্দুদের প্রতিশোধ গ্রহণের দুর্দমনীয় স্পৃহা এবং সর্বোপরী ছিল মুসলমানদের ইসলামী বিধান থেকে বিচ্যুতি এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ বিভেদ ও অনৈক্য। যে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আমরা পাকিস্তানের প্রথম দিনের সোনালী প্রভাত দেখলাম তাতে বিশ্বাস ছিল আমরা পাকিস্তানে আদর্শিক ভিত্তি ইসলামের উপর আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, জীবন বোধ, জীবন বিধান গড়ব এবং একটি স্বতন্ত্র জাতির ঈমান আকিদা নিয়ে অতীতের গৌরবজ্জল অধ্যায়ের পুনারাবৃত্তি করব। হেরার গুহায় যে রোশনী প্রজ্বলিত হয়েছিল তা বিশ্বের যে স্থানেই পৌছেচে সেখানেই সাম্য, মৈত্রী ও ইনছাফের মানদন্ডকে সুদৃঢ় করেছে এবং বঞ্চিত মানবতাকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের পতাকাতলে ভারতের দশকোটি মুসলমান পাকিস্তান প্রস্তাবের সমর্থনে শীশাঢালা প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে গেলে একদশকের কম সময়ের মধ্যেই ইংরেজ ও হিন্দুদের বিরোধীতায় বিজয় ছিনিয়ে আনে। মদিনায় একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠনের পর নবী করিম (দঃ) এর নেতৃত্ব সাহাবায়ে কেরাম, স্পেন বিজয়ের পর মুছা ও ত্বারেক, সিন্দু বিজয়ের পর মহম্মদ বিন কাসেম এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এ জাতির পূর্বসূরীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সীমাহীন ত্যাগ ও কোরবানীর বিনিময়ে যাবতীয় স্বৈর ও কুশাসনকে মিটিয়ে দিয়ে যে ইনছাফভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তার নেয়ামত বিশ্বমানবতা কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভোগ করেছে। আশা ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই আমাদের গৌরবময় অতিতের পথ ধরে জাতির কর্ণধাররা পাকিস্তান আন্দোলনের দিনগুলোর মত ভোগ নয়, ত্যাগ ও কোরবানীর আদর্শে সঞ্জীবিত হয়ে নূতন রাষ্ট্রটিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করবেন। প্রায় দুইশত বছরের ইংরেজ ও বর্ণ হিন্দুদের নিষ্পেষণ ও শোষণের কারণে সৃষ্ট হারানো ঈমানকে পুনরুদ্ধার করা হবে, লুপ্ত প্রায় রাজনৈতিক শক্তিকে পুনরুজ্জিবীত করা হবে, অর্থনৈতিক দৈন্যদশাকে মিটিয়ে দিয়ে স্বচছলতা আনয়ন করা হবে, অঞ্চলে অঞ্চলে বৈষম্য দূর করা হবে এবং হযতর ওমর (রাঃ) এর মত দূরবর্তী ফোরাতের কূলে অভূক্ত কুকুরের জন্য চিন্তা না করলেও অন্ততঃ আল্লাহর বান্দাহ আদম সন্তানের জন্য চিন্তা করবে এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাদিহীতার ভয়ে সর্বদা ভীতগ্রস্থ থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ, কায়েদে মিল্লাত লিয়াকত আলি খাঁন ও অনেক প্রথম সারীর নেতৃবৃন্দ দুনিয়া থেকে বিদায় নিলে নেতৃবৃন্দ প্রথম থেকেই কিছু ভূলভ্রান্তি করলেন যেগুলো ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে অবশ্যই পরিহার করা উচিত ছিল। দেশ বিভাগের পর লক্ষ লক্ষ মোহাজের এদেশের বাসিন্দা হলেন। বিশ্বনবী মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) যে নীতির ভিত্তিতে আনছার মোহাজের সমস্যার সমাধান করে বিশ্বের বুকে নূতন ভ্রাতৃত্ব বোধের সন্ধান দিলেন যা ইসলামের বিশ্বভাতৃত্ব নীতির সহায়ক তা কালেমার আওয়াজে সমৃদ্ধ পাকিস্তানের মাটিতে বাস্তবায়িত হল না। মোহাজের ও আনছার যমুনা ও পদ্মা নদীর মিলিত স্থানে যে ঘোলা পানি ও স্বচছ পানির পার্থক্য রেখে প্রবাহিত হতে থাকে এখানে সেরূপ পার্থক্য প্রথম থেকেই রয়ে গেল। হেরার রোশনীতে এই জাতির পূর্বসূরীরা পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে, মরুভূমির প্রচন্ড দাবদাহ অতিক্রম করে, লক্ষ যোজন পার হয়ে যে ভূমিতেই পা রেখেছেন সেখানের ভাষা শিক্ষা করে ও বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে মনের দূরত্ব, ভাষার দূরত্ব, পরিবেশের দূরত্ব, মনমানসিকতার দূরত্ব, সংস্কৃতির দূরত্ব সব মুছে দিয়ে এক দেহে লীন হয়ে গেছেন, এখানে সেরূপ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলনা বরং ভাষার প্রশ্নে অধিকাংশ জনগণের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির সুযোগ করে দেওয়া হল। এই পথ ধরেই পোত্তলিক সংস্কৃতি চোরাপথে মুসলিম সমাজ দেহে বিশেষ করে ছাত্র, তরুণদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করল যা পরবর্তীতে পাকিস্তানের মৌলিক ভিত্তি দ্বিজাতি তত্বের অস্বীকৃতির বাহন হিসাবে খাড়া করা হল।

www.pathagar.com

শাসকরা মুসলিম লীগের ছায়াতলেই এসব কাজ দ্বিধাহীন চিত্তে করে গেছেন এজন্য পাকিস্তান আন্দোলনে একমাত্র মুসলিম জনগণের সংঘবদ্ধ রূপ মুসলিম লীগকে চক্রান্তের মাধ্যমে শাসকদের আজ্ঞাবহ, জনতার সমর্থন হীন সংগঠনে পরিণত করা হল। নিরাপত্তা আইনে পাকিস্তানের আদর্শের নিরাপত্তা বিধান না করে শাসককূল ও তাদের আশ্রিত সর্বস্তরের আমলাদের নিরাপত্তা বিধান করা হল। তাইতে পাকিস্তান সৃষ্টির অর্ধ দশকের কম সময়ের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণে মুসলিম লীগের অবদানের কথা মানুষ বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিস্মৃত হয়ে গেল। মুসলিম লীগ ধনীক শ্রেণী, শাসক শ্রেণীর সংগঠন হওয়ায় পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু নেতৃবৃন্দ ও উচ্চ পর্য্যায়ের কর্মীবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যখন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হল তখন সাধারণ মানুষ 'আওয়াম' শব্দের মধ্যে হতাশার মধ্যেও আশার পথ খুজে পেল। কোরান ও সুন্নার আদর্শে দেশ গড়া হবে এ ঘোষণা না দিয়ে 'কোরান ও সুন্নার পরিপন্থী কিছু করা হবেনা' ঘোষণা দিয়ে ইসলামপ্রিয় জনতার সমর্থন কুড়ানো হল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ৩ নেতার একই মঞ্চে অবস্থান থাকলেও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে অনৈক্যের যে নাটক মঞ্চস্থ হল, ইসলামী ন্যায় নীতি ও ইনছাফের যে ধ্বস নামল, পরিষদে ডেপুটি স্পীকার হত্যা করে যে কলঙ্কময় অধ্যায় সৃজিত হল, ক্ষমতার দ্বন্দে যেভাবে নীতি ও রুচীর অবনতি ঘটল তাতে দেশ ও সমাজ ধ্বংসের সর্বপ্রধান হাতিয়ার 'অনৈক্যের' বীজকে সার প্রয়োগে তরতাজা করা হল। যারা ছিল পাকিস্তান সৃষ্টির মূল বিরোধী শিবিরে, যাদের হাতে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের রক্ত ঝরেছে তাদের সঙ্গে মিলে-যুক্ত নির্বাচন প্রথা গলাধকরণ করে শত সহস্র বছরের আদর্শিক ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া হল। শিক্ষিত ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পিছিয়ে পড়া সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে রাজনৈতিক অঙ্গনে মিশবার ও প্রভাবান্বিত করার সুযোগ পেল। ব্রিটিশ আমলেও হিন্দু নেতৃবৃন্দ কোন মুসলমানকে 'হিন্দু' বানাতে চায়নি, তাদের ধর্মে এ ব্যবস্থাও নেই তবে তারা মুসলামানদেরকে হিন্দুমনা করতে চেয়েছে এবং করেছেও। মওলানা আযাদের মত স্বনামধন্য আলেমও বলেছেন 'হাম পহেলে হিন্দী হ্যায় উসকে বাদ হাম মুসলমান হ্যায়'। যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি, ভাষাকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মুসলমানদের সাংস্কৃতির শক্তিশালী দেওয়ালে বহু ছিদ্র পথ সৃষ্টি করে দিল। আয়ুবের মার্শাল ল এর অধিনে সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তির অধীনে 'মাও সেতুং' এর বাণী সমৃদ্ধ লাল বই এদেশের সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করল কিন্তু আমাদের দেশের ইসলামী সাহিত্য চীনের প্রাচীর ভেদ করতে পারল না। 'রাজনীতির শক্তি বন্দুকের নল থেকে বের হয়' - এই মতবাদের বহুল প্রচার দেশে সন্ত্রাসের জন্ম দিল এবং রাজনীতির ময়দানে যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান চর্চা কবরস্থ হয়ে লাঠি ও অস্ত্র সে স্থান দখল করে নিল। কোন চিন্তাশীল মানুষ নীরব দর্শকের ভূমিকায় বসে থাকতে পারে না তাকে উপযুক্ত আদর্শের তালাশ করতেই হবে। আমার জীবনেও এর ব্যতিক্রম হল না।

www.pathagar.com

আওয়ামী মুসলিম লীগ বা আওয়ামী লীগে অবস্থানকালে আমি তিনবার নিরাপত্তা আইনে কারাবরণ করেছি এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারাজীবনে আমি আল কোরানের সংস্পর্শে আসি। ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদতের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই, সেগুলো রিতীমত অনুশীলনও করতে শুরু করি কিন্তু ইসলামের প্রাণশক্তি 'তাওহিদ' এর ক্ষেত্র ও পরিধি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা তখনও আমার মনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিছুটা জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবার মত। একজন হিন্দু পালোয়ানের চাইতে মুসলমান পালোয়ান আমার গর্বের বস্তু তবে সে মুসলমান পালোয়ান খোদার নির্দ্দেশ অনুযায়ী এবং রসুলের (দঃ) শিক্ষা অনযায়ী জীবন যাপন করছে কিনা সেটা কোন লক্ষণীয় ছিলনা। তবুও পূর্বে যেমন এসব ক্ষেত্রে মনে প্রশ্নের উদয় হতনা, দুইবার কারাগারে বসে একান্তে আল কোরআনের বাংলা তরজমা পড়বার কারণে নিজের সম্পর্কে, নিজের রাজনীতি সম্পর্কে, সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে প্রশ্নের উদ্ভব হত। একই সঙ্গে নিজের দলের মধ্যে ভাঙ্গনের কারণেও আওয়ামী লীগের প্রতি বিতশ্রদ্ধা সৃষ্টি হচ্ছিল। আওয়ামী লীগের যাত্রা পথে যখনই লিখিত নীতি ও আদর্শের পরিবর্তন হয়েছে তখনই কিছু ভাঙ্গন হয়েছে এর মধ্যে বড় আকারের ভাঙ্গন হয়েছে দুইবার। বৈদেশিক নীতি ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা চালুর প্রশ্নে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে নুতন দল সৃষ্টির মাধ্যমে প্রথম ভাঙ্গন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সনে। আর দ্বিতীয়বার ভাঙ্গন হয় ১৯৬৬ সনে ৬ দফা ভিত্তিক বনাম পি. ডি. এম. এবং আট দফা ভিত্তিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ওখানে এ প্রশ্ন জড়িত ছিল আইয়ুব শাসনের স্বৈরাচারী শাসন ও নিস্পেষণ থেকে বাঁচবার জন্য আওয়ামী লীগ এককভাবে সংগ্রাম করবে, না তৎকালীন আয়ুব সরকার বিরোধী অনান্য দল যথা কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম ইত্যাদির সঙ্গে মিলিত ভাবে আন্দোলন করবে। এই দ্বন্দে ইসলামী জীবন বিধানে বিশ্বাসী এবং পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী ও পাকিস্তানী আদর্শে নিষ্ঠাবান কর্মীদের শেষ দলটিও শেখ মুজিবর রহমানে নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই শেষোক্ত সময় শেখ মুজিবর রহমান কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে। আওয়ামী লীগের ৬ দফায় বিশ্বাসী 'একাচল' গোষ্ঠীরা একের পর এক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অক্টোপাস থেকে শেখ সাহেবের বের হবার কোন রাস্তা নেই। পি. ডি. এম. এর অন্তর্ভূক্ত দলগুলো পাকিস্তানের উভয় অংশে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলেছে আয়ুব সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ঠিক এই পরিবেশে আওয়ামী লীগের 'একাচল' গোষ্ঠীরা পি. ডি. এম. এর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করলেন। পি. ডি. এম. এর বলিষ্ঠ আন্দোলন এবার আওয়ামী লীগ সহ 'ডাক' (DAC) নামে শেখ মুজিবের মুক্তি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার সহ দশ দফা দাবী নিয়ে দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তোলে।

www.pathagar.com

এ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গঘাতে আয়ুব সরকারের মসনদ টলে উঠল। ডাকের প্রায় সব দাবী সরকার কর্তৃক গৃহিত হলো। শেখ সাহেব মুক্তি পেলেন, ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা প্রত্যাহার করা হলো। নেতাদের ডাক পড়ল রাওয়ালপিন্ডির গোল টেবিল বৈঠকে। সেদিনের সব চাইতে বড় প্রয়োজন জনসাধারণের ভোটাধিকার, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনসাধারণের হাতে শাসন ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার পথকে প্রশস্থ করে দেশে হতে সামরিক শাসনের সম্ভাবনাকে চিরতরে রোধ করা ছিল হাতের মুঠোর মধ্যে। আয়ুব সরকার এ দাবী মেনে নিলেন। আওয়ামী লীগ ছাড়া সমস্ত বিরোধীদলও এই দুটি অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করে দেশ হতে ভয় ও ত্রাসের রাজনীতির অবসানের পক্ষে মত দিলেন। সুষ্ঠ পরিবেশে যে কোনদল তার নিজস্ব মতামত দেশবাসীর কাছে পেশ করে নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে পারতেন, কিন্তু আওয়ামী লীগের একক বিরোধিতায় সব বানচাল হয়ে গেল। শেখ সাহেব গোল টেবিল বৈঠকেই তাঁর ৬ দফার স্বীকৃতি দাবী করলেন। অনান্য দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি ষড়যন্ত্র মামলা অব্যাহতি পেলেও সমস্ত দলগুলোর গ্রহণযোগ্য কোন সিদ্ধান্তের দিকে এগোলেন না। ফল হল গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা, গোটা দেশে নৈরাশ্যজনক অবস্থা এবং এই নৈরাজ্যে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে অস্বীকারকারী দলগুলির অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস। যে ভয় ও ত্রাসের রাজনীতি খতম করার জন্য এত ত্যাগ, এত সংগ্রাম সেই ভয় ও ত্রাস আবার প্রবলভাবে ঘিরে ধরল। মার্শাল ল পুনরায় জারী হল। আয়ুব খান সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতার দন্ড হস্তান্তর করে সরে পড়লেন। এই দুর্ঘটনা ঘটল ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ। ষাট দশকের রাজনীতির এই ভাঙ্গা গড়ার এক পর্য্যায়ে আদর্শবিহীন ও ক্ষমতার দ্বন্দে নিয়োজিত কুটিল রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে ইসলামী আন্দোলনের এক নিবেদিত কর্মী হিসাবে সমাজ বিপ্লবের লক্ষে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং সেটাও ছিল এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার মাঝে।

পি.ডি.এম.পন্থী ও ছয়দফাপন্থী আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে দুইভাগ হয়েছে - পি. ডি. এম. পন্থী ও ছয়দফা পন্থী। উভয় গ্রুপের কেন্দ্র থেকে জেলা পর্যন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। উভয় দলই নিজেকে সঠিক মনে করছে। শেখ সাহেব কারাগারে - উভয় দলই তাঁর আশীবাদ পুষ্ট। ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগ থেকে যেমন কুষ্টিয়া জেলার পি. ডি. এম. ও ডাক এর আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছি তেমনি পি. ডি. এম. পন্থী হয়েও নেতৃত্ব দিচ্ছি। দ্বিধাবিভক্ত আওয়ামী লীগের সদস্যরা এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের সমলোচনায় মুখর, কিন্তু শেখ সাহেবের মুক্তির আন্দোলনে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মাকদ্দমা প্রত্যাহারের আন্দোলনে সবার মুখে একই আওয়াজ।

www.pathagar.com

ঘন ঘন ঢাকায় যাচ্ছি কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে আন্দোলনের নির্দেশনা পাওয়ার জন্য কিন্তু সর্বস্তরের নেতৃত্বের মধ্যে হতাশা আওয়ামী লীগের দ্বিমুখী নীতির কারণে। দেশ কোথায় যাবে - এ রাজনীতির সঠিক লক্ষ্য কি, ছয়দফা কি সত্যই স্বায়ত্বশাসন আদায়ের বিশ্বাসযোগ্য পরিকল্পনা না অন্য কিছু, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা কি সত্যই মিথ্যা ও বাস্তবতা বিবর্জিত, নাকি সামান্যতম সত্যতাও এর মধ্যে রয়েছে যা আমাদের সম্মিলিত কণ্ঠের আওয়াজে চাপা পড়ে আছে, আমরা দেশের পুঞ্জিভূত সমস্যার সংস্কার চাই, আমরা কি সত্যই সে পথে চলছি - এসব চিন্তাধারা আমার মনমস্তিস্কে ভরপূর হয়ে থাকত। আদর্শহীন রাজনীতির নৌকায় মাঝি নয় শ্রমিক হয়েও বইঠা টানতে যেন মন সায় দিচ্ছিল না। এমনি এক মেঘলা দিনে পি. ডি. এম. এর কেন্দ্রিয় মিটিং করে ঢাকা থেকে প্লেনে ঈশ্বরদি হয়ে কুষ্টিয়ায় ফিরছিলাম। মেঘলা আবহাওয়ার কারণে প্রায় ২ ঘন্টা প্লেন লেট হওয়ায় ঈশ্বরদি স্টেশনে সংযোগকারী ট্রেন ধরতে ব্যর্থ হলাম। প্রায় ৩/৪ ঘন্টা প্ল্যাটফরমে কিভাবে কাটাব চিন্তা করছিলাম হঠাৎ মনে হল বই পড়ে সময় কাটানোই সব চাইতে ভাল হবে। বুক স্টলে গিয়ে প্রথমেই নজর পড়ল 'ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন' - মওদুদী - এই শিরোনামে একটি বই এর উপর। মওলানা আবুল আলা মওদুদীর নাম শুনেছি পি. ডি. এম. এর রাজনীতি করার শুরুতেই কিন্তু তাঁর লিখিত বই কোনদিন পড়িনি। উৎসুক্য জাগল - আমি রেঁনেসায় বিশ্বাসী, আলিগড় জীবনে আল্লামা ইকবালের Thoughts on Religious Reconstruction in Islam বই পড়েছি সমাজে সংস্কারের প্রয়োজন এ বিশ্বাস করতেই হবে তবে তা কোন পথে - আদর্শ কি হবে - পদ্ধতি কি হবে - মানুষের রচিত মতবাদ কি এখানে প্রাধান্য পাবে নাকি বর্তমান বিশ্বে অহির পথে চলে মানবতা তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে পারে - মনের মধ্যে পুঞ্জিভূত প্রশ্নগুলো আমাকে বইটি খরিদ করতে উদ্ধুদ্ধ করল। ঈশ্বরদী স্টেশনের ওয়েটিং রুমে পুরো ৩ ঘন্টায় আমার বই পড়া শেষ হল - এক নুতন চিন্তা চেতনা আমার মনমস্তিস্ককে দখল করে নিল।

মানব জীবন সম্পর্কে প্রচলিত চারটি মতবাদ

মওলানা মওদূদী তাঁর এই গবেষণামূলক বইতে সর্বপ্রথম মানবজীবন সম্পর্কে প্রচলিত চারটি মতবাদের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন "খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মানুষ ও বিশ্বজাহান সম্পর্কে চারটি অতিপ্রাকৃত (Metaphysical) মতবাদ স্থিরিকৃত হতে পারে। দুনিয়ায় যতগুলো জীবন বিধানের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটি এই চারটির মধ্য থেকে যে কোন একটিকে অবশ্য গ্রহণ করেছে।"

www.pathagar.com

"প্রথম মতবাদটিকে আমরা নির্ভেজাল জাহেলিয়াত আখ্যা দিতে পারি। এর মূল কথা হলো ঃ বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাবলী একটি আকস্মিক ঘটনার বাস্তব প্রকাশ মাত্র। এর পিছনে কোন প্রজ্ঞা, সদিচ্ছা ও মহান উদ্দেশ্য কার্য্যকরী নেই। এমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এটি তৈরী হয়েছে স্বত:স্ফূর্তভাবে পরিচালিত হচেছ এবং স্বত:স্ফূর্তভাবে একদিন হঠাৎ কোন কার্য্যকারীতা ছাড়াই শেষ হয়ে যাবে। এর কোন খোদা নেই আর যদি থেকেও থাকে, তাহলে মানুষের জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।"

দ্বিতীয় অতিপ্রাকৃত মতবাদ হিসাবে মওলানা চিহ্নিত করেছেন শের্কমিশ্রিত জাহেলিয়াতকে। "এর সারকথা হলো ঃ বিশ্বজাহানের এ ব্যবস্থা কোন ঘটনাক্রমিক প্রকাশ নয় এবং খোদাহীন অস্তিত্বের অধিকারীও নয়, কিন্তু একটি খোদ নয়, বহু খোদা আছে। এ ধারণা কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ভিত্তিক নয় বরং নিছক কল্পনা নির্ভর। তাই কাল্পনিক, অনুভূতিগ্রাহ্য ও দৃশ্যমান বস্তুর সঙ্গে খোদার শক্তিকে সম্পর্কিত করার ব্যাপারে মুশরিকদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কোন ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন হতে পারেনা। অন্ধকারে দিশেহারা মানুষরা যার উপর হাত রেখেছে তাকেই খোদা বানিয়ে নিয়েছে।"

"তৃতীয় অতিপ্রাকৃত মতবাদ বৈরাগ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর সংক্ষিপ্ত সার হলো ঃএই পৃথিবী এবং এই পার্থিব অস্তিত্ব মানুষের জন্য কারাগারের শাস্তি স্বরূপ। দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ মানুষের প্রাণ আসলে একটি শাস্তিভোগী কয়েদী। সমস্ত আমোদ আহলাদ কামনা বাসনা, স্বাদ ও দৈহিক প্রয়োজন আসলে এই কারাগারের শিকল ও বেড়ীমাত্র। ... নাজাত ও মোক্ষ লাভের একটি মাত্র পথ আছে। সমস্ত কামনা বাসনাকে নির্মূল করতে হবে, সকল প্রকার ভোগ পরিহার করতে হবে, দৈহিক প্রয়োজন ও ইন্দ্রিয়ের দাবীসমূহ অস্বীকার করতে হবে। ... সর্বপরি নিজের দেহ ও ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুকে ত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমে পীড়ন করতে হবে এবং এত অধিক পরিমানে পীড়ন করতে হবে যেন আত্মার উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। এভাবে আত্মা, সূক্ষ, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়ে যাবে এবং নাজাতের উন্নত স্থান সমূহে উড্ডীন হবার শক্তি অর্জন করবে।"

উল্লিখিত ৩টি মতবাদ সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পেশ এবং মানবইতিহাসের ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে যে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে মওলানা চতুর্থ অতিপ্রাকৃত মতবাদটি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন এ মতবাদটি পেশ করেছেন খোদার নবীগণ। এর সংক্ষিপ্ত সার হলো ঃ

"আমাদের চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত এই সৃষ্টি জগত, আমরা নিজেরাও এর একটি অংশ বিশেষ - আসলে এক সম্রাটের সাম্রাজ্য।

www.pathagar.com

তিনি একে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এর মালিক। তিনিই এর একমাত্র শাসক ও পরিচালক। এ সাম্রাজ্যে আর কারও হুকুম চলেনা, সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত আর সমস্ত ক্ষমতা পূর্ণতঃ ঐ একজন মালিক ও শাসকের হাতে কেন্দ্রিভূত। এ সাম্রাজ্যে মানুষ জন্মগত প্রজা। অর্থ্যাৎ প্রজা হওয়া বা না হওয়া তার ইচছা নির্ভর নয়, বরং সে প্রজা হিসাবেই জন্মলাভ করেছে এবং প্রজা ছাড়া অন্য কিছু হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ও নয়।"

"এ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মানুষের স্বাধীনতা ও দায়ীত্বহীনতার কোন অবকাশই নেই। জন্মগত প্রজা ও সাম্রাজ্যের একটি অংশ হওয়ার কারণে অনান্য অংশগুলি যেভাবে সম্রাটের নির্দেশের আনুগত্য করছে তেমনি তাকেও আনুগত্য করতে হবে, এছাড়া তার জন্য দ্বিতীয় কোন পথ নেই। সে নিজেই নিজের জন্য জীবন বিধান তৈরী করার এবং নিজের কর্তব্য নিজেই স্থির করার অধিকার রাখেনা। তার একমাত্র কাজ হলো মালিকুল মুলক - সম্রাটের পক্ষ থেকে আগত প্রত্যেকটি নির্দেশে পালন করা। এ নির্দেশ আগমনের নাম হলো 'ওহি' আর যে সব মানুষের নিকট এ নির্দেশ আসে তাঁরা হলেন নবী।"

"এ পার্থিব জীবন একটি পরীক্ষাকাল। এখানে যা কিছু দান করা হয় তা কোন সৎকর্মের পুরস্কার নয় বরং পরীক্ষার সামগ্রী এবং যে সমস্ত দুঃখ কষ্ট, বিপদ আপদ আসে তাও কোন অসৎ কর্মের শাস্তি নয় বরং যে প্রাকৃতিক বিধানের উপর দুনিয়ার এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত প্রধানত তারই আওতায় এগুলোর স্বত:স্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ ঘটে, কর্মের আসল হিসাব, যাচাই বাছাই এবং সে সম্পর্কে রায়দানের সময় আসবে এ পার্থিব জীবন শেষ হবার পর, তারই নাম আখেরাত। আসল মানদন্ড হলো আখেরাতের ফলাফল। আখেরাতের কোন পদ্ধতি এবং কোন কর্মের ফল ভাল বা মন্দ হবে, তার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীগণের উপর অবতীর্ণ ওহির মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। ... এ সত্য অবগত হবার পর মানুষ স্বেচছায় ও সাগ্রহে (নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকা সত্বেও) আল্লাহর কর্তৃত্ব এবং তাঁর নির্দেশাবলীর সম্মুখে আনুগত্যের শির নত করবে।"

"সৃষ্টির প্রারম্ভকাল থেকে নবীগণ এ মতবাদ পেশ করে এসেছেন। এই মতবাদের ভিত্তিতে বিশ্বজাহানের যাবতীয় ঘটনাবলীর ব্যাখা হয়। বিশ্বের দৃশ্যমান বিষয় সমূহের সুষ্ঠ অর্থ জ্ঞাত হওয়া যায়। কোন পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ মতবাদ ভূল প্রমাণিত হয় না। এর ভিত্তিতে জাহেলিয়াতের জীবনদর্শন থেকে মূলগতভাবে পৃথক একটি স্বতন্ত্র জীবনদর্শন গড়ে ওঠে। ... সারকথা হলো এই যে, এই সভ্যতার শিরা উপশিরায় যে প্রাণশক্তি সক্রীয়, তা এক সর্বময় ক্ষমতা সম্পন্ন খোদার কতৃত্ব, আখেরাতে বিশ্বাস এবং মানুষের অধীনতা ও দায়িত্ব শীলতার কথা ঘোষণা করে।

www.pathagar.com

বিপরীত পক্ষে প্রত্যেকটি জাহেলী সভ্যতার সমগ্র ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের অবাধ স্বাধীনতা, বল্গাহারা উচ্ছৃংখল প্রবৃত্তি ও দায়িত্বহীনতার প্রেরণা অনুপ্রবেশ করে থাকে। তাই নবীগণের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবতার যে নমুনা তৈরী হয় তার আকৃতি, প্রকৃতি, রূপ ও রং জাহেলী সভ্যতা-সংস্কৃতি সৃষ্ট নমুনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এই পার্থক্য তার প্রতিটি অংশে ও প্রতিটি দিকেই স্বতঃস্ফূর্ত।"

"অতঃপর এর ভিত্তিতে তমুদ্দন যে বিস্তারিত রূপ লাভ করে তা সমগ্র দুনিয়ার অনান্য নকশা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ে। পবিত্রতা, পোষাক পরিচ্ছদ, খাদ্য, জীবনপদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি, ব্যক্তিচরিত্র, জিবীকা উপার্জন, অর্থব্যয়, দাম্পত্যজীবন, সাংসারিক জীবন, বৈঠকি নিয়মকানুন, মানুষ ও মানুষের সম্পর্কের বিভিন্ন আকৃতি, লেনদেন, অর্থ বন্টন, রাষ্ট্র পরিচালনা, সরকার গঠন, রাষ্ট্র প্রধানের মর্য্যাদা ও দায়িত্ব, পরামর্শ পদ্ধতি, সিভিল সার্ভিস সংগঠন, আইনের মূলনীতি, মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত বিস্তারিত বিধানাবলী, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সংবাদ সরবরাহ, শিক্ষা ও সংগঠন এবং যুদ্ধ ও সন্ধির নীতিও এ তমুদ্দনে এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। প্রতিটি অংশে সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা তাকে অনান্য তমুদ্দুন থেকে আলাদা করে রাখে। প্রতিটি বিষয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত তার মধ্যে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য এবং একটি বিশেষ নৈতিক আচরণ সক্রীয় থাকে, যার সম্পর্ক থাকে এক খোদার সার্বভৌম কতৃত্ব, মানুষের অধীনতা ও দাসত্ব এবং দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতের গন্তব্যের সংঙ্গে।"

কারাগারের জীবনে মাতৃভাষার মাধ্যমে আলকোরআনের সঙ্গে আমার পরিচিতি ঘটেছে। এর পর ইমাম গাজ্জালী সহ কিছু কিছু স্মরণীয় মনিষীদের রচিত ইসলামী সাহিত্যের রস আস্বাদন করেছি। সমাজ সংস্কারের মূল লক্ষ্যে কোন আদর্শের অনুসারী হতে হবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র মওদূদীর এই বইতে খুঁজে পেলাম। জন্মসূত্রে অবশ্য আমি এই আদর্শেরই উত্তরাধিকার ছিলাম। কিন্তু এ কওমের পরাধীনতা, পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তু বাদী দর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থা, বিজাতীয় সংস্কৃতি, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের রসম রেওয়াজ, সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মিটিয়ে দিয়ে শাসকদের মানবীয় প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার সীমাহীন ধৃষ্টতার কারণে ৩টি জাহেলী মতবাদের অনেক কিছুই ইসলামী জীবন ধারা মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। এই অনুপ্রবেশের কারণ সৃষ্ট শেরক ও বিদায়াত আমাদের প্রায় সবার জীবনকেই কম বেশী স্পর্শ করেছে। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এমনকি ধর্মীয় পরিবেশও এ থেকে মুক্ত নয়। একজন মুসলিম এমন রাজনীতি করতে পারে না বা এমন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারেনা যেখানে জীবনে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি নয় ও রাসুল (দঃ) এর নির্ভেজাল আনুগত্য পথ চলার একমাত্র পন্থা নয়।

www.pathagar.com

তাইতে ১৯৬৬ সালের এক শুভ মুহূর্তে প্রচলিত রাজনীতির পথ পরিহার করে সমর্থক হিসাবে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি। সংখ্যার হিসাব না করে সত্যের অনুসারী হবার কারণে আমার অনেক আত্মীয়স্বজন, ভক্তবৃন্দ, অতীত রাজনৈতিক জীবনের সহযাত্রীরা দূরে সরে গেলেন। সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে নিবেদিত কর্মী হিসাবে আমি এমন একটি পণ্য নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলাম যার 'মান' অত্যন্ত উচচ সম্পন্ন কিন্তু খরিদ্দার অত্যন্ত কম তবুও ইসলামী আদর্শের মধ্যেই আমি মহা সত্যের সন্ধান পেলাম এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হলো আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

অধ্যায়-৮

রাজনীতির ময়দানে ঝড়ো হাওয়া

গোল টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার পর সৃষ্ট অরাজকতাকে সামরিক শাসনের অজুহাত হিসাবে খাড়া করে জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনতন্ত্র রচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শাসনের বিলুপ্তি ঘোষণা করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য একটি আচরণ বিধি এবং দেশের শাসনতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি ঘোষণা করে আদেশ জারী হল ইয়াহিয়া সরকারের পক্ষ থেকে। বলা হল পাকিস্তানের অখন্ডত্ব বজায় রেখে, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা করে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গণপ্রতিনিধিত্বশীল শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। এই সমস্ত আদর্শের শর্ত সাপেক্ষেই ১৯৭০ সনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হল। অর্থ্যাৎ যারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন তাদের আচরণ বিধি ও আদর্শিক শর্ত মেনে নিয়েই ময়দানে নামতে হবে। আওয়ামী লীগের মেনিফেষ্টো ও ৬ দফার বিভিন্ন ধারার সঙ্গে ইয়াহিয়ার নির্বাচনী আদেশ ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সংক্রান্ত বিধি নিষেধের প্রত্যক্ষ সংঘাত থাকা সত্বেও আওয়ামী লীগ ইয়াহিয়ার শর্ত মেনে নিয়ে নির্বাচনে পা বাড়াল।

ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন জারীর পর প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপর যে সমস্ত বিধি নিষেধ আরোপিত হয়েছিল তা অপসারিত হলো ১৯৭০ এর ১লা জানুয়ারী থেকে। সমস্ত দলই ময়দানে নামলেন। ৬ দফাকে সামনে রেখে, পাকিস্তানের অখন্ডত্ব কাগজে রেখে, পশ্চিম পাকিস্তান ও কেন্দ্রিয় সরকারের বিরূদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অনান্য দল ও দলের নেতৃবৃন্দের বিরূদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চালিয়ে, মিথ্যা ওয়াদার পাহাড় রচনা করে, ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে সস্তা উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি প্রতিপক্ষের জনসভায় ছাত্র তরুনদের লেলিয়ে দিয়ে শক্তি প্রয়োগে বানচাল করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী অভিযান শুরু হল এবং তা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলল।

www.pathagar.com

জামায়াতের জনসভায় আওয়ামী লীগের হামলা

পঞ্চাশ দশকে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রাথমিক প্রচার কাজ এই দেশে শুরু হলেও বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। আদর্শবাদী আন্দোলন হিসাবে প্রতিটি জায়গায় এর লক্ষ্য থাকে প্রথমে কিছু জ্ঞানী, কর্মক্ষম, ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী সৎ চরিত্রের মানুষের সন্ধান করা এবং তাদেরকে একটি দলগত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপক সম্প্রসারণ করা। ১৯৫৮ সনে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে এ কাজ বাধাগ্রস্থ হয়। ১৯৬২ সনের পর জামায়াতের সাংগঠনিক কাজ পুনরায় শুরু হয় কিন্তু শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে জামায়াত আয়ুব সরকারের রোষানলে পতিত হয়। ১৯৬৩ সন থেকে বিভিন্ন সরকারী হয়রানীমুলক হামলা শুরু হয় এবং ১৯৬৪ সনের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তানের উভয় অংশের জামায়াতের সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করে বহু নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ১৯৬৪ সনের শেষের দিকে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক সরকারী বিধিনিষেধ বেআইনী সাব্যস্ত হওয়ায় জামায়াত শৃংখলামুক্ত হয়ে পুনরায় কাজ শুরু করে। ১৯৬২ থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সনের মার্চ পর্য্যন্ত তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য অনান্য গণতন্ত্রকামী দলগুলোর সঙ্গে মিলে সাধারণ দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছিলো। অতিতের শাসনতন্ত্র সংশোধনের আন্দোলন, এন. ডি. এফ., মাদারে মিল্লাতের নির্বাচনী অভিযান (কপ), পি. ডি. এম., ডাক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই জামায়াতের ছিল বলিষ্ঠ ভূমিকা। ১৯৬৯ সনের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকাশ্য জনসভার উপর সরকারী বিধিনিষেধ ছিল। সুতরাং বলা চলে এই দেশে জনসাধারণের পর্য্যায়ে জামায়াতের ইতিহাসে ব্যাপক সংগঠন ও প্রচারের কাজ প্রথম শুরু হয় ১৯৭০ সনের জানুয়ারী থেকে। অতিতের শত প্রতিবন্ধকতা সত্বেও সর্বস্তরের ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে জামায়াত যুক্তি ও জ্ঞানের অস্ত্রের সাহায্যে অধিকতর উন্নত চরিত্রের যে দল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল ১৯৭০ সনের জানুয়ারী মাসে প্রত্যেকের সম্মিলিত ব্যাপক গণঅভিযান একদিকে যেমন তাওহিদী জনতার প্রাণে আনন্দের সঞ্চার করল তেমনি ইসলাম বিদ্বেষী মহল ও ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষমতা লোভী মহলে বিস্ময়, ইর্ষা ও গোস্বার সৃষ্টি করল। ১৯৭০ এর ১৮ ই জানুয়ারী পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রথম প্রকাশ্য জনসভায় আওয়ামী লীগের বর্বরোচিত হামলায় এই সত্যের বাস্তবতা প্রমাণিত হল। ট্রাকে ভর্ত্তি করে আনা গুন্ডাবাহিনী, লোহার রড, ইটের টুকরার সদ্ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পল্টনের বিপুল জনসমাবেশ তছনছ করে, প্যান্ডেলে চার শত কর্মী জখম করে এবং ২ জনকে শহীদ করে আর পরের দিন নিজেদের প্রভাবান্বিত খবরের কাগজের মাধ্যমে মনমত গল্প ছাপিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেন। এর পরই কিছু দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগ কর্মীরা নারায়নগঞ্জে ন্যাপের অফিস ঘর ভেঙ্গে ফেলে এবং ন্যাপ, পি. ডি. পি., মুসলিম লীগ, জাতীয় লীগ ইত্যাদি প্রায় সব দলের জনসভায় মারপিট করে ইঁট ছুড়ে, মাইক কেড়ে নিয়ে বানচাল করতে শুরু করে।

www.pathagar.com

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সরকারী ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। গভর্নর থেকে আরম্ভ করে মহকুমা প্রশাসক পর্যন্ত কেউই আওয়ামী লীগের এই মারমুখো আচরণের প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বোধ করলেন না।

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর কর্মী হিসাবে ইসলামী আন্দোলনে সক্রীয়ভাবে জড়িত ছিলাম। নির্বাচনী অভিযানে খুলনা, যশোহর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর ও পাবনা জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত জামায়াতের জনসভায় আমাকে যোগদান করতে হয়েছে। আওয়ামী লীগের তরফ থেকে অনেক স্থানে মিটিং ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক জায়গায় মিটিং ভাঙ্গতে কামিয়াব না হওয়ায় মিটিং শেষে ফেরার পথে আক্রমণ চালিয়েছে। এইরূপ আক্রমণের মুখে দুইবার গুরুতর রক্তাক্ত জখম হয়েছিলাম। নিজের গাড়ীর ক্ষতিও হয়েছিল প্রচুর। এই কাজগুলো সাধারণত স্কুল কলেজের ছাত্র দিয়ে করানো হত। তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতেও মন সায় দিতনা। যে পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তাতে ফলাফল একরূপ নিশ্চিত ছিল। বহু নির্বাচনী কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের এজেন্ট ও কর্মী ছাড়া অন্যান্য প্রার্থীর এজেন্ট ও কর্মীরা উপস্থিত হতে পারেনি। মাত্র ২টি পক্ষ জোর গলায় ঘোষণা করল নির্বাচন অত্যন্ত নিরপেক্ষ হয়েছে। একপক্ষ হচেছ আওয়ামী লীগ ও অপর পক্ষ হচেছ ইয়াহিয়া সরকার। আর এখন এই দুই পক্ষের মধ্যে রাজনীতির খেলা সীমিত হল। জনতার রাজনীতি থেকে দেশ এবার পার্লামেন্টের রাজনীতির মুখে এসে থমকে দাঁড়াল। নির্বাচনের ফলাফলে বিপুল ভোটাধিক্যের অধিকারী হয়ে নিজের মর্য্যাদা ও স্থান সম্পর্কে নিশ্চিত থেকে গণপরিষদের অধিবেশনের দিনটির জন্য অপেক্ষা না করে শেখ সাহেব ৬ দফার উপর আপোষ নেই মর্মে ঘোষণা দিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়ী জনাব ভূট্টোর নেতৃত্বে পিপলস পার্টি পাল্টা হুমকি ছেড়ে তার সঙ্গে সমঝোতা সৃষ্টির জন্য শেখ সাহেবের প্রতি আহ্বান জানালেন। নুতন গণপরিষদের অধিবেশন ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ তারিখ ধার্য করে নেতৃবৃন্দের ঘোষণা ও পাল্টা ঘোষণাকে অজুহাত হিসাবে খাড়া করে ২২ দিনের জন্য মুলতুবী ঘোষণা করলেন। এই মুলতুবী ঘোষণা যদিও অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক তবুও ২২ বছরে যে শাসনতন্ত্র রচিত হয়নি তার জন্য হয়ত ২২ দিন অপেক্ষা করা যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উগ্র ছাত্র রাজনীতির প্রভাবান্বিত হয়ে শেখ সাহেবের ৭ই মার্চের জনসভার আহ্বানে সরকারী যন্ত্রের নিষ্ক্রিয়তার কারণে গোটা দেশ অচল হয়ে গেল। প্রতিটি স্থানে আর্মির সঙ্গে দ্বন্দ সৃস্টির চেষ্টা হতে লাগল। আর্মির জন্য যানবাহন বন্ধ করা হলো, হাট বাজার, পানি, আলো যাবতীয় বন্ধ করা হলো। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই পদক্ষেপের মধ্যে আসন্ন বিপদের আলামত দেখছিলেন।

দুনিয়ার কোন দেশের সামরিক বাহিনী এরূপ অবস্থায় চুপ থাকতে পারেনা। গণতান্ত্রিক দেশে এরূপ কল্পনা করা গেলেও সমাজতান্ত্রিক দেশে আদৌও সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

এই পরিবেশের মধ্যে ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো এবং প্রতিদিনই সরকারী মহল ও আওয়ামী লীগ মহল বৈঠকের অগ্রগতি ও সন্তোষজনক আলোচনা হচ্ছে বলে দেশবাসীকে শোনাতে লাগলেন। কিন্তু উগ্র রাজনীতির খেলোয়াড়রা দেশকে দুর্ভাগ্যের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল। আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ পল্টনের ময়দানে স্বাধীনতা ঘোষণা করল এবং ২৩শে মার্চ সমগ্র দেশেই শুধু নয় শেখ সাহেবের বাড়ীতে ও তার উপস্থিতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হলো। শেখ সাহেব তাঁর ৭ই মার্চের বক্তৃতায় তাঁর অনুসারীদের যে কোন অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ২৫শে রাত্রে সামরিক বাহিনী গোটা দেশেকেই শত্রু মনে করে ঝাঁপিয়ে পড়ল এর ভবিষ্যত ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা না করে। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সমগ্র দেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধেই অভিযান চলল। সামরিক বাহিনীর নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শীতা যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করল তাতে ১৯৬৫ সালের পাক ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানের দুর্ধর্ষ সামরিক বাহিনী উভয় অংশের জনসাধারণের মধ্যে যে জনপ্রিয়তা ও দুর্জয় ঐক্য গড়ে তুলেছিল তা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল।

সংঘাত ও সংঘর্ষ

২৬ শে মার্চ থেকে কুষ্টিয়া শহর সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে গেল। শহরের ৪টি স্থানে ঘাঁটি করে সামরিক বাহিনীর জোয়ানরা টহল দিতে শুরু করল। জেলা সদরে তারা এমনিভাবে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ করল যে শহরের বাইরে এক মাইলের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের মারমুখী প্রস্তুতি চলছে তার কোন খবরই তাদের কাছে ছিলনা। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে হতে ই. পি. আর., পুলিশ, আনছার ও ছাত্র যুবকদের সশস্ত্র বাহিনী আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে জেলা সদরে অবস্থিত সামরিক বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এ খবর সামরিক বাহিনীর কর্তা ব্যক্তিরা জানতে পারলনা। ৩০শে মার্চ ভোর ৩:৪৫ মিনিটের সময় চারিদিকে দোতরফা গুলির আওয়াজে শহরবাসীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। শহরের যে ৪ জায়গায় সামরিক ছাউনি ছিল সবখানেই আক্রমণ চালান হয়েছে। ৩১ শে মার্চ সকাল ১০ টার মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। সামরিক বাহিনীর যারা রাতের অন্ধকারে পালিয়েছিল তারা রাস্তায় নিশ্চিহ্ন হল। শোনা যায় কয়েকশতকের মধ্যে মাত্র ১০ জন জোয়ান যশোরে ফিরে যেতে পেরেছিল। হাজার হাজার নাগরিকের মত আমরা পুরা ৩০ ঘন্টা বাড়ীতে আটকা ছিলাম। ভ্রাতৃঘাতী লড়াই শেষে শুরু হল গোটা শহরে তোলপাড়। বন্দী করা জোয়ানদের উৎসব করে হত্যা করা হল। উর্দুভাষী এডিশনাল ডেপুটি কমিশনার ও মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যানকে হত্যা করে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা মিছিল বের করে লাশ দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে মহা উল্লাসে শহর প্রদক্ষিণ করল।

www.pathagar.com

উর্দুভাষীদের দোকানপাট লুট ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় হিন্দু, সাংবাদিক ও সামরিক বাহিনীর অফিসারদের শহরে আনাগোনা দেখে বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না যে দুই দেশের মানচিত্রে যে সীমারেখা ছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

শহর ছেড়ে নিভৃত গ্রামে

জেলা শহরে আটকা পড়ে আছি। দিনগুলো বেজায় বড় সময় কাটতে চায়না। সরাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, বাস ইত্যাদি যাবতীয় যানবাহন সবই বন্ধ। আছে একটি ওয়ারলেস ব্যবস্থা যা ছিল আওয়ামী লীগ ও ই. পি. আর. এর দখলে। ওয়ারলেসে প্রাপ্ত খবরের হাওলা দিয়ে প্রত্যহ আওয়ামী লীগের তরফ থেকে মাইক যোগে প্রচারাভিযান চলছে। ৭ই এপ্রিল তাদের প্রচারে বলা হয় যশোহর ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া গোটা পূর্ব পাকিস্তান তাদের দখলে এবং ২/৩ দিনের মধ্যে এ দুটোও দখল হয়ে যাবে। কিন্তু ৮ই এপ্রিল সকাল থেকে অনবরত কামানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ৯ই এপ্রিল পাবনার দিক থেকে আগুনের ধোঁয়া দেখা গেল এবং কামানের আওয়াজ আরও বিকট ভাবে আসতে লাগল। গুজব ছড়িয়ে পড়লো পাক আর্মী পাবনায় এসে গেছে। ইতিমধ্যে পাবনা থেকে কিছু লোক নদী পাড়ি দিয়ে পালিয়ে আসতে লাগল এবং তাদের নিকট থেকে পাক বাহিনীর অগ্রগতির কথা জানা গেল। ১০ তারিখের মধ্যে কুষ্টিয়া শহর প্রায় শূণ্য। শুধু রইল উর্দুভাষী জনসাধারণ কেননা তাদের যাওয়ার কোন জায়গা ছিলনা। ৩০ তারিখের ঘটনার কথা স্মরণ করে এবং প্রত্যাবর্তনকারী পাক বাহিনীর অগ্নিমূর্তিকে কল্পনা করে শহরে থেকে বিপদের ঝুঁকি নেওয়া কোনমতেই সমিচীন মনে করলাম না। সুতরাং আমরা জনতার স্রোতে মিশে গেলাম এবং শহর থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে একটি নিভৃত গ্রামে আত্মীয়ের বাড়ীতে স্থান নিলাম পরিবার পরিজন সহ।

গ্রামেও শান্তি নেই কেননা আওয়ামী লীগ পন্থি আমি নই। অবশ্য গ্রামের জনতা তখন আর মারমুখো নেই কারণ পাক বাহিনীর অগ্রাভিযানের কথা ও অনান্য শহর সহ কুষ্টিয়া শহরের পুনঃ দখলের কথা তারা জানতে পেরেছে। হাজার দেড় হাজার লোকের গ্রামে স্থান নিয়েছে প্রায় দশহাজার লোক। এদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বইজন ভোট দিয়েছে আওয়ামী লীগকে। বাসস্থান, খাদ্য ও পরিচ্ছন্নতার সমস্যা গ্রামে প্রকটভাবে দেখা দিল। আওয়ামী লীগের এম. এন. এ., এম. পি. এ. ও অনান্য নেতৃবৃন্দের খোঁজে আওয়ামী লীগ পন্থীদের পাঠান হল। জানা গেল তারা সবাই ভারত মুখে পাড়ি দিয়েছেন। পাক আর্মী পাবনা জেলা দখল করে যখন ১৫ই এপ্রিল তারিখে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পার হয় তখন থেকেই নেতারা পালাতে শুরু করে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার পূর্বে যে বিভৎস ও নারকীয় কান্ড আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ঘটিয়ে গেল এবং দেশের যে সম্পদ লুট করে নিয়ে গেল তা ছিল অচিন্তনীয়। জেলার সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

স্থানগুলোতে উর্দুভাষীদের জড়ো করে হত্যা করা এবং সম্পদ লুট করার কাজ তারা ১২ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিলের মধ্যে করেছে। ট্রেজারী, ব্যাংক ইত্যাদি হতে কোটি কোটি টাকা, সরকারী খাদ্য গুদাম থেকে কয়েক লক্ষ মন খাদ্য, কয়েকশত সরকারী জীপ, ট্রাক, ওয়াগন ক্যারিয়ার, রেলওয়ে ইঞ্জিন ও বগী ইত্যাদি লুট করে ভারতে নিয়ে গেল। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পালিয়ে যাওয়ার সময় ব্যক্তিগত সম্পদ যা রেখে গেলেন - নিয়ে গেলেন তার চাইতে হাজার হাজার গুণ বেশী। কারও বাধা দেবার উপায় ছিলনা। কেননা আওয়ামী লীগের যুবক কিশোরদের হাতে অস্ত্র। ই. পি. আর., পুলিশ ইত্যাদি সবাই আওয়ামী লীগের সাথে একাকার হয়ে গেছে প্রাণ নিয়ে পালানোর ব্যাপারে। সুতরাং পলায়নমুখী হিংস্র হায়েনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাধা দেবার মত অবস্থা কারও ছিলনা।

শহর থেকে দূরে আর থাকতে পারছি না। গ্রামে খাদ্যভাব দেখা দিয়েছে। বসবাসের প্রশ্ন অত্যন্ত সঙ্কটময়, যে কোন সময় রোগ ব্যাধি মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সবাই নজি নিজ এলাকায় ফিরে যেতে চায়। বাড়ীতে সবাই সব কিছু ফেলে এসেছে কিন্তু কে নেবে ঝুঁকি। গুলী গোলার আওয়াজ স্তিমিত হয়ে এসেছে, আগুনের নিশানা আর দেখা যাচ্ছেনা। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে রুজী রোজগারের তালাশ করা, নিজ নিজ গৃহে ফিরে যাওয়া বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল। আমরা কিছু সংখ্যক চরম প্রয়োজনের মুখে সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে গেলাম ভেড়ামারার দিকে। দূর থেকে নজর পড়ল পাক আর্মীর উদ্যত রাইফেল ও সঙ্গীনের প্রতি। দূর হতে ইশারা দিলাম আমাদের সাক্ষাতের প্রয়োজন। দুই হাত উচুতে উঠিয়ে এগিয়ে গেলাম রাইফেলের নলের সোজাসুজি। কাছে গিয়ে অফিসারকে বুঝিয়ে বললাম দেশের সাধারণ মানুষ এরা, এদের শান্তিতে থাকতে দাও, বাড়ী ঘরে ফিরে আসতে দাও, আর বাড়ী ঘরে আগুন জ্বালিও না। আমাদের প্রচেষ্টা সফল হল। নিজ নিজ গ্রামে সবাই ফিরে আসতে লাগল। এটা ছিল ২০শে এপ্রিল ১৯৭১সাল।

গ্রাম থেকে শহরে ফিরে এলাম

পরিস্থিতি কিছু শান্ত হলে পরিবার পরিজন নিয়ে জেলা শহরে ফিরে এলাম। নিজের বাসস্থানের সম্মুখে যখন এসে উপস্থিত হলাম স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আমি নিজে আমরা সবাই হতভম্ব বাকরুদ্ধ। সম্পূর্ণ পোড়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। জীবনের সমস্ত সম্পদ ও স্মৃতি পুড়ে গেছে - মায় দরজা জানালার রেশ পর্যন্ত নাই। এ দুর্ভাগ্য আমার একার হয়নি, শহরের বহু ব্যক্তির দোকান পাট এভাবেই বিধ্বস্ত হয়েছে। যে দিকে তাকাই ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কিছুই চোখে পড়েনা। শহর জনশূন্য - শুধুমাত্র উর্দুভাষী সম্প্রদায় যারা গণহত্যা থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচে আছে আর কিছু বাংলাভাষী যারা আমার মতই প্রয়োজনের তাগিদেই শহরে ফিরে এসেছে।

www.pathagar.com

সামরিক শাসন আমরা কোনদিনই চাইনি, কিন্তু সামরিক শাসন তার সমস্ত কঠোরতা নিয়ে দেশবাসীর উপর চেপে বসল। উগ্র রাজনীতিবিদরা সামরিক বাহিনীকে খোঁচা দিয়ে ব্যারাক থেকে বের করে দিল বটে কিন্তু তাদের তান্ডবলীলা সইতে হল জনসাধারণকে। বিবাদমান পক্ষ ছিল দুটি - আওয়ামী লীগ ও সামরিক সরকার। উভয় পক্ষের ভুল-ত্রুটিতে যে বর্ণনাহীন সমস্যার উদ্ভব হলো তার অন্তত মানবীয় দিকাটার প্রতি দৃষ্টিপাত করা অনান্য দলগুলির জন্য রাজনীতির উর্দ্ধে একটি পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে দেখা দিল। বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত লাশগুলোর সৎকার করা, গৃহহীনদের মাথা গুজবার ঠাঁই করে দেওয়া, সর্বহারাদের এক মুঠো অন্নের ব্যবস্থা করা, ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া মানুষের ঘরে ফিরে আসবার ব্যবস্থা ইত্যাদি অত্যন্ত জরুরী কাজ বলে মনে হলো। এসব কাজের সঙ্গে মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত ছিল। তাই দুঃখ দুর্দশার কথা সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরে নিরাপত্তার আশ্বাস লাভ করাই ছিল একমাত্র পথ। এই বিশেষ প্রয়োজনেই গড়ে উঠল শান্তি কমিটি অরাজনৈতিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে। সামরিক সরকারের স্বার্থে নয় বরং জন সাধারণের নিরাপত্তার স্বার্থেই দ্রুত স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল। শান্তি কমিটির উপরোক্ত কাজগুলো একদিকে দুর্দশাগ্রস্থ জনসাধারণের কষ্টকে লাঘব করেছে, স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সহায়তা করেছে - অন্যদিকে সামরিক বাহিনীর রোষানলের তীব্রতাকে কমিয়ে দিয়েছে।

অতিতেও বিভিন্ন সময় সামরিক শাসন চালু হলেও বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা পুরাপুরি অক্ষুন্ন ছিল। সামরিক শাসন ব্যবস্থা শুধুমাত্র হুকুমদারীতেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু জনসাধারণের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের ক্ষেত্রে তাদের কোনই আনাগোনা ছিলনা। কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম হলো। জেলা প্রশাসক পাড়ি দিয়েছেন ভারতে। পুলিশ প্রধান সামরিক বাহিনীর হাতে বন্দী। ই. পি. আর., পুলিশ, আনছার ইত্যাদি অনেকেই ভারতের পথে আর যারা এদেশে তারাও সহকর্মীদের অপরাধে ভীত হয়ে প্রাণের দায়ে দেশের ভিতরে পালিয়ে। ভীতি ও উৎকণ্ঠা প্রায় সমস্ত সরকারী কর্মচারীদেরই শহরে ফিরে আসার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সামরিক সরকার নির্দিষ্ট দিন ধার্য্য করে কর্মচারীদের অফিস আদালতে যোগদানের জন্য নির্দেশ দিচ্ছে এবং সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও বকেয়া বেতন দানের ওয়াদা দিচ্ছে। তবুও এ সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করার মত পরিবেশ তখনও গড়ে ওঠেনি। শান্তি কমিটির তরফ হতে এসব সুযোগ গ্রহণের মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি। সেই সঙ্গে যানবাহন ব্যবস্থাকে চালু করে দুর-দূরান্ত থেকে কর্মস্থলে ফিরে আসবার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য শান্তি কমিটির পরামর্শও সামরিক কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করল। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেল, ষ্টীমার ও ফেরী যোগাযোগ চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহকুমা ও জেলা শহরে আবার প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে এলো। বিধ্বস্ত কুষ্টিয়া শহর নুতন প্রাণের স্পন্দন পেল। নুতন জেলা প্রশাসক ও পুলিশ প্রধান শাসনযন্ত্রকে গড়ে নিতে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

মানুষের ক্ষয়ক্ষতির পুরো খতিয়ান প্রস্তুত হল। শান্তি কমিটির সদস্যদের সহযোগিতা সরকারী কর্মচারীরা ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে রিলিফ বন্টন ও পুনর্বাসনের কাজ শুরু করলেন। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের নিজেদের তাগিদেই বিভিন্ন স্থানে শান্তি কমিটি গড়ে উঠল। দেশের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে শান্তি কমিটির কোন সম্পর্ক ছিলনা।

গ্রামে পালিয়ে থাকা মানুষ শহরে ফিরে এলো। গ্রামের মানুষও দৈনন্দিন কাজে শহরের পথ ধরল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রামেও শান্তি কমিটি গড়ে উঠল। বিভিন্ন গ্রামে রেশন, রিলিফ বিলি বন্টনের কাজ চেয়ারম্যান বা সদস্যদের অনুপস্থিতিতে সাময়িকভাবে শান্তি কমিটির মাধ্যমে চালু হল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল জনসাধারণের জীবন ও মালামালের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। মার্চের আন্দোলনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে থানা সহ যে সমস্ত অস্ত্রাগার লুট হলো তার একটি মোটা অংশ জেল থেকে ছাড়া পাওয়া বা বের হয়ে আসা চোর ডাকাতদের হাতে পড়ে গেল। এদের মধ্যে কেউ ভারতে আশ্রয় নিয়ে বিপ্লবী সাজল আর যারা এদেশে রয়ে গেল তারাও সুযোগ সুবিধা মত পুরানো অভ্যাসটাকে কাজে লাগাতে শুরু করল। এদের মোকাবিলা করার মত যথেষ্ট পুলিশ বা অন্য কোন বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী ছিলনা। গ্রাম্য বাহিনী হিসাবে যে আনছার বাহিনী প্রায় ২ যুগ উর্দ্ধকাল ধরে কাজ করে আসছিল তারাও ছিন্ন ভিন্ন। এই শূন্যতাকে পূরণ করার জন্যই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আনছার বাহিনীর স্থলে রাজাকার বাহিনী গঠন করলেন প্রাদেশিক সরকার। জেলার প্রতিটি জায়গায় সংক্ষিপ্ত ট্রেনিংএর মাধ্যমে রাজাকার বাহিনী গড়ে উঠল এবং অতীতের আনসার এ্যডজুট্যান্ট ও কর্মকর্তারাই রাজাকার এ্যডজুট্যান্ট ও কর্মকর্তা হিসাবে গৃহিত হল। রাজাকার বাহিনী পুলিশ বিভাগের অধিনস্থ হিসাবে তাদের নির্দ্দেশে শান্তি শৃংখলার রক্ষার কাজে নিয়োজিত হল, শান্তি কমিটির সঙ্গে রাজাকার বাহিনীর কোন সম্পর্ক ছিল না।

সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের খবর

ইতিমধ্যে নূতন সমস্যা দেখা দিল। কিছু সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের খবর আসতে লাগল বিভিন্ন গ্রাম থেকে। কে বা কারা রেলওয়ে ব্রীজ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তারা যেন গ্রামের পথে না যায় এটাই ছিল আমাদের সবার কাম্য। বেসামরিক শাসনযন্ত্রের সক্রীয়তার পেছনেও এই ছিল উদ্দেশ্য। কেননা যে কোন গ্রামে সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি জনসাধারণের মনে আতঙ্কসৃষ্টি করতে বাধ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই সন্ত্রাসমূলক কাজগুলো সামরিক বাহিনীকে গ্রামের পথ দেখাল। সামরিক আইনানুযায়ী অকুস্থলের একশত গজ বা তদুর্ধ স্থানের জনসাধারণকে এই সন্ত্রাসমূলক কাজের জন্য দায়ী করা হল এবং কিছু কিছু ব্যক্তির উপর শাস্তি প্রদত্ত হলো। এতে আইন জারী করা হলো বটে কিন্তু মানুষের মন জয় করা গেলনা।

www.pathagar.com

কোন স্থানে রাতের অন্ধকারে অপরাধমূলক ঘটনা ঘটলে আশে পাশের লোক দোষী নাও হতে পারে। এতে তাদের কোন জ্ঞান নাও থাকতে পারে। কিন্তু সামরিক ব্যক্তিদের হিসাব নিকাশ বেসামরিক ব্যক্তিদের মাপকাঠির বাহিরে, তাই অনেকের প্রচেষ্টা সত্বেও সামিরিক বাহিনীকে এই কাজ থেকে বিরত রাখা গেল না। সুতরাং বাধ্য হয়েই জানমালের নিরাপত্তার খাতিরে গ্রামবাসীরা রাত জেগে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো পাহারা দেবার ব্যবস্থা করল। এ সত্বেও কোথায়ও কোন সন্ত্রাসমূলক ঘটনা পুনরায় ঘটলে আশে পাশের জনসাধারণ ভিটে ছাড়া হয়ে দূরের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। মানুষের এই দুরবস্থার জন্য কে দায়ী? কোন প্রতিষ্ঠিত সরকার সন্ত্রাসবাদীদের এই কার্য্যকলাপে নিশ্চুপ থাকতে পারে কি?

ভারতীয় প্রচার ও প্রোপাগান্ডা

সন্ত্রাসমূলক ঘটনাগুলোর খবর স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা ছাড়া খবরের কাগজের পাতায় বা রেডিও, টেলিভিশন মারফত পাওয়া যেতনা। কেউ দুরবর্তী অঞ্চলের সঠিক কোন খবর রাখত না। অথচ এদেশের অভ্যন্তরে প্রতিটি নাশকতামূলক কাজের অতিরঞ্জিত খবর ফলাও করে ভারতীয় রেডিও প্রচার করত। বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, বিভিন্ন ঘটনার অতিরঞ্জিত কাহিনী ফলাও করে প্রচার করে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিওর প্রচারবিদরা এদেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনবার পথে বিরাট বাধা সৃষ্টি করল। প্রশ্নটি ছিল রাজনৈতিক এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই এর সমাধান প্রয়োজন ছিল। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এবং তাদের অনুসরণ করে সরকারী কর্মচারী ও জনসাধারনের একাংশ যারা ভারতে পাড়ি দিয়েছিল তাদের খপ্পর থেকে বের করে দেশে আনার ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিল ইয়াহিয়া সরকার। সাধারন ক্ষমা ঘোষণা হল সবার জন্য। সরকারী কর্মচারীদের স্ব স্ব চাকুরীতে বহাল ও বকেয়া বেতনদানের ওয়াদা এবং জনসাধারণের জন্য সাহায্য ও পুনর্বাসনের ওয়াদা ঘোষিত হল। কারাগারে লৌহ কপাট উন্মুক্ত হওয়ায় বহু মানুষের বন্দীত্ব ঘুচল। আর সেই সঙ্গে ভারত থেকেও মানুষের ফিরে আসার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ইয়াহিয়া সরকারের এসব সিদ্ধান্ত তার সামরিক উপদেষ্টাদের সাহায্যে গৃহিত হয়নি বরং এদেশেরই মানুষ যারা সামরিক শাসনামলে সৃষ্ট বহুবিধ মানবিক সমস্যার সমাধানের জন্য ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছিল তাদেরই প্রত্যক্ষ চাপ প্রয়োগের ফলে এ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল। তবুও এতদসত্বেও ইয়াহিয়া সরকারের সিদ্ধান্ত আশানুরূপ ফল লাভে সমর্থ হলনা। ভারত থেকে শরনার্থীদের দেশে ফিরে আসার উপর কড়াকড়ি আরোপিত হল ভারত সরকারের তরফ থেকে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের চলাচলের উপরও সন্ধানী দৃষ্টি রইল সদা জাগ্রত। আর সেই সঙ্গে ভারতের প্রচারভিযান চলল আরও জোরে। ফিরে আসা শরনার্থীদের মনগড়া হয়রানীমূলক কাহিনী প্রচার করে ভীতি ও আশঙ্কার সৃষ্টি করল ভারতে রয়ে যাওয়া শরনার্থীদের মনে।

www.pathagar.com

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার পথ

সামরিক শাসনের অবসান করে দেশের মানুষের হাতে শাসন ব্যবস্থা তুলে দেওয়াই ছিল পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ। কেন্দ্রিয় শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দের এই উপদেশ নীতিগতভাবে ইয়াহিয়া সরকার মেনে নিলেন। সামরিক বাহিনীর ভয়ে যারা ভারতে পালিয়ে গেছে - সামরিক বাহিনীর উপস্থিতিতে তারা ফিরে আসতে পারেনা এই সহজ সত্যের খাতিরেই আমরা আর্মীর ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার পক্ষপাতি ছিলাম। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকার নীতিগতভাবে এ উপদেশ গ্রহণ করলেও যে বিলম্বিত কর্মপন্থা গ্রহণ করলেন, তাতে এ পদক্ষেপের শেষ সাফল্য সংশয়পূর্ণ হয়ে উঠল। আগস্ট (১৯৭১) মাসের বেতার বক্তৃতায় তিনি কিছু সংখ্যক শূন্য আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করে ২৮শে ডিসেম্বর নূতন গণ পরিষদের প্রথম অধিবেশনের দিন ধার্য করলেন এবং ঐদিন সামরিক সরকারের অবসান করে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তৎকালীন সামরিক শাসনের শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে এ সিদ্ধান্ত সবার মনেই কিছুটা স্বস্তি সৃষ্টি করেছিল ঠিকই, কিন্তু এই দীর্ঘ সময় সব কিছুকেই বানচাল করে দেওয়ার মত অবকাশও দিল ভারতকে প্রচুর। দেশের সংহতি ও অখন্ডতাকে বজায় রেখে এবং অচলাবস্থাকে দূর করে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য ইয়াহিয়ার ঐ সিদ্ধান্ত মেনে না নিয়ে কোন উপায় ছিল না। অসহযোগিতার মাধ্যমে কোন মতেই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ত্বরান্বিত হত না। আবার ভারতের সাহায্যে পাকিস্তান থেকে দেশকে বিচ্ছিন্ন করার পক্ষপাতি আমরা ছিলাম না। কেননা ইতিহাসের শিক্ষানুযায়ী দেখা যায় এরূপ আন্দোলন আজাদীর পথে দেশবাসীকে এগিয়ে দেয় না বরং গোলামীর বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে আর মানুষের জন্য নিয়ে আসে আন্তহীন সমস্যা। সাড়ে ৪ কোটি পশ্চিম পাকিস্তানীর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 'পঞ্চান্ন কোটি' ভারতবাসীর খপ্পরে পড়ে আমরা তাদের জন্য শোষণের স্থান করে দিতে পারি, কিন্তু নিজেদের স্বাধীন বলে দাবী করতে পারি না। সাড়ে ৪ কোটি পশ্চিমার শোষণে সাড়ে সাত কোটি পূর্ব পাকিস্তানীরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা শক্তি দিয়েও বন্ধ করতে পারবে, কিন্তু ৫৫ কোটির শোষণ থেকে বাঁচবার কোন প্রচেষ্টাই কার্য্যকরী হবে না। শুধু সংখ্যার প্রশ্নেই নয় ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়েও ভারতের প্রভাব থেকে কোনদিনই মুক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশই যখন কেন্দ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে শোষণ ও বঞ্চনার অভিযোগে আন্দোলনের পথে এগোচেছ তখন ভবিষ্যতে এদেশের মানুষও বিভিন্ন স্বার্থের প্রশ্নে ভারতের বিরুদ্ধে বৈরী মনোভোব দেখাবে। কিন্তু ভৌগলিক অবস্থার কারণে ভারতকে ডিঙ্গিয়ে অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কঠিন হবে। ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রশ্নগুলো ছাড়াও শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেও আমরা ভারতের অস্ত্রের সাহায্যে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হবার পক্ষপাতি ছিলাম না। কেননা এই 'দুর্দিনের দেনা' কোন দিনই পরিশোধ হবে না। অর্থের পূজারী ভারতীয় হিন্দু জাতি 'আসলের দায়ে' নয়, শুধুমাত্র সুদের দায়েই আমাদের স্বাধীন

www.pathagar.com

সত্ত্বাকে বন্ধকী মাল হিসাবে নিলামে গ্রাস করে নেবে। তাই আমরা এই দেশের স্বায়ত্বশাসনের বিরুদ্ধে ছিলাম না, দাবী দাওয়া আদায়ের বিরোধীও ছিলাম না, প্রয়োজনে আপোষে ভাগবাটোয়ারা করার কথাও চিন্তা ভাবনা করা যেত যদি তা আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী না হত। কিন্তু ভারতীয় অর্থ ও কুটনীতির সাহায্যে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বিশেষ করে বড় অংশকে ছোট অংশ থেকে পৃথক করা আমাদের স্বাধীন অস্তিত্ব ও সামগ্রিক উন্নতির জন্য মঙ্গলজনক মনে হয়নি। ইয়াহিয়ার ঘোষণা মোতাবেক উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে সামরিক শাসনের অবসান করা তখনকার পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম রাজনৈতিক পন্থা হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। ইয়াহিয়া খান তার ঘোষণার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সামরিক গভর্নরের স্থলে রাজনীতিবীদ গভর্নর নিয়োগ করলেন এবং এর পরপরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত 'অস্থায়ী মন্ত্রীসভা' ঐ ঘোষণার আন্তরিকতা প্রমাণে সাহায্য করল।

ইয়াহিয়া সরকারের ঐ ঘোষণার পর ভারতীয় প্রচার যন্ত্রকে আরও ধারালো করা হল। এদেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসমূলক কার্য্যকলাপ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। যানবাহন, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিকল করে দেবার সমস্ত ব্যবস্থাই জোরদার হল। সন্ত্রাসমূলক কার্য্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সামরিক সরকারকে প্রয়োজনের তাগিদেই শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ় ও জোরদার করতে হলো। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সশস্ত্র পাহাড়ার ব্যবস্থা হলো। শহরে সীমাবদ্ধ সামরিক বাহিনীকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে হলো। বিভিন্ন সীমান্ত ঘাঁটিগুলো সামরিক বাহিনীর দ্বারা পূর্ণ হলো। বিভিন্ন সশস্ত্র আধা সামরিক বাহিনী গড়ে উঠল সামরিক অফিসারদের তত্ত্বাবধানে। পুলিশ বাহিনীকে জোরদার করার জন্য এদেশের যুবকদের রিক্রুট করা হল। ট্রেনিং সময় সাপেক্ষ ছিল সেজন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ আমদানী করল কয়েক হাজার অন্তবর্তীকালীন সময়টিতে কাজ চালু রাখার জন্য। এদেশের মানুষ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পরিচিত ছিল কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশের সঙ্গে আদৌ পরিচিত ছিল না। এমনিতেই এদেশে পুলিশের বিরুদ্ধে জনসাধারণ চিরদিনই অভিযোগমূখর, এরপর পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ আমদানী হওয়ায় জনসাধারণের অভিযোগের মাত্রা শতগুণ বৃদ্ধি পেল। সামরিক কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপ আদৌ শুভ হলনা। যে রাজনৈতিক প্রশ্নে সামরিক বাহিনীর ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার কথা সেখানে বাইরে থেকে পুলিশ আমদানী ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ ও শত্রুদের অপপ্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া মোটেই সমিচীন হয়নি। সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতিও বিরাট আকারে প্রচারিত হয়ে জনসাধারণের একাংশকে ভারতমুখী করে তুলল। দেশের তরুণ ও যুবকদের ভারতে গিয়ে দীক্ষা নেবার প্ররোচণা সফল হলো। ভারতীয়দের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বিভিন্ন এলাকায় সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশ সহজতর হলো।

www.pathagar.com

মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা সাহসিকতা ও মনোবলের দিক দিয়ে রাজাকারদের চাইতে অনেক নিম্নমানের ছিল কিন্তু হাতিয়ারের দিক দিয়ে ছিল সুসজ্জিত। আধুনিক ও হালকা আগ্নেয়াস্ত্র এবং প্রচুর গুলি ও রসদ নিয়ে মুক্তিবাহিনীরা ভারত থেকে অনুপ্রবেশ করে রাতের অন্ধকারে হামলা করত। আর রাজাকারদের ছিল সেকেলে রাইফেল এবং পাঁচ থেকে দশ রাউন্ড গুলি। এতদসত্ত্বেও অনেক আক্রমনে ও খন্ডযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা নিহত হয়েছে এবং অনেকে ভারত পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। এই সব ফলাফলে রাজাকারদের উন্নত ট্রেনিং দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো কিন্তু ততদিন পরিস্থিতি মোড় নিয়েছে অন্য দিকে। সন্ত্রাসমূলক কাজ চালিয়ে ও মুক্তিবাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বা কিছু সংখ্যক মানুষ হত্যা করে এই দেশেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবেনা একথা ভারতীয়রা ভাল করেই উপলব্ধি করল। একমাত্র পশুশক্তি ছাড়া পাকিস্তানের অখন্ডতাকে ধ্বংস করতে পারে এই বিশ্বাসের উপর ভারত মরণ কামড় দেবার জন্য সমরায়োজন শুরু করল। ভারতের রণ প্রস্তুতি সম্পর্কে এবং পাকিস্তান সরকার বা সামরিক বাহিনীর পাল্টা প্রস্তুতির ধরন ও খুঁটিনাটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোন ধারণা থাকার কথা নয়। প্রতিটি দেশেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। ভারতের রণপ্রস্তুতির কিছু বিক্ষিপ্ত খবর পেলেও সত্যিকারভাবে দুই দেশ কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হবে কিনা এ সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ ছিল। অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি হতে পারে, একের বিরুদ্ধে অন্যকে লেলিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে যুদ্ধ করা যেতে পারেনা। কেন্দ্রিয় সরকারের সঙ্গে এদেশের সম্পদ বন্টন নিয়ে যে মনোমালিন্য সেরূপ মনোমালিন্য ভারতেও বিরাজমান। পূর্বাঞ্চলের ও দক্ষিণ ভারতের বহু প্রদেশই কেন্দ্রিয় সরকারের অসাম্য নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর। পৃথক হওয়ার দাবী নয় - শুধুমাত্র স্বায়ত্বশাসন বা প্রদেশের হাতে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের দাবী ভারতের কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন। সুতরাং ভারত এমন একটি কর্মপন্থা পাকিস্তানের কোন প্রদেশ সম্পর্কে নিতে পারেনা যা হবে তার জন্য আত্মঘাতি এবং ভবিষ্যতের জন্য কঠিন বিপদ ডেকে আনবে। এমন কোন উদাহরণ ভারতের কেন্দ্রিয় নেতৃত্ব সৃষ্টি করবেনা যা ভবিষ্যতে ভারতের কোন প্রদেশ বা অঞ্চল পৃথক হবার দাবী হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া বহু জাতি অধ্যুষিত বহু ভাষাভাষীর দেশ ভারত কোন অঞ্চল ভিত্তিক বা ভাষা ভিত্তিক আন্দোলন সমর্থনও করতে পারেনা। অলক্ষ্যেও যদি এরূপ কোন বীজ ভারতের কোন অঞ্চলের মাটিতে প্রোথিত হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তা মহীরুহের আকার নিয়ে গোটা দেশের মাটিতেই ফাটল ধরাতে সক্ষম হবে। এরূপ চিন্তাধারার জনমতই ছিল সংখ্যাগুরু যারা যুদ্ধের কোন আশংকাকে মোটেই আমল দেয় নাই। পাকিস্তানের অখন্ডত্বে বিশ্বাসী প্রায় প্রত্যেকেই এইরূপ চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিল।

www.pathagar.com

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন আসন্ন লড়াই এর সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা আদৌ বিশ্বাসী ছিলামনা। সুতরাং খোলামন নিয়েই আমরা উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করলাম এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতা দ্বন্দ্ব পরিহারের পথে বিরাট সহায়ক হল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন সমাপ্ত হল এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে একাধিক প্রার্থী থাকায় নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণের চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলেন। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে আমরা অনেকেই নির্বাচিত হয়ে গেলাম এবং দেশের ভবিষ্যত শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে একটি সুরাহা করার জন্য পারস্পরিক আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আগের নির্বাচনগুলোতে নিজেদের দলগত মেনিফেষ্টো, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সমস্যাবলী, দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল ও সরকারের বিভিন্ন ভুল ও বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপের আলোকে আমরা এমন একটি শাসনতান্ত্রিক দলিলের পক্ষপাতী ছিলাম যা অতিতের ব্যাথা, বেদনা ও তিক্ততা সৃষ্টির আর কোন সুযোগই সৃষ্টি করবেনা। আমরা এমন একটি শাসনতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলাম যা পাকিস্তানের গোটা জনসমষ্টিকে আদর্শগত দিক দিয়ে একজাতি, একমন করে রাখবে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করবার ও রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করবার সমান সুযোগ সৃষ্টি করবে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রদেশে প্রদেশে, অঞ্চলে অঞ্চলের মধ্যে অতিতের বৈষম্যকে দূর করে ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ গড়বে ও প্রতিটি মানুষের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। এ কাজ অত্যন্ত কঠিন এতে সন্দেহ ছিলনা। তবে উভয় অংশের নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক সমঝোতা এবং বিশেষ করে ভ্রাতৃঘাতি দ্বন্দ্বের মধ্যে অতিতের ভুলত্রুটির যে চিত্র প্রকট হয়ে উঠেছিল তা সংশোধনের একান্তিক প্রচেষ্টা কঠিনতম কাজকেও সহজ করে দেবে এ বিশ্বাস আমাদের ছিল। তাই আমরা যারা প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হলাম তারা দেশের উভয় অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতে পৌছানোর জন্য পার্লামেন্ট বৈঠকের কিছুদিন পূর্বেই একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী করার জন্য সরকারের সহযোগিতা এল এবং ২৫শে নভেম্বর থেকে ১০ই ডিসেম্বরের মধ্যে ১৯৭০ সনের নির্বাচিত ও ১৯৭১ সনের উপনির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের পার্লামেন্ট অধিবেষন স্থলে অর্থ্যাৎ ইসলামাবাদে পৌছিয়ে দেবার ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গৃহিত হল।

দুর্যোগের বছরঃ আমি মা হারালাম

বছরটাই চলছিল জাতীয় দুর্যোগের বছর। অনেকেই সম্পদ হারিয়েছেন, অনেককেই আপনজন হারানোর ব্যাথা সইতে হয়েছে দুর্যোগের আবর্তে পড়ে, আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিলনা। তবুও ঐ দুর্যোগের বছরে আমার জন্য একটি মহাদুর্যোগ অপেক্ষা করছিল - এটা ছিল সন্তানের শ্রেষ্ঠসম্পদ তার গর্ভধারিনী মাতার খেদমত করার সুযোগ। আমার পিতামাতা ভেড়ামারায় বসবাস করতেন এবং আমার

www.pathagar.com

কর্মস্থল ও বাসস্থল ছিল কুষ্টিয়া শহর। আমার পিতামাতা বেশীরভাগ সময় নিজেদের ভিটায় বসবাস করতেন। সন্তান হিসাবে আমরা প্রায়ই তাদের দেখতে যেতাম ও তাঁরাও মাঝেমাঝে কুষ্টিয়া এসে কিছুদিন থাকতেন। আমার পিতা মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে যখন অসুস্থ হলেন তখন আমরা চাইলাম উনি কুষ্টিয়ায় এসে থাকুন কিন্তু অন্য পিতামাতাদের মত তিনি নিজের ভিটা আঁকড়িয়ে থাকলেন। আমার আশঙ্কা ছিল হয়ত পিতার মৃত্যুর খবর কুষ্টিয়ায় পেতে হবে। কিন্তু মৃত্যুর ৩/৪ দিন পূর্বে তিনি বললেন 'বাবা আমাকে কুষ্টিয়া নিয়ে চল'। আমি অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে কুষ্টিয়ায় নিয়ে এলাম। ২ দিন পর উনার ষ্ট্রোক হল এবং ২ দিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকবার পর উনি কি যেন বলতে চাইছিলেন। আমি বুকের কাছে মাথা রাখলে উনি কোন রকমে হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। আমি বলতে লাগলাম 'সব দায়িত্ব আমি পালন করব'। তিনি হাত ছেড়ে দিলেন - আমি ছোট চামচ দিয়ে মুখে পানি দিলাম। মনে হল তিনি আশ্বস্ত হয়ে স্রষ্টার আহ্বানে নীরবে সাড়া দিলেন। আমার এইটুকু শান্তনা ছিল যে দূরে অবস্থান করেও আল্লাহ মেহেরবান আমার পিতার অন্তিম মুহূর্তে আমাকে পাশে থাকার সুযোগ দিয়েছেন। এটা ছিল ১৯৫৯ সন। ঠিক বার বছর পর এমনি আর একটি মুহূর্ত আমার ভাগ্যে আল্লাহ মেহেরবান লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। দুর্যোগের বছর তার উপর আমার আম্মা ৫ বছর থেকে ছিলেন প্যারালাইজড। পরে কিছুটা উন্নতি হয়েছিল কোনরকমে দুই এক কদম চলতে পারতেন। উনাকে নিয়ে চলাফেরা করা বা কোথাও স্থানান্তর করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। মার্চ-এপ্রিলে যখন শহর ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নেই তখনও আমার স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে উনিও ছিলেন। পরিবেশ কিছু শান্ত হলে উনি কিছু সময় কুষ্টিয়া থাকলেও বেশীর ভাগ সময় ভেড়ামারায় নিজের ভিটাতেই থাকতে পছন্দ করতেন। বাড়ীর সম্মুখে ছিল আমার পিতার কবর, মনে হয় নিজের ভিটার আকর্ষণ ছাড়াও এই আকর্ষণও কম ছিলনা। তবুও আমরা কেউই চাইনি উনি অসুস্থ অবস্থায় ভেড়ামারায় থাকুন। তাইতে কিছুদিন উনাকে উনার ইচছার বিরুদ্ধেই কুষ্টিয়ায় আমার বাসায় রাখলাম। আমার স্ত্রী সৈয়দা বলল 'মা যখন যেতে চাচ্ছেন তখন রেখে আসা যাক। ক'দিন পর আবার নিয়ে আসা যাবে'। এক সপ্তাহ পর নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আম্মাকে দেখতে গেছি ভেড়ামারায়। আমাকে দেখে মনে হল খুব খুসী হয়েছেন। বল্লেন 'বাবা আমাকে কুষ্টিয়া নিয়ে চল'। পরদিনই আমার সন্তানরা গাড়ীতে করে তাদের দাদীকে আমার কুষ্টিয়ার বাসায় নিয়ে এল। আমি আশস্ত হলাম আম্মাকে কাছে পেয়ে, আনন্দিত হলাম উনি নিজে মুখে আমাকে আদেশ করেছেন 'আমাকে কুষ্টিয়া নিয়ে চল'। আমার আম্মা কুষ্টিয়ায় আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও ভগ্নিদের সেবাযত্নে ডুবে রইলেন। আমিও সামাজিক কাজে বিভিন্ন প্রোগ্রামে ব্যস্ত রইলাম। ২ দিন পর আমার আম্মার তৃতীয় বারের মত ষ্ট্রোক হল - খবর পেয়ে প্রোগ্রাম ছেড়ে দৌড়লাম - ততক্ষণে জ্ঞান হারা হয়ে গেছেন। দিনটা এই অবস্থায় কাটল, রাতটাও পোহাল। সোবেহ সাদেকে আযানের সময় শুক্রবার ভোরে আমার আম্মা আমার হাতের শেষ পানির কয়েক ফোটা মুখে নিয়ে স্রষ্টার আহ্বানে আমাদের এতিম করে

www.pathagar.com

চলে গেলেন। আমার আম্মা ও আব্বার বয়সের পার্থক্য ছিল ১২ বছর। মারাও গেলেন ১২ বছরের ব্যবধানে ৬২ বছর বয়সে। উভয়ই মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে আমাকে কুষ্টিয়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করেছেন, উভয়েই আমার হাতের শেষ পানির ফোটাগুলো মুখে নিয়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমাদের জন্য রেখে গেলেন কান্না ও অশ্রুর মধ্যেও কিছুটা শান্তনা, পিতা মাতা উভয়েরই শেষ মুহূর্তে আমরা তাদের কলিজার টুকরোগুলো কাছে থাকতে পেরেছি। আল্লাহ মেহেরবান তাঁর অপার করুণায় স্থানের ব্যবধান এইভাবে ঘুচিয়ে দিয়েছেন।

ইসলামাবাদ যাওয়ার প্রস্তুতি

নিজের মৃত্যু ছাড়া অন্য কারও মৃত্যুতে সে যতই আপনজন হোক না কেন তার জীবনের ঘড়ির কাটা গতি স্তব্ধ হয়ে যায়না। আমার জীবনের গতিও পূর্বের মতই সচল রইল - কাজের মধ্যেই শোক ভুলবার চেষ্টা করলাম। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আমাদের কিছু সংখ্যক সদস্যদের ইসলামাবাদের পথে পাড়ি দেবার দিন স্থীর হয়েছে। সদস্যদের প্রথম দলটি ২৫/২৬শে নভেম্বরের দিকে রওনা দেবেন। চিরতরে দেশের অচলাবস্থার অবসানের জন্য দেশের মানুষের আশা-আকাংখা রূপ নিতে চলেছে। ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ে যাদের হাত ভাইয়ের রক্তে কলুষিত হয়েছিলো, তারাও দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ ও অতিতের ভুল বুঝাবুঝি বিস্মরণ হয়ে কলুষমুক্ত সমাজের বুনিয়াদ গড়বে, ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন আবার প্রেম ভালবাসায় সিক্ত হবে,এর মধ্যে বিবাদমান ভাইদের আশার আলো থাকলেও ভারতের জন্য ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক। ভারতীয় ক্ষমতাসীনদের গোটা ২৫ বছরের সমস্ত প্রচেষ্টা ও চক্রান্ত ব্যর্থ হতে চলেছে। তাই কোন মতেই এই প্রচেষ্টাকে সার্থক হতে দেওয়া যেতে পারেনা। সুতরাং পশুশক্তি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হল ভারতকে। নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় হামলার খবর পাওয়া গেল। ভারতীয় সরকার ও বেতার যন্ত্রগুলো ভারতীয় সামরিক বাহিনী সরাসরি অংশগ্রহণের কথা অস্বীকার করে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ ও কল্পিত সাফল্যের অলীক কাহিনী ফলাও করে প্রচার করতে লাগল। সীমান্ত এলাকার প্রতিটি ছোট ছোট সংঘর্ষে আক্রমণকারীরা শুধু পর্য্যদুস্তই হলোনা বরং সেই সঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর জওয়ান ও উচচপদস্থ সৈনিকরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্নস্থানে যে সমস্ত ভারতীয় জওয়ানরা পাক সেনাদের হাতে বন্দী হলো তাদের জবানবন্দীতে ভারতের দূরভীসন্ধিমূলক কার্য্যকলাপ ও সমরায়োজনের বহু তথ্য উদঘাটিত হলো। বিভিন্ন স্থানের এই সমস্ত সংঘর্ষ ও ভারতীয় বাহিনীর সরাসরি অংশগ্রহণ স্বভাবতই আমাদের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করল। এ উদ্বেগ ভীতির ছিলনা কেননা পাক সামরিক বাহিনীর অতিতের ইতিহাস সৃষ্টিকারী সাফল্যের কথা জাতির মনে জাগ্রত ছিল। আমাদের উদ্বেগ ছিল সরকারের গোটা সমস্যাটাকে মোকাবেলা করবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারতের যে মারমুখি সমরাভিযানের প্রস্তুতির কথা সীমান্ত

www.pathagar.com

পার হয়ে এদেশে আসছে তাকে মোকাবিলা করবার মত আধুনিক সমরাস্ত্রের আয়োজন ও সমাবেশ এদেশের মাটিতে এবং বিশেষ করে সীমান্ত অঞ্চলে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। হাওয়াই হামলার উত্তরে কিভাবে জবাব দেওয়া হবে তার তথ্যও আমাদের কাছে নেই। স্থানীয় সামরিক বাহিনী থেকে শুরু করে প্রদেশের উচচপদস্থ সামরিক কর্মকর্তার কাছে আমরা বার বার উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেছি। তাদের বলিষ্ঠ উত্তরের মধ্যে এ কথাই প্রকাশ পেয়েছে যে ভারত যুদ্ধের ঝুঁকি নেবেনা। আর ভুলবশত এ পথে পা বাড়ালে সমুচিত শিক্ষা পাবে। এর উর্ধ্বে গিয়ে সামরিক বাহিনীর প্রস্তুতির গোপন খবর আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিলনা। ভারত নিজেও সরাসরি বড় আকারের একটি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এ সংশয়ও আমাদের মনে আদৌও ছিলনা। তাই যখন ইসলামাবাদ রওনা দেওয়ার সময়টি ঘনিয়ে এলো তখন শুধু যে পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছি তার গুরুত্বের কথাই বার বার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল। ৩রা ডিসেম্বর আটটায় স্ত্রী পুত্র কন্যাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশনে হাজির হলাম। আমার একহাত জড়িয়ে ধরে সঙ্গে এল ছোট্ট আদুরে ছেলে ওমর। অন্য দিনের মত বাড়ী থেকে রওয়ানা এবং প্রত্যাবর্তনের সময় যেমন তোতা পাখির মত কথার মালা গাঁথে আজ কেন জানি একেবারে নীরব। স্টেশনে বড় দুই ছেলে সউদ ও আলি, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীরা অনেকেই এসেছে। হাসি মুখে বিদায় দিয়ে চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় সালাম দিচ্ছি। ওদের মুখের হাঁসি কেন যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। সবার মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ, দাঁড়িয়ে আছে স্থবির গতিহীন হয়ে। আমার 'কলিজার টুকরো' ওমরের চোখেও পানি।

অধ্যায়-৯

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সন। ভীতি ও উৎকণ্ঠার মধ্যে নিদ্রাবিহীন রাত পেরিয়ে উষার আলো ছড়ানোর সাথে সাথে চারিদিকে মানুষের হৈ চৈ ও কলরবের মধ্যে যে সত্য পরিস্ফুট হয়ে উঠল তা হল - বাংলাদেশ অর্থাৎ সাবেক পূর্ব পাকিস্তান দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয়েছে। ভারতীয় সেনারা মুক্তিবাহিনী সহ ঢাকা শহরে প্রবেশ করছে, ভারতীয় ট্যাঙ্ক বিশাল আওয়াজ করে শহর কাঁপিয়ে এগিয়ে চলেছে রেসকোর্স ময়দানের দিকে যেখানে বিকেলে ভারতীয় বাহিনীর কাছে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের নাটক মঞ্চস্থ হবে। আর সেই সঙ্গে শেষ হবে এই উপমহাদেশে রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়ার পচিশ বছরের একটি অধ্যায়। মতিঝিলের একটি চারতলা দালানের কামরায় বসে সারাদিন ধরে ১৯৪৭ সনের আগষ্টের পর দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার রূপ আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করছি। এক একটি ট্যাঙ্কের উপর ভারতীয় সেনাদের ১০/১২ জন করে বসা, পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে গর্বিত মুক্তিযোদ্ধারা, চারিদিক থেকে ছুটে আসা মানুষ বেশীর ভাগ ছিল কিশোর ও যুবকরা 'ইন্দিরা গান্ধী জয়' বলে তাদের বরণ করে নিচ্ছে।

www.pathagar.com

হাত তুলে সালাম দিয়ে ভারতীয় সেনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে, আর অতি উৎসাহী কেউবা হাত এগিয়ে দিচ্ছে ভারতীয় সেনাদের দিকে একটু ঐ হাতের পরশ পাওয়ার জন্য। ১৯৪৭ সনের আগষ্টে আমি ২০ বছরের এক যুবক, স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন গর্বিত কর্মী, আর ১৯৭১-এ আমার বয়স ছিল ৪৫ বছর, এ স্বাধীনতা আন্দোলনে আমি শরীক হতে পারিনি, আর না পারার কারণে জীবন, মান ও সম্মানের উপর বিরাট ঝুঁকি নিতে চলেছি।

ডিসেম্বরের ৩ তারিখে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকা পৌছি। রাত ১০টার দিকে কাজকাম সেরে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিলাম। শেষ রাতে কামানের গর্জনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উপরে হাওয়াই জাহাজের শব্দ আর নীচে কামানের গর্জন ও উর্ধগতি অগ্নিগোলা দেখে বুঝতে অসুবিধা হলনা যে হাওয়াই হামলা হয়েছে আর এ হামলাকারী ভারত। হাওয়াই হামলা উপর্য্যপরী হতে লাগল। প্রথম দিকে পাকিস্তান বিমান বাহিনী ও গোলন্দাজরা প্রতিরোধ সৃষ্টি করলেও দুই তিন দিন পর থেকেই পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসতে থাকে এবং দশ তারিখ থেকে ঢাকার আকাশে ভারতীয় হাওয়াই হামলা ছিল সম্পূর্ণ একতরফা আর ইচেছ করলেই যে কোন লক্ষ্যবস্তুকে তারা আক্রমনের নিশানা বানাতে পারত অনায়াসে ও অক্লেশে। ঢাকার যে মাঠে গতি দেখবার জন্য হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ হত ঘোরদৌড়ের প্রতিযোগিতায় সেখানে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বিকেলে গতিহীন, স্থবির, পরাজিত পাক বাহিনীর দর্শনে মানুষের সমাবেশ হয়েছে আরও বেশী।

দেশ স্বাধীন করার আন্দোলনের ধারা, পদ্ধতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটি গণতান্ত্রিক দেশে মত পার্থক্য স্বাভাবিক, কিন্তু যে দেশটি স্বাধীন হল তার প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনের প্রশ্নে ১৬ তারিখে এ দেশবাসীর কারও মনে কোন দ্বিমত ছিল না। একজন জ্ঞানী ব্যক্তির ভাষায় বলতে হয় আল্লাহর সৃষ্টি গোট দুনিয়া একটি দেশ ছিল, কিন্তু মানুষ একে খন্ড খন্ড করেছে। যদি এই সংখ্যার উপর আরও ২/১টি সংখ্যা যোগ হয় তাতে দোষের কি? শুধুমাত্র কয়বিঘা জমি নিয়ে একটি দেশের জন্য গর্ব করার কিছু নেই। একটি দেশের আসল বস্তু হচেছ এর মানুষ। মানুষ সেখানে সুখী কিনা, শোষণমুক্ত কিনা, সামাজিক বিচার ও ন্যায়নীতি এ সমাজে আছে কিনা, এটাই দেখবার বিষয়। বেইনছাফীতে ভরা একটি বিরাট ভূখন্ডের চাইতে ইনছাফ ও কল্যাণবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বর্গ মাইলের একটি রাষ্ট্রও অনেক শ্রেয়। আশা ছিল পৃথিবীর মানচিত্রে যে নুতন দেশের পত্তন হল তাকে গড়ে তোলবার ডাক পড়বে সবার। অতিতের রাজনৈতিক মত পাথর্ক্যের দরুন নুতন রাষ্ট্রীয় শক্তির ছোবল দিয়ে কাউকে দংশন করা হবেনা। আর সমৃদ্ধি ও উন্নতির পূর্ব শর্ত শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বিজয়ী দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

www.pathagar.com

কিন্তু নবলব্ধ স্বাধীন দেশে ১৭ই ডিসেম্বর আমার চোখের সামনে যে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সূচনা হল তাতে আমার মনে ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হলো। রাস্তায় মানুষের হৈ চৈ শুনে জানালার পর্দা সরিয়ে যা দেখলাম তা ছিল সত্যই মর্মবিদারক। আদমজী কোর্ট ও বাওয়ানী বিল্ডিং এর উর্দুভাষী দারোয়ানগুলোকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে এবং মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। দারোয়ানগুলো সংখ্যায় পনের/ষোল জন। অধিকাংশই ছিল বৃদ্ধ কিন্তু ওদের মৃত্যুর কারণ ওরা বাঙালী নয়। এ দেশের মাটিতে জন্মায়নি এই ছিল ওদের অপরাধ। দুই/চারজন পথচারী এই নৃশংস হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে মৃদু প্রতিবাদ করেছে, নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু উল্লাসে ফেটে পড়া মানুষের সংখ্যার তুলনায় এ ছিল নিতান্ত নগণ্য। নুতন রাষ্ট্রের জন্য এ ছিল এক অশুভ ঘটনা, হিংস্রতা ও পাশবিকতার নখরে যাত্রাপথ হলো ক্ষতবিক্ষত। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানালার পর্দা টেনে দিলাম।

নুতন সরকারী যন্ত্র কায়েম

নুতন সরকারী যন্ত্র ক'দিনের মধ্যে পুরোপুরি কায়েম হয়ে গেল। মন্ত্রীসভার সদস্যরা ঢাকায় এসে কাজ শুরু করলেন। শুরু হল তাদের সম্বর্ধনা আর সেই উপলক্ষে বর্ষিত হতে লাগল মন্ত্রীদের বাণী ও বিবৃতি। এ সব বক্তৃতা, বিবৃতিতে প্রথমেই কতকগুলো দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল যথা মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, পি. ডি. পি., পিপিপি ইত্যাদি। আরও ঘোষণা করা হলো দালালদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। যদিও পরবর্তীতে ২৪শে জানুয়ারী (১৯৭২) পর্য্যন্ত দালাল শব্দটির সংজ্ঞা দিয়ে শাস্তির বিধান সম্বলিত কোন আইনের অস্তিত্ব ছিলনা, কিন্তু শব্দটির প্রচার ও ব্যবহার ২০শে ডিসেম্বর (১৯৭১) থেকে ব্যাপক শুরু হয়ে গেল। কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার অভাবে পাক বাহিনীকে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, ক্ষতিসাধনে সাহায্যকারী ছাড়াও নিষিদ্ধ দলগুলোর সদস্য ও কর্মী যারা অতীতে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে একমত হতে পারেনি, উপনির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ, পাক আমলে স্কুল কলেজের অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী, রেডিও টেলিভিশনে অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ, বিভিন্ন সভা সমিতিতে অংশগ্রহণকারী বক্তাগণ, বিদেশে প্রেরিত প্রতিনিধিবৃন্দ ইত্যাদি সবাইকে দালাল হিসাবে আখ্যায়িত করা শুরু হল। 'দালালদের শাস্তি দেওয়া হবে' উক্তির মধ্যে কর্তৃপক্ষের যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, দালালদের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করে তাদের বিচারের কাঠগড়ায় এনে শাস্তি দেবার দায়িত্ব সরকার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেননি। এমনিতেই দেশে ছিল অস্ত্রের ছড়াছড়ি, উত্তপ্ত পরিবেশ, তার উপর দালালদের শাস্তি দানের ঘোষণায় আগুনে ঘি ঢেলে দেওয়া হল।

www.pathagar.com

হত্যা ও নির্যাতনের ভয়াবহ খবর

চারিদিক থেকে হত্যা ও নির্যাতনের ভয়াবহ খবর আসছে। মনে হচ্ছে যেন মৃত্যু গোটা দেশে তার কালো চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। খবর পেলাম ঢাকা শহরের মহল্লায় মহল্লায় বিভিন্ন ক্যাম্প গঠিত হয়েছে এবং প্রত্যেক দলই স্বনির্ধারিত এলাকায় দালাল চষে বেড়াচ্ছে। দালালদের হাইজ্যাক করে নিয়ে হত্যা করা হচ্ছে, মুক্তিপণ নিয়ে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, আবার কারও নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করেও রেহাই দেওয়া হচ্ছেনা, দালালদের বাড়ী লুটপাট করে যথাসর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং এসব ছাড়াও নানান ধরনের হয়রানীর স্টীমরোলার চালানো হচ্ছে। জনৈক আত্মীয় খবর নিয়ে এলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর সাজ্জাদ হোসেন সাহেবের ক্ষতবিক্ষত দেহ গুলিস্তানের সামনে কামানের কাছে পাওয়া গেছে। শরীরে ছিল সাত/আটটি বেয়নেটের জখম, অনেক জায়গার হাড় ভাঙ্গা, মৃত বলে ফেলে দেওয়া হয়, কিন্তু জনৈক রিক্সাওয়ালা জ্ঞানহীন ক্ষতবিক্ষত দেহটি ভারতীয় সেনাদের কাছে পৌঁছে দেয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্যোগে মেডিক্যাল কলেজে তার চিকিৎসা করা হয়। খবর এল জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর ডিরেক্টর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর হাসান জামানের ক্ষতবিক্ষত দেহ মৃত বলে ফেলে দেওয়া হয়। পথচারীরা তার দেহে প্রাণের স্পন্দন পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে যায় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। ঢাকা জেলা হাসপাতালে একত্রে থাকাকালীন জানতে পেরেছিলাম ডক্টর সাহেবের শরীরে ছিল আটান্নটি ধারালো অস্ত্রের জখম। খবরের কাগজে প্রকাশিত হল প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও পার্লামেন্টারিয়ান মৌলভী ফরিদ আহমদ সাহেবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে আবশ্য জেলে পাওয়া যায়নি। তার সহবন্দীর কাছ থেকে পরে জানা গেছে ইকবাল হল অর্থ্যাৎ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে নিয়ে গিয়ে নির্মম অত্যাচার করে বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যা করা হয়। মুজিব বাহিনীর বিচারাদালত, কয়েদখানা, আর্মারী ও হত্যাযজ্ঞের কেন্দ্র এই হলেই অবস্থিত ছিল।

আমি হাইজ্যাক হয়ে গেলাম

এমনিতর নতুন নতুন খবরের মুখে নিজেকে আড়াল না করে উপায় ছিলনা। গত কদিনের বেদনাদায়ক কার্য্যকলাপের খবরে নিজের নিরাপত্তা এবং কুষ্টিয়ার সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তার কথা ভেবে শংকাগ্রস্থ হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। আশংকাটা মিথ্যা প্রমাণিত হলেই হয়ত সুখী হতাম এবং উদ্বেগজনক খবরগুলো চাক্ষুস প্রমাণের অভাবে অবিশ্বাস করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারতাম। জানুয়ারীর ৩ তারিখে সন্ধ্যার পর সশস্ত্র যুবকের একটি দল সংখ্যায় ছয়/সাত জন হবে অতর্কিতে আমার আশ্রয়দানকারী আত্মীয়ের ড্রইংরুমে হাজির হলো। আত্মীয়টির নাম মি. শাহ সম্পর্কে আমার পুত্রের মামা। ঘটনার অতর্কিতে মি.শাহ আমার উপস্থিতি অস্বীকার করতে পারলেননা।

www.pathagar.com

আমি হাইজ্যাক হয়ে গেলাম।(এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে কারাগারে বসে আমার লিখা বই 'মুজিবের কারাগারে পৌনে সাতশ দিন' পড়ুন)। সশস্ত্র রক্ষী পরিবেষ্টিত অবস্থায় গাড়ীতে নারায়নগঞ্জের রাস্তায় প্রায় ৩ মাইল গিয়ে একটি নদীর ধার দিয়ে প্রায় অর্দ্ধমাইল হাটবার পর একটি নির্জন বাড়ীর ড্রইংরুমে আমাকে বন্দী অবস্থায় রাখা হলো। একদম নিশুতি, কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই, কেবল এই বীরগুলোর সাফল্যের উত্তেজনাপূর্ণ ক্রুর হাসির শব্দ যা পাশের কামরা থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছিল। আমি আরও শুনতে পাচ্ছিলাম আমার হৃদয়ের চঞ্চল আওয়াজ যা মিনতি হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী মেহেরবান খোদার দরগায় ফরিয়াদ জানাচ্ছিল নব্য জালেমদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য।

রাত ১০টার পর ওদের বিচার বসল আমাকে নিয়ে। চারিদিক থেকে অভিযোগের তীর ছুড়া হচ্ছিল। বর্ম ছিল না, ঢালও ছিল না যে লড়াকু বীরের মত এক হাত দিয়ে আক্রমন ঠেকিয়ে অন্য হাত দিয়ে আঘাত হানব। ছিল শুধু আমার জীবন ও মৃত্যুর মালিক সর্বশক্তিমান প্রভুর তরফ থেকে তাৎক্ষণিক দান মনের প্রচন্ড শক্তি ও প্রশান্তি। ওদের প্রতিটি অভিযোগের উত্তর ওদের হিংস্রতাকে কমিয়ে দিয়েছে। কঠিন অভিযোগ ছিল কুষ্টিয়ার স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত খবর 'আমার বাসায় কুয়ার মধ্য থেকে বহু মাথার খুলী পাওয়া গেছে'। উত্তর দিলাম আমার বাসায় কোন কুয়া নেই, তোমরা ফোন করে সংবাদ নাও - মাথার খুলি বের হবার প্রয়োজন নাই - যদি আমার বাসায় কোন কুয়ার অস্তিত্ব থাকে তাহলে তোমরা আমাকে হত্যা কর। জানিনা আমার বক্তব্যের মধ্যে কি প্রভাব ছিল। ওরা কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে সবাই মিলে বাহিরে গিয়ে শলা-পরামর্শ শুরু করে দিল। চাপা স্বরে কি কথা বলছিল শুনতে পাইনি। তবে শেষে কে যেন বলল 'যদি রাজী না হয় তবে শেষ করে দাও'।

দলের মধ্যে কুষ্টিয়া জেলার একটা দুর্দান্ত ছেলে ছিল। সে জানত যুদ্ধকালীন অবস্থায় পাক আর্মি কুষ্টিয়া শহর পুনঃদখল করে যখন আগুন জ্বালিয়ে দেয় অন্যান্যদের মত আমার বাড়ীও সম্পূর্ণরূপে ভস্মিভূত হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা আমার কাছে মুক্তিপণ দাবী করে বসল। দলনেতা বলল 'আপনাকে হত্যা করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করতে পারিনি - তাই মুক্তিপণ দিলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।" আমার অসহায়তার অবস্থা বুঝতে পেরে আমাকে হাটিয়ে নিয়ে আধ মাইল দূরে এক বাড়ীতে গিয়ে মি. শাহের সঙ্গে দলনেতা টেলিফোনে দরকষাকষি করে দশ হাজার টাকা মুক্তিপণ সাব্যস্ত করল এবং জানিয়ে দিল আগামী কাল বেলা ২টার মধ্যে দশ হাজার টাকা না দিলে আমার লাশ তারা মতিঝিলের রাস্তায় রেখে আসবে। পরদিন বেলা ২টা পর্যন্ত মি. শাহ টাকা জোগাড় করতে পারলেন না। দলের অধিনায়ক তাকে শুনিয়ে দিয়ে এসেছে রাত ৮টায় আমার লাশ মতিঝিলে রেখে আসা হবে। মি. শাহ দুদিন সময় চেয়েছেন, আমার স্ত্রী সৈয়াদার কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় আসবার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছেন কিন্তু দলপতি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। সৈয়াদা তার সঞ্চিত সামান্য অর্থ নিয়ে একাকী ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল।

www.pathagar.com

মৃত্যুর দুয়ার হতে ফিরে এলাম

আশ্চর্য হলাম দলের মধ্যে আমার অপরিচিত কুষ্টিয়া জেলার দুর্দান্ত ছেলেটি আমার জন্য জোর ওকালতি করতে লাগল এবং মি. শাহের প্রস্তাবে দলকে দিয়ে মানিয়ে নিল। আমার প্রভু মানুষের অন্তর রাজ্যের বাদশা। মনে পড়ছে মওলানা আবুল আলা মওদূদীর মৃত্যুর মুখে এসে একটি সাহসী উচচারণের কথা। সামরিক সরকার তড়িঘড়ি বিচার করে তার ফাঁসির আদেশ দিলে মওলানা বলেছিলেন 'মওতকা ফয়সালা জমিন মে নেহি হোতা হ্যায়, আসমান মে হোতা হ্যায়'। আজ যখন এই কথাগুলো লিখছি সেই কঠিন সময় থেকে ২৯ বছর পার হয়ে গেছে - আমার প্রভু সে সময় আমার মৃত্যুর ফয়সালা করেননি তাইতে দস্যুদের গুলি ভর্ত্তি রাইফেলের ট্রিগারের উপর ওদের আঙ্গুলের চাপ পড়েনি। ৪ঠা জানুয়ারি রাত ৯টার দিকে গাড়ীতে করে ওরা আমাকে পৌঁছে দিল মতিঝিলে। টাকার দুঃশ্চিন্তা যদিও ছিল তবুও আজাদীর স্বাদ নতুন প্রাণের সঞ্চার করলো। মি. শাহ ঐ অপ্রত্যাশিত ঘটনায় হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। দস্যুদের ফেরেশতার খেতাব দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর সারাদিন ধরে তার সংগ্রহ করা তিন হাজার টাকা মুক্তিপণের প্রথম কিস্তি হিসাবে ওদের হাতে তুলে দিলেন। অবশিষ্ট টাকা দুই/তিন দিনের মধ্যে পরিশোধ করবেন বলে ওয়াদা করলেন। ওরা হয়ত চাপ দিত তখনই পুরো দশ হাজার টাকা পরিশোধ করার জন্য কিন্তু রেডিও মারফত শেখ মুজিবের আশুমুক্তির সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় রাস্তায় তখন আনন্দমুখর জনতার উল্লাস ফেটে পড়েছে। আর দস্যু দলও টাকাটা হাতে নিয়ে হাতের আগ্নেয়াস্ত্রের ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে জনতার ভিড়ে মিশে গেল। আমাদের জন্য রেখে গেল কিছুটা দুঃশ্চিন্তা, কিছুটা ভীতি, আবার আসবে ওরা টাকা নিতে নইলে পুনরায় নিয়ে যাবে বধ্য ভূমিতে।

সৈয়দার সঙ্গে সাক্ষাত: কুষ্টিয়ার খবর বিনিময়

পুরো ২৪ ঘন্টা জল্লাদের শিবিরে বাস করবার চিত্রগুলো বারবার মনে ভেসে আসছিল। লাঞ্ছিত মানবতার হাজারো কাহিনী কলিজাকে ক্ষতবিক্ষত করছিল। দৈহিক নির্য্যাতনের শিকার যেসব ভায়েরা হয়েছেন তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলাম জানালার পাশে একাকী বসে। সময়টা ছিল ১৯৭২ সনের ৫ই জানুয়ারী বিকেল। মনটা ছিল ব্যাথায় ভরপুর আর মনের চঞ্চল দৃষ্টি দিয়ে কুষ্টিয়া-ঢাকার রাজপথে এক পথযাত্রীর খোঁজ করছিলাম, যে হয়ত আশা নিরাশার মাঝে দূরের পথ পাড়ি দিচ্ছে। গন্তব্যস্থল যতই নিকটবর্তী হচ্ছে ততই হয়ত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর নারী জীবনের গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়ের সমাপ্তির দুঃসহ দুশ্চিন্তায় ভেঙ্গে পড়ছে। সময় গড়িয়ে চলেছে আমার যাত্রীর পথ চলা শেষ হয়েছে। কে যেন সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠছে, শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, এ ঐ পদধ্বনি যা গত ২২ বছর ধরে শুনে আসছি। পদধ্বনি ঘরের দরজার কাছে এসে থেমে গেল-

www.pathagar.com

পদধ্বনি থামল বটে, কিন্তু ফুফিয়ে কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ঐ কান্নার সুরও আমার চেনা - ২২ বছরের দাম্পত্য জীবনের হাসি-কান্নায় ঘেরা সংসারে স্মৃতির ভান্ডারে এসব জমা হয়ে আছে। উঠে গেলাম দরজার কাছে, আমাদের মধ্যে ব্যবধান শুধু একটি কাঠের দরজা, ব্যবধান অপসৃত হল, আমরা উভয়ে উভয়ের দিকে নীরবে দাঁড়িয়ে - উভয়ের চোখে ছিল অশ্রু - এ দর্শনের আনন্দ ১৯৫০ সনের ৩রা মার্চের রাত্রের শুভ দৃষ্টির আনন্দকেও ম্লান করে দিল।

৩রা ডিসম্বর ১৯৭১ আমি ঢাকায় আসি এবং সৈয়াদার সঙ্গে পুনঃ সাক্ষাতের মাঝে ৩২ দিন কেটে গেছে। কিন্তু কি বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে এই কদিনে। উভয়েই নিজ নিজ খবর বিনিময় করলাম। ৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান বাহিনী কুষ্টিয়া শহরে বোমা বর্ষণ করে বহু জায়গা বিধ্বস্ত করে। উভয় পক্ষের সৈন্যদের সম্মুখ লড়াইয়ে ৬ তারিখে ভারতীয় সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করে চলে যায়। কুষ্টিয়া শহরের দক্ষিণে লড়াই হয়। শহরের দক্ষিণাঞ্চলের লোকজন ঐদিন শহরের উত্তরাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করায় আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েসহ নিজেদের হাতে বহনযোগ্য সামান্য কিছু মালামাল নিয়ে আমার ছোট ভগ্নিপতি এ্যডভোকেট মঈনউদ্দিনের বাসায় আশ্রয়গ্রহণ করে। ঐ রাত্রেই পাকবাহিনী কুষ্টিয়া ছেড়ে চলে যায় এবং পরের দিন খালি ময়দান দেখে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিফৌজ শহরে ঢুকে পড়ে। শুরু হয় গোটা শহরে তান্ডবলীলা, সংজ্ঞাহীন দালালদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার। উর্দুভাষীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বললেই চলে, তাদের বাড়ীঘর ও ব্যবসার মালামাল সবই লুণ্ঠিত। বহু সহকর্মী ও বন্ধুদের উপর চরম দৈহিক নির্য্যাতন চালানো হয়েছে। আফিল জুট মিলের অন্যতম ডাইরেক্টর খেলাফত ভাইকে হত্যা করে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। কুমারখালী'র আজিজুল হক ভাইকে নদীর চরে নিয়ে গিয়ে মুখের মধ্যে বালি ভর্ত্তি করে হত্যা করা হয়। ভেড়ামারার প্রসিদ্ধ আলেম আলহাজ্ব মওলানা আহমদ হোসেন সাহেবেকে ৩ খন্ড করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। কুষ্টিয়া শহরের প্রসিদ্ধ চামড়া ব্যবসায়ী শওকত ভাইকে স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ গড়াই নদীর মধ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়। দৌলতপুর থানার গাছিরদিয়াড় গ্রামের মুজিবর রহমান ভাইসহ তার পরিবারের এগারজনকে হত্যা করা হয়। অনেক ভাইএর শরীরে কেটে কেটে লবন দেওয়া হয়েছে। কাউকে শীতের রাত্রিতে পানির মধ্যে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। এরূপ হাজারো টুকরো খবর জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গেছে।

মঈনুদ্দিন আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের তার বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছে। সেখানেও হামলা। সঙ্গাবিহীন কোন দালাল আছে কিনা, অস্ত্র আছে কিনা, খোজ করার অজুহাতে বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘর তছনছ করা হয়। কিছু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আমার বড় ছেলে সউদকে পাকড়াও করে এবং আমার বদলে তার উপরই নির্যাতন চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সউদ কলেজের ছাত্র এবং তার ক্লাসের সেরা ছাত্র।

www.pathagar.com

সউদকে উপর তলা থেকে ওরা উঠনে নামিয়ে আনে এবং সবাই রাইফেল ও নিজ নিজ আগ্নেয়াস্ত্র তার দিকে তুলে ধরে। করুন দৃশ্য! আমার স্ত্রী ছেলেকে বুকে চেপে ধরেছে, ছেলের বুকে গুলি করতে হলে সেটা প্রথমে তার বুক ভেদ করতে হবে। আমার ছোট্ট আদুরে ছেলে ৬ বছরের ওমর হুংকার দিচ্ছে,"খবরদার আমার ভাইজানকে মারতে পারবে না।" এই অবস্থা চললে না জানি কি হত কিন্তু রহমানুর রাহীমের রায় ছিল আমাদের পক্ষে। দুইজন ভারতীয় সাধারণ সৈনিক পথচলাকালীন হইচই শুনে মঈনুদ্দিনের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে এই দৃশ্য দেখে হামলাকারীদের ওখান থেকে বহিষ্কার করে দেয়। এদুটি ভারতীয় সৈনিক কি অপূর্ব মানবতার পরিচয় দিল!

বাড়ী তল্লাশীর নামে উদ্যাম গতীতে চলেছে সোনাদানা, টাকাপয়সা ও মূল্যবান আসবাবপত্রের অবাধ লুটপাট। সরকারের হিসাব গ্রহণযোগ্য হলেও অর্থাৎ এক কোটি মানুষ ভারতে আশ্রয় নিলেও সাড়ে ছয় কোটি মানুষ দেশের মাটি কামড়ে ছিল এবং তারা পাক সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের স্বীকার হয়েছে। স্বাধীনতার পর বেশ অনেকদিনই মুক্তিবাহিনীর ধারণায় এই সাড়ে ছয় কোটিই ছিল দালাল এবং তাদের উপর যে কোন অত্যাচার করা জায়েজে মনে করা হত। এমন কোন সরকারী যন্ত্র ছিলনা বা এমন কোন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছিলনা, যা ঐসব অত্যাচারমূলক কার্যকলাপকে দমন করে স্বাধীনতাকে সত্যিকারভাবে জনসাধারণের বোধগম্য ও আস্বাদন করাতে পারত।

আমাকে হাইজ্যাককারী দল অবশিষ্ট মুক্তিপণের কথা ভোলেনি। প্রতি মুহূর্তে তাদের আগমনের আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার স্ত্রী টাকা সংগ্রহ করতে পারেনি, কুষ্টিয়ায় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ মারা গেছেন, কেউ জেলে, আর কেউ দেশে ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। মি. শাহ ব্যাংক থেকে টাকা সংগ্রহ করতে পারছেন না। কাবুলীওয়ালারা সত্যই কয়েকদিন পর হানা দিল মতিঝিলের জেড. শাহ হাউজে, লাঠি নিয়ে নয়, আরও ভয়াবহ অস্ত্র নিয়ে। কুষ্টিয়ার পরিস্থিতি এবং আমাদের বিপর্য্যয়ের কাহিনী তাদের মনে রেখাপাত করলনা। অবশিষ্ট সাত হাজার টাকা চাই অথচ হাতে আছে স্ত্রীর মোট সম্বল মাত্র দেড় হাজার টাকা। হাইজ্যাককারীদের অনেকের চাইতে বেশি বয়সের ভার্সিটি ও কলেজে পাঠরত ছেলেমেয়েদের মা হবার সৌভাগ্য আমার স্ত্রীর হয়েছে, কিন্তু তার চোখের পানি ব্রাহ্মণ্য নিষ্ঠুরতায় ট্রেনিং প্রাপ্ত মনে কোন দাগ কাটাতে সক্ষম হলনা। তবে চোখের পানিতে এতটুকু কাজ হল যে আরও দুইদিন সময় মঞ্জুর হল ও ওরা আমাকে নিয়ে গেলনা। এ কাহিনীর এখানেই ইতি টানি শুধু এটুকু বলে যে শেষ পর্য্যন্ত মোট সাড়ে ছয় হাজার টাকা দিতে হয়েছে এবং এ ব্যাপারে মিঃ শাহ এর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব যারা সরকারী কর্মচারী এবং আমার পরিচিত ঘটনার কথা শুনে তাদের গোটা মাসের বেতন মিঃ শাহ এর হাতে তুলে দিয়েছেন। তাদের নাম প্রকাশের অনুমতি নেই তবে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি তাদের মহানুভবতা।

www.pathagar.com

শেখ মুজিব ফিরে এলেন

উত্তেজনার মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হল বটে কিন্তু বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের জন্য শান্ত অবস্থার প্রয়োজন। ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে যে অশান্ত অবস্থা সৃষ্ট হয়েছে, সেটাকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে রোধ করার চেষ্টা না করে 'বিপ্লবের স্বাভাবিক ফল' হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে। গোটা দেশের শাসনযন্ত্র কোন কেন্দ্রিয় সেক্রেটারিয়েট থেকে পরিচালিত হচ্ছেনা বরং হাজারো নবাব, জায়গীরদার ও সামন্ত প্রভূদের উৎপত্তি হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদপুষ্ট বিভিন্ন বাহিনীর একাধিক ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছে। ইকবাল হল অর্থাৎ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল হচ্ছে ছাত্রলীগ বা মুজিব বাহিনীর কেন্দ্রীয় অফিস, আর্মারী ও হত্যাযজ্ঞের কেন্দ্র। মোজাফফর পন্থী ন্যাপের সমর্থক ছাত্র ইউনিয়নের এসব কাজগুলো হচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইন্স বিল্ডিংএ। ঐ দুটি জায়গায় সরকারের প্রবেশ নিষেধ। ঐ দু'টির মধ্যে মর্য্যাদায় ইকবাল হলের গুরুত্ব বেশী। কেননা ছাত্রলীগ ছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জঙ্গী সংগঠন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের দিশারী। যদিও এ সময় দেশে কোন সরকার বিরোধী পত্রিকার অস্তিত্ব ছিলনা কিন্তু এতদসত্ত্বেও বিদেশী পত্রিকা, রেডিও ইত্যাদি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক বিশৃংখলা ও শূন্যতার খবর প্রচার করছিল। জনাব তাজউদ্দিন সাহেবের প্রধানমন্ত্রীত্বে গড়া সরকার প্রমাদ গুণলেন। তিনি অশান্তির মূল কারণের দিকে নজর দিলেন কিন্তু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলেন। প্রধানমন্ত্রী অস্ত্র জমা দেবার আদেশ না দিয়ে অস্ত্র জমা দেবার প্রশ্নে মতামত চাইলেন। তড়িৎ জবাব দেওয়া হল অস্ত্র জমা দেওয়া হবেনা - শেখ সাহেবের কথায় অস্ত্র হাতে নেওয়া হয়েছে এবং শেখ সাহেবের কথাতেই অস্ত্র জমা হতে পারে। এর পর স্বাভাবিক ভাবেই সবার দৃষ্টি শেখ সাহেবের আগমনের দিকে নিয়োজিত হল। তাঁর নৌকার মাল্লারা হাঁফ ছাড়লেন - মাঝি এসে হাল ধরবে। দেশবাসী খুশীর বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে এই আশায় যে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের শেষ প্রতিবন্ধকতাটুকুও দূর হতে চলেছে। আর রাজনীতির ক্ষেত্রের পরাজিত পক্ষরা ভাবছেন, তারা যে অনিয়ম, অবিচার ও পাশবিক শক্তির নির্য্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েছে শেখ সাহেবের বলিষ্ঠ হাতে সেসব দূর হয়ে যাবে।

সেই দিনটি সত্যিই এলো। ১০ই জানুয়ারী ১৯৭২ সন। গোটা দেশের মানুষ যেন ঢাকায় জড়ো হয়েছে। রাস্তায় মানুষের ঢল। ঢাকা বিমানবন্দর থেকে যে অগণিত মানুষের ঢেউ এর উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হল তা সবই বিকেল পাঁচটার দিকে রেসকোর্সে মানুষের মহাসমুদ্রে আছড়িয়ে পড়ল। মানুষের হাজারো স্রোত সব দিক থেকে এসে মিশে গেল এই মহাসমুদ্রে। সবাই চেয়ে ছিল শেখ সাহেবের মুখের দিকে - ৯ মাস ১৫ দিন যে মুখ বন্ধ ছিল তা হয়ত আজ এক নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত জাতিকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য - শেখ সাহেব তাঁর বক্তৃতায় জনতাকে

www.pathagar.com

এগিয়ে যাওয়ার আদেশ না দিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির বাণী শুনালেন। তিনি ঘোষণা করলেন, দালালদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে কোন মতেই মাফ করা হবে না।

শেখ সাহেব ১০ই জানুয়ারীতে যে ব্যক্তিত্ব নিয়ে জনসমক্ষে হাজির হয়েছিলেন তা ছিল অসাধারণ, অপ্রতিহত ও তুলনাহীন। তাঁর যে কোন আদেশ দেশের মানুষ বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করত এবং বিধ্বস্ত দেশ গড়বার জন্য যে শান্ত পরিবেশ পূর্বশর্ত, তার বুনিয়াদ তিনি স্থাপন করতে পারতেন। কিন্তু সংজ্ঞাবিহীন দালালদের বিরুদ্ধে শেখ সাহেবের হুঙ্কার মুক্তিবাহিনী, আওয়ামী লীগ কর্মী ও নব্য দুস্কৃতিকারীদের মধ্যে জিঘাংসা জাগিয়ে তুলল। মানুষের প্রাণ নেওয়া একটা ছেলেখেলায় পরিণত হল। যে কোন মানুষকে দালাল হিসাবে চিত্রিত করে, ভয় দেখিয়ে সর্বস্ব লুটপাট করে নেওয়া অত্যন্ত সহজ হল। রাজনৈতিক খেদমতগাররা, সর্বহারার ত্রাণ কর্ত্তারা আর জনতার ভাগ্যোন্নয়নের ঠিকাদাররা রাতারাতি সম্পদের স্তুপ গড়তে লাগলেন এবং অচিরেই এসব স্তুপ শনৈঃ শনৈঃ গতিতে পাহাড়ে পরিণত হতে লাগল। অফিস-আদালতেও দালাল বলে উচ্চপদস্থ অফিসারকে আউট করে নিচের উৎসাহী কর্মচারী ঐ কুরসীতে বসবার সুযোগ পেলেন। কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্কুলকলেজ, রেশনের দোকান, মায় ফুটপাতের ক্ষুদে হকার সর্বত্রই এ আগুন ছড়িয়ে গেল। হিন্দুস্তানে পালিয়ে যাওয়া এক কোটি বাদে অবশিষ্ট সাড়ে ছয় কোটিই এই ভেবে তটস্থ, সন্ত্রস্থ - না জানি কখন দালালির অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্থ বা নিশ্চিহ্ন হতে হয়।

শাসন যন্ত্রে পরিবর্তন

নুতন রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রে পরিবর্তন হল। শেখ সাহেব প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করলেন এবং বিশ্বকে তাক লাগিয়ে হাইকোর্টের এককালীন বিচারপতি জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে বরণ করলেন। শুরু হল ফরমান জারী। ১৯৭২ সনের ৫নং ফরমান জারী করে ২৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী ঢাকা হাইকোর্টকে মৃত ঘোষণা করে সেস্থলে নুতন হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হল। ঐ ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে বৈশিষ্ট্য হলো এই যে নুতন রাষ্ট্রের নুতন হাইকোর্টকে সর্বপ্রকার রীট জারী করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। অপূর্ব - স্বাধীন দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে বিরাট পদক্ষেপ!

১৯৭২ সনের ৯ নং ফরমান দ্বারা স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার কণ্ঠরোধ করা হলো। এই অর্ডিন্যান্স বলে প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে মফস্বল কোর্টের ক্ষুদে পিওন পর্যন্ত এবং দেশের চীফ সেক্রেটারী থেকে শুরু করে ক্ষুদে তহশীল অফিসের ঝাড়ুদার পর্যন্ত সবাইকে এই হুকুমের আওতায় আনা হল। হুকুমে বলা হলো অতীতের চাকুরীর মেয়াদ যাই হোক না কেন কোন কারণ না দর্শিয়ে সরকার যে কোন কর্মচারীকে রুজী রোজগারের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিয়ে কর্মচ্যুত করতে পারবেন।

www.pathagar.com

১৯৭২ সনের ৮ নং ফরমানে দালাল আইন জারী করা হল ২৪শে জানুয়ারী তারিখে কিন্তু ঐ আইনের কার্য্যকারিতা ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ থেকে গণ্য হবে বলে ঘোষণা করা হল। আইনে দালাল সন্দেহে পুলিশ যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবে এবং প্রথম দফায় তদন্ত সাপেক্ষে তাকে ৬ মাস লাল ঘরে আটকিয়ে রাখা যাবে। ৬ মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ না হলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাকে আটকিয়ে রাখা যাবে। তদন্ত হবার পর চার্জশীট দাখিল হলে ট্রাইবুনাল বিচার করে নির্দ্ধারিত শাস্তি দেবে। ট্রাইবুনাল কাউকে খালাস দিলে সরকার হাইকোর্টে আপীল করবেন এবং আপীলের শুনানী না হওয়া পর্য্যন্ত ট্রাইবুনাল কতৃক খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জেলে পচতে হবে। তদন্ত, বিচার বা আপীলের কোন ক্ষেত্রেই আসামীকে জামিন দেবার ক্ষমতা আদালতের থাকবে না। ট্রাইবুনাল যদি কাউকে শাস্তি দেন (অর্থাৎ জেল জরিমানা) তাতেও কিন্তু আসামীর পাপ খন্ডন শেষ হল না। এরপর সরকার পুনরায় দ্বিতীয়বার জবেহ করবেন - অর্থ্যাৎ শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা সরকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

হাইজ্যাককারীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম বটে কিন্তু মতিঝিলের মত প্রকাশ্য স্থানে বাস করা সম্ভব হলনা। যে কোন সময় এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা ছিল। আশ্রয় পেলাম আজিমপুর কলোনীতে জনৈক অধ্যাপকের বাসায়। ভদ্রলোক তার ভাইরা মি. আহমদ ও শ্যালিকা বেগম সহ বাস করেন। অধ্যাপকের স্ত্রী যিনি এককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রী ছিলেন তিনি সন্তানসন্ততি সহ লন্ডনে থাকেন। মি. শাহ এর দিক থেকে এরাও আমার আত্মীয়। বেগম আমাকে দুলাভাই বলে ডাকে। মি. আহমদ ও বেগম প্রতি মুহূর্ত্তে দরদী মনের পরিচয় দিয়েছে। নিজেদের বিছানা আমাকে ছেড়ে দিয়ে শীতের দিনে মেঝেতে ওরা রাত কাটিয়েছে। জানুয়ারীর শেষের দিকে আমার স্ত্রী কুষ্টিয়া চলে গেলেন। আত্মীয়স্বজনের মাধ্যমে কতৃপক্ষের কাছে হাজির হয়ে কারাগারে একটু স্থান করে নেবার প্রচেষ্টাকে জোরদার করা হল। জনৈক পুলিশ অফিসার আত্মীয়ের মারফত জানুয়ারীর ৫ তারিখ থেকে চেষ্টা করছিলাম থানা বা কোর্টে হাজির হওয়ার জন্য কিন্তু হাজির হবার পরিবেশ না থাকায় তিনি আমাকে নিরুৎসাহ করছিলেন। থানায় পুলিশের কতৃত্ব তখনও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। থানা মুক্তিবাহিনীর দখলে। থানা বা কোর্ট থেকে জেলেও আসামী নিয়ে যাওয়া নিরাপদ ছিলনা। আর জেল গেট ছিল লুটপাটের কেন্দ্রস্থল। অধ্যাপক, প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আখতার ফারুকের কাছে পরে জেল জীবনে জানতে পেরেছিলাম তিনি যখন জেলে আসেন তখন জেল গেটে সব খোয়াতে খোয়াতে শেষ পর্যন্ত জেলে ঢুকবার পর শুধু পরনের লুঙ্গীটি অবশিষ্ট ছিল। এইরূপ ঘটেছে বহু ক্ষেত্রে এবং বাহিরে এসব ঘটনার প্রচারই আমার মত অনেকেরই কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। পুলিশ অফিসার আত্মীয়টি ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম

www.pathagar.com

সপ্তাহে হাজির হওয়ার পক্ষে মত দিলেন এবং তারই নির্দেশের অপেক্ষায় আজিমপুরের বাসাতেই দুঃসহ দিন কাটাচ্ছিলাম।

পুনরায় হাইজ্যাকের সম্মুখীন হলাম

অপ্রত্যাশিত ভাবে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আবার ঝড়ের সম্মুখীন হলাম। নিজের কামরায় বসে কি যেন একটা বই পড়ছিলাম। বেগম রান্নাঘরে ব্যস্ত, বাসায় কেউ নেই, ছেলেমেয়েরা স্কুলে, তখন ৯টা হবে। হঠাৎ বেগম কামরায় ঢুকল। ভীত, সন্ত্রস্থ, সারা মুখে উদ্বেগের ছাপ, হাতে একখানা চিঠি। 'দুলাভাই সর্বনাশ' বেগমের এটুকু কথাতেই বুঝতে পারলাম আশু বিপদের লক্ষণটা। চিঠিখানা পড়লাম - অধ্যাপক সাহেবকে উদ্দেশ্য করে লিখা, আমার সম্পর্কে। স্থানীয় বাহিনীর কমান্ডার লিখেছে অধ্যাপক সাহেবকে 'কুখ্যাত দালালকে' স্থান দেবার জন্য নগদ পাঁচ হাজার টাকা নজরানা দিতে হবে তাদেরকে। অনুগ্রহ করে টাকা নেবার জন্য তারা সন্ধ্যার পর আসবে এবং দালালকেও তারা পাকড়াও করে নিয়ে যাবে। চিঠিতে হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে কোন প্রকারেই দালালকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার চেষ্টা না করা হয়। বাসার চারিদিক সন্ধ্যা পর্যন্ত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও চিঠিতে জানান হয়েছে।

সত্যিই সর্বনাশ, বেগম ঠিকই বলেছে। রাজ্যের দুর্ভাবনা, দুশ্চিন্তা এসে বাসা বাঁধল মনে। আমার জন্য অধ্যাপক সাহেব বিপদে পড়বেন এই চিন্তাই চরমভাবে পীড়া দিচ্ছিল। তাছাড়া টাকা কোথায় পাওয়া যাবে। প্রথম হামলাতেই সব কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। মি. শাহও ঢাকায় নেই। তিনি নিজের কাজে কলকাতা গেছেন। নিজে কোর্টে বা থানায় গিয়ে হাজির হব সে উপায় নেই। কেননা চারিদিকে ঘেরাও হয়ে আছি। যখন সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, নিজের বুদ্ধি, বিবেক, চিন্তা সেখানে খেই হারিয়ে ফেলে, চেষ্টা ও সাধনার দ্বার রুদ্ধ, সেখানে নিজের সমস্ত বুদ্ধি বিবেচনা, শক্তির গর্বকে ধুলায় লুণ্ঠিত করে মহাশক্তিমান রাব্বুল আলামীনের দরবারে আত্মসমর্পণ করলে রাস্তার সন্ধান পাওয়া যাবে, এই ঈমান নিয়ে নিজের শিরকে নত করলাম। হৃদয়ের আবেগ দিয়ে, চোখের অশ্রু দিয়ে, বাকরুদ্ধ ভাষা দিয়ে ফরিয়াদ জানালাম মহান সত্তার দুয়ারে। আমার আবেগের দরিয়ার ঢেউ অনেক সময় উপলব্ধি করেছি কিন্তু এমন উত্তাল তরঙ্গের সন্ধান এর পূর্বে পাইনি। বেগমের খবর পেয়ে তার স্বামী ও অধ্যাপক সাহেব বাসায় এলেন - উভয়ে ঘটনার কথা শুনলেন, তারা উদ্বেগহীন অবস্থায় চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা করছিলেন কার সাহায্য নিলে এই বিপদ কাটান যায়। কথাবার্তা চলছে এমন সময় অলৌকিকভাবে এল পথের সন্ধ্যান। আত্মীয় পুলিশ অফিসার লোক পাঠিয়েছেন আমার মতামত নিতে আমি ঐদিন পুলিশের কাছে সারেন্ডার করতে রাজী আছি কিনা। তিনি সব ব্যবস্থা করবেন বলে খবর পাঠিয়েছেন। অপ্রত্যাশিত, বিস্ময়কর এই খবর পাঠানো - আরও বিস্ময়কর ঘটনার অপূর্ব যোগাযোগ। আমার অবস্থার কথা জানিয়ে উত্তর পাঠালাম ত্বরিত ব্যবস্থা করতে এবং সন্ধ্যার পূর্বেই আমাকে পুলিশের হাওলায় সোপর্দ করতে। বিকেল পাঁচটার দিকে সশস্ত্র পুলিশের গাড়ী বাসার দিকে

www.pathagar.com

আসতে দেখে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। দুঃখের পরিবর্তে হাসি এল মনের কোঠাতেই। মানুষ বিশেষ করে অপরাধীরা পুলিশ থেকে দূরে থাকতে চায়, অথচ পুলিশ দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে। জেলের শাস্তি কেউ স্বেচ্ছায় ভোগ করতে চায় না, আর আমি শান্তির সন্ধান করছি জেলে। এই মুহূর্তে দেশের নবলব্ধ স্বাধীনতার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করছিলাম। এই স্বাধীনতা বিস্ময়কর বলে মনে হল, জেল ভেঙ্গে বাহিরে আসার পরিবর্তে ঘর ছেড়ে, লোকালয় ছেড়ে জেলে যাওয়ার জন্য মানুষের ভীড়। ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে এ ভীড় বেড়েই চলেছে। পূর্বে পুলিশ অপরাধীদের খোঁজ করত আর বর্তমানে এই স্বাধীন দেশে অপরাধীরাই পুলিশকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পুলিশকে খোঁজ করার প্রচেষ্টা আজ আমার সফল হলো। প্রস্তুতই ছিলাম, অধ্যাপক সাহেব, মি. আহমেদ-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে, বেগমের কদমবুসির জওয়াবে মাথায় হাত বুলিয়ে, অফুরন্ত দোয়া দিয়ে, আর ওদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পুলিশের গাড়ীতে উঠলাম। সন্ধ্যার সময় লালবাগ থানায় পৌঁছে পুলিশ অফিসারদের ভদ্র ব্যবহার ও আন্তরিকতার মধ্যে নামাজ ও নিজ খরচে খাওয়া সেরে নিলাম।

চতুর্থবার কারাজীবনে প্রবেশ

রাত ৮টার দিকে ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগারের বিশাল গেট-এর সামনে গিয়ে হাজির হলাম। গেট উন্মুক্ত হল, সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত হয়ে এগিয়ে চললাম এক অনির্দিষ্ট জীবন পথে, হাসি কান্না কোলাহলে ভরা সমাজ থেকে বাহিরে আর স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রিয়জনদের প্রেম-প্রীতি, ভক্তি-ভালবাসা, মান অভিমান থেকে দূরে বহুদূরে। জেল অফিসের খাতায় আমার নাম লিখা পড়ল। জেল অফিসে কর্মকর্তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কামরার অপর পার্শ্ব থেকে দু'জন গোঁফওয়ালা যুবক একরকম মারমুখো হয়ে ছুটে এল আমার কাছে। 'কি খুব দালালী করেছেন না'? 'কত লোক হত্যা করেছেন'? 'কত নারীর ইজ্জত মেরেছেন'? এসব প্রশ্ন শুনে হতবাক হয়ে গেলাম। এরা কারা? এরা কি জেলের স্টাফ - হাজতী কয়েদীর সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করার বিধান আছে কি? প্রশ্নকারীদের রক্তচক্ষুর দিকে নজর করলাম কিন্তু হঠাৎ খাকী পোষাক পরা একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার কামরায় ঢুকে আমাকে সালাম দিলেন। পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো বলে উভয় উভয়কে জড়িয়ে ধরলাম। যদিও তিনি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার আর আমি একজন দালাল তবুও উভয়ে ক্ষণিকের জন্য সে পরিচয় ভুলে গেলাম। গোঁফওয়ালা যুবকদ্বয় আমার বন্ধুটিকে আগেই সালাম করেছিল কিন্তু আমাদের অন্তরঙ্গ ভাব দেখে সেখান থেকে কেটে পড়ল। বন্ধুটির কাছে ওদের পরিচয় পেলাম। ওরা মুক্তিবাহিনীর সদস্য তবে ডাকাতি করার অপরাধে ধৃত হয়ে জেলে প্রেরিত হয়েছে। ওহঃ হাঁফ ছাড়ালাম - এতক্ষণ ওদের বিই না বড় অফিসার বলে ভেবেছিলাম। আমিও বন্দী হয়ে আসছি কিন্তু কি শান্ত শিষ্ট, গো বেচারা। এরাও বন্দী হয়ে আসছে কিন্তু কি দাপট, জেল অফিসে সবার কাছে ইজ্জত পাচ্ছে, সবাই চেয়ার এগিয়ে দিচ্ছে, সত্যি ওদের পদমর্যাদা ইর্ষার বস্তু। তবে ও ভাগ্য লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। কেননা ডাকাতি না হয়

www.pathagar.com

করলাম, কিন্তু মুক্তিবাহিনীর সার্টিফিকেট সংগ্রহ করব কি করে? পরে অবশ্য জেনেছি চাঁদীর জুতার বদৌলতে ওটাও কোন দুষ্প্রাপ্য বস্তু নয়।

পুলিশ অফিসার বন্ধুর সাহায্য পেলাম

পুলিশ অফিসার বন্ধুটি আমার ভিতরে যাওয়ার ব্যবস্থা তরান্বিত করার জন্য জেল কতৃপক্ষকে অনুরোধ করে চলে গেলেন। রাত ৯টার দিকে জেল গেটের ভিতরের অংশ আমার জন্য খোলা হল। সিপাহীসহ প্রবেশ করলাম, হাতে আমার দুখানা কম্বল ও সামান্য কিছু কাপড় চোপড়। বিশাল ঢাকা জেলের অভ্যন্তরে পাকা রাস্তার উপর দিয়ে হেটে চলেছি। বাহিরের কোলাহলের কোন চিহ্ন এখানে নেই, পাড়াগাঁয়ের নিশুতি বিরাজমান। হাঁটতে হাঁটতে জেল গেটের অপর প্রান্তে অর্থ্যাৎ পশ্চিমউত্তর অঞ্চলে এসে থামলাম। পুরানা ২০ নম্বর সেলের এক নং ওয়ার্ডের এক নম্বর কামরায় আমার স্থান হলো। জমাদার এসে কামরায় তিনটা সাধারণ কম্বল, এক কলসি পানি, অ্যালুমিনিয়ামের একটি থালা ও একটি বাটি রেখে দরজায় এক বিরাট তালা ঝুলিয়ে চলে গেল। বিছানাপত্র কিছু নিয়ে এসেছিলাম সাথে কিন্তু গেটে সবই রেখে দিয়েছে মায় মশারীও। পুলিশ অফিসার বন্ধুটির সাহায্যে দু'খানা ভাল কম্বল আনতে পেরেছিলাম এই যা নইলে জেলের খসখসে মোটা কম্বল যা দেখতে পাটের বস্তার মত তাই দিয়ে শীতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হত। আমি ছিলাম তৃতীয় শ্রেণীর হাজতি। আমার সম্বল হচেছ কম্বল, একটা মাটির কলসী, একটা থালা ও একটা বাটি। কম্বলই হচেছ তোষক, চাদর, লেপ বা বালিশ। থালা হচেছ ভাতরুটি খাওয়ার জন্য আর বাটির কাজ ছিল বহুমুখী। তরকারী বা ডাল রাখা, পানি খাওয়া, গোসল করা, ওজু করা, পায়খানা ও প্রস্রাবের পর পানি খরচ ইত্যাদি। এও এক নতুন অভিজ্ঞতা। সমস্ত প্রশংসা লীলাময় আল্লাহ তায়ালার। অত্যন্ত শীত আর সেলের মধ্যে বেজায় ঠান্ডা। সেলের লোহার রডের দরজায় কোন আবরন নেই। ঠান্ডা বাতাস অবস্থা আরও কাহিল করে তুলছিল। দুখানা কম্বল ডবল করে বিছানা বানালাম, একটা জড়িয়ে বালিশ তৈরী করলাম আর নিজের ভাল কম্বল গায়ে দেওয়ার জন্য রাখলাম। শরীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত, আশেপাশে কথা বলার কেউ নেই। মাঝেমাঝে সেলের বাইরে প্রহরীর ভারী বুটের আওয়াজ শোনা যাচেছ। নামাজ শেষে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। ভোরের আজানে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কুয়াশা ঢাকা নিস্তব্ধ জেলখানা, হিমেল হাওয়া আর কম্বলের প্রেমময় উষ্ণ পরিবেশ, অন্যদিকে মধুর আহ্বান, সুমধুর সুর, উদাত্ত ঘোষণা 'আছছালাতো খায়রুম মিনান নাউম', নিদ্রা হতে নামাজ ভাল। এত আজান একসঙ্গে এর পূর্বে শোনবার সৌভাগ্য হয়নি। ঢাকা হাজার মসজিদের শহর হিসাবে বিখ্যাত শুনেছিলাম। কিন্তু এ প্রবাদের সত্যতা যাচাই করবার প্রয়োজন পড়েনি। জেলখানার চারপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ছোটবড় বহু মসজিদ থেকে যখন একসঙ্গে আযান শুরু হয় তাতে ইথারে শুধু কম্পনই সৃষ্টি করেনা বরং উত্তাল তরঙ্গ বইতে শুরু করে। বিশ্ব প্রভূর দরবারে হাজিরা দেওয়ার জন্য কম্বলের উষ্ণ পরিবেশ থেকে বের হয়ে এলাম। যথারীতি প্রকৃতির আহ্বান সেরে ওজু পর্ব শেষ করে চতুর্থ বারের জেল

www.pathagar.com

জীবনের প্রথম ফজরের নামাজ আদায় করলাম। প্রভূ হে - তুমি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমার একমাত্র তোমারই প্রাপ্য, তুমি মহিয়ান, গরিয়ান তুমি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী, তুমি দয়ালু করুণাময়, পাপ মার্জনাকারী, গোপনকারী, কৃপাময়, তুমি সূক্ষদর্শী ও সর্বজ্ঞ। প্রভূ হে, তুমি শ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী, কঠিন বিপদের চরম মুহূর্তে তোমার করুণার প্রস্রবন অযুত ধারায় রহমতের বারী সিঞ্চন করেছে। প্রভূ হে, চারিদিকে নিরাশা, হতাশা আর সূচীভেদ্য অন্ধকার আমাদের ঘিরে ধরেছে। এতিম অসহায় ও মজলুমের ব্যথিত হৃদয়ে সান্তনা দেবার কোন সুযোগই আমাদের নেই। প্রভূ হে, তুমি পথ প্রদর্শক - পথের সন্ধান দাও, তুমি জ্যোতির্ময় - তোমার পবিত্র জ্যোতি দিয়ে আমাদের যাত্রা পথের অন্ধকার দূরীভূত কর। আমিন।

কারাগারের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া বিষাক্ত

দিন যায়, রাত আসে। রাতের অন্ধকার দূর করে সূর্য্য একটি নতুন দিনের আগমন ঘোষণা করে। কষ্টের হলেও কারাজীবনের সময়গুলো ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দিয়ে চলেছে আর স্মৃতির খাতায় রচনা করে চলেছে ক্রমান্বয়ে দিন সপ্তাহ ও মাসের ইতিহাস। ইতিমধ্যে জেলের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত কর্মচারীদের আচার ব্যবহার হাজতিদের সম্পর্কে জেল কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গী, জেলের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার উপর বাইরের রাজনৈতিক আবহাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার ছিটেফোটা সুযোগগুলোকে জোড়াতালি দেয়ার মত করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। জেলের প্রত্যক্ষ শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারী হচ্ছেন ডি. আই. জি., জেলার, ডেপুটি জেলার, চীফ হেড ওয়ার্ডার, জমাদার এবং ওয়ার্ডার। ওয়ার্ডারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় চব্বিশ ঘন্টাই সুতরাং এরা আমাদের সার্বক্ষণিক প্রতিবেশী, জমাদারদের আগমন হয় গুণতির জন্য প্রতি ওয়ার্ডারের ডিউটির আমলে দুই একবার, হেড ওয়ার্ডার দিনে দুই একবার আসেন লাঠি ঘোরানোর জন্য, চীফ হেড ওয়ার্ডার আসেন মাঝে মাঝে ত্রাস সৃষ্টির জন্য, নির্জীব ডেপুটি জেলার আসেন বিশেষ প্রয়োজনে, প্রধান কর্মসচীব হিসাবে জেলার আসেন সফরে সপ্তাহে দু'একবার ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে আর সান শওকতের অধিকারী ডি. আই. জি. আসেন সপ্তাহের নির্দিষ্ট একটি দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন প্যারেডের মত মিছিল সহকারে, বরং আরও বেশি জৌলুস এখানে লক্ষ্যণীয় মিছিলের পুরোভাগে 'নকীব' আলা হুজুরের আগমন হায়দারী হাঁকে ঘোষণা করতে করতে এগিয়ে চলে।

দন্ডবিধি আইনে যাকে সলিটারী কনফাইনমেন্ট বলে সেরকম অবস্থার মধ্যে আটকে আছি। আমার সেলের সাইজ হচ্ছে ৯′×৬′। একদিকে লোহার মোটা রডের দরজা এবং বিপরীত দিকে ছিল একটা ছোট্ট ভেনটিলেটর। শুধুমাত্র ঐ দুই পথে আলো ও হাওয়ার পারমিশন আছে সেলে ঢুকবার। প্রায় রাজনীতিবিদদেরই আমার মত সেলে আটক রাখা হচ্ছিল। ফেব্রুয়ারীর (১৯৭২) মাসের শেষ দিকে দালাল ধরার

www.pathagar.com

জন্য সরকার হন্যে হয়ে হুলিয়ার পর হুলিয়া জারী করা শুরু করল। রাজনীতিবিদ ও বিভিন্ন দলের কর্মীরা যারা আত্মগোপন করেছিলেন তারা থানা বা কোর্টে হাজির হয়ে জেলে চলে এলেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া সবাইকে তৃতীয় শ্রেণীর হাজতী হিসাবে গণ্য করা হলো। এর ফলে যে সেলে আমি একা থাকতাম সেখানে আমরা চারজন হলাম, ৯×৬ ফুট সাইজের একটি কামরায় ৪ জনের বিছানা, কম্বল, থালাবাসন, পানি, পায়খানা ও প্রস্রাবের টিনের তৈরী কমোট ইত্যাদি। সেলে সারা রাত আলো জ্বলে সুতরাং রাত্রে কারও পায়খানা প্রস্রাবের বেগ হলে রিতীমত নোটিশ করতে হত চোখ বন্ধ রাখবার জন্য, অথবা বিপরীত দিকে ঘুরে শোবার জন্য আর নাকে কাপড় গোঁজবার জন্য। রাতে ঐ কাজটা না করার জন্যই আমরা প্রত্যেকে সবাইকে উপদেশ দিতাম কিন্তু জেলের কংকর ও ময়লা মিশ্রিত অর্ধ সিদ্ধভাত, পাকা চালকুমড়ো বা মিষ্টিকুমড়ো আর বিশেষ দুর্গন্ধের মশলা দিয়ে রান্না করা তরল ডাল আমাদের প্রত্যেক দিনের প্রতিজ্ঞা বানচাল করে দিত। এত ক্ষুদ্র কামরায় ৪ জনের বাস করা অসুবিধা ছিল প্রচুর কিন্তু কারাজীবনের দুঃসহ পথের যাত্রীদের পারস্পরিক হামদরদী ও ভ্রাতৃত্বে এমন এক সহনশীল মনোভাব গড়ে উঠেছিল যে এসব ছোটখাট অসুবিধাগুলোকে আমরা কোন উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসাবে মনে করিনি।

জেলের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া বিষাক্ত। মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মচারী বাদে সবাই আমাদের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণকারী হিসাবে জাহির করবার প্রবণতা সবারই। পে-রোলে সহি করে যে হয়ত পুরো ১৯৭১ সালের মাহিনা নিয়েছে আর ঢাকায় বসে সরকারী রেশন খেয়েছে সেও মুজিবনগরের বাসিন্দা অথবা কমপক্ষে বনজঙ্গলে বাস করা গেরিলা যোদ্ধা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে নানান অলীক গল্প কাহিনীর মাধ্যমে। বক্তা হচেছ ওয়ার্ডাররা আর শ্রোতা ও সমঝদার আমরা। ডেল কার্নেগীর বইয়ে পড়েছিলাম কথা বলার চাইতে এরূপ ক্ষেত্রে শ্রোতা হওয়া অনেক লাভ। সহজেই বক্তার মন জয় করা যায়। আমরা এই মহাজন বাক্য অনুসরণ করে হাতে হাতে ফল পেয়েছি। জেলের বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে অন্তত যারা আমাদের সার্বক্ষণিক প্রতিবেশী তাদের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠল। অবশ্য সরকারী দলের সমর্থক হিসাবে এবং দালালদের সমালোচক হিসাবে তারা ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং আওয়ামী লীগের ওয়াদা মোতাবেক শেখ সাহেবের নেতৃত্বে এই দেশের আশু চরম উন্নতি সম্পর্কে ছিল স্বপ্নবিভোর। জমাদার থেকে ডি. আই. জি. যার যখন আগমন হয় সুযোগমত দালালদের চিমটি কাটতে কেউ কম করেনা। এটুকু সহ্য না করে উপায় ছিলনা কেননা জেলের বাহিরে যে দুনিয়া সেখানে বিচার বা শাসন বিভাগে এমন কোন কর্তাব্যক্তি ছিলনা, যার কাছে অভিযোগ করে আমরা প্রতিকার পেতাম।

জেল হাসাপাতালের ডাক্তার সাহেবদের আচরণ ছিল আরও কঠোর।

www.pathagar.com

'বাহিরে দালালী করে এসে আবার ঔষধ চান', 'বাহিরে প্রাণটা কেউ রেখে দিতে পারল না', 'কতগুলো মার্ডার করে এসেছেন' - ইত্যাদি মিজাইলগুলো ডাক্তারদের জবান থেকে বের হত। মানবতার সেবা ডাক্তারদের ধর্ম কিন্তু দেশের রাজনৈতিক বিষবাষ্প ডাক্তারদের এই মহান উক্তিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তাদের হাবভাব দেখে মনে হতো সরকারী দল হুকুম দিলে দালালদের প্রাণ বের করার দায়িত্বটুকু এরা নির্বিঘ্নে সমাধা করতে পারেন। ডাক্তার সাহেবদের দাঁত খিচুনী ছিল একতরফা। যাদের উদ্দেশ্যে মিজাইল ছুড়তেন তাদের নিকট থেকে কোন উত্তর না পাওয়ার কারণে উদ্যমে ভাঁটা পড়ত। রোগীর মুখের মলিন হাঁসি আর তার সহনশীল মনের বেদনা ভারাক্রান্ত নিঃশব্দ আচরণ ডাক্তারদের রাজনীতির উগ্রপথ পরিহার করে সেবার পবিত্র পথে পা বাড়ানোর কর্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দিত। ডাক্তাররা তুলে নিতেন তার যন্ত্র। রোগীকে টেনে নিতেন তাদের সান্নিধ্যে কয়েক সেকেন্ডের জন্য। মুদীর দোকানীর মত বিভিন্ন ঠোঙ্গায় সাজানো থাকত হাসপাতালের বিপনী - ট্যাবলেট, বিভিন্ন রং এর, বিভিন্ন সাইজের। ব্যারামের কথা এখানে বেশী বলবার প্রয়োজন হতনা। মুখ খুললেই অভিজ্ঞ ডাক্তার বুঝতে পারতেন কোন ঠোঙ্গা দিয়ে রুগীকে ঠুকতে হবে। রোগের বর্ণনা যখন ভূমিকার স্তরে তখন প্রেসক্রিপশন শেষ করে ডাক্তার অন্য রুগীর কার্ড হাতে নিয়েছেন। দৈনিক কয়েকশত রোগী, অগ্রতুল ঔষধ - বেচারা ডাক্তার এ ছাড়া করবেনই বা কি?

মুক্তিবাহিনীর সদস্যরাও জেলে আসছে

ইতিমধ্যে কিছু কিছু মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের ডাকাতি, ছিনতাই, লুট, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধমূলক কার্য্যে জড়িত থাকার দায়ে এবং নিজেদের অন্তর্দ্বন্দের কারণে জেলে আসা শুরু হয়েছে। কোথাও কোন ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ক্ষমতাসীন ব্যক্তি পর্যন্ত সবারই রেওয়াজ আছে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া। ১৯৭২ এর জানুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত এদেশে পুলিশের কোন ক্ষমতা ছিলনা বললে অত্যুক্তি হবেনা - কেননা শাসন, শোষণ, ভক্ষণ নিশ্চিহ্নকরণ ইত্যাদি কাজগুলো মন্ত্রীদের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে মুক্তিবাহিনীর নেতা উপনেতারই চালিয়েছে। ফেব্রুয়ারী থেকে পুলিশের কিছুটা কতৃত্ব দেখা গেল। সরকারী দল ও তার লেজুড়রা রাজাকার, আলবদর, দালাল সম্পর্কে গালিগালাজ ও একতরফা অভিযোগের তুফান চালিয়ে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু প্রায় প্রতিটি জায়গায়ই শাসন ও শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা দেখতে পেলেন যে মুক্তি বাহিনী, মুজিব বাহিনী, আওয়ামী লীগ ও সরকার সমর্থক ন্যাপের কর্মী ও নেতৃবৃন্দ উদ্দাম গতিতে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ চালিয়ে যাচেছ। পুলিশকে অত্যন্ত সন্তর্পণে পা ফেলতে হল। অপরাধীদের পাকড়াও না করলে বিপদ বিশৃংখলার সমস্ত দোষ চাপবে পুলিশের উপর। আবার পাকড়াও করাও বিপদ, চাকুরী নিয়ে টানাটানি হবে, বলা যায়না জীবনটাও হারাতে হতে পারে। কিন্তু কিছু না করে উপায় ছিলনা। পুলিশ রুই-কাতলাদের বাদ দিয়ে পুঁটি, চেলা ইত্যাদি পাকড়াও করে জেলে পাঠানো আরম্ভ করল দেশের প্রচলিত আইন

www.pathagar.com

অনুসারে। দেশী বিদেশী খবরের কাগজেও কিছু কিছু ঘটনা প্রকাশ হতে লাগলো। ক্ষমতাসীন দল প্রমাদ গুণলেন। শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার মত সরকারী দল এটাকে ঢাকবার চেষ্টা করলেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এ সমস্ত অপরাধীদের আসল পরিচয় গোপন করে আলবদর, রাজাকার, আলশামস হিসাবে ঘোষণা করলেন এবং ফলাও করে তা প্রচার করা হলো। কিন্তু ফল হলো উলটো। এই নামের ছদ্মাবরণে ক্ষমতাসীন ও তাদের লেজুড়রা অপরাধের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেন কেননা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন - যত দোষ নন্দ ঘোষের।

সরকারের প্রচার যদিও এটাই ছিল কিন্তু অপরাধীরা যারা জেলে আসছিলো তারা কিন্তু এ প্রচারণায় রাজী ছিলনা। নিজেদের পরিচয় তারা সগর্বে প্রকাশ করত। কেননা জেলে তাদের দাপট ও ইজ্জত ছিল প্রচুর। জেলের অভ্যন্তরে আমাদের গতি ছিল সীমাবদ্ধ, কিন্তু ওদের গতি ছিল অবাধ। তাইতে মুক্তি নামধারী কারাবন্দীরা জেলের আইন শৃংখলা ভঙ্গ করে এবং প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার সীমা লংঘন করে প্রশাসনিক সমস্যার সৃষ্টি করল। কথায় কথায় ওয়ার্ডার বা জেলে কার্যরত হাজতী বা কয়েদীদের সঙ্গে গোলযোগ সৃষ্টি, পানির অপব্যবহার, গণনার সময় ফাইলে অন্যদের সঙ্গে বসতে অস্বীকার, উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের সময় অসৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। জেল কর্তৃপক্ষ বুঝলেন মুক্তি নামধারী হাজতীদের বেআইনী সুযোগ সুবিধা দান করা মোটেই ঠিক হয়নি। কিন্তু কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার মত সৎসাহস তাদের ছিলনা দু'টি কারণে। একটি হলো মুক্তি নামধারীদের দোসর যারা বাহিরে আছে তাদের গোলাগুলির লক্ষ্যবস্তু না হওয়ার জন্য আর দ্বিতীয় কারণ হলো না জানি কোন ক্ষমতাসীন ও তার লেজুড় দলের নেতা বা হবু নেতার সঙ্গে এরা হয়ত সংশ্লিষ্ট। এরূপ একটি ঘটনাও ঘটে গেল। ঢাকা শহরের নাম করা 'দস্যুবাহিনীর' কুখ্যাত কয়েকজন কমান্ডার বিভিন্ন জঘন্যতম হত্যা ও ডাকাতির অভিযোগে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়ে জেলে আসে। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত দূত এসে তাদেরকে জেল থেকে মুক্ত করে নিয়ে যায়। বেচারা পুলিশ - এমন কেসও কিনা রেকর্ড করতে হয়। পুলিশ এসব রেকর্ড বুড়িগঙ্গার পানিতে বিসর্জন দিয়েছে না খাতার পাতা বদলিয়ে দুর্দিনে নিজের প্রাণ আর দুর্মূল্যের বাজারে নিজের চাকুরী বজায় রেখেছে - এখবর সরকারই বলতে পারেন।

কারাগারে সংঘর্ষ,পাগলা ঘন্টা, গুলি

তবুও সংঘর্ষ বেঁধেই গেল। ২৯শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৯টার দিকে পাগলা ঘন্টা বেজে উঠল। আমাদের ওয়ার্ডার দৌড়ে আসল। আমাদেরকে সেলের মধ্যে পুরে দিয়ে বলল পাগলা ঘন্টা বাজছে। জেলের সশস্ত্রী রক্ষীদল পাগলের মত রাইফেলের নল বাগিয়ে হন্যে হয়ে বৈশাখী ঝড়ের মত ছুটে আসছে, সামনে যাকে পাবে তাকে গুলি করবে। এগুলি নাকি ন্যায় অন্যায়ের বিচার করেনা, পরিস্থিতি বুঝে এরা গুলি করেনা, গুলি করে তারপর পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করে। গোলমালের সূত্রপাত

www.pathagar.com

হয়েছিল ভোর বেলাতেই। প্রত্যেক খাতাতেই ভোরে সমস্ত হাজতী কয়েদীদের ফাইল করে বসতে হয় গণনার জন্য। সেদিনের প্রায় ৩০০০ হাজতী কয়েদীর মধ্যে মুক্তিবাহিনীর প্রায় ২৫ জনের মত বীর নিয়ম ভঙ্গ করে বিছানায় শুয়ে থাকে। সেদিনের জামাদারটা কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী ছিল আর তাছাড়া তার অথরিটি অমান্য হতে চলেছে দেখে মুক্তিবাহিনীর বীরদের ফাইলে বসবার জন্য হুকুম দেয়। এতে গালাগালি ও হৈ চৈ এর সূত্রপাত। জামাদার অপমান হয়ে চলে যায় এবং কিছুক্ষণ পর ৪/৫ জনকে কেস টেবিলে নিয়ে যায়। জেলের অভ্যন্তরে যাবতীয় কেসের যেখানে নিষ্পত্তি হয় তাকে বলা হয় কেস টেবিল। সেখানে মনে হয় তাদের প্রতি অত্যন্ত দুর্বল ব্যবহার করে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরের ঘটনা বেলা ৭টার দিকে ৪নং খাতার হাজতী ও কয়েদীরা সবাই বের হয়ে এসে আঙ্গিনায় ফাইল করে বসে আছে। আঙ্গিনার এক পাশে টিউবওয়েলের ধারে প্রায় ৪০/৫০ জন মুক্তিবাহিনীর বীররা জটলা করে বসেছিল, তারা সাধারণ হাজতী কয়েদী বা দালালদের সঙ্গে বসবেনা। উপস্থিত জমাদার ও কয়েকজন ওয়ার্ডারদের সঙ্গে মুক্তিদের এই নিয়ে প্রথমে বচসা শুরু হয় এবং পরে মুষ্টিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা মাত্র কিছুদিন পূর্বে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছে সুতরাং তারা জমাদার ওয়ার্ডারদের কয়েকজনকে ধরাশায়ী করে ফেলল। দালালদের মধ্যে অনেকেই তখন ছুটে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমন থেকে জমাদার ও সিপাইদের উদ্ধার করে। ইতিমধ্যে পাগলা ঘন্টা বেজে উঠেছে। সবাই যার যার ঘরে আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু প্রায় ৩ হাজার লোকের সিড়ি বয়ে দালানে স্থান নেওয়া সময় সাপেক্ষ ছিল। যারা রাইফেল নিয়ে ছুটে এল তারা ঘটনাটি জানবার চেষ্টা করল না - মানুষের ভীড় দেখে গুলি ছুড়ল। প্রাণ দিল সাধারণ হাজতী প্রায় ১৫ জন আর জখমী হল অসংখ্য। কেউ কেউ হাসপাতালে মারা গেল। গুলী ছোড়বার পর জেল কতৃপক্ষ আসল ব্যাপার জানতে পেরে মুক্তিবাহিনী হাজতীদের পাকড়াও করে খুব লাঠি পেটা করেছে বলে জানা গেল।

জেলে একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে গেল। সরকারকে ঘটনা জানাতে হবে এবং এটা সম্পূর্ণ একতরফা। জেল কতৃপক্ষ তাড়াতাড়ি করে ৪ নং খাতার প্রাঙ্গণে ইটের টুকরা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রাখল পুরানা কয়েদীদের সাহায্যে, কিছু লাঠিও এদিক ওদিক রাখা হল। প্রচার করা হল দালালরা ইট লাঠি দিয়ে প্রহরারত ওয়ার্ডার, জমাদারদের আক্রমন করায় জেল কতৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে কয়েক রাউন্ড গুলী ছুড়তে হয়। নিরপেক্ষ স্বাক্ষীরা হল জেলের সুবিধা ভোগী পুরানা কয়েদীরা। পরদিন বঙ্গবন্ধুর সরকারের প্রেসনোট ছাপা হলো সরকার নিয়ন্ত্রিত খবরের কাগজে ফলাও করে। আলবদর, রাজাকাররা জেল ভেঙ্গে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করায় জেল কতৃপক্ষকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছুড়তে হয়। এতে ৫ জনের মৃত্যু ও ৭ জন আহত হয়। দালালদের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। মুজিব সরকারের প্রচারণায় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জখমী অনেকেই পরবর্তী আমলে আমার সঙ্গে জেলে বসবাস করেছে।

www.pathagar.com

তারাও 'জাতির পিতার' সন্তান বাৎসল্য দেখে কটূক্তি করেছে। এতবড় একটা জুলুম হয়ে গেল অথচ দেশবাসী সম্পূর্ণ অজ্ঞ রয়ে গেল। কোন বিচার বিভাগীয় নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠানের ও প্রয়োজন সরকার বোধ করলেন না।

অধ্যায়-১০

২৫বছর মেয়াদী ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি

পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে। পাকিস্তানের অংশ হিসাবে স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের ও স্থানীয় সম্পদ পূর্ণাঙ্গভাবে নিজেদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে ব্যবহারের যে সুযোগ থেকে বাংলাদেশের বঞ্চিত থাকার অভিযোগ ছিল তা অপসারিত হয়েছে। পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে সোনার বাংলাকে শ্বশান করার অভিযোগ যারা সব চাইতে বেশী করেছেন তারাই এখন নূতন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত - বিরোধী দল বা মত বলতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। শেখ সাহেব মার্চ মাসের প্রথম দিকে মস্কো সফর করেছেন এবং সেখানে রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। দেশে এই সফরকে এবং অর্থনৈতিক চুক্তিকে একটি বিরাট সাফল্য হিসাবে সংবাদপত্রগুলো, ক্ষমতাসীন দল এবং মস্কোপন্থী মোজাফফর ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিষ্ট পার্টি প্রচার চালাচ্ছে। এই প্রচারণার সুর মিলিয়ে না যেতেই এল আর একটি উত্তেজনাময় খবর। ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ঢাকা আসছেন। যেদিন বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের নাটক মঞ্চস্থ হল সেদিন ভারতীয় পার্লামেন্টে ইন্দিরা গান্ধীর প্রশংসায় জনৈক সদস্য বিপুল করতালীর মধ্যে ঘোষণা করেছিলেন 'অনেকেই ইতিহাস তৈরী করেন আমাদের প্রধান মন্ত্রী ভূগোল তৈরী করেছেন' - অর্থ্যাৎ পাকিস্তান ভেঙ্গে দুটি দেশ বানিয়েছেন। তাইতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সফর ছিল অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে আসছেন অথচ বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় সৈন্যদের বিপুল সমাবেশ রয়েছে, এ নিয়ে দুষ্ট লোকে অনেক কুকথা বলতে পারে বা বাংলাদেশ প্রকৃত স্বাধীন হয়নি এমন কথাও তৈরী করতে পারে,মনে হয় এমন ধারণার বশবর্তী হয়েই ৭ই ফেব্রুয়ারীতে কলকাতায় ইন্দিরা-মুজিব বৈঠকে ভারতীয় সৈন্যদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তারিখ ২৫শে ধার্য হলেও ১২ই মার্চ তারিখে ঢাকা স্টেডিয়ামে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিদায়ী কুচকাওয়াজ

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হলো এবং ১৫ই মার্চ তারিখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সমাপ্ত হয়েছে বলে ঘোষণা করা হল। ১৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্সে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিপুল সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হল এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যত ভাষা অভিধানে ছিল সব কিছুই সেখানে উজাড় করা হলো। বাংলাদেশ-ভারত ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করে স্বদেশে ফিরে গেলেন শ্রীমতি গান্ধী ১৯শে মার্চ তারিখে। পঞ্চান্ন কোটি মানুষের দেশ ভারত এবং সাড়ে ৭ কোটি মানুষের দেশ ভারতীয় এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব ও শান্তি স্থাপনের নামে সিকি শতাব্দী কালের জন্য যে অসম চুক্তি হল, তা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরী, ব্যবসা, যানবাহন, যোগাযোগ, বন্যা নিয়ন্ত্রন, নদী অববাহিকার উন্নয়ন, জলবিদ্যুৎ ও জলসেচ, শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধূলা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলো বন্ধুত্বের মায়াডোরে বাঁধা পড়ল। শুধু তাই নয় যে কোন প্রকার হুমকির ক্ষেত্রেও (আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক) বন্ধুর শরনাপন্ন হওয়া চাড়া অন্য সব পথ রূদ্ধ হল। চুক্তিটি যদিও দ্বিপাক্ষিক কিন্তু পক্ষগণের অসম মর্য্যাদা ও গুরুত্ব, ভৌগলিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শক্তিশালী পক্ষেরই অধিকতর ফায়দা লুটবার পথ উন্মুক্ত করে দিল।

এদিকে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের মধ্যে কিছু মান অভিমান লক্ষ্য করে শেখ সাহেব অঙ্কুরেই তা বিনাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। গণপরিষদ সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির নির্দেশনামা জারী হল ২৩শে মার্চ তারিখে। শতকরা ৯৯.৫ ভাগ সদস্যদের অধিকারী হয়েও আওয়ামী লীগ তার সদস্যদের বাকরূদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় হুকুম নামা জারী করলো। এতে এই বিধান করা হল পার্টি কোন সদস্যকে বহিস্কার করলে তার গণপরিষদ সদস্যপদও লোপ পাবে। গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এ এক অপূর্ব পদক্ষেপ। যারা অত্যন্ত বাধ্য ও অনুগত বলে পরিচিতি ছিল তারা 'সততার' সার্টিফিকেট পেল এবং দুর্নীতির কোন অভিযোগেই তারা কলঙ্কিত হবে না বলে নিশ্চয়তা লাভ করল। আর যারা অবাধ্যতার কারণে কলুষিত ছিল তারা 'দুর্নীতিবাজ' বলে আখ্যায়িত হয়ে সদস্যপদ হারাল বটে কিন্তু দুর্নীতির কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হলনা।

গণপরিষদ সদস্যপদ বাতিলের বিধান করে স্বাধীন বাংলাদেশ গণপরিষদের প্রথম অধিবেষন আহ্বান করা হল। গণপরিষদ দেশের জন্য সংবিধান প্রনয়ণ করবে। গণপরিষদে আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা যে কোন আইন পাশ করা তাদের জন্য সহজ ব্যাপার। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পি. ডি. পি ও জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচিত মাত্র ৩ জন এম. পি. এ. কারাগারে আবদ্ধ। নিজ দলের মধ্যেও যেন কোন প্রকার সমালোচনা না করতে পেরে শেখ সাহেব সে ব্যবস্থা করলেন। ৬ই এপ্রিল তারিখে ১৬ জন এম. সি. এ. এবং ৯ই এপ্রিল তারিখে আরও ৭ জন এম. সি. এ. দুর্নীতির অভিযোগে দল থেকে বহিস্কৃত হবার কারণে গণপরিষদ সদস্যপদ হারালেন।

www.pathagar.com

মোজাফফর ন্যাপের একজন এম. সি. এ বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন হিজ ম্যাজেষ্টিস মোষ্ট লয়াল অপজিসন সদস্য হিসাবে। বহু প্রচারণার পর ১০ই এপ্রিল তারিখে যে গণপরিষদ অধিবেষন আরম্ভ হল তা মাত্র ২দিনের বৈঠকের পর খসড়া সংবিধান প্রনয়ণের জন্য আইন মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে সমাপ্তি ঘোষণা করল। গণপরিষদের অধিবেষনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ দলীয় কাউন্সিল অধিবেষন আরম্ভ হলো ৮ ও ৯ তারিখে। দলীয় কাউন্সিল অধিবেষনে প্রদত্ত ভাষণে শেখ সাহেব এমন কতকগুলো কথার অবতারণা করলেন যা তাঁর বিরুদ্ধে অতিত সরকারের আনীত অভিযোগগুলো তিনি নিজেই দেশবাসী ও বিশ্বের কাছে অলক্ষে প্রমাণ করে দিলেন। ১৯৪৭ সনে এদেশের স্বাধীনতা সত্যিকারের স্বাধীনতা ছিলনা তিনি কোনদিনই এ স্বাধীনতার উপর বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি বহু পূর্ব থেকেই এ দেশের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করে আসছিলেন। তিনি আরও প্রকাশ করেন যে, সর্বপ্রকার সাহায্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য ভারতের সঙ্গে পূর্বেই তার চুক্তি হয়েছিল। সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারত হতে তিনি অস্ত্রশস্ত্র পাবেন এবং প্রয়োজনবোধে বাস্তুহারাদের ভারত সাহায্য ও আশ্রয় দেবে এ সব চুক্তি তিনি পূর্বেই সম্পন্ন করেছিলেন। শেখ সাহেবের এই স্বীকারোক্তির পর অতীতের ৬ দফার আন্দোলন, ৬ দফার মাধ্যমে দুর্বল কেন্দ্র ও শক্তিশালী পাকিস্তান গড়বার প্রচারণা, যে কোন যৌথ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শেখ সাহেবের অনমনীয় মনোভাব ইত্যাদির অন্তরনিহিত উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিস্কার হয়ে ধরা দেয়।

ছাত্রশক্তির ভাঙ্গন

দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আর একটি চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হল। আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা দখল ও একনায়কতত্বের মূলে যে ছাত্রশক্তি তাতে ভাঙ্গন ধরেছে। এ ভাঙ্গন যদিও শতকরা হিসাবে পঞ্চাশ কিন্তু ইজ্জত হানীর দিক দিয়ে ষোল আনা না হলেও পৌনে ষোল আনা। ছাত্রলীগই ছিল আওয়ামী লীগের জঙ্গী সংগঠন এবং স্বাধীন দেশে নুতন করে স্বাধীনতা ঘোষণার অগ্রদূত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় ছাত্র সংস্থা ছিল ছাত্রলীগের দখলে। এই সংস্থার দুজন প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রিয় ছাত্রলীগের দুজন প্রতিনিধি এই ৪ জনের সমন্বয়ে যে অলিখিত সরকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর গড়ে উঠেছিল, গুরুত্বে ও মর্য্যাদায় তাজউদ্দিন বা মুজিব সরকারের চাইতেও ছিল শ্রেষ্ঠত্বর এবং শক্তির অপব্যবহারের দিক দিয়ে ছিল অধিকতর বর্বর। চারের যে সম্মিলিত শক্তি অলিখিত সরকারের রূপ নিয়ে দোর্দান্ড প্রতাপে চালিয়ে যাচ্ছিল নিজেদের মধ্যে মন কষাকষির ফলে তার উত্তাপ কিছুটা হ্রাস পেল। অচিরেই মন কষাকষি প্রতিদ্বন্দ্বি মনোভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হল। এদেশে ছাত্রশক্তিই রাজনৈতিক শক্তির পরিচায়ক। আর ছাত্রশক্তির পরীক্ষা কেন্দ্র হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন। আওয়ামী লীগের বি-টিম ছাত্রলীগই ছিল এই মসনদের অধিকারী। কিন্তু মে ১৯৭৩ এর ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চার ছাত্রনেতার মনোমালিন্য গোটা সংগঠনকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলল এবং ছাত্রলীগ দুটি

www.pathagar.com

দলে বিভক্ত হয়ে দুই দুই নেতার নেতৃত্বকে সম্বল করে আর উভয় দলই শেখ মুজিব এর জয়ধ্বনি তুলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেখ মুজিব এই কোন্দলে নিরপেক্ষক থাকার ভান করলেও তাঁর দক্ষিণ হস্ত বলে যারা কথিত তারা প্রত্যেকেই সমস্তশক্তি সমাবেশ করল সিদ্দিক-মাখন গ্রুপের পিছনে। অপর গ্রুপ রব-সিরাজ কোন মন্ত্রীর আশীষ পেলনা বটে, অপর গ্রুপের মত সরকারী গাড়ীর সমাবেশও ঘটাতে পারলনা তবে স্বাধীনতার যে নেয়ামত অজস্র হাতে লুটেছে তার সদ্ব্যবহার করার কোন সুযোগই তারা হাতছাড়া করলনা। বিপুল সম্পদ ও ঐশর্য্যের অধিকারী একই পতাকার নীচে ছাত্রলীগের দু'টি উপদল নিজেদের মধ্যে কোন্দল করে শক্তি পরীক্ষার যে লড়াইএ অবতীর্ণ হল তা শুধু এদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলনা। মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন এই কোন্দলে ফায়দা লুটবার জন্য তারাও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করল। চরম উত্তেজনা ও সরকার সমর্থক খবরের কাগজের পাতায় সিদ্দিক-মাখন গ্রুপের ঢালাও প্রচারের মাঝে নির্বাচনী যে ফলাফল বের হলো সরকারী দলের জন্য তা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। কেন্দ্রিয় ছাত্রসংসদের নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন বাজীমাত করল।

ছাত্রলীগের উভয় গ্রুপের দ্বন্দ্ব এখানে থেমে রইল না। ছাত্রলীগের নামে দু'টি উপদলের দেশভিক্তিক দুটো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ঢাকার বুকে ২১, ২২ ও ২৩ জুলাই তারিখে। সিদ্দিক-মাখন গ্রুপের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং রব-সিরাজ গ্রুপের পল্টন ময়দানে। শেখ সাহেব আর নিরপেক্ষতার ভান করে থাকতে পারলেন না, পল্টনের দাওয়াতকে প্রত্যাখান করে তিনি সোহরাওয়ার্দী উদ্রানের উদোক্তাদের ভাষণ দিয়ে কৃতার্থ করলেন। পল্টন হতে মাত্র ১ মাইল দূরত্বে থেকে শেখ সাহেব যে ভাষণ দিলেন তাতে দুই ময়দানের দুরত্ব অপসারণ করে এক কাতারে ছাত্রসমাজকে দাঁড় করানোর কোন আহ্বান ছিলনা। স্থানের এই এক মাইল দুরত্ব মনের দুরত্ব বাড়িয়ে দিল হাজার গুণ। দলের ভাঙ্গন ও মনের ভাঙ্গন এর সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাপাল্টি সম্মেলনের উত্তপ্ত ক্ষোভ ও আক্রোষ শেষ পর্য্যন্ত ছাত্র নেতা ও কর্মীদের অঙ্গ প্রতঙ্গেঁও ভাঙ্গন ধরাতে সক্ষম হলো। ২৩শে জুলাই উভয় দলের মিছিলের সংঘর্ষে রাজপথে যে নাটক মঞ্চস্থ হল তার ফলাফল পরদিন খবরের কাগজে ফলাও করে বের হলো - শক্তি পরীক্ষার দুটি পৃথক পৃথক মহড়ায় প্রায় ১০০ ছাত্র যখম যার মধ্যে ২৬ জন হাসপাতালে শয্যাশায়ী। যখমীরা কিছুদিন পর নিরাময় হল বটে তবে আওয়ামী লীগের সর্বপ্রধান হাতিয়ার ঐক্যবদ্ধ ছাত্রশক্তি হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার রোগে আক্রান্ত হয়ে চিরশয্যায় শায়িত হলো। স্বাধীনতার পর যে অলিখিত সরকার কায়েম হয়েছিল সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে তার জৌলুষ চিরতরে ম্লান হয়ে গেল। যে শক্তির প্রচন্ড বর্বরতা মানুষের রক্ত নিয়ে হোলী খেলেছে, মান, ইজ্জত, আবরু যারা ধূলায় লুটিয়েছে, আর নিজেদের পাশব প্রবৃত্তির ক্ষুধা মিটিয়েছে, এদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির সৌধকে যারা ধূলায় লুন্ঠিত করবার প্রধান হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে, তারা নিজেরাই নিজেদের পতনের সূচনা করে ইতিহাসের শিক্ষার পুনরাবৃত্তি করল।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও ঘেরাও নিষিদ্ধ

সরকার অনুসৃত বহু নীতির ব্যর্থতাই জনসমক্ষে প্রকট হয়ে উঠছে। কারাগারের মধ্যে আমাদের একঘেয়ে জীবনে এর বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া না থাকলেও বাহিরের বিশাল জনসমষ্টির জন্য সরকারের প্রতিটি ভ্রান্ত নীতি এবং প্রতিটি ব্যর্থতাই অন্তহীন সমস্যার জন্ম দিচ্ছে। সরকারী দলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্টতা ও বিরোধীদলের অনস্তিত্ব, দেশের সংবাদপত্রের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, মানুষের রুটি, রুজী ও মানবীয় অধিকার হরণকারী আইনের অস্তিত্ব এবং নিজেদেরকে বিপ্লবী সরকার হিসাবে আখ্যায়িত করে যে কোন কর্ম ও অপকর্মের এখতিয়ার গ্রহণ ইত্যাদি। আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিব সরকারকে একনায়কত্বমূলক সরকারের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছে। সমালোচনার কিতাবী স্বীকৃতি থাকলেও এরূপ সরকারের মেজাজে তা অসহনীয়। গণতন্ত্রের দাবীদার মুজিব সরকার ১৫ই এপ্রিল তারিখে বিনা নোটিশে ঘেরাও ও ধর্মঘট বেআইনী ঘোষণা এবং ২৮শে মে তারিখে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও ঘেরাও ৬মাসের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর সরকারের নাকের ডগায় ধর্মঘট ও ঘেরাও হয়েছে কিন্তু সরকারী নির্দেশের অবমাননার জন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। বরং সরকারী দল শ্রমিকের মধ্যে দালাল সৃষ্টি, প্রলোভন দিয়ে সরকার সমর্থক বানানো, কলকারখানায় কাজ না করেই পুরো মাসের বেতন নেবার সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদেরকে দিয়ে ধর্মঘটীদের দাবীদাওয়াকে বানচাল করা, শ্রমিকদের মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালানো হয় পুরো মাত্রায়। আর গুপ্ত হত্যা চালিয়ে সরকারী পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে যে জাগ্রত জনতার রুদ্ররোষে ধর্মঘটীরা পর্য্যদুস্ত এতে সমস্যা সমাধানের চাইতে শ্রমিক ঐক্যের মধ্যে বিভেদের ব্যাপকতা বৃদ্ধি হয়েছে।

হাজারো ল্যান্ডিকোটাল সৃষ্টি

বাংলাদেশ ভারত ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তির নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে অবাধ সীমান্ত বাণিজ্যের জালে মুজিব সরকার জড়িয়ে পড়ল। অত্যাধিক ভারত প্রীতির স্বাক্ষর বহন করে ১০ই মে তারিখে বাংলাদেশ-ভারত অবাধ সীমান্ত ব্যবসা চালু হল। পাক আমলে ল্যান্ডিকোটাল ছিল চোরাচালানীদের স্বর্গ। সরকারের ভারতমুখী নীতির ফলে ১৭০০ মাইলব্যাপী বাংলাদেশের সীমান্তে হাজারো ল্যান্ডিকোটাল সৃষ্টি হল। এদেশের খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় খরিদ করা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ভারতে পাচার করতে গোটা দেশের সম্পদ চোরাচালানীদের মাথায় উঠে প্রকাশ্য দিবালোকে পাচার হয়ে দ্রব্যের দুস্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করল। দ্রব্যমূল্যের ব্যাধি গোটা দেশকে ছেয়ে ফেলল এবং সরকারের মুদ্রামান হ্রাসের দিদ্ধান্ত এ ব্যাধিকে কাল ব্যাধিতে পরিণত করল। সরকারের বিভিন্ন

www.pathagar.com

ব্যর্থতা সরকারের স্বাধীন সত্তা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ এনে দিল। সরকার বিরোধী মনোভাব সঙ্গে নিয়ে এলো ভারত বিরোধী প্রচারণা। স্বাধীনতার লড়াইএ ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা যে দেশে এখনও শেষ হয়নি, সেখানে ভারত বিরোধী প্রচারণার সামান্যতম স্ফুলিঙ্গকেও প্রজ্জলিত হতে দেওয়া যেতে পারেনা। দালাল আইনে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের ঘায়েল করা হয়েছে কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকারের কাছে দালাল আইন যথেষ্ট বলে মনে হলনা। ১৬ই ডিসেম্বরের পরের যে কোন অপরাধমূলক কাজের জন্য এ আইন প্রযোজ্য নয়। অথচ ভারত বিরোধী মনোভাব এই তারিখের অনেক পরে গড়ে উঠেছে। তাছাড়া ভারতে পালিয়ে যাওয়া মানুষের মধ্যে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপক্ষের শক্তিদের মধ্য থেকে সরকার বিরোধী ও ভারত বিরোধী প্রচারণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সরকার এদের দালাল বলবে কি করে?

পি.ও.৫০.জারী হলো

মুজিব সরকারের একনায়কত্বমূলক চরিত্রে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় দমননীতি গ্রহণ মোটেই কঠিন বলে মনে হলনা। ২৭ শে মে তারিখে 'সিডিউল অফেনসেস' নাম দিয়ে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার নম্বর ৫০ জারী হল। দালাল আইনের মত বৈশিষ্ট নিয়ে এই অত্যাচার মূলক আইনের সৃস্টি হল সাড়ে ৭ কোটি মানুষকেই রাষ্ট্রশক্তির চাবুকের ভয় দেখিয়ে বাধ্যানুগত করে রাখার জন্য অনেক বিষেয়ে প্রচলিত আইনে শাস্তির বিধান থাকা সত্বেও কিছু হয়রানীমূলক বিধিবিধানের লেবাস পরিয়ে এই আইনগুলির নখরকে আরো সঠিক ধারালো করা হল। সন্দেহের উপর ভিত্তি করে যে কোন নাগরিককে গ্রেফতার করার ক্ষমতা ন্যস্ত কারা হলো পুলিশের উপর। প্রথম দফায় তদন্ত সাপেক্ষে ছয় মাস লাল ঘরে রাখবার এবং ৬ মাসের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত না হলে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আসামীকে বিনা বিচারে আটক রাখার ক্ষমতা সরকারী যন্ত্রকে দেওয়া হলো। দালাল আইনকে যারা বরণ করেছিলেন তারাও এই বিভৎস আইনের চেহারা দেখে আঁতকিয়ে উঠলেন।

৫০ নং ফরমান জারী হওয়ার মাত্র ১১দিন পর অর্থ্যাৎ ৭ই জুলাই তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যোনে আয়োজিত জনসভায় দেশের কুচক্রী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের উদ্দেশ্যে শেখ সাহেব সাবধান বাণী উচচারণ করলেন এবং ১৫ দিনের মধ্যে দ্রব্যমূল্য কমিয়ে ব্যবসায়ীদের কুকর্ম বন্ধ করতে এবং হাইজ্যাককারীদের, খুনীদের ও লুটেরাদের পথে আসতে বললেন। ২১শে জুলাই তারিখে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পোষাকে সজ্জিত বাংলাদেশ রক্ষীবাহিনীর প্রথম চালান রাস্তায় কুচকাওয়াজ করে জনসাধারণের মনে ত্রাসের সঞ্চার করল। এর উপর ২৫ তারিখ হতে সান্ধ্য আইন জারী করে ঘরে ঘরে ও ব্যবসা কেন্দ্রে তল্লাশী করবার ব্যবস্থা করে ত্রাস সৃস্টির সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দ্রব্যমূল্য ও সামাজিক বিশৃংখলা হ্রাস না পেয়ে উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকারের এই সমস্ত

www.pathagar.com

পদক্ষেপের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহের কারণগুলো সাধারণ মানুষের মনকেও স্পর্শ করল। স্বাধীনতার পর ব্যবসার পারমিট লাইসেন্সের সুযোগ সুবিধা কারা পেয়েছে? আওয়ামী লীগের নেতা, সদস্য, কর্মী ও তাদের সমর্থকরা। সরকারী সুত্রেই বলা হয়েছেল প্রতি থানায় অন্ততঃ ১০ জন মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের আমদানী রফতানী লাইসেন্স দেওয়া হবে। নিশ্চয়ই এরা এই ফায়দা লুটতে কার্পণ্য করেনি। পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের ফেলে যাওয়া কলকারখানা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং কারাগারে আবদ্ধ দালালদের মিল-কারখানা ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সবই সরকারের দখলে অথবা সরকারী দল কর্তৃক বেদখল হয়ে আছে। সরকারের দখলে যা আছে তাতে সরকারী দলের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিরা পরিচালক হয়ে ফায়দা লুটছে। এই সমস্ত মিল-কারখানার উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য অনভিজ্ঞ ও দুর্নীতি পরায়নের হাতে পড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তারপর সরকারী দালের মধ্য থেকে শতকরা নব্বইজন ডিলার নিযুক্ত হয়েছে যারা দ্বিগুণের উপর আর একগুণ চড়িয়ে ছোট ব্যবসায়ী ও ফড়িয়াদের কাছে শুধুমাত্র লাইসেন্স বা পারমিট বিক্রি করে দিচ্ছে। ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে যা কিছু আমদানী হচ্ছে তাও সরকার সমথকদের পকেট ভারী করছে। সরকারী পর্য্যায়ে আমদানী কৃত দ্রব্যাদির জন্য আওয়ামী লীগ সমর্থকরাই হোলসেলার ও ডিলার নিযুক্ত হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের বেইজ্জতির কোন প্রচেষ্টাই তারা বাঁকী রাখেননি। এসব শেখ সাহেবের সরকারের জানা ছিল। তবুও কেন শুধুমাত্র হুমকি দিয়ে অসাধ্য সাধনের প্রয়াস? ব্যবসায়ীরা মাল মওজুদ রেখে কালো বাজারী করছে এটাই যদি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একমাত্র কারণ হয় তাহলে ১৫ দিনের সময় দিয়ে দুর্নীতি পরায়ণ ব্যবসায়ীদের মালামাল সরিয়ে ফেলবার সুযোগ দেওয়া হলো কেন? বাস্তবতা অস্বীকার করে শুধুমাত্র কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে পুলিশ রক্ষীবাহিনীর উৎপাত বৃদ্ধি করে, কিছু দোকানে তালাচাবী লাগিয়ে ব্যবসায়ীদের মালামাল সীজ করে আর কিছু সংখ্যক ব্যক্তির উপর হালে জারী করা ৫০নং ফরমান প্রয়োগ করে দ্রব্যমূল্যর গতি মোটেই নিম্নগামী হলোনা বরং রকেটের গতি নিয়ে উর্দ্ধগামী হল। তিনগুণ দাম পূর্ব থেকেই বিরাজমান ছিল। ব্যবসায়ীরা কষ্ট করে মালামাল সরিয়ে ফেলবার জন্য একগুণ এবং সরকারে হয়রানীর ইনসিওরেন্স প্রিমিয়াম বাবদ আরও একগুণ দাম বাড়িয়ে দিল। অর্থ্যাৎ তিনগুণ সরকারী প্রচেষ্টায় পাঁচগুণ হল। এই উদ্বৃত্ত অর্থ কার পকেটে গেল? দালাল নাম নিয়ে যারা কারাগারে বেঁচে আছে অথবা যারা কোন রকমে আত্মগোপন করে আছে বা যারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে - তারা নিশ্চয়ই এই উদ্বৃত্তের ভাগীদার নয়।

অস্ত্র জমাদানের মহড়া

জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে অস্ত্র জমা দানের মহড়ায় মাত্র তিনভাগের একভাগ অস্ত্র জমা পড়লেও শেখ সাহেবের আদেশে পুরো অস্ত্র জমা পড়েছে বলে সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করলেন। সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী ও সশস্ত্র জনতার মুজিব নেতৃত্বের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে, বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরাই ছিল এই প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য। শেখ সাহেবও বিভিন্ন জনসভায় প্রচার করলেন কোন মুক্তিবাহিনীর কাছে

www.pathagar.com

বেআইনী অস্ত্র নেই। শুধুমাত্র রাজাকার ও আলবদরদের কাছেই এরূপ অস্ত্র রয়েছে। ফেব্রুয়ারী থেকে গোটা দেশে প্রত্যহ যে হাজারো চুরী, ডাকাতি, রাহাজানী, ব্যাংকলুট, হত্যা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হলো এবং যে চেহারার স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্র যুবকরা পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার হয়ে দালালদের দ্বারা ভরপুর জেলগুলোতে স্থানাভাবের সমস্যা বৃদ্ধি করল তাতে সরকারের সমস্ত প্রচারণার ভিত্তিমূল ধূলিস্যাত হয়ে গেল। তাছাড়া পূর্বের প্রচারণায় সরকার নিজেও স্বস্তি পাচেছনা কেননা মুজিববাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রশ্নে, ভারতমুখী ও ভারত বিরোধী মনোভাবের ফলে ছাত্র সমাজ, মুক্তিবাহিনীর তরুণরা, কৃষক ও শ্রমিক সমাজ বহুধা বিভক্ত সুতরাং এর মধ্যে সরকারের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন শ্রেণীর হাতে বেআইনী অস্ত্র থাকা গদীনশীন নেতৃত্বের প্রতি আদৌ নিরাপদ ছিলনা। বেআইনী অস্ত্র সম্পূর্ণ উদ্ধার করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে নয় বরং অতীতের সহযাত্রী আর বর্তমানের প্রতিদ্বন্দ্বী বা সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের অস্ত্রহীন করার উদ্দেশ্যেই মুজিব সরকার জুন মাসের শেষ সপ্তাহ হতে গোটা দেশে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনী লেলিয়ে দিলেন ঘরে ঘরে তল্লাশী করে গোপন অস্ত্র উদ্ধার করার জন্য। সরকারী দল ও সমর্থকরা এ তল্লাশী থেকে বাদ পড়ল কিন্তু তবুও যে লক্ষাধিক অস্ত্র উদ্ধার হল তা কিন্তু কোন রাজাকার, আলবদর বা দালালদের বাড়ী থেকে উদ্ধার হয়নি।

দালাল আইন আরো কঠোর করা হলো

কিন্তু তবুও সমস্ত ব্যর্থতার জন্য দালালদের এবং পাকিস্তানী হানাদারদের দোষারোপ করে জনমতকে নিজের অনুকূলে রাখবার জন্য সরকার ব্যস্ত। দেশের বিভিন্ন শিল্প এলাকায় অহরহ যে শ্রমিক সংঘর্ষ হচেছ তার জন্য দায়ী করা হচেছ পাকিস্তানের এজেন্টদের যারা নাকি এদেশে বিভিন্ন স্থানে তৎপরতা চালিয়ে যাচেছ। আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে যে কোন ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা হচেছ চীন ও আমেরিকাকে। ২৫শে আগষ্ট তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের জাতিসংঘে সদস্য লাভের প্রশ্নে চীনের প্রথম ভেটো প্রয়োগের পর চীন ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাক্যবান বর্ষণ বৃদ্ধি পেল। মুজিব সরকার চীন ও পাকিস্তানকে হাতে না পেয়ে সমস্ত আক্রোশ ঝেড়ে দিল দালালদের উপর। চীন, আমেরিকা, পাকিস্তান ও দালালদের স্বার্থ নাকি এক ও অভিন্ন। সরকার দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ২৯শে আগষ্ট তারিখে দালাল আইনের সংশোধন করে আরও কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করে চীনের ভেটোর ব্যাথা ভূলবার জন্য এবং দেশের জনমতকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা নিলেন। স্বাক্ষ্য বিষয়ক আইন ও কার্য্যবিধি আইনের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো হলো। প্রমাণের সংজ্ঞা ও প্রকৃতিকে বদলিয়ে দিয়ে আসামীকে একরূপ দোষী সাব্যস্ত করেই তার বিচার প্রহসনের ব্যবস্থা রাখা হলো। যুগ যুগ ধরে যে সমস্ত বিষয় প্রমাণ করতে হত বাদী পক্ষকে তার প্রমাণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করার সুযোগ দেওয়া হল। নির্দিষ্ট মেয়াদের শাস্তি প্রদানের জন্য বিচারককে বাধ্য করা হল। বিচারকরা

www.pathagar.com

বিচারের জন্য নয় বরং বাদীর অভিযোগপত্র ও সরকারে নির্দ্ধারিত শাস্তির মেয়াদের উপর সীল ও স্বাক্ষর দেবার জন্য বিচারাসনে অধিষ্ঠিত রইলেন। এসব অবস্থা এখন অনেকের বিবেককেই নাড়া দিচেছ। যারা বর্তমান সরকারের সমর্থক অথচ কিছুটা স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার চিন্তাধারায় বিশ্বাসী তারাও সরকারের কার্য্যকলাপে উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করলেন।

আবুল মনছুর আহমদের কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর

খবরের কাগজের পাতায় কিছু কিছু সমালোচনা প্রকাশ পাচেছ। আওয়ামী লীগের গোঁড়া সমর্থক এককালীন আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার বাণিজ্য মন্ত্রী, প্রবীণ সাংবাদিক ও সুসাহিত্যিক জনাব আবুল মনছুর আহমদ ইত্তেফাক পত্রিকায় ইং ৮-৯-৭২ সংখ্যায় 'বাংলাদেশ সরকার কি বিপ্লবী সরকার না নির্বাচিত সরকার' - এই শিরোনামায় মুজিব সরকারের নয় মাসের কার্য্যকলাপের যে চিত্র তুলে ধরলেন তা কোন মতেই অতিরঞ্জিত ছিলনা। তিনি লিখলেন "বর্তমান সরকার যে সব কাজ করিয়াছেন তাদের কাছে কেও এসব আশা করেনা, কারণ এসব আওয়ামী লীগের বিশ বছরের ঐতিহ্য ও বিঘোষিত নীতি বিরোধী। বিনা বিচারে বন্দী করা, হাইকোর্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নুতন হাইকোর্ট বসানো, হাইকোর্টসহ সব আদালতের ক্ষমতা হরণ করা, রাজনৈতিক বিরোধী দলসমূহ বেআইনী ঘোষণা করা, রাজনৈতিক অপরাধ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে রিট্রসপেকটিভ প্রয়োগ দেওয়া, রাজনৈতিক অপরাধে দন্ডিত ব্যক্তির ভোটাধিকার হরণ করা, গ্রেফতারী ব্যক্তিকে দন্ড দিবার কালে প্রচলিত দন্ডবিধি ও সাক্ষ্য আইন যথেষ্ট না হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কয়েদ করিয়াই এসব আইনের পছন্দমত সংশোধন করা, সর্বনিম্ন দন্ডের বিধান করা এবং সর্বোপরি শ্রমিকদের ফান্ডামেন্টাল রাইট ষ্ট্রাইক করার অধিকার বাতিল করা ইত্যাদি এমন সব কাজ তারা করিয়াছেন যার নজির সভ্য জগতের কোথায়ও নাই। ডিক্টেটররাও তা করেন নাই।" ... "স্বাধীনতার বিরোধীতা দেশদ্রোহিতা নয়, রাজনৈতিক মতবিভিন্নতামাত্র। ভারত স্বাধীন হইবার আগে পর্য্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও পার্টি স্বাধীনতার বিরোধীতা ও ইংরেজ সরকারের সমর্থন করিয়াছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগের দিন পর্য্যন্ত অনেক হিন্দু মুসলিম ব্যক্তি ও পার্টি পাকিস্তানের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ভারত স্বাধীন ও পাকিস্তান হাছিল হইবার পর ঐকারণে কেও দন্ডিত হন নাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের আগের দিন পর্য্যন্ত বাংলার স্বাধীনতা ও পাকিস্তানের অখন্ডতা ছির রাজনৈতিক মত পার্থক্যের প্রশ্ন। মত বিভিন্নতা দন্ডণীয় নয়, আনুগত্যের অভাবই দন্ডণীয়।" সামান্যতম চিন্তাতেই ধরা পড়বে সরকারের অনুসৃত এই পদক্ষেপগুলো সবই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের নির্য্যাতন ও ভবিষ্যতে যাতে তারা কোন দিনই মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে তারই অপচেষ্টা মাত্র। তবে শাসকদের বিরুদ্ধে মজলুমদের হাহাকার, নির্যাতীতদের গুমরে কান্নার রোলও ক্রমশঃ ঘনিভূত হয়ে উঠছে।

www.pathagar.com

নিয়তির নির্মম পরিহাস

নিয়তির নির্মম পরিহাস। ইতিহাসের কি অমোঘ নীতি। অতীতে যা কিছুরই কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে সেই সব কাজগুলোই নিজ হাতে সরকারী দলকেই করতে হচ্ছে। বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রচারে যারা এপার বাংলা ওপার বাংলার প্রেমের দুর্ভেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়বার পরিকল্পনায় মেতে ছিলেন তাদের স্বপ্নকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত পাসপোর্ট ভিসা চালু হলো সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখ থেকে। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে সোচচার রাজনৈতিক দল তাদের মসনদের মৃদুমন্দ হাওয়ার পরশেও কালবৈশাখীর ঝড়ো হাওয়ার আলামত অনুভব করলেন। আর তাই কুঁড়িতেই একে ঘায়েল করার জন্য ১২ ই সেপ্টেম্বর তারিখে ৫টি পত্রিকার উপর রাষ্ট্রবিরোধী সংবাদ পরিবেশনের অভিযোগে শোকজ নোটিশ জারী করা হলো এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ৩টি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হককথা', মুখপত্র ও স্পোকসম্যানের প্রকাশনা নিষিদ্ধ হল। কয়েকজন সম্পাদক ও সাংবাদিকও লালঘরের হেফাজতে আটকা পড়লেন রাষ্ট্রীয় আদেশ বলে। চোরাচালানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং এই প্রচারণাকে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বের ফাটল ধরানোর অপপ্রয়াস বলে আখ্যায়িত করে জাত, কুল ও মান ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। তাই শেষ রক্ষার জন্য ৫ই অক্টোবর তারিখে প্রধানমন্ত্রীর নির্দ্দেশে চোরাচালান রোধকল্পে সীমান্তে অবিলম্বে নৌ ও সেনাবাহিনী প্রেরিত হল। পরের দিন তৃড়িৎ আদেশে চোরাচালান রোধকারী সংস্থাসমূহ সেনাবাহিনীর অধীনে ন্যাস্ত হল। ৯ই অক্টোবর তারিখে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বাণিজ্য 'সাময়িকভাবে স্থগিত' রাখবার আদেশের ছদ্যাবরণে সীমান্ত বাণিজ্য বন্ধ করা হল। সরকারের ফরমান জারী হলো ঠিকই কিন্তু দেশের সম্পদ উজাড় হয়ে যাওয়ার পর। ডাক্তার এল বটে - কিন্তু ততক্ষণে শব মিছিল রাস্তায় নেমে পড়েছে এবং গোরস্তানেও কবর খোঁড়া শেষ হয়েছে।

খসড়া সংবিধান গৃহিত হলো

১২ ই অক্টোবর বাংলাদেশ গণপরিষদে যে খসড়া সংবিধান পেশ হলো এবং যা নভেম্বর ৪ তারিখে গৃহিত হয় তাতেও সৃষ্টি হল চরম বিস্ময়। মৌলিক ও মানবীয় অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যাদের গলার আওয়াজ ছিল সবার উর্দ্ধে তাদের হাতেই এ সব অধিকারের সমাধি রচিত হল। শাসনতন্ত্র বিল পেশ করে সরকার একে রক্তের অক্ষরে লিখা দলিল হিসাবে আখ্যায়িত করলেন। মূলনীতি, মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি হিসাবে বহু মূল্যবান ও সাধুবাক্য সম্বলিত হয়েছে কিন্তু বিস্ময়কর হচ্ছে এই যে শাসনতন্ত্রের প্রথম অংশের বিভিন্ন ধারায় উল্লিখিত অধিকার সমূহ সংবিধানের ৪৭ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কেড়ে নেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ৪৭ ধারার অধিনে সংবিধানের প্রথম সিডিউলে বর্ণিত সংবিধান পূর্ব প্রেসিডেন্টের জারীকৃত ১৮টি ফরমানের (অর্ডার) বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে কারও পক্ষে সংবিধানের নিয়ামত ভোগ করার অধিকার থাকবেনা। সুতরাং সংবিধান গৃহিত হওয়ার পরও সরকার ১৮টি ফরমান

www.pathagar.com

দ্বারাই দেশ শাসন করবেন এবং সংবিধান একটি পবিত্র দলিল হিসাবে শোভা পাবে। সংবিধান পূর্ব সময়ে জারীকৃত যে ১৮টি ফরমানকে মৌলিক অধিকারের বিধি নিষেধ থেকে এবং বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ থেকে বল্গাহীন ও মুক্ত রাখা হয়েছে সেগুলো হলো ঃ ১৯৭২ সনের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নম্বর ৮, ৯, ১৩, ১৪, ১৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৪৭, ৫০, ৫৭, ৬৭, ৭১, ৯৫ ও ৯৮। শাসনতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করার পথে এই সমস্তঅর্ডারগুলো কিভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে তা সামান্য চিন্তাভাবনা করলেই ধরা পড়ে। ৮নং অর্ডার অর্থ্যাৎ বাংলাদেশ কোলাবরেটর (স্পেশাল ট্রাইবুনাল) অর্ডার যা দালাল আইন নামে বহুল প্রচারিত সমস্ত মৌলিক অধিকার বিরোধী। দালালের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে সাড়ে ছয় কোটির মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে দালাল হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সরকার ও যে কোন পুলিশ কর্মচারীর হাতে এ এক মারণাস্ত্র। মিথ্যা ও ভুল করেও কারও উপর এই আইন প্রয়োগ হলে শাসনতন্ত্রের কোন রক্ষাকবচ সে পাবেনা। একই দেশের মানুষের জন্য দুই প্রকার আইন অর্থ্যাৎ মৌলিক অধিকার সম্বলিত ও মৌলিক অধিকার বিহীন আইন পাশাপাশি চরবে। সরকার সুবিধার ক্ষেত্রে কোনটি প্রয়োগ করবে তা একটি শিশুও বুঝতে সক্ষম।

বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে চাকুরীর প্রতিটি ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ থাকতে হবে। শাসনতন্ত্রের ১৩৫ ধারায় এই রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু প্রেসিডেন্টের দুইটি অর্ডার অর্থ্যাৎ পি. ও ৯ এবং পি. ও ৬৭ মারফত উপরোক্ত রক্ষাকবচ কেড়ে নেবার ব্যবস্থা রাখা হল। সংবিধানের ১৩৫ ধারা অনুযায়ী কোন সরকারী কর্মচারীকে ছাঁটাই করতে হলে কিছু কিছু বিধি নিষেধ মানতে হবে সরকারকে এবং বিচার বিভাগের সম্মুখীন হবার ঝুঁকি নিতে হবে কিন্তু এই দুই অর্ডারের অধীনে কোন কারণ না দর্শিয়ে যা ইচছা করা যাবে এবং বিচার বিভাগের সম্মুখীন হতে হবেনা।

প্রেসিডেন্টের ৫০ নম্বর অর্ডার অর্থ্যাৎ বাংলাদেশ সিডিউল অফেনসেস (স্পেশাল ট্রাইবুনাল) অর্ডার সমস্ত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। দালাল আইনে এ দেশের এক কোটি মানুষ যারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছির তারা ছিল দালাল আইনের আওতামুক্ত। কিন্তু ৫০ নম্বর অর্ডারে এদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ এই আইনের সম্ভাব্য শিকারে পরিণত হল। দেশের প্রচলিত আইনে অপরাধী হলে তার মৌলিক অধিকার থাকবে কিন্তু ৫০নং অর্ডারে অভিযুক্ত ব্যক্তির শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকার থাকবেনা। শাসনতন্ত্রের পাশাপাশি এই আইন তার নিজস্ব রাজকীয় মর্য্যাদাসহ পাশাপাশি অন্তহীন সময়ের জন্য অবস্থান করলে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারের বিধানগুলি কোন উপকারে আসবেনা। অন্যান্য অর্ডারগুলি সম্পর্কে একই বক্তব্য প্রযোজ্য - বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা হল। ফলকথা দেশ পূর্বের মত প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডারের দ্বারাই চালিত হতে থাকবে।

www.pathagar.com

যারা দেশের জন্য রক্ত দিয়ে জীবনের জয়গান গেয়ে গেল তাদের দেহের ঝরা রক্তে শাসনতন্ত্র লিখা হয়নি। হিংস্র হায়েনার নখরে যে রক্ত জমা হয়েছিল তারই আখরে এ শাসনতন্ত্র লিখা ভবিষ্যতে আর এক হিংস্র হায়েনাই পারবে এই শাসনতন্ত্রকে বাতিল বা সংশোধন করতে।

নুতন সংবিধান প্রণীত হলো বটে কিন্তু দেশে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে এলোনা। ভাঙ্গনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। গত জুলাই মাসে ক্ষমতাসীনদের জঙ্গী সংগঠন ছাত্রলীগের দ্বিধা বিভক্তি রক্তের স্বাক্ষরে চূড়ান্ত হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেরও বছরের গোড়া থেকে বিভিন্ন সময়ে অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে। এই ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো বি-টিমের নেশাগ্রস্থ খেলোয়াড়দের সহযোগিতায় ৩১শে অক্টোবর তারিখে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল নাম নিয়ে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জন্ম নিল। ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীন এই মর্য্যাদাগত পার্থক্য ছাড়া রূপে, রসে ও গন্ধে যদিও এই দুই দলের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলনা তবুও এই ভাঙ্গন ক্ষমতাসীন দলের ইজ্জত ও শক্তি বৃদ্ধি করেনি বরং কমিয়েই দিয়েছে। ভারতীয় যুব কংগ্রেসের অনুকরণে তাড়াহুড়ো করে ১১ই নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশে আওয়ামী যুবলীগ গঠন করে ভাঙ্গনের ব্যথা ভূলবার চেষ্টা করা হলো বটে তবে তাতে ভাঙ্গা অঙ্গগুলো জোড়া লাগলনা। যে শক্তি ও স্বার্থের দ্বন্দ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রশক্তিতে ভাঙ্গ ধরালো ক্ষমতাসীনদের সমর্থন পুষ্ট শ্রমিক শক্তি ওরফে শ্রমিক লীগ ওরফে লালবাহিনী একই ভাঙ্গনের স্রোতে প্লাবিত হলো। ক্ষমতাসীনদের অনেক অপকর্মের ফিরিস্তি যা ছিল পর্দার আড়ালে শ্রমিক শক্তির দ্বিধাবিভক্তির কারণে তা প্রকাশ পেল অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের বদৌলতে।

শ্রমিক সংগঠনে ভাঙ্গন

সরকারী আশিষ প্রাপ্ত শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে ছিল চারজনের হাতে। জাতীয় শ্রমিকলীগ সভাপতি মোহাম্মদ শাজাহান, সম্পাদক ও লালবাহিনী প্রধান আব্দুল মান্নান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহতাব উদ্দিন এবং আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক ও যুবলীগ নেতা রুহুল আমীন ভূঁইয়া শ্রমিক রাজ্যে বিচরণশীল বিরাট বিরাট তারকা। তবে ক্ষমতার জৌলুষে, সরকারের আশীষপ্রাপ্ত ও নৈকট্য লাভের দিক থেকে জাতীয় শ্রমিক লীগের সম্পাদক ও লালবাহিনী প্রধান আব্দুল মান্নানই ছিল বিচরণশীল তারকাদের মধ্যে ধ্রুবতারা। ক্ষমতা ও দ্বন্দের রাজনীতিতে এ অবস্থা অসহনীয় আর তাই অপর ৩ জন মাথা চাড়া দিয়ে নুতন গাজিয়ে উঠা শক্তিগুলোর সঙ্গে গোপন অভিসারে মেতে উঠল। সরকারী দল প্রমাদ গুনলেন। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে অংকুরেই বিনাশ করার ব্যবস্থা করলেন। রুহুল আমীন ভূঁইয়া ও মাহতাব উদ্দিনের পতন হল অকস্মাৎ। শুধু পতন নয়, সেই সঙ্গে দুর্নীতির অভিযোগ। সরকারী প্রেসনোটে বলা হল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ রুহুল আমীন ভূঁইয়ার বাড়ী থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, কার, এয়ার কন্ডিশনার, টি. ভি. সেট, ফ্রিজ সহ জবরদখলকৃত

www.pathagar.com

গোটা একটি প্রসাদোপম বাড়ী উদ্ধার করেছে। আর মাহাতাবের বাড়ী থেকে প্রচুর পরিমান রিলিফ দ্রব্যাদি একটি টি. ভি. সেট, দুইটি ইলেকট্রিক মোটর, ঢাকা - ক৮২৯৮ ভক্সওয়াগন কার ইত্যাদি উদ্ধার করেছে। প্রেস নোটে আরও প্রকাশ পেল ৬ই ডিসেম্বর ভোরে উভয়কে বন্দী করে পুলিশ রমনা থানায় নিয়ে আসে। কিন্তু বেলা ১০টার দিকে সশস্ত্র সমর্থকরা এসে গোলাগুলি ছুঁড়ে পুলিশদেরকে যখম করে ও কয়েদখানা ভেঙ্গে বুহুল আমীন ভূঁইয়া ও মাহতাব উদ্দিনকে মুক্ত করে নিয়ে যায়।

৭ই ডিসেম্বর বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে রব-সিরাজ ছাত্রলীগের নামে ছাত্র শ্রমিকের সংযুক্ত প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল ঢাকা শহর জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি মওলানা মতিনের সভাপতিত্বে। থানা থেকে বুহুল আমীন ভূঁইয়াকে ছিনতাই ও তার বিরুদ্ধে বাড়ী-গাড়ী ও টাকা আত্মসাতের অভিযোগ অস্বীকার করে হুঙ্কার ছাড়লেন, শ্রমিক লীগের সভাপতি মহম্মদ শাজাহান। তিনি বলেন - 'বুহুল আমীনকে সরকার গায়েব করেছে। সাতদিনের মধ্যে ফিরিয়ে না দিলে ডিসেম্বর মাসেই সমস্ত কলকারখানায় তালাবদ্ধ করে দেওয়া হবে। বুহুল আমীন শ্রমিকের টাকায় জীবন ধারণ করত। তিনি ২৬৯ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি। শ্রমিকরা প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা তাকে দিয়ে থাকে খরচের জন্য। সরকারই বুহুল আমীনকে কোহিনুর কেমিক্যালের গাড়ী রিকুইজিশন করে দিয়েছে'। এই সঙ্গে তিনি অপর পক্ষের যাবতীয় কুকীর্তিও প্রকাশ করে দিলেন। শ্রমিক রাজনীতির নামে শ্রমিকের রক্ত ঝরা পয়সা দিয়ে নেতাদের বিলাসবহুল জীবন যাপন, বিদেশী পয়সায় চলে এদেশের শ্রমিক রাজনীতি, বিদেশ থেকে পাওয়া রিলিফের মাল ব্যক্তির কবজায় কুক্ষিগত আর এদের সম্পর্কে সরকার নির্বিকার অথচ সবকিছুই সরকারের জ্ঞাতসারে সম্পন্ন হচেছ।

বন্ধুজনের মধ্যে ভাঙ্গন সম্প্রসারিত

ভাঙ্গনটা শুধুমাত্র নিজেদের অন্তর্দ্বন্দের কারণে আপনজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলনা, বন্ধুজনের মধ্যেও সম্প্রসারিত হল। ১৯৭০ এর নির্বাচন পর্য্যন্ত মুজাফফর ন্যাপ ছিল শেখ মুজিবের কঠোর সমালোচক এবং আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে আপোষহীন, ১৯৭১-এ পরিস্থিতির চাপে পড়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাদের ভারতে বাস করতে হয়েছে। তাইতে রাজনৈতিক প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত না মেনে উপায় ছিলনা। বাংলাদেশ প্রশ্নে রাশিয়ার ভূমিকা এদের মর্য্যাদা আশ্রিত জন থেকে বন্ধুজনে রূপান্তরিত করে। ১৯৭২ পুরোটাই এরা সরকারী দলের বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়েছে। কিন্তু মুজিব সরকারের উদার হস্তে মার্কিন সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ এবং বাংলাদেশ মার্কিন সম্পর্ক বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করতে গিয়ে মুজাফফর ন্যাপ ও তাদের আশ্রিত ছাত্র প্রতিষ্ঠান অপ্রত্যাশিতভাবে মুজিব রাজনীতির সঙ্গে প্রকাশ্য দ্বন্দে অবতীর্ণ হলো। ১৯৭৩ সনের ১লা জানুয়ারি তারিখে মোজাফফর ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী বিক্ষোভ পালন কালে ঢাকাস্থ তথ্য কেন্দ্রের সম্মুখে পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত এবং

www.pathagar.com

বিক্ষোভকারীদের দ্বারা তথ্য কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগ, ভাংচুর, পুলিশের প্রতি হাত বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য দ্বন্দ আরও কয়েকধাপ এগিয়ে গেল। তার উপর ২রা জানুয়ারি তারিখে মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন কর্তৃক দখলকৃত ডাকসুর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় শত সহস্র কণ্ঠের বজ্র ঘোষণা পেট্রোলে অগ্নিসংযোগ করে দিল। জনসভায় ৩টি প্রস্তাব গৃহিত হলো। গত ২৩-২-৬৯ তারিখে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ডাকসুর পক্ষ থেকে শেখ সাহেবকে যে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়েছিল ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে তা প্রত্যাহার করা হলো। শেখ সাহেবকে ডাকসুর আজীবন সদস্যপদ যা ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছিল, বাতিল ঘোষণা করা হল তৃতীয় প্রস্তাবে শেখ সাহেবকে আর জাতির পিতা বলে সম্বোধন না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। মস্কো ন্যাপ প্রধান মুজাফফর আহম্মদ ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে মুজিব সরকারের পদত্যাগ দাবী করে কড়াইতে ঘি ঢেলে দিল। ত্বরিৎ জবাব এল সরকার সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতৃবৃন্দের তরফ হতে। ৩-১-৭৩ তারিখের সংবাদপত্রের মাধ্যমে তারা হুংকার ছাড়ল মুজাফফর ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের প্রতি "৭ই জানুয়ারির মধ্যে 'বঙ্গবন্ধুর' কাছে ক্ষমা চাও, নইলে বাংলার মাটিতে তোমাদের সভা করতে দেওয়া হবেনা। যুবলীগ নেতা নুরে আলম সিদ্দিকী মুজাফফর ন্যাপকে আওয়ামী লীগের রক্ষিতা হিসাবে উল্লেখ করে জানিয়ে দিল 'রক্ষিতাকে নিয়ে মওজ করা চলে, শয্যাশায়িনীও করা চলে, তবে হেরেমে স্থান দেওয়া চলেনা।' ৭ তারিখ পর্য্যন্ত ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দিলেও এত দেরী ছিল অসহ্য। তাই তার আগেই প্রেমের আগুনে জ্বলতে হল মুজাফফর ন্যাপ নেতৃবৃন্দকে। ৬-১-৭৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মুজাফফর আহম্মদের প্রেস কনফারেন্স মারফত জানা গেল ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ৫ তারিখে মুজাফফর ন্যাপ অফিসে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে নেতৃবৃন্দকে উত্তম মধ্যম দিয়ে শেখ মুজিবের প্রতি কটাক্ষপাতের জ্বালা মিটিয়েছে এবং অফিসের যাবতীয় সরঞ্জাম ও আসবাব পত্র লুণ্ঠন করে দুই লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি সাধন করেছে। এছাড়াও সহ নেতা-নেত্রী ও ছাত্রছাত্রী কর্মীদের উপর এমন চিমটে ও কামড় দেওয়া হয়েছে যা নিয়ে প্রকাশ্য বক্তব্য রাখা চলেনা। পিপড়ের নাকি পাখা গজিয়েছিল তাই আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা দফতর কোন মতেই বল সঞ্চারের পক্ষাপাতী ছিলেন না। ফল পাওয়া গেল অবশ্য হাতে হাতে। মুজাফফর ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের বীর ও বীরাঙ্গনারা ঠেঙ্গানী ও কামড় খেয়ে একেবারে চুপসে গেল। ভাবটা যেন এই 'মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না?"

অধ্যায়-১১

ইনসাফের কাঠগড়ায়

দীর্ঘ ১৩ মাস এগারো দিন পর দেশের মাটির পরশ পেলাম। ১৪-১-৭৩ তারিখে কুষ্টিয়ার ডি. এস. পি. জনাব আমিনুল ইসলাম সাহেবের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র

www.pathagar.com

পুলিশ বাহিনীর প্রহরাধীনে ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগার থেকে নিজ জেলা কারাগারে স্থানান্তরিত হলাম। রাত্রি ৯টার সময় কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম মনে হল এই প্রাচীরের ওপারে মাত্র কয়েকশত হাত দুরে আমার কলিজার টুকরো, নয়নের পুত্তলিগুলো, আমার পরম প্রিয়জনেরা ব্যাথাভরা রাত পাড়ি দিচ্ছে। জালেমের গড়া আইন যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে তা যদিও অপসৃত হলনা তবুও স্থানের দুরত্ব কমে যাওয়ায় চোখ ও মনের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পেল। চোখের দেখায় মনে তৃপ্তি আনে তা উপলব্দি করলাম পরদিন যখন ব্যথিতা স্ত্রীকে পাশে পেলাম আর কলিজার টুকরোগুলো গভীর তৃপ্তিতে আমার বুকের উষ্ণতায় লুটিয়ে পড়ল।

দায়রা জজ ও স্পেশাল ট্রাইবুনালের নির্দেশে আমাকে কুষ্টিয়া জেলে স্থানান্ত রিত করা হয়েছে দালাল আইনে বিচারের জন্য। এতদিন জানা ছিল না আমার বিরুদ্ধে আদৌ কোন অভিযোগ আছে কিনা। ১৮/১/৭৩ তারিখে আদালতে হাজির হওয়ায় আমার বিরুদ্ধে সরকার বা সরকারী দলের অভিযোগের ফিরিস্তি জানবার সুযোগ পেলাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দুই শত দিন পার হয়ে যাচেছ অথচ আমার বিরুদ্ধে জেলাবাসীর কারও তরফ হতে কোন অভিযোগ দায়ের হলনা এটা স্থানীয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিই (ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি) দালালদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুযায়ী অভিযোগের তীর পরিচালনা করেন এবং নেপথ্যে এটা আইনগত মর্যাদাও পেয়েছে। সাধারণ নিয়ম হচেছ দেশে একটি প্রচলিত আইন থাকে, কেউ তা লংঘন করলে তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে বা সরাসরি কোর্টে মোকদ্দমা দায়ের করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিচারে দোষী প্রমাণিত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। এখানে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমে দালালদের কারাগারে আবদ্ধ করা হয়েছে আইন বা অভিযোগের কোনই অস্তিত্ব ছিলনা তখন। তারপর আইন তৈরী হল শাসকদের ইচছা মোতাবেক, এরপর আরম্ভ হল অভিযোগ তৈরীর হিড়িক--ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে না ছিল কোন আইনগত বাধা না ছিল কোন নৈতিক বাঁধন যা অভিযোগকারীকে মিথ্যার আশ্রয় থেকে বিরত রাখতে পারত। আর বিচারকের কণ্ঠরোধত পূর্বেই হয়েছে "বাংলাদেশ সার্ভিসেস অর্ডারের" মাধ্যমে। সোনায় সোহাগা।

এরূপ একটি পরিস্থিতির আমি ও স্বীকার হলাম। কুটিল হিংস্র রাজনৈতিক হায়েনার দল আমাকে কারাগারে রেখে শান্তি পাচেছ না, তারা চরম আঘাত হানতে চায়। স্বাধীনতার প্রথম লগ্নে জেলা হতে আমার অনুপস্থিতির কারণে ওরা ওদের হিংস্র নখর দিয়ে আমার কলিজাকে ক্ষতবিক্ষত করে রক্ত পান করতে পারেনি। তাই আজ আইনের সুতীক্ষ নখর দিয়ে ওরা আমার রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটাতে চায়। ওরা কারা? কেউ ১৯৬৬ পর্যন্ত আমার রাজনৈতিক জীবনের সহযাত্রী, কেউ আমার দীর্ঘ

www.pathagar.com

সাফল্যজনক আইনজীবী জীবনে শিষ্য কেউ রক্তের সম্পর্কে বাঁধা আর কেউবা ১৯৭১-এর দুর্দিনে পেয়েছে নিরাপত্তা ও আশ্রয়। আর ওদের অনেকেই যখন অতীতে সরকার পতনের মুখে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং বিভিন্ন মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হয়েছে আইনজীবী হিসাবে পেয়েছে আমার অকপট সেবা ও সাহায্য। রাজনৈতিক মত পার্থক্যের দরুণ মানবীয় অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হতে পারেনা। এই মূলমন্ত্রই অতীতে আমাদের সেবাধর্মী ও সহনশীল মনোভাব গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমান পরিবেশে এরাই দেশের নেতা, দেশের মানুষের ইজ্জত ও নিরাপত্তার রক্ষক, দালালদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সৃষ্টির দায়িত্ব এদের হাতে, তদন্ত পরিচালনা ও রিপোর্ট দায়ের হয় এদেরই প্রত্যক্ষ নির্দেশে আর আদালতে সরকারী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন এদেরই কেউ না কেউ। নেপথ্যে বহু অভিনয়ের পর আমার সম্পর্কে যে নাটক মঞ্চস্থ হল তার নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল কুষ্টিয়া কালেক্টরেটের জনৈক কেরানী মোঃ আব্দুস সাত্তার। ইং ১৫/৭/৭২ তারিখে অভিযোগ দায়ের করেছে আমার বিরুদ্ধে মোঃ আব্দুস সাত্তার ইং ১/৫/৭১ তারিখের একটি দুর্ঘটনা সম্পর্কে। অভিযোগে বলা হয়েছে "১/৫/৭১ তারিখে দুই জন বিহারী রাজাকার আমাকে বন্দী করে এবং সেই সময় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সা'দ আহমদের নিকট নিয়ে যায়। তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করে ঐ সময়কার "মার্শাল ল" কর্তৃপক্ষের অফিস সাবেক পুলিশ লাইনে পাঠিয়ে দেন। ৮/৫/৭১ তারিখে আমাকে বিচারের জন্য চুয়াডাঙ্গায় পাঠান হলে ওখানকার মেজর আমাকে গুলী করে হত্যার হুকুম দেয়। সেই দিন আমাকে চুয়াডাঙ্গার ক্যাম্পে আটক করে রাখে। রাত্রি বেলায় আমি জানালার শিখ ভেঙ্গে পালিয়ে ভারতে চলে যাই এবং বাংলাদেশ মুক্ত হবার পর আমি দেশে ফিরে আসি।"

দন্ডবিধির ৩৬৪ ধারার একটি অভিযোগ আনয়ন করাই ছিল এই এজাহারের মূল লক্ষ্য। দালাল অর্ডারের বদৌলতে শাস্তির পরিমান বৃদ্ধি করে এই অভিযোগের সর্বোচচ শাস্তি মৃত্যুদন্ড করা হয়েছে। এজাহারে দুর্ঘটনার স্থল, অর্থাৎ যে স্থানে আব্দুস সাত্তারকে বন্দী করা হয় এবং ঘটনা সম্পর্কে কোন সাক্ষীর নাম আদৌ উল্লেখ নেই। ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে ঘটনার স্থল, পক্ষগণের পরিচয়, সাক্ষীদের নাম ধাম প্রাথমিক অভিযোগ উল্লেখ থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক এক্ষেত্রে সনাতন পথের হলো ব্যতিক্রম। জনৈক করিৎকর্মা পুলিশ ইনেসপেক্টরকে অন্য স্থান থেকে কুষ্টিয়া সদরে বদলী করে আনা হলো আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের তদন্তের জন্য। ইং ৯/৯/৭২ তারিখে জগতী রিফিউজি কলোনী থেকে ৪ জন সাক্ষী সংগ্রহ করলেন করিৎকর্মা ইনেসপেক্টর নুরুল বাশার এবং তাদের নামে পৃথক পৃথক বিবৃতি রচনা করে ৩৬৪ ধারার মোকদ্দমাকে জোরদার করলেন। জগতী মোহাজের কলোনী থেকে সাক্ষী সংগ্রহ করে তিনি ঘটনার স্থান হিসাবে জগতী গ্রামের একটি চায়ের দোকানকেই নির্ধারিত করলেন। আব্দুস সাত্তারের অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষী সংগ্রহ করে এবার ইনেসপেক্টর সাহেব নজর দিলেন রাজনৈতিক অপরাধসমূহের দিকে এবং বোঝার উপর শাকের আটি চাপিয়ে তিনি চার্জশীট দাখিল করলেন ইং ১৫/৯/৭২ তারিখে।

www.pathagar.com

এই সমস্ত সম্মিলিত অভিযোগের বিচারের জন্য আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল আমাকে ইং ২৬/২/৭৩ তারিখে বিচারক মিঃ আর. কে. বিশ্বাস কুষ্টিয়ার সেশন জজ ও ১ নং স্পেশাল ট্রাইবুনাল।

সশস্ত্র পুলিশ বেষ্টনীতে নিজের অত্যন্ত পরিচিত পরিবেশে উপস্থিত হলাম। তবে শুধুমাত্র আইনজীবী হিসাবে নয়। প্রধানত আসামী হিসাবে এবং সেই সঙ্গে নিজের আইনজ্ঞ হিসাবেও। ২২ বছর ধরে যে স্থানে দাঁড়িয়ে জয় যশ ও গৌরবের মই বেয়ে শুধু উপরেই উঠেছি আজ সেখানেই আমাকে আইনের শৃংখল পরিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে দুইটি মৃত্যুদন্ড অথবা পঞ্চান্ন বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডের অভিযোগে। আদালতে জেলাবাসীর ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। সবার চোখে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের ছাপই লক্ষ্য করলাম। আইনজীবী সম্প্রদায়ের কাছে পেলাম শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও অকুণ্ঠ সমর্থনের আশ্বাস, তবে আইনজীবীদের মধ্যে যারা সরকারী দলের বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছেন তাদের চিহ্নটিও দেখা গেল না আদালতের আশে পাশে। পুতুল নাচে সুতোর টানে পড়ে অদৃশ্য থেকেই তাই তাদের নূতন স্বাধীনতার রসে সমৃদ্ধ মেদবহুল চেহারা দেখতে আগ্রহ থাকলেও উপায় ছিলনা। এদের সংখ্যা অবশ্য খুব বেশী নয় - এক ডজনও পুরো হবে না। অবশিষ্ট আইনজীবী সদস্যগণ যারা সংখ্যায় ওদের চাইতে পাঁচ/ছয় গুণ বেশী ঘৃণা প্রকাশ করলেন সরকারী দলের রাজনৈতিক জিঘাংসার, নিন্দা করলেন তাদের মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টির প্রয়াস আর আগ্রহ ভরে এগিয়ে দিলেন তাদের সাহায্যের হাতগুলো। বন্ধুদের কাঠে আমি কৃতজ্ঞ, শ্রদ্ধায় স্মরণ করি তাদের মূল্যবান সাহায্য ও সহযোগিতা প্রশংসা করি তাদের মানবতা বোধ। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু আইনজীবী বন্ধুদের দাবীতে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে আসন দিলেন শ্রদ্ধেয় বিচারক মিঃ আর. কে. বিশ্বাস।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ

বিশেষ সরকারী উকিল যিনি জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদকও বটে, অভিযোগের ফিরিস্তি তৈরী করলেন কয়েক শত মিনিট খরচ করে। বিচার শুরু হল। অভিযোগের ফিরিস্তি পাঠ করে শুনালেন মাননীয় বিচারক। অভিযোগ (১) আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনি গত ইং ১/৫/৭১ তারিখে দুইজন অবাঙ্গালী রাজাকারকে সক্রিয়ভাবে নিজ চেষ্টায় এবং হুকুম ও নির্দেশ দিয়া আব্দুস সাত্তারকে গ্রেফতার করিয়া বা করাইয়া তাহাকে হত্যা করাইবার জন্য ... জোরপূর্বক তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আনয়ন করেন এবং ঐদিনই স্থানীয় মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের অফিসে সাবেক পুলিশ লাইনে সোপর্দ করেন এবং ৭/৫/৭১ পর্যন্ত আটক রাখিয়া বিভিন্নভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন চালান তারপর ৮/৫/৭১ তারিখে বিচারের জন্যে তাঁহাকে চুয়াডাঙ্গায় পাঠান। চুয়াডাঙ্গার মেজর দোষীসাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যার আদেশ দেন এবং তাহাকে হত্যা করিবার জন্য একটি ঘরে আটক করিয়া রাখে। এমতাবস্থায় রাত্রিকালে

www.pathagar.com

আব্দুস সাত্তার ঐ ঘরের জানালার শিক ভাঙ্গিয়া ভারতে পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করে। এ কারণে আপনি বাংলাদেশ দন্ড বিধি আইনের ৩৬৪ ধারা যোগে দালাল আইনের সিডিউল Part:-1(a) (সর্বোচচ শাস্তি মৃত্যুদন্ড) বর্ণিত অপরাধ করিয়াছেন অথবা অপরাধ করিতে সহায়তা করাইয়াছেন এবং আপনি দালাল আইনের ধারা ১১(ধ) মোতাবেক দন্ডনীয় হইতেছেন। আপনার জবাব কি?

আমার জবাব

জবাব ঃ এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং এরূপ কোন ঘটনার সঙ্গে আমি কোন দিনই লিপ্ত ছিলাম না। ঘটনার দিন পিস কমিটি বা রাজাকারের কোন অস্তিত্ব ছিলনা বা আমার কোন সম্পর্ক ছিলনা। এটা দুঃখজনক স্বাধীনতার ৮ মাস পর আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা কেস তৈরী করা হয়েছে, আমি নির্দোষী।

অভিযোগ (২) ঃ আপনি ইং ২/৩/৭১ হইতে ১৬/১২/৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে পাক বাহিনীর একজন দালাল হিসাবে বাংলাদেশের তদানীন্তন বৈধ সরকারকে উচেছদ করিবার উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়ার জেলা সদরে ও বিভিন্ন স্থানে নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ ইত্যাদি জনিত কার্যে লিপ্ত থাকিয়া ও দখলদার পাক বাহিনীকে উক্ত ঘৃণ্য কার্যকলাপে সক্রিয় সহযোগিতা করিয়া দখলদার পাক বাহিনীর দখল কায়েম রাখিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে স্বেচছায় সভাসমিতির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। এই জন্যে আপনি 2(B) যোগে সশ্রম কারাদন্ড ও জরিমানার অপরাধ করিয়াছেন এবং উক্ত আইনের Act 11(d) দন্ডনীয় হইতেছেন। আপনার জবাব কি?

জবাব ঃ এইরূপ কোন উদ্দেশ্যে আমি কোথায়ও কোন জনসভায় বক্তৃতা করি নাই, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষী।

অভিযোগ (৩) ঃ আপনি ইং ২৬/৩/৭১ হইতে ১৬/১২/৭১ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একজন দালাল হিসাবে তদানীন্তন বৈধ সরকারকে উচেছদ করিবার উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়া জেলার সদরে ও বিভিন্ন স্থানে রাজাকার বাহিনী গঠন করিয়া বাংলাদেশ বৈধ সরকার বাহিনীকে ঘায়েল করিবার উদ্দেশ্যে এবং পাক বাহিনীর বেআইনী দখল কায়েম রাখার মতলবে আপনি ... বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন বা যুদ্ধ ঘোষণার প্রয়াস নেন বা সহায়তা করিয়া আইনের ১২১ ধারা যোগে দালাল আইনের schedule-এর Part- 1(a) বর্ণিত মোতাবেক অপরাধ করেন, প্রয়াস নেন অথবা সহায়তা করেন। সুতরাং দালাল আইনের Act 11(a) মোতাবেক সর্বোচচ শাস্তি মৃত্যুদন্ড আপনি দন্ডনীয় হইতেছেন। আপনার জবাব কি?

জবাব ঃ রাজাকার সংগঠনের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিলনা। রাজাকার অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকার রাজাকার সংগঠন কায়েম করেন এবং স্থানীয়

www.pathagar.com

পুলিশ বিভাগের উপর পরিচালনা ও বেতন দানের দায়িত্ব ছিল। কোন যুদ্ধ ঘোষণা বা সহযোগিতা হতে বা অভিযোগ বর্ণিত যে কোন কাজ হতে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

অভিযোগ (৪) ঃ আপনার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ এই যে উক্ত স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালে আপনি বাংলাদেশ সরকারের বিরোধীতা করিয়া দখলদার পাক বাহিনীর অবৈধ দখল কায়েম করিবার উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়া জেলা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নানারূপ কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন। আপনি দালাল আইনের Act 2(b)(v) যোগে schedule-এর part (iv)(b) অনুসারে অপরাধ করিয়াছেন যাহা উক্ত আইনের ১১(ফ) মোতাবেক দন্ডনীয় (সর্বোচচ শাস্তি ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও জরিমানা) হইতেছেন, আপনার জবাব কি?

জবাব ঃ জুন ৭১ থেকে কুষ্টিয়া জেলা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে আমাকে কাজ করতে হয়েছিল, কিন্তু অভিযোগ বর্ণিত কোন কিছু করিনি। বরং জনসাধারণের উপকারের জন্য এবং বিভিন্ন বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আমি কাজ করেছি। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

অভিযোগ (৫) ঃ আপনার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ বাংলাদেশে দখলদার পাক বাহিনীর অবৈধ দখলকালে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়া W. E.40 Kushtia (ii) নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রার্থী হইয়া ... আপনি স্বেচ্ছায় M. N. A. নির্বাচিত হন। সুতরাং আপনি বাংলাদেশ দালাল আইনের Act 2(b)(v) যোগে schedule-এর part (iv)(b)-তে বর্ণিত অপরাধ করিয়াছেন যাহা দালাল আইনের Act ii(d) মোতাবেক দন্ডনীয় (সর্বোচচ শাস্তি ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ড জরিমানা) হইতেছেন। আপনার জবাব কি?

জবাব ঃ উক্ত নির্বাচনে আমি অংশগ্রহণ করেছি তবে অভিযোগে বর্ণিত উদ্দেশ্যের জন্য নয় বা সামরিক বাহিনীর দখল কায়েম রাখার জন্য নয় বরং জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার পূনরুদ্ধার করে মার্শাল 'ল সরকারের সৈন্যদের ব্যারাকে পাঠানোর উদ্দেশ্যেই আমি উপনর্বাচনে অংশগ্রহণ করি। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষী।

সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হল

বাদীপক্ষের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হল। এতগুলো অভিযোগের বিচার হচেছ একসঙ্গে দুটো মৃত্যুদন্ডের অভিযোগ। দেশের সাধারণ আইনে এ অভিযোগ অচল বিচারের নামে প্রহসন। আইনের শাসনের নামে যে সমস্ত বিধি বিধান চালু হয়েছে এবং শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ লাগিয়ে দালাল আইন ও সাক্ষ্য বিষয়ক আইন প্রয়োগ করা হয়েছে এবং বিশেষ করে প্রাভাবান্বিত বিচারাদালতে যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে নিজের মোকদ্দমা পরিচালনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া সত্যই দুরূহ ব্যাপার ছিল। তবুও এই জুলুমের বিরুদ্ধে নিজেই আওয়াজ তুলব, জয় বড় কথা নয়, চরম সংগ্রামই আসল লক্ষ্য, মন ও বিবেকের এই চাহিদাই আমাকে এ কাজে

www.pathagar.com

এগিয়ে দিল এবং ভয় ও শঙ্কাশূন্য চিত্তে, দৃঢ়তা নিয়ে দায়িত্ব মাথায় তুলে নিলাম। আল্লাহর সাহায্যই ছিল আমার বড় অবলম্বন। রাজনৈতিক পরিবর্তনে সরকার সৃষ্ট রাজনৈতিক মোকদ্দমার বিরুদ্ধে আমার অতটা বিদ্বেষ না থাকলেও নির্দোষ মানুষের মানবতা বিরোধী ঘৃণ্য অভিযোগে জড়িত করবার অপচেষ্টার প্রতি আমার নিশ্চয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল। আমার বিরুদ্ধে আব্দুস সাত্তারকে দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণের যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা ছিল মিথ্যা ও দূরভীসন্ধীমূলক। রাজনৈতিক অভিযোগ আনয়ন করা সরকারের পক্ষে মোটেই অসুবিধা ছিল না। কিন্তু স্থানীয় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এতে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাই তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন ৩৬৪ ধারার অভিযোগ প্রমাণের জন্য। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, নূতন নূতন সাক্ষী আমদানী, মিথ্যা দলিল তৈরী, অতিরঞ্জিত উক্তি, সাক্ষীকে হুমকি দিয়ে ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য করা ইত্যাদি, কোন প্রচেষ্টাই গ্রহণ করতে সরকারী উকিলের ভূল হল না।

বাদী আব্দুস সাত্তার তার এজাহারের উপর রং চড়িয়ে সাক্ষী দিল সত্য বলার হলফ নিয়ে। সরকারী উকিলের প্রশ্নে আদালতে আব্দুস সাত্তার যে বক্তব্য পেশ করল তার বিশেষ কথাগুলো ছিল এই ঃ "ইং ১/৫/৭৯ তারিখের কুষ্টিয়া শহরের হাউজিং এষ্টেট থেকে আমি পাক আর্মীর ভয়ে শহর সংলগ্ন চৌড়হাস গ্রামে পালিয়ে যাই। বিকেল পাঁচটার সময় একটি চায়ের দোকানে বসা অবস্থায় দু'জন বিহারী আমাকে ঘিরাও করে এবং বলে জেলা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সা'দ সাহেবের কথা মত তোমাকে বন্দী করলাম। আমাকে শান্তি কমিটির অফিস রকসি হোটেলে নিয়ে যাওয়া হল, সা'দ সাহেব আমাকে বাংলাদেশ আন্দোলনের সহায়তার অভিযোগে দোষীসাব্যস্ত করেন এবং তিনি নিজে রাজাকারদের হুকুম দিয়ে মিলিটারীর কাছে পুলিশ লাইনে পাঠিয়ে দেন। চুয়াডাঙ্গায় বিচারের সময় মেজর বলেন যে তিনি সা'দ সাহেবের নিকট হতে আসামীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট পেয়েছেন এবং তার উপর ভিত্তি করে গুলী করার হুমকি দিচ্ছেন। রাত্রে আমি জানালার শিক ভেঙ্গে ভারতে পালিয়ে যাই।' লক্ষণীয় যে, এত শিখিয়ে পড়িয়ে সাক্ষী কাঠগড়ায় তোলা হল, কিন্তু তবুও মারাত্মক ভুল করে গেল আব্দুস সাত্তার। এজাহারে ঘটনার স্থানের কথা উল্লেখ নাই। করিৎকর্মা ইনেসপেক্টর জগতী গ্রামে ঘটনার স্থল বলে উল্লেখ করেছেন আর প্রমাণের জন্য জগতী থেকে সাক্ষী তৈরী করেছেন। বাদী আব্দুস সাত্তার তার জবান বন্দীতে চৌড়হাস গ্রামে ঘটনা হয়েছে বলে উল্লেখ করল এবং চায়ের দোকানের নাম বা কোন স্বাক্ষীর নাম উল্লেখ করল না। পুলিশের ডাইরীতেও বাদীর সরবরাহ করা কোন সাক্ষীর নাম নেই। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে--ইনেসপেক্টর এসব সাক্ষীর সন্ধান পেল কি করে?

বাদীর জেরা শুরু হল, আইনজীবী হিসাবে আমার ২২ বৎসরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগল। মিথ্যা উক্তিকে জোরদার করতে গিয়ে আব্দুস সাত্তারকে আরও বহু

www.pathagar.com

মিথ্যার আশ্রয় নিতে হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কথার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। আব্দুস সাত্তারের এজাহার জবানবন্দী ও জেরার মধ্যে কোনই সামঞ্জস্য রইল না। জেরার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উপর আব্দুস সাত্তারের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ "এপ্রিল ১৯৭১-এর পূর্বে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলনা। আসামী সা'দ আহমদের সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক ছিলনা। মার্চ ১৯৭১-এ আমি আওয়ামী লীগের সংস্পর্শে আসি। আমি ভারত থেকে মোহাজের হয়ে চুয়াডাঙ্গা মহকুমার মুন্সিগঞ্জে বসতী স্থাপন করি, কুষ্টিয়ার হাউজিং এষ্টেটে ১৯৬৬ সন থেকে বাস করি। কুষ্টিয়া শহরবাসী এপ্রিল মাস থেকে পালাতে শুরু করে, আমি ১৬ই এপ্রিল ১৯৭১ সন কুষ্টিয়া শহর থেকে পালিয়ে মুন্সিগঞ্জে চলে যাই। পাক আর্মী কুষ্টিয়া শহরে ১৬/৪/৭১ তারিখে প্রবেশ করে। সেখানে ১৫/১৬ দিন ছিলাম। সেখান থেকে আমি ১লা মে তারিখে চৌড়হাস গ্রামে আসি। যে দুই বিহারী আমাকে চায়ের দোকানে বন্দী করে তারা একথা বলে নাই যে সা'দ সাহেবের হুকুমে তারা বন্দী করেছে। চুয়াডাঙ্গায় আমার সঙ্গে আরও দু'জন বন্দী ছিল। তারাও সাহায্য করেছিল পালানোর ব্যাপারে। আমরা সবাই পালাই, তাদের নাম জানিনা, জিজ্ঞাসাও করি নাই, দেশে ফিরে এসেও তাদের অনুসন্ধান করি নাই। এস. ডি. ও. সাহেবের অফিসের উপর তলায় বসে আমি কাজ করি, স্বাধীনতার পরপরই আমি অফিসে যোগদান করি, তবে আমার ঘটনার ব্যাপরে কোন কেস করতে হবে কিনা তা আমি জানতাম না। আমি একথা এজাহারে বলি নাই যে, চুয়াডাঙ্গার মেজর বলেছিলেন যে তিনি সা'দ আহমদ সাহেবের নিকট থেকে আমার সম্পর্কে রিপোর্ট পেয়েছেন। এজাহারে এই মোকদ্দমার সাক্ষীর নাম উল্লেখ করি নাই, এজাহারের উল্লিখিত ব্যক্তি এই মোকদ্দমার সাক্ষী নয়। চুয়াডাঙ্গার যে ঘরের জানালার শিক ভেঙ্গে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম তা পুলিশকে দেখাই নাই। একথা সত্য নয়, সে সা'দ সাহেবের সন্মানকে নষ্ট করার জন্য আমি একটা মিথ্যা ও বানোয়াটি গল্প দিয়ে কেস খাড়া করেছি।"

আব্দুস সাত্তারের অপহরণ সম্পর্কে ইনেসপেক্টর সাহেবের যোগাড় করা জগতী গ্রামের সাক্ষী হাজু মিঞা, নুরুল ইসলাম ও মানু সেখ ঘটনার স্থল সম্পর্কে বাদীকে মোটেই সমর্থন করল না। কেননা পুলিশের কাছে তাদের জবানবন্দী অনুযায়ী জগতী গ্রামে ঘটনা ঘটেছে বলে তাদের সাক্ষী দিতে হলো। মাননীয় বিচারক বিরক্তি প্রকাশ করে সরকারী উকিলের দিকে আড় নয়নে চাইলেন। বুদ্ধিমানের ইশারাই যথেষ্ট, সরকারী উকিল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সাক্ষীদের বৈরী ঘোষণা করে জেরা করতে শুরু করলেন। সাক্ষীরা সরকারী উকিলের আশা পুরণ করল না। তাদের কথায় প্রকাশ পেল সাত্তারকে জগতী গ্রামে দুইজন বিহারী বন্দী করে এবং সেখানে কারো কোনো হুকুম বা নির্দেশের কথা তারা উল্লেখ করে নাই। উপরন্তু দুই জন সাক্ষী স্বীকার করল শান্তি কমিটির তরফ থেকে রিলিফের খাদ্য বিলি বন্টন হয়েছে। সরকারী উকিলের উদ্বেগের মধ্য দিয়ে বিচারের প্রথম দিনের কাজ শেষ হল।

www.pathagar.com

মোকদ্দমার দ্বিতীয় দিনে সরকারী উকিলের বিশেষ তত্ত্বাবধানে এল অপহরণ অভিযোগের শেষ সাক্ষী কুষ্টিয়া কালেক্টরেটের ড্রাইভার জগতী মোহাজের কলোনীর মোমিন সেখ। ইনেসপেক্টর সাহেবের রেকর্ড ঠিক রাখতে গিয়ে তাকেও অবশ্য জগতী গ্রামের ঘটনার কথা বলতে হলো, কিন্তু তাতে বাদীর বর্ণিত স্থানের সমর্থন পাওয়া গেল না। সরকারী উকিলের এক প্রশ্নে মোমিনের উত্তর শুনে সরকারী উকিল ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাক্ষীর উপর।

প্রশ্ন ঃ আসামী শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান কি কি কাজ করতেন?

উত্তর ঃ শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করতেন। সরকারী উকিলের ক্রোধ ও হুমকি এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করল যা আমার ২২ বছরের ওকালতি জীবনে চোখে দেখবার বা কানে শুনবার দুর্ভাগ্য হয় নাই। সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণা করা হলো এবং Leading প্রশ্ন (সাক্ষীর মুখে কথা তুলে দেওয়া) করে সাক্ষীর মৌনতাকে সম্মতি ধরে নিয়ে সাক্ষ্য লিখিত হল। ৩৬৪ ধারার মায়া পরিত্যাগ করে ১২১ ধারা রসদ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চলল এই সাক্ষীর মাধ্যমে। সরকারী উকিলের চেষ্টায় মোমিন সেখের যে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হল তা এইঃ সা'দ আহমদ সাহেবের হুকুমে বিহারীরা নর হত্যার কাজ চালাত। তিনি বাড়ী বাড়ী থেকে রাজাকার সংগ্রহ করতেন রাজাকাররা গ্রামে এবং শহরে মুক্তিবাহিনীর খোঁজ করত, তারা গ্রামে চোর ডাকাতও ধরত।"

জেরার মাধ্যমে যে সমস্ত কথা পাওয়া গেল তাতে মোমিন সেখের উপরোক্ত সাধারণ অভিযোগের কোনই মূল্য থাকে না বিচারের দৃষ্টিতে। প্রতিটি অভিযোগই নির্দিষ্ট হওয়া উচিৎ এবং আইনের বিচারে সাধারণ অভিযোগ না এনে নির্দিষ্ট ঘটনা দিয়েই একজনের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা প্রমাণ করতে হয়। শোনা কথা বা লোকবলে এইরূপ সাক্ষ্যের কোনই গুরুত্ব নাই, মোমিন সেখের সাক্ষ্যের কি মূল্য তা তার জেরা থেকেই নির্ধারণ করা যেতে পারে অনেক কথার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি নিম্নরূপঃ "রাজাকার সংগঠন কখন থেকে শুরু হয়েছে আমি জানি না। আমি মুক্তিবাহিনীতে ছিলাম না বা তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত নই, কোন শান্তি কমিটি বা তার সদস্য সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। আমি সা'দ সাহেবের বাড়ী যাই নাই বা শান্তি কমিটির অফিসেও যাই নাই। লোকে বলা বলি করত শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। শান্তি কমিটি শহরে ও গ্রামে রিলিফ দ্রব্য বিলি বন্টন করত।"

সরকারী দল ও সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের ৩৬৪ ধারার অপরাধ সৃষ্টির যত প্রচেষ্টা ছিল এবং তাদের ঝোলায় যত তুণ জমা করা ছিল তা সবই নিঃশোষিত হল। এবার রাজনৈতিক অভিযোগ প্রমাণের জন্য সাক্ষী আমাদানী শুরু হলো। নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং শান্তি কমিটির চেয়ারম্যানের পদগ্রহণ করার জন্য কিছু দলিল ছাড়া আর কোনই প্রমাণ বাদী পক্ষের ভান্ডারে নেই। যার দ্বারা তারা আমার যুদ্ধ ঘোষণায় সহায়তা করবার মত কোন অপরাধ প্রমাণ করতে পারে।

www.pathagar.com

আমার বিরুদ্ধে ৩নং অভিযোগের মমার্থই এই ছিল যে, রাজাকার বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে আমি বাংলাদেশ বৈধ সরকারী বাহিনীকে ঘায়েল করবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি বা যুদ্ধ ঘোষণায় সহায়তা বা প্রয়াস পেয়েছি। অথচ মোকদ্দমায় পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী যাদের সাক্ষী আনা হল তাদের স্বীকারোক্তি মতে প্রমাণ হল যে, প্রাদেশিক সরকার আনসারের পরিবর্তে রাজাকার সংগঠন কায়েম করেন, রাজাকারদের জন্য জেলা ও মহকুমা এ্যাডজুট্যান্ট ছিল, রাজাকারগণ পুলিশের অর্ন্তভুক্ত (Embodied) ছিল, থানা পুলিশের অধীনে তারা সরকারের কাজ করত এবং থানার মাধ্যমে তাদের মাসিক মাহিনা দেওয়া হত, কোন সরকারী সশস্ত্র বাহিনীর গঠন বা পরিচালনার দায়িত্ব বেসরকারী ব্যক্তির হাতে ন্যাস্ত হয় না। সরকার কর্তৃক দাখিলীকৃত একটি দলিলের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জনৈক রাজাকারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তা জেলা পুলিশ প্রধানের কাছে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে মন্তব্য লিখে আমি পাঠিয়ে দেই, এসব থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে রাজাকার সংগঠনের বা পরিচালনায় আমার বা আমার মত বেসরকারী ব্যক্তির কোনই হাত ছিল না। এমনকি যে কন্ট্রাক্টর রাজাকার ক্যাম্পে আলু, পটল, তেল, লবণ সরবরাহ করে তাদের ইঞ্জিনে কয়লা জুগিয়েছে বা সহায়তা করেছে সেরূপ কিছুও আমার সম্পর্কে বলা চলে না। সরকারী উকিলের ভ্রুকুঞ্চন থেকে স্পষ্টই প্রতিয়মান হচেছ তিনি অধিক শাস্তিদানের দুশ্চিন্তায় কাতর, বহুল প্রচারিত জেলার ১নং দালালদের বিরুদ্ধে ৩৬৪ বা ১২১ প্রমাণিত না হলে প্রভুদের কাছে তিনি কি কৈফিয়ত দেবেন। অথচ এ দু'টি ছাড়া অধিক শাস্তি দেবার আর কোন অভিযোগই সরকারের ভান্ডারে মওজুদ নেই। বিচারের তৃতীয় দিনে সরকারী উকিল দুইজন নতুন সাক্ষী পেশ করবেন বলে আবদার করলেন, এ দুই সাক্ষীর নাম এজাহারে নাই, চার্জশীটে নাই। কোন সাক্ষীর মুখে বা দলিলের মাধ্যমে এদের নাম প্রকাশ পায়নি পুলিশের ডাইরীতেও এদের কোন নামোল্লেখ নেই বা পাঁচটি অভিযোগের কোনটির সঙ্গেও এরা সংশ্লিষ্ট নয় অথবা ওরা কি বলবে তাও আসামী পক্ষের জানবার কোন উপায় নাই। এই নতুন সাক্ষী সরকারী উকিলের স্বয়ং আমদানী করা কেননা পুলিশ বা বাদীর তরফ থেকে আদালতে এইরূপ প্রার্থনাও ছিল না। চরম আপত্তি সত্ত্বেও সরকারী উকিলের আবদার গৃহীত হল। ৯নং সাক্ষী হয়ে হাজির হল আব্দুল গনী, গ্রাম্য বাজারের এক ক্ষুদ্র মৎসজীবী। সরকারী উকিল সাহেবের প্রশ্নে তৃতীয় দিনের সংগ্রহ করা সাক্ষী আব্দুল গনীর জবানবন্দীর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি হল -"আমি চৌড়হাস গ্রামের একজন মৎসজীবী। আমার পুত্র মজনু মুক্তিবাহিনীর সদস্য ছিল, গত ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি রাজাকাররা আমার পুত্রকে বন্দী করলে তার মুক্তির জন্য আমি সা'দ সাহেবের কাছে যাই, কিন্তু তিনি বললেন এইরূপ ছেলের মরাই প্রয়োজন। আমি শুনেছি আমার ছেলে মারা গেছে।" হঠাৎ আমদানী করা সাক্ষীল জেরা করার জন্য পূর্ব থেকে মালমশলা সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভব ছিলনা। তবুও জেরার মাধ্যমে এইরূপ সাক্ষীর যে অবাস্ত বতা পাওয়া গেল তা নিম্নরূপঃ "আমি ইতিপূর্বে পুলিশের কাছে কোন সাক্ষী দেই নাই।

www.pathagar.com

আমার পুত্রের মৃত্যু সম্পর্কে আমি এ পর্যন্ত কারও কাছে কোন দরখাস্ত করি নাই। পুলিশ আজ সকালে আমাকে বাড়ী থেকে ডেকে এনে সরকারী উকিলের বাড়ী নিয়ে যায়। আমার পুত্র মুক্তিবাহিনীতে ছিল এ দেখানোর মত কোন কাগজ আমার কাছে নাই।
লাল মোহাম্মদ আমার ছেলেকে বাড়ী থেকে বন্দী করে নিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে আমি এ পর্যন্ত কোন দরখাস্ত করি নাই।"

হঠাৎ সংগ্রহ করে নিয়ে আসা সাক্ষীকে ঢাকাই সাক্ষী বলার চলন আছে। আব্দুল গনীর পর ঢাকাই সাক্ষী হয়ে কাঠগড়ায় এলো জনৈক ড্রাইভার ইব্রাহিম খলিল। তার সাক্ষী নিম্নরূপঃ "আমার বাড়ী বারখাদা গ্রামে। যুদ্ধকালীন সময়ে আমি বাড়ীতেই বাস করতাম। ২ বৎসর পূর্বে ১৪ই শ্রাবণ তারিখ বিকেলে সা'দ আহমদ সাহেবকে জীপে যেতে দেখলাম। তিনি জীপ থামালেন এবং কয়েকজন সশস্ত্র রাজাকারসহ নেমে আসলে তিনি রাজাকারদের হুকুম দিলেন বারখাদা গ্রামের সমস্ত যুবকদের হত্যা কর এবং সমস্ত নারীদের, আমীদের কাছে পৌছে দাও।"

জেরার সময় তার বক্তব্য ছির নিম্নরূপঃ "আমি ওয়াপদার জনৈক অফিসারের মোটর ড্রাইভার। গতকাল পর্যন্ত এই ঘটনা আমি কারও কাছে ব্যক্ত করি নাই। গতকাল পুলিশ আমার বাড়ীতে গিয়ে আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্য ডেকে আনে। হাজার হাজার নারী ও পুরুষ বর্তমানে আমার গ্রামে বাস করছে। যেখানে আসামী দাঁড়িয়ে হুকুম দিয়েছিল তার আশে পাশে কোন বসতী ছিলনা। এইরূপ ঘটনা কর্তৃপক্ষের কাছে জানানোর জন্য আমার অফিসারকেও কোনদিন বলিনি। আজকে বাংলা রুভ তারিখ বলতে পারিনা"। সরকারী উকিলের সংগ্রহ করা এই দ্বিতীয় সাক্ষী পাইকারী হত্যা ও নারীহরণের অভিযোগের হুকুমদার আসামী হিসাবে আমাকে চিহ্নিত করল বটে, কিন্তু এ হুকুমের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তা প্রকাশ হলনা। যে গ্রামে হাজার হাজার নারী-পুরুষ এখনও বসবাস করছে তার একজনও কি এই কল্পিত তান্ডবলীলার স্বীকার হয়নি? দালাল আইনের বলগাহারা সুযোগে ক্ষমতাসীনদের দাক্ষিণ্যভোগী ঘৃণ্য রাজনীতির মন্ত্রে দিক্ষিত সরকারী উকিল ভদ্রতা, নৈতিকতা ও শিষ্টাচারের সামান্যতম শিক্ষাও জলাঞ্জলী দিয়ে এইরূপ জঘণ্য মিথ্যার আশ্রয় নিত পারেন তার নজীর কোন সভ্য সমাজে বা দেশে নাই। এই ধরনের সাক্ষী আইনের চোখে শুধু অগ্রহণযোগ্যই নয় বরং আনীত অভিযোগসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। শতাব্দীকালের উর্ধকাল হতে এই উপমহাদেশে বৃটিশ আমলে বা পরবর্তী সময়ে বিচারের পবিত্র আসনকে যারা অলংকৃত করেছেন তাঁরা চিরদিন এইরূপ ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং অবিচারের অভিশাপ থেকে সমাজকে রক্ষা করেছেন।

www.pathagar.com

মোট ১৫ জন সাক্ষী নিয়ে ক্ষ্যান্ত দিলেন সরকারী উকিল মিঃ আমজাদ হোসনে। কিছু সাক্ষী ও দলিল ছিল মামুলী ধরনের। সত্য কথা বলতে গেলে অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ও গ্রহণযোগ্য সাক্ষী ছিল আব্দুস সাত্তার ও জগতী কলোনীর কয়েকজন এবং শান্তি কমিটির পদগ্রহণ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রমাণের জন্য কিছু দালিলিক প্রমাণ ও তদসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট অফিসিয়াল সাক্ষী। এ ছাড়া নুতন সাক্ষী ও মিথ্যা দলিল যা সৃষ্টি করা হয়েছিল শেষ মুহূর্তে তা অভিযোগের সঙ্গে মোটেই সংশ্লিষ্ট ছিলনা। আইনের দৃষ্টিতে এগুলোকে প্রমাণ বলা যায় না তবে গল্প বলা যেতে পারে। প্রমাণের উপর নির্ভর করেই বিচার হয় গল্পের উপর নয়। আব্দুল গনী ও ইব্রাহিম খলিল যে গল্প পেশ করল তা প্রমাণ ছিল না। কেননা এইরূপ কোন ঘটনার বিচারের জন্য আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তৈরী করা হয়নি। তাছাড়া এসব উক্তির পিছনে কোন সমর্থন নাই। সুতরাং আমার বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক আনীত অভিযোগ সমুহের দৃষ্টিতে এসব সাক্ষীর বলা গল্পের কোন সাক্ষ্য মূল্য ছিলনা। যাই হোক সাক্ষী শেষে আসামীর বক্তব্য পেশের সুযোগ আসে। অন্যান্য অধিকার সঙ্কুচিত হলেও এ অধিকার এখনও অবশ্য অক্ষুন্ন আছে। তাই এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করাই বর্তমান পরিস্থিতিতে সমিচীন মনে করলাম। ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে সরকারী দল, সরকারী যন্ত্র ও তাদের তল্পী বাহকরা মিথ্যা প্রচারে মেতে উঠেছে। অতীতের সব কিছুকে মিথ্যা প্রমাণের প্রচেষ্টা চলেছে; অতীতের মৃত-জীবিত নেতৃবৃন্দ ও সমাজ দরদীদের বিরুদ্ধে চলেছে একতরফা বিষাদগার। কারাগারে বন্দী করে, মত প্রকাশের সর্ববিধ উপায়কে খর্ব করে, মিথ্যা মোকদ্দমার পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চলেছে অহরহ প্রচারণা। বর্তমান ক্ষমতাসীনদের অতীতের ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাদেরকে দোষারোপ করা হয়েছে এবং স্বাধীনোত্তর কালেরও ভুল-ত্রুটি ব্যর্থতার জন্যও দোষ চাপানোর অবিরাম প্রচেষ্টা চলেছে তাদের উপর রাজাকার, আলবদর, মুসলিম লীগ, জামায়াত, পিডিপির নামে। আমার নিজের অবস্থাও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও সমাজকর্মীর চাইতে কোন অংশে উন্নত ছিলনা। সরকারী দল এ জেলায় আমাকেই তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে ধরে নিয়ে অবিরাম অপপ্রচার চালিয়েছে, দেশের মানুষের কাছে কত কল্পিত বিভৎস নারকীয় কাহিনী যার প্রধানতম ভূমিকায় ওরা চিহ্নিত করেছে আমকে। জনমতকে বিভ্রান্ত করবার পূর্ণ সুযোগ লুটেছে সরকারী দল। একই কথা বার বার প্রচার করে গোয়েবলসের মৃত আত্মার প্রতি ওরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। অথচ আমাদের কোন ক্ষমতাই ছিলনা এগুলোকে রুখবার--কোন সুযোগই ছিলনা এগুলোকে খন্ডন করবার। অসহায় বন্দীদের হাত পা যেখানে শৃংখলাবদ্ধ, বাকশক্তি যেখানে রুদ্ধ আর তাদের দরদী ও শুভাকাঙ্খিরা সমাজ জীবনে জুলুমের চাবুকে প্রতি মুহূর্তে জর্জরিত সেখানে মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য বন্দী ও মজলুমের সব চাইতে শাণিত অস্ত্র হচেছ আল্লার আরশকে কাঁপিয়ে তোলা, দীর্ঘ নিশ্বাস, বুকফাটা হাহাকার আর চোখের অশ্রু দিয়ে। আমাদের প্রচেষ্টা ছাড়াই কোন্ সে মহান কৌশলকারীর নৈপুণ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। গত পনের মাসের

www.pathagar.com

ঘটনাবলীতে সরকারী দলের মানসিকতার কোন পরিবর্তন না হলেও দেশের মানুষের কাছে অনেক সত্যিই উদঘাটিত হয়েছে। বহু মাশুল দিয়ে অনেকেই উপলব্ধি করছে যা কিছু উজ্জ্বল তাই সোনা নয়। এ উপলব্ধি জুলুমের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত হানবার জন্য হয়ত যথেস্ট নয় তবুও জনসাধারণের মনে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। জনসাধারণের একাংশ আজ আদালতে ভীড় করেছে--এসেছে শিক্ষিত সমাজের মধ্য থেকে। রাজনৈতিক পরিবেশের আমি শিকার, বিদ্বেষ ও হিংসায় গড়া আইনে অভিযুক্ত, মিথ্যা প্রচারণায় কষাঘাতে জর্জরিত। তাই নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে আমার বিরুদ্ধে পাঁচটি বিভিন্ন অভিযোগ ও সাক্ষ্য প্রমাণের উপর বিচারকের প্রশ্নে জবানবন্দী দিলাম কাঠগড়ায় দাড়িয়ে অপরাধীর দুর্বলতা নিয়ে নয়, আজাদী পাগল সৈনিকের উদ্দামতা নিয়ে।

আমার জবানবন্দী

আমি নির্দোষী। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে সাক্ষীরা যা বলেছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। আমি কারও দালালী করি নাই বা কোন অন্যায় কাজে সমর্থন করি নাই বা বাংলাদেশের কোন বৈধ আন্দোলনকে বিরোধিতা করি নাই। কোন প্রকার জুলুম, ধর্ষণ, ভয়ভীতি প্রয়োগ বা অন্যায় কাজে সমর্থন বা মানবতা বিরোধী কাজ আমার গোটা জীবনে অনুষ্ঠিত হয় নাই। জ্ঞানের চর্চা, সৎজীবন, স্পষ্টবাদিতা এবং নির্ভীক নাগরীক হিসাবে আমি আমার জীবন গড়ে তুলেছি। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. কমে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে, এম. এ. (অর্থনীতি) তে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়ে এবং এলএল. বি.র উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী লাভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র হিসাবে আমি ১৯৫০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করি। যদিও ১৯৪৭ সন পর্যন্ত ভারতে বাস করা অবস্থায় পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলাম, তবুও ভারতের অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়, লাক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকে সর্ব্বোচচ সম্মানে ভূষিত করে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ইন্টার ইউনিভারসিটি আইন বিষয়ক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করি। একই সঙ্গে আরো দুইটি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় একই সনে লাক্ষৌ ও আলিগড়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি। ১৯৫০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে এবং তারপর দুই বছর ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করে নিজের জেলার মানুষের সেবা করবার জন্য আইনজীবী হিসাবে আমি কুষ্টিয়া জজ কোর্টে যোগদান করি। ১৯৫২ সনে আমি জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হই এবং ১৯৬৬ সন পর্যন্ত জেলা আওয়ামী লীগের ঐ পদে বহাল থাকি। ১৯৫৩ সনের এপ্রিল মাসে আমি প্রথম কারাবরণ করি জননিরাপত্তা আইনে নুরুল আমিন মন্ত্রীসভার অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

আন্দোলন করতে গিয়ে। ১৯৫৭ সনে আমি এ্যাডভোকেট হিসাবে হাইকোর্টে অন্তর্ভুক্ত হই। ১৯৫৮ সনে আমি কুষ্টিয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হই এবং আজকের আওয়ামী লীগ জেলা প্রধান জনাব আব্দুর রউফ চৌধুরী সাহেবের জামানত বাজেয়াপ্ত হয় আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে। ১৯৫৭ সন থেকে ১৯৬০ সন পর্যন্ত পকিস্তান ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের পূর্ব পাকিস্তান থেকে একমাত্র ডাইরেক্টর ছিলাম এবং পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়নের জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করি। আমি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং সেহেতু সামরিক শাসন কোন দিনই সমর্থন করি নাই। ১৯৫৯ সনের ডিসেম্বর মাসে আমি দ্বিতীয়বার নিরাপত্তা আইনে কারাবরণ করি। তৃতীয়বার ১৯৬২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে আমিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হই নিরাপত্তা আইনের বিধান মতে। কারাগার থেকে মুক্তির পর আবার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ১৯৬৯ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সামরিক শাসন বিরোধী দল যে সমস্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এই দেশে যেমন সম্মিলিত বিরোধী দল (COP), পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন (PDM), ডেমোক্র্যাটিক এ্যাকশন কমিটি (DAC), তার সবগুলোতেই আমি কুষ্টিয়া জেলার নেতৃত্ব দিয়েছি। আন্দোলনের ধারা ও প্রকৃতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ১৯৬৬ সনে আমাদের মত পার্থক্যের উদ্ভব হয় এবং ঢাকা হাইকোর্টের প্রথিতযশা এ্যাডভোকেট মরহুম জনাব আব্দুস সালাম খানসহ আমরা অনেকেই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করি। আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করে আমি একজন সমর্থক হিসাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করি। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পরও শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের মুক্তির প্রশ্নে এবং আগরতলার মোকদ্দমা রদের প্রশ্নে ১৯৬৯ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য দল সমন্বয়ে তারও এই নেতৃত্ব আমাকে দিতে হয়েছে। ১৯৭০ সনের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি এবং আমি বিশ্বাস করি রাজনেতিক মত পার্থক্য দোষনীয় নয়। আমার এই বৈশিষ্টময় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার দেশের মানুষের হত্যা বা দেশের মা, বোনদের ধর্ষণে সহায়তা আমার চরিত্র ও মেজাজে অচিন্তনীয়। বর্তমান মানবতা বিরোধী ও মৌলিক অধিকার বিরোধী আইনের সুযোগে আমার জীবনের সুনামকে নষ্ট করবার জন্য এবং বিচার আদলতকে প্রভাবান্বিত করবার জন্য সরকার পক্ষ মিথ্যা দুই জন ভাড়াটে সাক্ষী সংগ্রহ করে এই সমস্ত অপমানজনক উক্তি করিয়েছে। আমি নির্দোষী।

আওয়ামী লীগ এই দেশে যে বিপ্লব ঘটায় তাতে সাড়ে ৭ কোটি মানুষই কর্তৃপক্ষের রোষাণলে পতিত হয়। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন পাক সামরিক বাহিনী পাবনা জেলা শহর পুনঃদখল করে তখন থেকে কুষ্টিয়া শহর এবং আশেপাশের মানুষ গ্রাম গ্রামাঞ্চলে পালাতে থাকে। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ভারতে পালিয়ে যান,

www.pathagar.com

কিন্তু দেশের মানুষকে আশু বিপদ থেকে রক্ষা করবার কোন ব্যবস্থা করে গেলেন না। যে সমস্ত সশস্ত্র দল আওয়ামী লীগকে সক্রিয় সাহায্য জোগাচ্ছিল তারাও নিরব জনসাধারণকে অসহায়ের মধ্যে ফেলে রেখে গোপনে পালিয়ে যায়। সুতরাং যারা নিরস্ত্র এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী জনসাধারণ ছিল, সামরিক বাহিনীকে বাধাদান বা রোধ করবার কোন ক্ষমতা তাদের ছিলনা। আমিও অন্যান্য লোকের মত স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পরিজনসহ ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সন গ্রামের বাড়ী ভেড়ামারায় পালিয়ে যাই। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে কুষ্টিয়া শহরে ফিরে আসি। কুষ্টিয়ায় এসে দেখি সামরিক বাহিনী বাঙ্গালী, বিহারী, হিন্দু-মুসলামন জাতি ধর্ম জনমত নির্বিশেষে সবারই বাড়ীঘর পুড়িয়ে দিয়েছে এবং সম্পত্তির প্রচুর ক্ষতি করেছে। আমার বসতবাটীর পোড়া ইট ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলনা। আমার সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ প্রায় দশ হাজার টাকার অধিক মূল্যের আইন পুস্তক সামরিক বাহিনী পুড়িয়ে দেয়। বসতবাড়ীর সমস্ত আসবাবপত্র মায় আমার মোটর গাড়ীও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই কাজ কোন বাঙ্গালী বা বিহারীর ছিল না সম্পূর্ণ পাক সামরিক বাহিনীর দ্বারাই এই ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়। এই জেলার প্রথম সারির রাজনীতিবিদ ও আইনজ্ঞ হিসাবে শোক বা ক্রন্দন করবার সময় আমার ছিলনা। তখন মানুষের উপকার করাই বড় ধর্ম ছিল। কিছু সংখ্যক লোকের সহযোগিতায় রিলিফের কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে পিস কমিটি, কুষ্টিয়া নামে একটি অরাজনৈতিক ও জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। চাঁদা ও অন্যান্য ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে দুর্গত মানুষের আশু উপকারের ব্যবস্থা করা হয় এবং তা দ্বারা ইং ১৩/৫/৭১ তারিখে ন্যাশনাল ব্যাংকের কুষ্টিয়া শাখায় একটি একাউন্ট খোলা হয়। পরবর্তী আমলে ১৯৭১ সনের ১লা জুন তারিখে জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কুষ্টিয়া জেলা শান্তি কমিটি গঠিত হয়। এই উভয় কমিটিরই আমি চেয়ারম্যান ছিলাম। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের কাছে তুলে ধরা, প্রাদেশিক সরকারের কাছে সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য ধর্ণা দেওয়া এবং শান্তি শৃংখলার ক্ষেত্রে শাসনযন্ত্রের সঙ্গে সম্ভব মত সহযোগিতা করাই আমাদের কর্তব্য ছিল। শান্তি কমিটি কোন অন্যায় উদ্দেশ্যে গঠিত হয় নাই বা কোন অপরাধমূলক কাজ করে নাই বা সামরিক বাহিনীর দখল কায়েমের জন্য কোন কাজ বা কোন সহযোগিতা করে নাই। রাজাকার সংগঠনের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক ছিলনা বরং কোন রাজাকারের অন্যায় আচরণ দেখলে আমরা শান্তি কমিটির তরফ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ পেশ করেছি। বাদীপক্ষ যে কাগজ দাখিল করেছেন সেটাই আমার বক্তব্য প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। তালবাড়িয়া ইউনিয়নের শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান জনৈক আব্দুল জলিল মৃধা রাজাকারের বিরুদ্ধে চুরি এবং অন্যান্য অভিযোগে মিরপুর থানার ওসির নিকট দরখাস্ত করেন এবং তার একটি কপি আমার নিকট পাঠান। আমি এস. পি. জনাব আব্দুল খালেক সাহেবের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দরখাস্তখানা পাঠিয়ে দেই। এস. পি. সাহেব জেলা রাজাকার এ্যাডজুট্যান্টের কাছে ঐ দরখাস্ত পাঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। জেলা

www.pathagar.com

এ্যাডজুট্যান্ট মিরপুর থানার ও-সির কাছে তদন্ত ও রিপোর্টের জন্য পাঠান। কোন অপরাধজনক কাজের জন্য রাজাকরকে হুকুম দেওয়া বা শাস্তি বিধান করার এখতিয়ার আমার বা শান্তি কমিটির কারও ছিলনা। সুতরাং অভিযোগ বর্ণিত কোন উদ্দেশ্যে আমি শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হই নাই বরং বিপদের দিনে দুর্গত মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে সরল বিশ্বাসে আমি জেলা শান্তি কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। আমি নির্দোষী।

সামরিক শাসন আমি কোন দিনই সমর্থন করি নাই, কিন্তু এদেশে সামরিক শাসন চেপে বসে। দেশের নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খাঁন সামরিক শাসন উঠিয়ে নিয়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন করতে সম্মত হন। সামরিক শাসনের অস্বস্থিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা আমরা এর মধ্যে দেখেছিলাম। প্রধান সামরিক শাসন পরিচালক ১৯৭০ সনের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী কিছু কিছু শূন্য আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করে জাতীয় পরিষদ আহব্বান করাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। কিছু সংখ্যক আসন শূন্য ঘোষিত হয় এবং ঐ সমস্ত আসনে অক্টোবর ১৯৭১-এ উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান সামরিক শাসন পরিচালকের ঘোষণায় আরও বলা হয়েছিল যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান হওয়ার পর ১৯৭১ সনের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসবে এবং সেই দিনই সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হবে। একই দিনে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার শপথ গ্রহণ করবে। শুধু মাত্র এই উদ্দেশ্যে এবং সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে পাঠান তরান্বিত করবার জন্য প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমিও নিজে কথিত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি। পাক সামরিক বাহিনীর কায়েমের জন্য নয়, রাজাকার গঠন বা পরিচালনার উদ্দেশ্যে নয়, জনসাধারণের উপর অত্যাচার করার জন্য নয় বরং দেশের মানুষের কথা সর্বোচচ পরিষদে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য আমি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি। তাছাড়া আওয়ামী লীগ যে আন্দোলন করেছে তা ছিল বুলেটের মাধ্যমে এবং আমি যে নিবাচন করেছি তা ছিল ব্যালটের মাধ্যমে সুতরাং ব্যালট কোন দিনেই বুলেটের অগ্রগতি রোধ করতে পারে না। সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে পাঠানর উদ্দেশ্যে নির্বাচন করে কোন অন্যায় আমি করি নাই। আমি নির্দোষী।

আমি কোন রাজাকার বাহিনী গঠন করি নাই বা পরিচালনা করি নাই। এইরূপ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। ১৯৭১ সনের এপ্রিলের ৩/৪ মাস পর প্রাদেশিক সরকারের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। সংগঠন, ট্রেনিং ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজাকাররা জেলা রাজাকার এ্যাডজুট্যান্টের অধীন ছিল এবং সরকারের আদেশে রাজাকারগণ Embodied হওয়ার পর পর পুলিশ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রতিটি থানার অধীন অফিসারদের হুকুম ও দায়িত্বে গ্রাম্য পুলিশ

www.pathagar.com

বাহিনী হিসাবে রাজাকারগণ ব্যবহৃত হয়। অতীতে আনসারদের যে ভূমিকা ছিল, রাজাকারদেরও ঐ একই ভূমিকা। পুলিশ বিভাগ অর্থ্যাৎ ও. সির মাধ্যমে আনসারের মতই রাজাকারগণ প্রতি মাসে তাদের বেতন গ্রহণ করত। নিযুক্তি ও শাস্তি প্রদান সবই ছিল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে যারা সবাই ঐসময় এদেশে কার্যরত ছিল। সুতারাং আমার সঙ্গে বা শান্তি কমিটির সঙ্গে রাজাকারদের কোন সম্পর্ক ছিলনা। কোন স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঘায়েল করি নাই। বাড়ী বাড়ী হতে রাজাকার সংগ্রহ করা, মুক্তি বাহিনীর খোঁজ করা, বিহারীদের বা অন্য কাওকে কোন প্রকার অন্যায় কাজে হুকুম দেওয়া, কথিত মত বারখাদা গ্রামের পুরুষদের হত্যা করা বা নারী সমাজকে ধর্ষণের জন্য প্রেরণের হুকুম দেওয়া ইত্যাদি কোন কাজ আমি করি নাই। আমার পক্ষে কখনও সম্ভবপর নয়। এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষী।

ইং ১/৫/৭১ তারিখে কোন রাজাকার সংগঠন এই প্রদেশের কোথায়ও ছিল না এবং উক্ত তারিখে কুষ্টিয়া জেলা শান্তি কমিটির কোন অস্তিত্বই ছিলনা বা এরূপ কোন কমিটির আমি চেয়ারম্যান ও ছিলামনা। ঐ সময়ে একজন নাগরিক হিসাবে এবং পরবর্তী আমলে জেলা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কাওকে বন্দী করা বা বন্দীর হুকুম দেওয়া, শাস্তি দেওয়া বা শাস্তির হুকুম দেওয়া বা কোন অভিযোগ সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করা আমার কোন কর্ত্তব্য ছিলনা। কুষ্টিয়া জেলা বারের অন্যতম সেরা আইনজিবী হিসাবে নাগরীকের কর্তব্য সম্বন্ধে আমি অবহিত। বাদী আব্দুস সাত্তারের সঙ্গে আমার কোন দিনই কোন রাজনৈতিক বা অন্য সম্পর্ক ছিলনা। এই মোকদ্দমার সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে তার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার কোন দিনই হয়নি। আইনজীবী হিসাবেও কালেকটরেট অফিসের কোন টাইপিষ্টের সঙ্গে আমার পরিচয় বা সম্পর্ক থাকা জরুরী নয়। ১/৫/৭১ তারিখের কথিত ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। জগতী চৌড়হাস বা হাউজিং এষ্টেটে এইরূপ কোন ঘটনা ঘটে নাই। আব্দুস সাত্তারকে বন্দী করবার জন্য আমি কোন হুকুম করি নাই বা কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট পাঠাই নাই। স্বাধীনতার আট মাস পরও সরকারী দল আমার বিরুদ্ধে উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ ও শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার অভিযোগ ছাড়া অন্য কোন অধিক শাস্তিযোগ্য অপরাধের সন্ধান না পাওয়ায় হতাশাগ্রস্থ হন এবং হতাশা বিদ্বেষে পরিণত হয়ে একটি স্বল্প বেতনভোগী সরকারী কর্মচারী মারফত আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা মোকদ্দমা সৃষ্টি করা হয়। এই মোকদ্দমা সৃষ্টির আরও দুই মাস পর জগতী মোহাজের কলোনী থেকে স্বাক্ষী ভাড়া করা হয় এবং গতকালও চৌড়হাস ও বারখাদা গ্রাম থেকে স্বাক্ষী ভাড়া করে নিয়ে আশা হয়েছে। আমার চরিত্রে এইরূপ জঘন্য কাজ সম্ভব নয়। যাদের সঙ্গে আমার রাজনৈতিক মত পার্থক্য ছিল এবং নির্বাচনে যে সমস্ত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তাদের বা তাদের আত্মীয় স্বজনের তরফ থেকে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। বর্তমান সার্ভিসেস অর্ডার আইনের

www.pathagar.com

সুযোগ নিয়ে সরকারী দল স্থানীয় একজন ক্ষুদ্র বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীকে প্রভাবান্বিত করে আমার রাজনেতিক মৃত্যু ঘটানোর জন্য এই মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করেছে। আমি নির্দোষী।

প্রশ্ন ঃ আর কিছু বলবেন কি?

উত্তর ঃ আমার শেষ বক্তব্য -- আমি বর্তমান দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পরিবেশের এবং স্থানীয় বিদ্বেষের শিকারে পরিণত হয়েছি। আজ প্রায় ১৪ মাস আমি জেলে আবদ্ধ, আমার স্ত্রী-পুত্র, পরিবার আজ পথের ভিখারী। সুতরাং বিচারকের প্রজ্ঞা ও সুবিচার ছাড়া এই বিদ্বেষকে মোকাবিলা করার কোন ক্ষমতাই আমার নেই। আমি মজলুম, আমি কারাবন্দী, রাজনৈতিক মত পার্থক্যের জন্য এই ঘৃণ্য অবস্থার মধ্যে আমি পতিত। আমি বিচারকের কাছে এবং বিচারকের বিচারক-এর কাছে সুবিচার প্রত্যাশী। রায় ঘোষণার দিন ধার্য হল ইং ১২ই মার্চ ১৯৭৩ সন তারিখে।

রায় ঘোষণা

জনাকীর্ণ আদালতে রায় ঘোষণা করলেন বিশেষ ট্রাইবুনাল ও জেলা জজ মিঃ আর. কে. বিশ্বাস এবং সঙ্গে সঙ্গে এক প্রস্থ রায়ের নকলও উপহার দিলেন। ১ নম্বর অভিযোগ (৩৬৪ধারা) অর্থাৎ আব্দুস সাত্তারের অপহরণ জনিত অভিযোগ থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়েছেন। এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে বাদী আব্দুস সাত্তার ঘটনাস্থল হিসাবে যে স্থানের কথা উল্লেখ করে তা ২ থেকে ৫ নম্বর সাক্ষীর দ্বারা মোটেই সমর্থিত হয়নি। সুতরাং এই ঘটনাটি সন্দেহজনক বলে মনে হয়। ঘটনার তারিখে আব্দুস সাত্তারের বন্দী ও অপহরণের কোন প্রয়োজন আসামীর মোটেই ছিলনা। সা'দ আহমদ সাহেবের হুকুমে বিহারীরা এই কাজ করেছিল এই অভিযোগ সমর্থিত হয়নি বরং বাদী নিজেই তার জেরায় এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাছাড়া ইং ১/৫/৭১ তারিখে আসামী জেলা পিস কমিটির চেয়ারম্যান ছিল এ প্রমাণেরও কোন দলিল বাদী পক্ষ দাখিল করেনি। ঐ সময় রকসী হোটেলে পিস কমিটির অফিস ছিল বা ঐ স্থানে আব্দুস সাত্তারকে আসামীর সম্মুখে হাজির করা হয়েছিল তারও কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং বাদীপক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে অপহরণ সংক্রান্ত অভিযোগ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

দ্বিতীয়-অভিযোগ হতেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। মন্তব্যে বলা হয়, আসামী বিভিন্ন জায়গায় সভা সমিতির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন তা মোটেই প্রমাণিত হয়নি। কোন বক্তৃতা বা দালিলিক প্রমাণ এ সম্পর্কে দাখিল হয়নি। এ মকদ্দমায় কোন সাক্ষী মৌখিক অভিযোগও করেনি। সুতরাং প্রমাণের অভাবে আসামী এই অভিযোগ হতে অব্যাহতি পেতে হকদার।

তৃতীয় অভিযোগে (১২১ দন্ডবিধি) শাস্তি দিতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় ট্রাইবুনাল বিপুল পরিশ্রম করেছেন। অভিযোগ ছিল তদানীন্তন বৈধ সরকারকে উচ্ছেদ করবার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে কুষ্টিয়া জেলা সদরে ও বিভিন্ন স্থানে রাজাকার বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করেছিলেন এবং উক্তরূপে রাজাকার বাহিনী গঠন করে বাংলাদেশ বৈধ সরকারী বাহিনীকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে ... যুদ্ধ ঘোষণা করেন বা যুদ্ধ ঘোষণার প্রয়াস নেন বা সহায়তা করেন। কিন্তু বাদীপক্ষের সাক্ষী বিশেষ করে পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী সাক্ষীদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রাদেশিক সরকারের অর্ডিন্যান্স বলে রাজাকার বাহিনী গঠিত ও পরিচালিত হয় এবং আমার মত বেসরকারী ব্যক্তির এইরূপ সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। তবুও মিঃ আর. কে. বিশ্বাস ২০ বছরের ইতিহাসের ফাঁদে আটকালেন আমাকে। দীর্ঘ ৪৪ পৃষ্ঠার রায়ে ২৮ পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন এই অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য। যদিও সাক্ষ্য প্রমাণ মোটেই ছিল না বা এ সম্পর্কে বাদীপক্ষ কোন সাক্ষীকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেননি বা কোন দলিলও প্রমাণিত হয়নি তবুও অতীত ইতহাস টেনে এনে রাজনৈতিক মন্তব্য দিয়ে রায়ের কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাস এমনই একটি বিষয় যা বিশ্লেষণকারীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ও মতবাদের উপর নির্ভরশীল। পাকিস্তানের পঁচিশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস বিভিন্ন দল বিভিন্নভাবে চিত্রিত করেছেন। কেউবা এঁকেছেন শোষণ ও বঞ্চনার করুণ চিত্র আর কেউবা এঁকেছেন দুধ ও মধুতে ভরা নহরের স্বপ্নিল চিত্র। বিচারকের দৃষ্টি নিরপেক্ষ, মন তার আবেগমুক্ত, কোন প্রান্তিকতার দোষে সে দোষী নয় তার রায় একান্তই নির্ভরশীল সাক্ষ্য প্রমাণের গন্ডীর মধ্যে। সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া কোন বিচারকের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করার ঝুঁকিগ্রহণ করা আদৌ উচিত নয় বা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের বক্তৃতার উপর আদৌ কোন গুরুত্ব দেয়া উচিৎ নয়। দুর্ভাগ্যবশত প্রদত্ত রায়ে অনেক রাজেনৈতিক ইতিহাসই স্থান পেল।

১৯৫৪ সনে নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, ১৯৫৬ সনের শাসনতন্ত্র এবং ঐ শাসনতন্ত্রের অধীনে ১৯৫৯ সনে নির্বাচনের প্রস্তুতি, ১৯৫৮ অক্টোবরে আইয়ুব খানের "মার্শাল ল" জারী ও শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা এবং পশ্চিম পাকিস্তানী চক্রের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কবর রচনার মাধ্যমে ক্ষমতার মসনদ অধিকারের কাহিনী দিয়ে তৃতীয় অভিযোগের আলোচনা শুরু করেছেন মিঃ আর. কে. বিশ্বাস। ১৯৬২ শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে আইয়ুব খানের একনায়কত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন, আইয়ুব শাহীর এগারো বছরের শাসন কালে দেশের শোষণ ও দূর্নীতি, পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমির সবুজ শস্যভান্ডারে রূপান্তর, জলসেচ ব্যবস্থা, পাহাড় কেটে রাস্তা গড়া, ইসলামাবাদে রাজধানী নির্মাণ ইত্যাদি সম্পর্কে ও মন্তব্য করেছেন। ১৯৬৫ সনে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অযথা(?) যুদ্ধ ঘোষণা, সশস্ত্র বাহিনীর খরচার সিংহভাগ পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর থেকে আদায়, যুদ্ধের যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতির বোঝা পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর চাপানোর প্রয়াস এবং এসব থেকে বাঙ্গালীর নূতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি আলোচনাও স্থান পেল রায়ে। রাজনৈতিক ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদেরকে শোষণ করে এদেশকে

www.pathagar.com

কলোনীতে রূপান্তর করা এবং ২৩ বছরে সীমাহীন শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানীদের গড় পড়তা আয় বৃদ্ধির কথাও বর্ণিত হল। শ্রদ্ধেয় বিচারক আরও মন্তব্য করলেন, এইসব শোষণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৬ সনে আওয়ামী লীগ জাতির সম্মুখে ৬ দফা ফর্মুলা তুলে ধরে। আর এই ছিল বাঙ্গালী জাতির আন্দোলনের মূল প্রেরণা ও তাদের বাঁচবার একমাত্র সনদ।

১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯-এর মাঝ পর্যন্ত জনগণের এক দুর্বার ঢেউ গোটা পাকিস্তানকে গ্রাস করে নেয় এবং এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ আইয়ুব খান নেতৃবৃন্দকে গোলটেবিল কনফারেন্স আহবান করেন যেখানে ভুট্টো ও মওলানা ভাসানী ছাড়া সবাই যোগদান করেন। শেখ মুজিবর রহমান তার শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবসমূহ সেখানে পেশ করেন। ১৯৬৯-এর ১৩ই মার্চ তারিখে আইয়ুব খান দু'টো দাবী মেনে নেন যথা ফেডারেল পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র এবং জনসাধারণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন, কিন্তু তিনি ২৪শে মার্চ তারিখে নিজের ওয়াদা রক্ষা না করে বেআইনীভাবে ও শাসনতন্ত্র বিরোধ পদক্ষেপগ্রহণ করে সেনাবাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে সরকারের দায়িত্ব দিয়ে সরে পড়লেন। বিচারকের ভাষায় আইয়ুব খান জাতির সঙ্গে গাদ্দারী করলেন। জাতির উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়া খানের ২৬শে মার্চ ও ২৮শে নভেম্বরের ভাষণ, নির্বাচনী ওয়াদা, ১৯৭০ সনের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার এবং এই অর্ডারের মধ্যে অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহের কথাও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শ্রদ্ধেয় বিচারক। ১৯৭০ সনে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাধিক্য, শাসনতন্ত্র প্রণয়নে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব ও খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কমিটি নিয়োগ, ১৯৭১ জানুয়ারীর মাঝামাঝি সময়ে ইয়াহিয়া মুজিব বৈঠক, ঐ মাসেই মুজিব-ভুট্টো বৈঠক, পরবর্তী সময়ে গণপরিষদ বর্জনের জন্য ভুট্টোর হুমকি, ৩রা মার্চের গণপরিষদ বৈঠকের তারিখ পরিবর্তন এবং এ ব্যাপারে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ইত্যাদিও বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে, রায়ের পাতায় পাতায়। এরপরেই মন্তব্য করেছেন শ্রদ্ধেয় বিচারক মিঃ আর. কে. বিশ্বাস জনসাধারণ শেখ মুজিবর রহমানকে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করবার জন্য উদাত্ত আহবান জানায় কিন্তু শেখ সাহেব ৩রা মার্চের জনসভায় ধৈর্যের আহবান জানিয়ে শাসনতান্ত্রিক পথেই আন্দোলন চাপিয়ে যাবার উপদেশ দেন। ইয়াহিয়া খানের ৬ই মার্চের রেডিও ভাষণ, শেখ সাহেবের ৭ই মার্চের জনসভায় শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক, ১৫ই মার্চ হতে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক, ভুট্টোসহ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের ঢাকায় আগমন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ, আলোচনার অগ্রগতি, মার্চের প্রথম থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত গোপনে গোপনে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

ইয়াহিয়া খানের ধুর্তমী, ঢাকায় যুদ্ধাস্ত্র আমদানী সৈনিকদের পরিবারবর্গ পশ্চিম পাকস্তানে প্রেরণ ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ করে শ্রদ্ধেয় বিচারক মন্তব্য করেছেন

www.pathagar.com

যে, ইয়াহিয়া খানের ঢাকা আগমন ছিল গণহত্যা যজ্ঞের একটা আবরণ। চট্টগ্রামের যুদ্ধ জাহাজ হতে অস্ত্র খালাস, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে সরকারী কর্মচারী ও নাগরিকদের উপর সৈনিকদের গুলীবর্ষণ, পাক আর্মীর দ্বারা সাম্প্রদায়িক ও গোত্রীয় দাঙ্গা শুরু এবং সর্বপরী ২৫ তারিখ রাত এগারোটার সময় ইয়াহিয়া খানের পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে মানব ইতিহাসের বৃহত্তম গাদ্দারী সংগঠিত হওয়া এবং সেই সঙ্গে সারা প্রদেশে গণহত্যার করুণ চিত্র এঁকেছেন মিঃ আর. কে. বিশ্বাস। আরও সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে মাননীয় বিচারক ঘটনা পরম্পরায় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন যে ইয়াহিয়া খানের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই গণহত্যার পর বাঙ্গালীর স্বায়ত্বশাসনের দাবী স্বাধীনতার দাবীতে রূপান্তরিত হল, লক্ষ লক্ষ যুবক মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আওয়ামী লীগ এম. এন. এ; এম. পি-রা মুক্ত এলাকায় মিলিত হল এবং গণপরিষদ গঠন করে ১৯৭১ সনের ১০ই এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণার অনুমোদন দান করেন। মুজিবনগরে অন্তর্বর্তীকালীন বাংলাদেশ সরকার গঠন, পাক সৈনিকদের জোরপূর্বক বাংলাদেশ দখল, দখলকালীন সময়ে দালালদের সহযোগীতা এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর যুক্ত বাহিনীর কাছে পাক সৈন্যের আত্মসমর্পণের কাহিনীও রায়ে স্থান পেল। শ্রদ্ধেয় বিচারক মন্তব্য করলেন আসামী স্বাধীনতা সংগ্রামকালে এই দেশের অভ্যন্তরে বাস করেছে এবং পাক আর্মীর হুকুমে জেলা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে গণহত্যায় সহযোগিতা করেছে। এরপর আব্দুস সাত্তারের অপহরণ জনিত অভিযোগ সম্পর্কে যে সমস্ত সাক্ষীকে অবিশ্বাস করা হয়েছে তাদের সাক্ষ্য থেকেই বিশেষ বিশেষ উক্তি এনে একের পর এক যোগ দিলেন। অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কহীন আব্দুল গণি ও ইব্রাহীম খলিলের অসমর্থিত সাক্ষ্যকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে মন্তব্য করলেন, "যদিও এই দুই জন সাক্ষী গ্রাম্য ব্যক্তি এবং শেষ পর্যায়ে তাদেরকে সংগ্রহ করা হয়েছে তবুও ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে দালালির বিচারে আমি গুরুত্ব আরোপ না করে পারিনা, ওরা কোন প্রকার জড়তা না করে দিলখোলা সাক্ষী দিয়েছে সুতরাং অবিশ্বাস করবার কিছুই নাই।"

তিন নম্বর অভিযোগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অর্থাৎ রাজাকার বাহিনী গঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন "যদিও আসামী তার জবানবন্দীতে বলেছেন যে রাজাকার বাহিনী প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক গঠিত হয় এবং তারা পুলিশ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এ ব্যাপারে তার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বা সংযোগ ছিল না ... কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে আসামী রাজাকার বাহিনী সংগঠন নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেছেন এবং তার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন বা সহায়তা করেছেন বা প্রয়াস পেয়েছেন।" মোকদ্দমার ১২নং সাক্ষী কুষ্টিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা এম. এ. গণি ১৪নং সাক্ষী জেলা এ্যাডজুট্যান্ট আনসার বাদী সাক্ষী হিসাবে যে প্রমাণ দিল অর্থাৎ "আনসার সংগঠনই রাজাকার সংগঠনে পরিণত হয়, জেলা রাজাকার এ্যাডজুট্যান্টের অফিস কালেক্টরেট

www.pathagar.com

অফিসে অবস্থিত ছিল রাজাকার সংগঠন পুলিশ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল থানার অধীনে তারা কর্তব্যরত ছিল এবং এমনকি ১২নং সাক্ষী নিজ হাতে তাদের মধ্যে প্রতি মাসে মাহিনা বিলি বন্টন করেছেন" এসব সাক্ষ্য প্রমাণ মাননীয় বিচারক আদৌ উল্লেখ করলেন না। শ্রদ্ধেয় বিচারকের দৃষ্টিতে আমার গুরুত্ব ছিল'অসীম অর্থাৎ আমি একজন সাধারণ নাগরিক ও বেসরকারী ব্যক্তি হলেও রাজাকার প্রতিষ্ঠানের মত একটি সশস্ত্র বাহিনীর সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব নাকি আমার উপরই ন্যাস্ত ছিল। শ্রদ্ধেয় বিচারক যে ইজ্জত ও মর্যাদা দিলেন তাতে দুঃখ ছিলনা, ছিল জ্বালা, ছিল কঠোর শাস্তির বিধান। রায়ের শেষে শ্রদ্ধেয় বিচারক লিখলেন "ফাঁসী আসামীর প্রাপ্য কিন্তু একজন সাফল্যজনক আইনজীবী হিসাবে এই জেলায় আসামীর যে অতীত সেবার অবদান রয়েছে তাতে মৃত্যুদন্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশই উপযুক্ত শাস্তি।"

চতুর্থ অভিযোগেও আমাকে দোষীসাব্যস্ত করা হল। অভিযোগে দোষীসাব্যস্ত করতে গিয়ে যে যুক্তির অবতারণা করলেলন তার শতকরা ৯৫ ভাগ ছিল রাজাকার সংগঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে। অর্থাৎ ১২১ ধারায় যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি করে শ্রদ্ধেয় বিচারপতি মন্তব্য করলেন যে পিস কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে আসামী রাজাকার গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেছেন এবং রাজাকার বাহিনীর মাধ্যমে পাক আর্মীদের সহায়তা করেছেন, সেহেতু পিস কমিটির চেয়ারম্যান থাকা অপরাধ হয়েছে। পিস কমিটির মাধ্যমে রিলিফের খাদ্য ও সাহায্য বিলি-বন্টন হত এই উক্তির সমর্থনে তিন জন সাক্ষী থাকলেও শ্রদ্ধেয় বিচারক রায়ে লিখলেন," দখলদার আমলে আসামী যে কোন মানব সেবার কাজ করেছে এমন কোন প্রমাণ নেই। " সুতরাং এই অভিযোগের দায়ে শাস্তি প্রদান করা হল পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদন্ড।

পঞ্চম অভিযোগে অর্থাৎ উপনির্বাচনে অংশগ্রহণের দায়ে শাস্তি নিতে হল আরও পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য শাস্তির পক্ষে যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় বিচারক পুনরায় রাজাকারের প্রশ্ন, আব্দুল গনি ও ইব্রাহীম খলিলের জবানবন্দী উল্লেখ করলেন যা ১২১ ধারার অভিযোগে আলোচিত হয়েছে। উপনির্বাচনের পর পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনের দিনই মার্শাল 'ল-এর ইতি হত, আর্মী ব্যারাকে ফিরে যেত আমার এই জবানবন্দীর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় বিচারক লিখলেন আসামীর এই উক্তির কোনই মূল্য নেই কেননা ঐ সময় বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করছিল এবং গোটা বাংলাদেশ তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বিচারকের ভাষায় একজন সেরা আইনজীবী হিসাবে এসব নাকি আমার

www.pathagar.com

জানবার কথা। সুতরাং এ অভিযোগও প্রমাণিত হয়েছে বলে মন্তব্য করলেন শ্রদ্ধেয় বিচারক এই অভিযোগে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রয়োগ করলেন। অবশ্য রায়ে বলা হল, সমস্ত শাস্তি গুলী-ই যুগপৎ চলবে।

রায়ের প্রতিক্রিয়া

মোকদ্দমা চলাকালীন সময়ে যে উদ্বেগ ছিল রায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা যেন সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে গেল। প্রাণ ও ইজ্জতের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। মানুষের পরীক্ষার জন্য বিপদ ও মঙ্গল উভয়ই তাঁর তরফ থেকে আসে, বিপদ মুছিবতে একমাত্র তিনিই শ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী ও সাহায্যকারী। তাই হাসিমুখে প্রশান্ত চিত্তে এই আঘাত মাথায় তুলে নিলাম। শাস্তি নিয়ে এমন এক পরিবেশে ফিরে গেলাম যেখানে নতুনত্বের কোন সন্ধান পেলাম না। জামীনেও বের হওয়ার উপায় ছিল না। হাজার হাজার দেশবাসী বিনা বিচারে কারাগারে আবদ্ধ অনেকের বিরুদ্ধেই এখনও কোন মোকদ্দমার তদন্তই হয়নি, অনেকের বিচারের দিনই ধার্য হয়নি, অজানা আশঙ্কায় তারা বিব্রত হচ্ছে। যে স্থানে ছিলাম সেখানেই ফিরে এলাম, আগের মতই চব্বিশ ঘন্টাকে পাড়ি দিতে হবে। তবে এতটুকু উন্নতি নিশ্চয়ই হল যে আশঙ্কা বা দুশ্চিন্তার কিছুই রইল না, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। সহ্য করবার অনেক কিছু আছে বাঁধ দেবার কিছু নাই।

আমার মোকদ্দমার রায় আমি হাসিমুখে গ্রহণ করলাম বটে, কিন্তু আমার শুভাকাংখী আপনজনের জন্য কি এটা সম্ভব ছিল? কয়েক হাজার জেলাবাসীর সঙ্গে আমার তিন পুত্র সউদ, আলী ও ওমর মোকদ্দমার শুনানী প্রত্যক্ষ করেছে। স্ত্রী ও কন্যারা প্রতিদিন খবর নিয়েছে, উদ্বেগভরা প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়েছে, প্রতিদিনই জেল থেকে আদালতে যাওয়ার প্রাক্কালে পথে এসে দাঁড়িয়েছে আর ওদের মনের আয়নায় আমার যে প্রতিচ্ছবি তার আলোকে আমার নির্দোষিতা কামনা করেছে। মোকদ্দমা বুঝবার বয়স ওমরের হয়নি। তাই আদালতের প্রশস্ত গৃহে দৌড়িয়ে কখোনও আব্বার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে, আর কখনও আদালতের কার্যপদ্ধতির দিকে সরলতার ছাপ ভরা চোখের চাহনী দিয়ে নীরিক্ষণ করেছে। অতীতে আব্বা যেভাবে কোর্টে দাঁড়িয়ে অন্যের মোকদ্দমা পরিচালনা করতেন আর আজকের মধ্যেও ওর চোখে কোন পার্থক্য ধরা পড়েনি। সুতরাং উদ্বিগ্নতার কোন ছাপই ওমরের মুখে ছিলনা। সউদ ও আলীর বুঝবার বয়স হয়েছে, প্রতিদিনই দশটা থেকে পাঁচটা সবকিছু দেখেছে, শুনেছে, আমার আড়াই ঘন্টা জবানবন্দীর প্রতিটি লাইন এবং আমার চার ঘন্টাব্যাপী বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ অনুধাবন করেছে। আমার দেওয়া যুক্তি, আমার মতবাদকে তাদের সরল কচি মন দিয়ে ওরা গ্রহণ করেছে। আব্বা অন্যায় করে নাই, এই বিশ্বাস ওদের মনকে দৃঢ়

www.pathagar.com

করেছে। প্রতিদিনই দুইবার বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে বীরত্ব সাহস ও ধৈর্যের সবক দিয়েছি। তাই রায় শুনে ওদের চোখের কোণে পানি দেখা গেলেও মুখের হাসি দিয়ে তার গতিরোধ করেছে। কিন্তু মুশড়িয়ে পড়েছে স্ত্রী ও কন্যারা, গুরুতর শাস্তির কথা শুনে হয়েছে বাকহীন, স্তব্ধ, কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি কেননা জুলুমের সামনে ভেঙ্গে পড়াই পরাজয়। আমার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের মনোবলের উপর আমার আস্থা ছিল, তাই আমার ধারণা ছিল যে সাময়িকভাবে মুসড়ে পড়লেও বিপদকে মুকাবিলা করবার মত ধৈর্য ও মনোবল নিশ্চয়ই তাদের শক্তি যোগাবে। তবুও কারাগার থেকে চিঠি পাঠালাম মাতৃরূপী কন্যা সেলিনাকে। মনের কোণে আমি যে আলোকের ছটা দেখেছিলাম তারই রূপ দিলাম কালির আঁচড়ে। ধৈর্য ও সাহসের উপদেশ দিয়ে লিখলাম আমার এই অপ্রত্যাশিত শাস্তি চার প্রকার মঙ্গল বয়ে আনবে। প্রথমতঃ যারা আমার শত্রু ছিল তারা এই গুরুতর শাস্তিতে মনের অতুলনীয় তৃপ্তি পাবে। নূতন করে শত্রুতা করার বা আরও মোকদ্দমা সৃষ্টি করবার প্রয়োজনবোধ করবে না। শাস্তি লঘু হলে আবার হিংস্র খেলায় মেতে উঠত। দ্বিতীয়তঃ আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাংখীরা যারা দূরে ছিল এবং অতীতের রাজনৈতিক প্রচারণার স্বীকারে দুরত্বের দেওয়াল খাড়া করেছিল তারা নিশ্চয়ই ভুল বুঝতে সক্ষম হবে এবং দুরত্বের দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলে তারা কাছে এগিয়ে আসবে। গুরুতর শাস্তি তাদের মনে বেদনার সৃষ্টি করবে এবং তাদের এ যাবৎ নির্লিপ্ততার জন্যে অনুশোচনার আগুনে পুড়বে। তৃতীয়তঃ অনেক নেতৃবৃন্দ প্রচেষ্টা চালিয়ে টাকা খরচ করে নিজেদের উপর সরকারের চাপানো গুরুতর অভিযোগ লঘু করেছে, নিজেদের মুক্তি খরিদ করেছে, কিন্তু কর্মী বা অনুসারীদের কথা ভেবে দেখেনি। আমার রাজনৈতিক জীবনের অনেক অনুসারীই মিথ্যা মোকদ্দমায় যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়েছে, সেখানেও আমার একার জন্য মুক্তি খরিদের কোন প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং আমার তৃপ্তি এইটুকু যে, আমার অনুসারীদের সঙ্গে আমি গাদ্দারী করিনি। তাঁরা আমাকে আরও ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। চতুর্থতঃ আমি জালেমের বর্বর জুলুমের শিকার হয়েছি--আঘাতের পরিমান বেশী হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই মজলুম হওয়ার কারণে স্রষ্টার প্রতিশ্রুত করুণা ও সাহায্য পাওয়ার হকদার। সামান্য কয়েক দিনের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মঙ্গলের বাস্তব প্রমাণ পেলাম। আর চতুর্থ মঙ্গল প্রাপ্তীর আশায় দিন গুনছি। **নিশ্চয়ই সে শুভক্ষণ আসবে--আসবে অন্ধকার ভেদ করে উষার আলো নিয়ে প্রভাতের স্নিগ্ধতা নিয়ে, ফুলের পাপড়িতে জমে থাকা ভোরের শিশিরের পবিত্রতা নিয়ে।**

অধ্যায়-১২

জাতীয় সংসদের নির্বাচন

আমার মোকদ্দমার ব্যস্ততার মধ্যে ক্ষমতাসীনদের প্রত্যক্ষ তদারকীতে ও সৃষ্ট পরিবেশে স্বাধীন বাংলাদেশে 'জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার'

www.pathagar.com

আদর্শসহ নূতন সংবিধানের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ৭ই মার্চ তারিখে। এই কথাগুলো ক্ষমতাসীনদের প্রচারণার অংশ বিশেষ যা সরকার সমর্থিত খবরের কাগজগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হরফে স্থানলাভ করে। অবাধ, স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ঢাক ঢোল পিটে। শেখ মুজিব নির্বাচনী অফিসারদেরকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। সরকারী দল হউক, আর বিরোধী দল হউক, কারও প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য করা চলবে না, সকলের প্রতি সমব্যবহার করতে হবে। গণতান্ত্রিক রীতি-রেওয়াজ ও মূল্যবোধের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রধান নির্বাচনী কমিশনারও নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বেই সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিয়ে তার বেতার ভাষণে উক্তি করলেন ঃ "আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি সরকারের আইন ও শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ ভোটগ্রহণের দিন সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।" জেল ডাক্তারের হাজতী কয়েদীদের খাদ্যের ভেজাল শূন্যতার সার্টিফিকেট দানের সঙ্গে এই অবস্থার তুলনা করা চলে। মাছ, তেল, ডালডা, আটা ইত্যাদি খালি চোখে দেখেই ডাক্তারকে সার্টিফিকেট দিতে হয়। সার্টিফিকেট দেওয়ার পর খাদ্যে ভেজাল আছে বলে যদি কেউ হৈ চৈ করে, তবে তাকে দুষ্ট প্রচারণা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। রন্ধনপাত্র বা চুলোতে জ্বালানী কাঠের অপরাধে খাদ্যের স্বাদ খারাপ হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ভেজালের সমর্থনে রায় দেওয়া যেতে পারেনা। সুতরাং বৃদ্ধকালে তরুণী ভার্যাগ্রহণ করে মোটা অংকের জীবন বীমা করে রাখার মধ্যে যে নিরাপত্তা ও স্বস্তি পাওয়া যায়, আগাম ডাক্তারী সার্টিফিকেট লাভ করে কন্ট্রাকটার সাহেবও এইরূপ নিরাপত্তা ও স্বস্তিবোধ করে থাকেন।

স্বাধীন, নিরপেক্ষ, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের একটি রূপ এই, এবার অন্য রূপটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। দালাল আইনে প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তি কারারুদ্ধ, হাজার হাজার কারারুদ্ধ নেতা ও কর্মীবৃন্দ কারাগারে ধুকছে। রাজনৈতিক অপরাধের কারণে ভোটদানের অধিকার হরণ করা হয়েছে আইন করে। আর লক্ষাধিক ব্যক্তির উপর হুলিয়ার প্রেতাত্মা ভর করে আছে। এই সমস্ত ব্যক্তিদের শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারই হরণ করা হয়নি, অর্থনৈতিক বুনিয়াদও ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, সম্পত্তি হেফাযত ও রক্ষণা-বেক্ষণের নামে। এই দুই লক্ষাধিক ব্যক্তিদের পরিবার-পরিজন যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে ভীতি ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সমাজে বাস করছে সরকার বা সরকারী দলের বিরুদ্ধে সামান্যতম সমালোচনা করারও সাহস বা পরিস্থিতি তাদের নেই। নিরাপত্তার অভাব ও অর্থনৈতিক দুর্গতিই তাদের সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে জুড়ে রয়েছে। সুতরাং ১৯৭০ সনের নির্বাচনে ভোট সংখ্যার দিক দিয়ে যারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অধিকারী ছিল (জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগ) তাদেরকে রাষ্ট্রীয় শক্তির ছোবল দিয়ে পঙ্গু করে রাখা হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম দিন থেকেই এই দলগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে

www.pathagar.com

এবং পরবর্তী আমলে এই বিধি নিষেধের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে ময়দানে বিচরণশীল রাজনৈতিক দলসমূহের নীতি, আদর্শ ও ভূমিকার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করেছি। আওয়ামী লীগ গ্রহ হতে ১৯৭২ সনের ৩১শে অক্টোবর তারিখে ছিটকে পড়া উপগ্রহটির পরিচয় আমরা পেয়েছি। এ ছাড়া নাম জানা, না জানা ও লেবেল সর্বস্ব কয়েক হালি দল নির্বাচনী ময়দানে ভর্তি ফি দিয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করলেও তাদের খেলা দেখে দর্শকরা মোটেই উৎসাহবোধ করেনি। ১৪টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। দলগুলি হচ্ছে ঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর গ্রুপ), বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী গ্রুপ), বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি (মনি সিং), বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, বাংলার কমুনিষ্ট, শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল, লেলিনবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি, বাংলা জাতীয় লীগ, শ্রমিক ফেডারেশন পার্টি, বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস, বাংলাদেশ জাতীয় গণতন্ত্রী দল, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন। মোট ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ সবক'টি আসনেই প্রার্থী মনোনীত করে। প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে বিভিন্ন দলের অবস্থা নিম্নরূপ ঃ মোজাফফর ন্যাপ ২২৩ জন, ভাসানী ন্যাপ ১৭০ জন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ২৩৬ জন, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ৬ জন, বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি ৪জন, বাংলা জাতীয় লীগ ১৩ জন, বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি ৩ জন, লেলিনবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ২জন, শ্রমিক ফেডারেশন ৩জন, জাতীয় কংগ্রেস ২জন, সমাজবাদী দল ৩ জন, জাতীয় গণতন্ত্রী দল ১ জন, এবং বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন ১জন। এর উপর রয়েছে কিছু স্বতন্ত্র প্রার্থী। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে ৪টি দল ছাড়া অন্যান্য দলগুলোর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেননা তাদের প্রার্থী এতই নগণ্য যে, সবকটি আসন দখল করলেও তারা দলগতভাবে সংসদে কোন প্রভাবই সৃষ্টি করতে পারবে না। মোজাফফর ন্যাপ কোন দিনই প্রভাবশালী ছিলনা। ১৯৭২ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দল যে প্রভাব সৃষ্টি করেছিল, তা জানুয়ারি ৭৩-এর বিপর্যয়ে স্তিমিত হয়ে যায়। নেতৃত্বের দুর্বলতা ও তোষামদে রাজনীতির কারণে এদের প্রতি জনসাধারণের কোন আকর্ষণ ছিলনা। তৃতীয় দল ভাসানী ন্যাপ সরকার বিরোধী দল বটে, কিন্তু দলের আভ্যন্তরীণ আদর্শগত বিরোধ, নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে মওলানা ভাসানীর অসংলগ্ন উক্তি ইত্যাদি কারণে এই দলের নিষ্ঠা সম্পর্কে জনসাধারণ ছিল সংশয়পূর্ণ। সরকারী দলের তুলনায় ভাসানী ন্যাপের প্রচারযন্ত্র ও যানবাহনের সুবিধাদি ছিল অত্যন্ত নগণ্য এবং গোটা সরকারী দলের প্রচার ও অপপ্রচারের মুখে শুধুমাত্র মওলানা ভাসানীর ব্যক্তিত্ব নির্বাচনে জয়লাভ করবার জন্য মূলধন হিসাবে যথেষ্ট ছিল না। চতুর্থ দল জাসদ প্রচার প্রপাগান্ডায় এবং তরুণ কর্মী সংগ্রহে সরকারের মোকাবিলা করতে সক্ষম হলেও জনসাধারণের মনে কোন আছরই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান থেকে ছিটকে এসে মাত্র চার মাসের মধ্যে নিজেদের বৈশিষ্ট তুলে ধরা মোটেও সম্ভব ছিলনা। এই কম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠেনি এবং যেসব স্থানে

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে সেখানে ছাত্র ও তরুণদেরই আধিক্য। মাত্র ক'মাস আগেও এরা আওয়ামী লীগের সঙ্গে একাত্ম ছিল আর বর্তমানে উগ্র সমাজতন্ত্রের দাবীদার ছাড়া কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না। আওয়ামী লীগ বিরোধী দলগুলোর এই সমস্ত দুর্বলতা ছাড়াও নিজেদের মধ্যে ঐক্যের অভাব আওয়ামী লীগের শক্তি ও প্রভাবকে আরও বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে। ভাসানী ন্যাপ ও জাসদের মধ্যে নির্বাচনী ঐক্যের অভাব উভয় দলের পরাজয়কে শোচনীয়তার রূপ দিয়েছে। দলগুলোর অবস্থা বিশ্লেষণের পর সরকারের অবাধ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিষ্ঠা ও সততা সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। ১৯৭০ সনের সাধারণ নির্বাচনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী দলগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা, ভোটাধিকার হরণ করা এবং আইনের সাহায্যে তাদেরকে নির্বাচনী ময়দান থেকে দূরে রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী দলগুলির অনেক নেতা-কর্মীকে প্রেসিডেন্টের ৫০নং আদেশ বলে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়েছে। কয়েকটি বিরোধী পত্রিকার প্রকাশনা অনেক পূর্বেই বন্ধ করা হয়েছে। এই সমস্ত পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকরা এখনও কারাগারে আবদ্ধ হয়ে আছে, বিরোধী দলসমূহের অনেক প্রার্থীও কারাগারে আবদ্ধ। এইরূপ 'স্বাধীন' পরিবেশে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠান দুই ডজন মন্ত্রী, এক ডজন সরকারী তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র, সরকারী জীপ, ট্রাক, পিকআপ, হাওয়াই জাহাজ, হেলিকপ্টার, স্পিডবোট, মটরলঞ্চ ইত্যাদি, রেডক্রসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যানবাহন, নিজেদের অঢেল অর্থ ও বিদেশ হতে প্রাপ্য রিলিফ দ্রব্যের বিপুল সুযোগ-সুবিধাসহ নির্বাচনী ময়দানে উল্কার গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সরকারের নিরপেক্ষতা অবলম্বনের সকল ব্যবস্থাই পাকাপাকি করলেন। সমালোচকদের জবাবে আওয়ামী লীগ সম্পাদক দাঁত ভাঙ্গা জবাবে বললেন বাংলাদেশের আদর্শ শুধু গণতন্ত্র নয় সমাজতন্ত্রও বটে, সুতরাং রাশিয়াসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ন্যায় দলীয় প্রধান ও কর্মীদের সরকারী হাতি ঘোড়ায় চড়বার এখতিয়ার আছে। এ কথা মোটেই মিথ্যা নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী ১৪টি দলই সমাজতন্ত্রের দাবীদার হওয়ায় আওয়ামী লীগের এই অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে তাদের মুখ বন্ধ করে কিল হজম করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এইরূপ সমালোচনায় লাভ এইটুকু হল যে, আওয়ামী লীগ সম্পাদক জিল্লুর রহমান নিজেকে ব্রেজনেভের সঙ্গে তুলনা করার মওকা পেলেন এবং সরকারী সুযোগ-সুবিধা ভোগের উদ্যামতা আরও বৃদ্ধি পেল। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদি পাকাপোক্ত করবার জন্য নির্বাচনের শেষের দিকে সরকারী দলের তরফ থেকে আরও একটি মোক্ষম ব্যবস্থা গৃহীত হলো। বাংলাদেশ আওয়ামী যুব লীগের প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনি ৮ই মার্চ থেকে শুদ্ধি অভিযানের পরিচালনার কথা ঘোষণা করে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৭ই মার্চ তারিখে, ফলাফলও ঐদিনই বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আসতে শুরু করবে। পরদিনই অর্থাৎ ৮ তারিখ থেকেই শুদ্ধি অভিযানের হুমকি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বলা হল এই শুদ্ধি অভিযান একটি গণসংগ্রাম। দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, মজুতদারী, ঘুষ, সাংস্কৃতিক বন্ধাত্ব ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনই নাকি এই শুদ্ধি অভিযানের মূল লক্ষ্য। প্রেসিডেন্টের ৯নং আদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশ সার্ভিসেস অর্ডারের মৌজেজা সরকারী কর্মচারীগণ ইতিমধ্যে ভালভাবেই টের পেয়েছেন। সুতরাং ৭৭ জন রিটার্নিং অফিসার, ৬০৫ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও ১৫০৪২ টি ভোট কেন্দ্রের জন্য নিয়োজিত ১ লক্ষ ৯৫ হাজার প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার শুদ্ধি অভিযানের ঝুঁকি নিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। বিরোধী দলগুলো হৈ চৈ ও চিৎকারের মধ্যে ১১টি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হল এবং শেষ পর্যন্ত ৭/৮ টি আসন ছাড়া সব আসনেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়জয়াকার। যদিও যুবলীগ শুদ্ধি অভিযানের ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছিল যে নির্বাচন বা নির্বাচনী ফলাফলের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই তবুও সুখের বিষয় যে, নির্বাচন বা নির্বাচনী ফলাফল দৃষ্টে শুদ্ধি অভিযানের আর প্রয়োজন হয়নি। সরকারী কর্মচারীরা এতই নিষ্ঠার সাথে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করেছেন যে, তাদের আর শুদ্ধির কোন প্রয়োজন ছিলনা।

অধ্যায়-১৩

কারাগারে কয়েদীর জীবন

কারাগারে আমি এখন হাজতী নই, আমি কয়েদী। কয়েদী হিসাবে কারাজীবনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। গত শতাব্দীতে সমুদ্রপারের এক বিদেশী হাতী এদেশের কালা আদমীদের দাস বানিয়ে রাখবার জন্য আইনের নামে যে সমস্ত বর্বর ও হিংস্র বিধি-বিধান রচনা করেছিল, সেগুলো সবই অক্ষত অবস্থায় বিরাজমান। দেশের সাধারণ আইনে দন্ডিত অপরাধীরা সব সময়ই এই বর্বর বিধি-বিধানের শিকার হলেও রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত ব্যক্তি অথবা দন্ডপ্রাপ্ত অপরাধীরা তুলনামূলকভাবে উন্নততর পরিবেশে জীবন যাপন করেছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সনের মধ্যে বিভিন্ন সরকারের আমলে রাজনৈতিক প্রশ্নে যত ব্যক্তিকেই কারাগারে যেতে হয়েছে সবাইকে উন্নত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং হয়রানীমূলক বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার জন্যেও বিভিন্ন পথ খোলা ছিল। আটকাদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন করা, হাইকোর্টের বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত স্ক্রীনিং বোর্ডের কাছে হাজির হয়ে মুক্তির প্রশ্নে সুপারিশ লাভ করা, বাহিরের রাজনৈতিক আন্দোলনের সুযোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি যে সমস্ত শাসনতান্ত্রিক পথ খোলা ছিল তা আজ সবই রুদ্ধ। জেল কোডের যে বর্বর বিধানগুলো বিদেশীদের বিদায়ের পর উপরোক্ত শাসনতান্ত্রিক সুযোগ- সুবিধার কারণে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার সেগুলোকেই আবার সতেজ করে নিয়েছেন। অতীতের শাসনতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধাগুলো স্বাধীনতার শুরুতেই বাতিল করে দেওয়ার কারণে অবিচার, অবস্থা ও উৎপীড়নকে রোধ করবার জন্য কোন শক্তি বা প্রভাবের

www.pathagar.com

অস্তিত্ব রইলনা। সুতরাং সাধারণ হাজতী কয়েদী রাজনৈতিক হাজতী বা কয়েদী আজ একই কাতারে। অবশ্য সাধারণ আইনে ধৃত ব্যক্তি বা দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীরাও মানুষ। আল্লাহর সৃষ্ট এই দুনিয়ায় পাপ ও পূণ্যের পরিবেশে গড়ে উঠা মানুষের বাঁচা, খাওয়া ও বাসস্থানের যে মৌলিক অধিকার তা খর্ব করবার কারও অধিকার নেই। চরম খোদাদ্রোহী শাক্তিকেও বিশ্ব স্রষ্টা জীবন ধারণের মৌলিক কোন উপাদান থেকেই বঞ্চিত করেননি। বেঁচে থাকার কারণেই খোদাদ্রোহী শক্তি স্রষ্টার পথে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পায়, অনুতাপের আগুনে অতীত জীবনের আবর্জনা পুড়িয়ে দিয়ে আনুগত্যের ভিত্তিতে নতুন জীবন গড়ে তোলে। চিরন্তন পাপ বলে কিছু নেই পাপীর জন্যেও প্রত্যাবর্তনের পথ, অনুতাপের পথ খোলা, পুণ্যের মই বেয়ে এগিয়ে চলবার অধিকার তার রয়েছে। এ পথ রুদ্ধ করবার বা মৌলিক অধিকারকে ছিনিয়ে নেবার কোন অধিকার স্রষ্টা মানুষকে দেন নাই, যারা এই মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হয় তারাই সীমালংঘনকারী তারাই জালেম অত্যাচারী।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১২ মাস অবস্থানের পর কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে প্রায় সাড়ে ৩ মাস বাস করবার সুযোগ পেলাম। প্রিয়জনদের অতি কাছাকাছি জেলা কারাগারে চাঁদির জুতা মেরে আরও কয়েক মাস প্রিয়জনের নৈকট্যের সুযোগ লাভ করা যেত। অধিক শাস্তিপ্রাপ্ত আসামী জেলা কারাগারে রাখা হয়না, কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়, জেল কোডের এই সাধারণ বিধানের ব্যতিক্রম হতে পারে অর্থের বিনিময়ে। আমার শাস্তির অনুরূপ শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীকে প্রায় এক বছরকাল পর কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আপীল দায়েরের সময় অর্থাৎ দুই মাস সময় দিতেও জেলার ও ডেপুটি জেলার আইনগত অসুবিধার প্রশ্ন উত্থাপন করলেন। তাই ২৬/৪/৭৩ তারিখে অপ্রত্যাশিতভাবে মাত্র তিন বছর শাস্তিপ্রাপ্ত অপর ২ জন আসামীসহ যশোহর কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত হলাম। সাত বছর দন্ডপ্রাপ্ত আসামী জেলা কারাগারে জেলার ও ডেপুটি জেলারের আশীর্বাদ খরিদ করে রয়ে গেল, কিন্তু ৩ বছরের দন্ডপ্রাপ্ত জেল বশীকরণ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ বেচারাগণ আমার সঙ্গী হয়ে দুর্গম পথ পাড়ি দিল। হাজতী ও কয়েদীদের হেফাজতকারীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত জেল কর্তৃত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সমাজের কোলাহল থেকে মুক্ত এক পরিবেশে নিজেদের কর্তৃত্বের জৌলুষে বিভোর হয়ে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেন। চার দেওয়ালের মাঝে এ জীবনে তাই অনেক কিছুই থাকে সমাজের চোখের আড়ালে। দেওয়ালের মাঝে ও দেওয়ালের বাহিরে এদের আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রদর্শনীতে আর অনেকেরই শশ্রুমন্ডিত চেহারায়, বাহিরের সমাজে অন্যান্য বিভাগের সরকারী কর্মচারীদের তুলনায় এরা মেষ শাবকের মত নিরীহ ভাল মানুষ, কিন্তু চার দেওয়ালের মাঝে এরা নরখাদক নেকড়ে বাঘ, উর্ধ আকাশে বিচরণশীল শকুনরি মত প্রখর দৃষ্টিশক্তির অধিকারী এবং ধূর্ত শৃগালের সব বিদ্যাই এদের রপ্ত।

www.pathagar.com

যশোহর কারাগারে এলাম

রাত প্রায় ৯টার দিকে যশোহর কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজির হলাম, ৩ জন মার্জিত আচরণ সম্পন্ন পুলিশ কনেষ্টবল ও নায়েকের প্রহরাধীনে। জেলার সাহেবের আচরণে মুগ্ধ হলাম। আমার শাস্তির কথা শুনে আঁতকে উঠলেন। তবে বন্ধুদের কাছে পরিচয় পেয়ে সমীহ করলেন এবং মালামালের কোন প্রকার তল্লাশী ব্যতিরেকেই ভিতরে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ঠাঁই--নাই, ঠাঁই--নাই ছোট এ তরী! কোথাও স্থান নেই--অবশেষে হাসপাতালের মেঝেতে সাময়িকভাবে স্থান করে নিতে হল। ২/৩ দিন পর জেলার সাহেবের প্রচেষ্টায় একজনের বাসপোযোগী সেল পাওয়া গেল--৩ জন মেঝেতে স্থান করে নিলাম। প্রায় দুই সপ্তাহ পর জেল পরিদর্শনের সময় স্থানীয় এস. ডি. ও. সাহেবের ইচছাপূরণ করতে গিয়ে জেলার সাহেব আমার জন্য আলাদা সেলের ও খাট, চেয়ার, টেবিলের ব্যবস্থা করলেন। এস. ডি. ও. সাহেবের সঙ্গে জেল গেটে দেখা অপ্রত্যাশিতভাবে বিনিয়ে বিনিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কি অবস্থায় আছি। সম্ভব মত সব ব্যবস্থাই করলেন জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। যশোহর কারাগারকে কয়েক বছর পূর্বে কেন্দ্রীয় কারাগারে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই মর্যাদাটুকু ছাড়া আর কোনই উন্নততর বৈশিষ্ট নেই। পাঁচশত কয়েদীর জন্য নির্মিত এই কারাগারে বাস করেছে প্রায় তিন হাজার হাজতী ও কয়েদী। বেশীর ভাগই দালাল আইনে আটক নির্দিষ্ট কি অভিযোগ তাদের জানা নেই, বিচার হবে কিনা, কবে হবে তাও তাদের কাছে অজ্ঞাত। হাজতী ও কয়েদীর এই চাপ সহ্য করবার মত রসদ ও কর্মী বাহিনীর প্রাচুর্য নেই এখানে। কারা অভ্যন্তরের সর্বত্রই অব্যবস্থা অনিয়ম, বিশৃংখলা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং সর্বোপরী শাসনযন্ত্রের প্রতিটি রন্দ্রে রন্দ্রে দুর্নীতি পরিবেশকে বিষময় করে রেখেছে। অতীতেও এসব যে ছিলনা তা নয় তবে নূতন স্বাধীনতার আমেজে সর্বত্রই শাসনযন্ত্রে যে অবনতি ও কর্মদক্ষতার ভাঁটা পড়েছে তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ এখানেও অব্যবস্থা ও দূর্নীতি উদ্যাম গতিতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। জেল কর্তৃত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক কর্মচারী এসব দূর্নীতির উর্ধে আছেন তবে তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, তারা কোন প্রভাবই সৃষ্টি করতে পারেননা। নিজে দুর্নীতিতে অংশগ্রহণ না করে অন্যান্যদের অবাধ সুযোগে বাধা না দেওয়ার নামই এখানে সততা। কারাগারের অনেক দুর্নীতির সঙ্গে বর্তমানে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জড়িত। সুতরাং সেসব ক্ষেত্রে নীরব ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া জেল অফিসারদের কোন গত্যন্তর নেই। আই. জি., ডি. আই. জি., সুপারিনটেনডেন্ট, জেলার, ডেপুটি জেলার, কেরানী, একাউন্ট্যান্ট, সার্জেন্ট-সুবেদার, জমাদার, ওয়ার্ডার, কয়েদী, সুপারভাইজার (মেট) কয়েদী পাহারা ইত্যাদি সমন্বয়ে পুরা জেল রাজত্ব পরিচালিত হচেছ। এই রাজত্বের আসল কর্মস্থল হচেছ কারা অভ্যন্তর। এখানে এত ভয়াবহ দুর্নীতি ও জুলুম বিরাজমান যে বিশেষ দুই একজন কর্মকর্তার পক্ষে রোধ করা মোটেই সম্ভবপর নয়। তিনি শাসনযন্ত্রের উর্ধস্থানে আসীন ব্যক্তি হলে ষড়যন্ত্রের স্বীকার হওয়ার আশংকায়, দূর্নীতি রোধের অযোগ্যতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হওয়ার দুশ্চিন্তায় দূরে

www.pathagar.com

থাকবেন, মধ্যম স্থানের অধিকারী হলে উভয় দিকের চাপে নিষ্পেষিত হবেন এবং নিম্নস্থানে আসীন ব্যক্তি হলে পদচ্যুত হবেন।

হাজতী ও কয়েদীদের সমাজ থেকে পৃথক করে রাখার স্থানই হচ্ছে কারাগার। এই পৃথক করে রাখার ব্যবস্থা অনন্তকালের জন্য নয় বরং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য। আটক থাকার কারণে সমাজের অনেক কিছু সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকলেও মানবীয় অধিকার থেকে এরা নিশ্চয়ই বঞ্চিত নয়। খাদ্য, চিকিৎসা, বিশ্রাম ও নিদ্রার স্থান, পরিজনদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ, প্রিয়জনদের খবরা খবরের জন্য পত্র আদান-প্রদান ইত্যাদি হাজতী কয়েদীদের অধিকার হিসাবে গণ্য। এই মৌলিক দাবীগুলোকে মিটিয়ে প্রতিটি অপরাধীর চারিত্রিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আগামী দিনের নাগরিক হিসাবে তাকে গড়ে তোলা প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থারই কর্তব্য। পূর্বেই বলেছি কারাগারের জীবন আনন্তকালের জন্য নয়, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের। মেয়াদ অন্তে যারা সমাজ জীবনে ফিরে যাবে তারা কি নির্মল চরিত্র নিয়ে ফিরে যাবে না আরও দূর্নীতি ও অপরাধ প্রবণতা নিয়ে ফিরে যাবে? সুষ্ঠু সমাজ জীবনের জন্য কোনটা কাম্য? সমাজ জীবনে অপরাধীরা ক্ষতস্বরূপ। এই ক্ষতকে নিরাময় করে গোটা দেহটাকে সুস্থ্য করে তোলাই সবার কাম্য। আর কারাগারগুলোকে অপরাধীদের চিকিৎসালয় হিসাবেই গড়ে তোলা উচিৎ। মানুষ সাধারণতঃ পরিবেশের দাস। সুতরাং কারাগারের গোটা পরিবেশটাই যদি এই ক্ষত নিরাময়ের উপযোগী না হয় তবে এটাকে চিকিৎসালয় না বলে শুড়িখানা বলাই ঠিক হবে। অসুস্থ্য মানুষ চিকিৎসালয়ে যায় সুস্থ হবার আশায়, সুস্থ মানুষ শুড়িখানায় গিয়ে মাতাল হয়। নেশার ঘোর কাটলে বাড়ি ফিরে আসে বটে, কিন্তু শুড়িখানা তাকে আবার হাতছানি দিয়ে ডাকে। নূতন অপরাধীরা অথবা সন্দেহ মূলকভাবে ধৃত নিরাপরাধ ব্যক্তি কারাগারে এসে অপরাধীদের পাল্লায় পড়ে বড় অপরাধের ট্রেনিং পায়, জেল কর্তৃপক্ষের খায়েশ মিটাতে দূর্নীতির সাগরে নিমজ্জিত হয়, মেয়াদ অনন্ত বাড়ী ফিরে যায় বটে, কিন্তু মাতালের শুড়িখানায় ফিরে আসার মত আবার জেলখানায় ফিরে আসার পথ খোঁজে। ছোট অপরাধী থেকে বড় অপরাধীতে উন্নিত হবার এই হচ্ছে সহজ সরল পথ। সমাজ ও সরকার অপরাধীকে লৌহ কপাটের অন্তরালে ঠেলে দিয়েই স্বস্তি পায়, কিন্তু উভয়ই এর ফলাফল সম্পর্কে উদাসীন। সমাজ জীবনে এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভাবনামুক্ত।

কারা অভ্যন্তরের ব্যবস্থাপনা

কারা অভ্যন্তরে গোটা ব্যবস্থাপনার চাবিকাঠি হেড ওয়ার্ডার বা সুবেদারের হাতে। তাকে কেন্দ্র করে জমাদার, ওয়ার্ডার, মেট পাহারা, রাইটার ইত্যাদি চব্বিশ ঘন্টা চক্রাকারে ঘুরছে। প্রত্যেকের কক্ষ পথ সুবেদার কর্তৃক নির্দিষ্ট, প্রত্যেকের গতি তার দ্বারাই নির্ধারিত। সুতরাং চক্রের গোলকধাঁধায় যে একবার পড়েছে গতির সঙ্গে

www.pathagar.com

তাল মিলে চলা ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর নেই। এরা সবাই সুবেদারের রঙে রঙিন। অন্য রঙে রঙিন হওয়ার চেষ্টা করা বিশাল মিছিলের ভীড় ঠেলে উল্টো দিকে চলার মতই অনতিক্রম্য।

বাসস্থান

কারাগারে হাজতী কয়েদীদের বেজায় ভীড় স্থানাভাবের সমস্যা সৃষ্টি করেছে, পঞ্চাশ জনের উপযোগী কামরায় চার/পাঁচশত মানুষের ভীড় জীবনকে দূর্বিষহ করে তুলেছে, বিশ্রাম ও নিদ্রার স্থানতো দূরের কথা, আয়াসে বসে থাকবার স্থান হতেও তারা বঞ্চিত। কারাগারের পরিধি ও আসন সংখ্যা রাতারাতি বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় তাই বিনা বিচারে আটক বন্দীদের জামিনের সুযোগ প্রদানের ও বিচার ত্বরান্বিত করে নির্দোষীদের খালাস প্রদানের মাধ্যমে কারাগারে ভীড় কমানোর ব্যবস্থা রয়েছে প্রতিটি দেশের আইনে। তাছাড়া বিনা বিচারে লক্ষাধিক মানুষকে কোনদিনই এ দেশে আটকিয়ে রাখা হয়নি। বিচারাধীন ব্যক্তিদের শতকরা ৯৫ ভাগই জামিনের সুযোগ গ্রহণ করত। শস্তিপ্রাপ্ত হলেও আপীলের শুনানী পর্যন্ত জামিনেই থেকে যেত এবং শেষ পর্যন্ত শাস্তি বহাল থাকলে কারাগারে আসতে হত। কিন্তু এই দেশের অদ্ভূত স্বাধীনতা দেশবাসীকে করেছে পরাধীন। বিচার পাওয়ার অধিকার নিয়েছে কেড়ে, জালেমের শীকারে পরিণত করে মানবীয় অধিকার হরণ করে নিয়েছে আর দুর্নীতিবাজদের শোষণের অবাধ সাধারণ লাইসেন্স প্রদান করেছে। কারাগারের সামান্য একটু বিশ্রাম ও নিদ্রার স্থানকে কেন্দ্র করে স্বাধীন দেশে হাজতী কয়েদীদের নিকট থেকে টাকাপয়সা কামাই করার যে জাল জেল কর্তৃপক্ষ বিছিয়ে রেখেছেন তা বিভৎস।

খাদ্য

শতাব্দীকাল পূর্বে বিদেশী শাসকরা এই দেশে হাজতী কয়েদীদের জন্য যে খাদ্য বরাদ্দ করেছিল তা এই দেশের মানুষের মনঃপুত না হলেও ক্ষুধার উপসমের জন্য যথেষ্ট ছিল। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত যদিও পুরানো জেল কোডেরই দৌরাত্ম ছিল তবুও 'দেশী ও বিদেশী' মিশ্র শাসনে নীতিবোধ ও দুর্নীতি পাশাপাশি অবস্থান করেছে। কিন্তু দেশী শাসনের পাল্লায় বিদেশী ভাষায় রচিত জেল কোড কার্য্যত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। আর তার ফলে ঘটি চোর পুকুর চোরে রূপান্তরিত হয়েছে। হাজতীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে জেলের সীমা বৃদ্ধি হয়নি তবে কন্ট্রাকটরের বিল বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েকগুণ এবং এই বিল তৈরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেল কর্তৃপক্ষের লালসা ও লোলুপ দৃষ্টির তীক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে সীমাহীন। পূর্বে হাজতীর সংখ্যা কম ছিল তখন এক ঘটি পানি নিলেও চুরী ধরা পড়েব এই ভয়ে কেউ ঘটি ডোবাতে সাহস পেত না। কিন্তু বর্তমানে হাজতীর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধির ফলে যে বৃহৎ জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে তাতে খাল কেটে দিলেও কমে যাবেনা এই ধারণাই সবার মনে বড় বালতি ডোবানোর দুঃসাহস সৃষ্টি করেছে। ফলে অখাদ্য, কুখাদ্য ও ক্ষুধাই হচ্ছে সাধারণ হাজতী ও কয়েদীদের নিত্য সহচর।

www.pathagar.com

চিকিৎসা

স্বাধীনতার আমেজ যশোহর কারাগারের চিকিৎসা বিভাগকেও স্পর্শ করেছে। কেন্দ্রিয় কারাগারে কমপক্ষে ৩ জন ডাক্তার থাকার কথা, কিন্তু এখানে মাত্র একজন। হাজতী কয়েদীদের সংখ্যা পাঁচশত থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩ হাজার, তবুও একজন ডাক্তারকেই চিকিৎসা করতে হচ্ছে। উপরন্তু অপ্রতুল ঔষধ চিকিৎসার কাজকে আরও কঠিন করে তুলেছে। কিন্তু যতটুকু ঔষধ, যতটুকু পথ্য সরকার ডাক্তার সাহেবের হাতে সোপর্দ করেছে তার সাহায্যে চিকিৎসা হয় শতকরা বিশ পঁচিশ ভাগ আর অবশিষ্ট পঁচাত্তর আশীভাগ ব্যবসার পণ্য দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। জেল হাসপাতালে ঠাঁই নাই অসম্ভব ভীড় কিন্তু সামান্য কিছু সংখ্যক ছাড়া সবাই এখানে ডাক্তার সাহেবের হোটেলের মাসিক বা পাক্ষিক চুক্তির স্থায়ী বোর্ডার। বোর্ডার ছাড়াও কিছু বাহিরের খরিদ্দার আছেন যারা নিজ নিজ ওয়ার্ডে বাস করেন কিন্তু হাসপাতালের হোটেল থেকে খাবার পেয়ে থাকেন। বাছাই করা হাজতী কয়েদীদের নিয়ে ডাক্তার সাহেবের চক্র তৈরী এবং এর তত্ত্বাবধান ও যাবতীয় কার্যাদি এই চক্রের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। সত্যিকারের রুগী মরণাপন্ন না হলে হাসাপাতালে ভর্ত্তি হবার সুযোগ পায়না কিন্তু সুস্থ মানুষ ভর্ত্তি ফি দিয়ে রোগগ্রস্থ হলে ভর্ত্তির ব্যবস্থা অতি সত্বর হয়ে যায়। সেই সঙ্গে উন্নতমানের খাবারও বরাদ্দ করা হয়। এর উপর আছে স্পেশাল ডায়েট যা অতিরিক্ত নগদ প্রাপ্তি বিনিময়ে ডাক্তার সাহেবের কলমের খোঁচায় পাওয়া যায়। ঔষধের অবস্থাও কিছুটা ডায়েটের মতই। সাধারণ হাজতী কয়েদীদের ভাগ্যে বড়ি ও ঔষধ মিশ্রিত পানি ছাড়া কিছু মেলেনা। ঔষধ নেই বলে অনেককে ফিরিয়ে দেওয়া হয় আবার কারও জন্য সরকারী টাকায় বাজার থেকে চড়া মূল্যে ঔষধ খরিদ করে এনে সরবরাহ করা হয়। এখানে রোগের চিকিৎসা হয়না - রোগীর চিকিৎসা হয়। একই ছাদের নীচে বসে বিভিন্ন প্রকার পক্ষপাতিত্বমূলক কাজ চলে, যার আসল তথ্য উদঘাটন করার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে সুষ্ঠ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তণের জন্য।

সাক্ষাৎকার

কয়েদী হাজতীদের প্রিয়জনদের সঙ্গে সাক্ষাৎকে কেন্দ্র করেও বিরাট দুর্নীতি গড়ে উঠেছে। উচচ শ্রেণীর হাজতী কয়েদীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ, তাই এ ক্ষেত্রে তারা দুর্নীতির শিকারে পরিণত হন না। কিন্তু এই দুর্নীতির খোরাক জোগাতে হয় সাধারণ হাজতী কয়েদীদের। জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যারা সাক্ষাতের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার তদারক করেন তারা পদে পদে অহেতুক বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করেন শুধুমাত্র শোষণের উদ্দেশ্যে। এদের মস্তিষ্ক এত উর্বর যে এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে তারা শোষণের কোন কৌশল বের করতে সক্ষম হবেন না। যাবতীয় বাধা বিপত্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার সহজ সরল পথ হচ্ছে

www.pathagar.com

সাক্ষাতের জন্য টাকা খরচ করা। এক খরচে বহু লাভ। প্রার্থীত ব্যক্তির অতি শীঘ্র সন্ধান পাওয়া যাবে, ঠাঁই হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবেনা, কথাবার্তার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে, আইন সঙ্গত এমনকি বেআইনী জিনিষপত্তরও গেটের মধ্য দিয়ে সিপাই সান্ত্রীর নাকের ডগা দিয়ে জেলের ভিতরে চলে আসবে, সাক্ষাতের বরাদ্দ দিন ছাড়াও যে কোন সময়, যতবার ইচছা সাক্ষাৎ হতে পারে। জেল কতৃপক্ষের গড়া ফাঁদের অপূর্ব চাকচিক্য ও নগদ লাভ, হাজতী কয়েদীদের দুর্নীতির পিচ্ছিল পথেই ঠেলে নিয়ে যায়। আর এর ফলে সাক্ষাৎকার কতৃপক্ষের এজমালী তহবিলটা দিনের শেষে বেশ ভারী হয়ে ওঠে।

শাসনের নামে বর্বরতা

কারাভ্যন্তরে নিয়ম শৃংখলার নামে যা কিছু অনুষ্ঠিত হচেছ তাতে প্রাচীন দাসযুগের বর্বরতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। জমাদার সিপাইদের কথায় কথায় লাঠি পেটার ধরন দেখলে শিউরে উঠতে হয়। নিকট অতিতে এতটা ছিলনা, বর্তমানে হাজতী কয়েদী সম্পর্কে সরকারের নির্লিপ্ত মনোভাবই জেল কর্মচারীদের এই পাশবিক মনোবৃত্তি জাগিয়ে তুলেছে। এর মধ্যেও রয়েছে শোষণের গন্ধ, নগদানগদি জরিমানা দিয়ে মারপিট বন্ধ করে সখ্যতা স্থাপন করা চলে। নইলে কষ্টদায়ক ও শাস্তিমূলক জেল কোডের বিধানগুলি যথেচছাচার ভাবে প্রয়োগ করা হয়। এর ক্ষীণতম প্রতিবাদের অর্থ হচেছ জেল কতৃপক্ষের সঙ্গে অসদাচারণ। নিভৃত কারাবাস বা লৌহ ডান্ডাবেড়ীর শাস্তি প্রয়োগের আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়াও আরও গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, প্রাপ্ত রেমিশন কাটা যেতে পারে বা বাজেয়াফত হতে পারে। একজন কয়েদী কারাগারে তার দন্ডের শতকরা ২৫ ভাগ এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে কিছু বেশী রেমিশন পেতে অধিকারী কিন্তু অসদাচারণের কোন রিপোর্ট হলেই সর্বনাশ। এই রিপোর্টের ভয়েই কয়েদীদেরকে সন্ত্রস্থ থাকতে হয় এবং এই অস্ত্রের সাহায্যেই জেল কতৃপক্ষ বেশীর ভাগ কয়েদীদেরকে তাদের জুলুম ও দুর্নীতিমূলক কাজে যথেচছা ভাবে ব্যবহার করতে থাকে। জেল কতৃপক্ষের এই বলগাহীন ক্ষমতাই জেল, জুলুম ও দুর্নীতির পথকে প্রশস্থ করেছে। জেল কতৃপক্ষের অস্ত্রাগারে আর একটি ভয়াবহ অস্ত্র আছে যা ব্যক্তি বা সমষ্টির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা চলে। যে কোন ওয়ার্ডার বা জমাদার হুইসেল বাজিয়ে দিলেই হল, গোটা জেলে সবার হুইসেল বেজে উঠবে এবং সেই সঙ্গে পাগলা ঘন্টা, হাজতী কয়েদীদেরকে চোখের নিমিষে নিজ নিজ ওয়ার্ডে ঢুকে পড়তে হবে নইলে রক্ষা নেই। জেলের বাহিরে থাকা রিজার্ভ বাহিনী রাইফেল অথবা লাঠি হাতে করে বন্য জন্তুর মত ছুটে আসবে আর তারপর শুরু হবে নারকীয় যজ্ঞ। পাগলা ঘন্টা নাকি সব কিছুকেই জায়েজ করে দেয়। পরিস্থিতি পাগলা ঘন্টা বাজানোর অনুকুলে ছিল কিনা সে বিচারও কতৃপক্ষ বা সরকার করেনা কেননা শাসন ও দমন নীতিতে বিশ্বাসীদের কাছে এ অর্থহীন। আসলে জেল পরিবেশটাই এমন যে জেল কতৃপক্ষকে হাজতী কয়েদীদের হেফাজতকারীর ভূমিকায় বিশ্বাসী নন। তারা প্রভুর মর্য্যাদার দাবীদার। সাধারণ

www.pathagar.com

হাজতী কয়েদীদের মাটিতে লাইন করে দুই পায়ের উপর ভর করে বসতে হবে। হাত হাঁটুর উপর থাকবে এবং জেলের সুপারিনটেনডেন্ট বা ডি. আই. জি. আসার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে স্যালুট কতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হতে হলে এই বিধান। হুজুরদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হলে পায়ে জুতা রাখা চলবেনা। দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান বিচারপতির সম্মুখে একজন সাধারণ নাগরিককে হাজির হতে হলে এরূপ হীন ও অপমানকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় কি? নিশ্চয় নয়। তবে কোন অধিকারে, কোন প্রয়োজনে, স্বাধীন দেশের জনগণের শাসিত রাষ্ট্রের কোন মর্য্যাদা বৃদ্ধির তাগিদে শতাব্দীকাল পূর্বের এই পৈশাচিক বিধানগুলো চালু রাখতে হবে? জনসাধারণের নামে রাষ্ট্র পরিচালনা করে জনসাধারণের একাংশের এই লাঞ্ছনা ও দুর্গতি এবং জেল কর্তৃপক্ষের বলগাহীন জুলুম ও স্বেচ্ছাচারের মূলে রয়েছে এই দেশের বর্তমান শাসনযন্ত্রের মৌলিক অধিকার বর্জিত মানবতা বিরোধী ধারাগুলো।

অধ্যায়-১৪

রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন

দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন হচেছ। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের পর দালালদের বিরুদ্ধে যে পরিকল্পিত উপায়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছিল সে উদ্যমে সর্বত্র ভাটা পড়েছে। যে শব্দটি উচচারণ করলে হাত তালি পাওয়া যেত শ্রোতাদের কাছে তা আর মোটেই আকর্ষণীয় নয়। যারা সমস্বরে এই শব্দটি উচচারণ করে নিজেদের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টায় ছিল তৎপর তারাও আজ দল উপদলে বিভক্ত, মারমুখো নীতি ও অসহনশীলতার মশক চলছে তাদের সর্বত্র এবং প্রত্যেক দল বা উপদলের নেতা ও কর্মীরা চরম অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত। দালালদের দিকে ফিরে চাইবার ফুরসৎ আর তাদের নেই। জনতাও চরম অর্থনৈতিক সমস্যায় নিমজ্জিত, কঠিন বাস্তবের কষাঘাতে জর্জরিত, স্বাধীনতার অর্থ এখন তাদের কাছে দুর্বহ, সোনালী স্বপ্নের সৌধ ভেঙ্গে চুরমার। তাদের রোষদৃষ্টি এখন নব্য শাষকদের প্রতি নিবদ্ধ। সর্বত্রই গুপ্ত হত্যার লীলা খেলা, রাত্রের অন্ধকার নিদ্রা ও বিশ্রামের আবরণ নয়, অবৈধ অস্ত্রধারীদের অবাধ বিচরণের পাসপোর্ট, গোটা জাতিকে ভয়, ক্ষুধা ও বেইজ্জতীর লেবাস পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় প্রতিটি দলেরই রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা গুপ্ত হত্যার শীকার হচেছ। ক্ষমতাসীন দলেও একজন নেতা বা কর্মীর হত্যাকে কেন্দ্র করে বহু জায়গায় তান্ডবলীলা চলছে। আওয়ামী স্বেচছাসেবক বাহিনী ও যুবলীগ প্রতিপক্ষকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য সরকারের ছত্রছায়ায় বেপরোয়াভাবে দুষ্কৃতিকারী নিধনে ব্যস্ত। সরকারী যন্ত্রগুলি যথা - পুলিশ, রক্ষীবাহিনী হত্যাকারীদের অনুসন্ধানে তৎপরতা দেখালেও তারা গাইডেড মিসাইলের

www.pathagar.com

মত উপর থেকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘত হানতে লাগলেন। ফলে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর আচরণ হল পক্ষপাতমূলক এবং এর ফলশ্রুতি স্বরূপ সরকারী দলের কর্মীদের গতি হল উদ্যাম আর প্রতিপক্ষের উপর জুলুমের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল। রাজনৈতিক প্রতি পক্ষদের শক্তি পরীক্ষার লড়াই নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলনা। পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর উপর, বিভিন্ন থানা ও পুলিশ ফাঁড়ির উপর দুষ্কৃতিকারীদের উৎপাত শুরু হল। আগষ্ট, সেপ্টেম্বরের সাংবাদপত্রের পাতায় থানা, পুলিশ ফাঁড়ি ও হাট বাজার লুটের ভয়াবহ খবর বের হতে লাগল। কুমিল্লা জেলার হোমনা থানাধীন চন্দনপুর পুলিশ ফাঁড়ি ও বাজার লুট করে দুষ্কৃতিকারীরা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া পুলিশের পোষাকগুলোও নিয়ে গেল। বৈদ্যের বাজার থানার আনন্দ বাজার হাটে আক্রমণ চালিয়ে হামলাকারীরা তাদের ৯ জন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে গুম করে দিল। ময়মনসিংহের ধানীখোলা পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সবকিছু ফেলে পুলিশ পালিয়ে গেল। নবাবগঞ্জ থানার বাগমারা বাজারে সৌখিন দুষ্কৃতিকারীরা কারফিউ জারী করে বাজার লুট করল। শুধুমাত্র অক্টোবর মাসের খতিয়ানে বলা হল সাতটি থানা ও ফাঁড়ি লুট, ৪টি থানা ও ফাঁড়ি আক্রান্ত প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র বেহাত, পুলিশসহ শতাধিক লোক নিহত এবং এক হাজারের বেশী ডাকাতি হয়েছে। পরের মাসটাও কম গেল না। মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানা, সরকারী খাদ্য গুদাম, ব্যাংক, ডাকঘর, ওয়ারলেস কেন্দ্র, নেত্রকোনার বারহাট্টা ফাঁড়ি, হরিণাকুন্ডী থানা, রাজশাহীর মাকলা, কামারগাঁও ও তাহেরপুর ফাঁড়ি, কুষ্টিয়া জেলার হালসা ও খাদিমপুর ফাঁড়ি, উজিরপুর থানার হারতা ফাঁড়ি, মেহেদীগঞ্জের ভাষানীর ফাঁড়ি, ঈদের দিনে পাথরঘাটা থানা হামলা ও লুটের খবর সংবাদ পত্রের পাতায় ছাপার অক্ষরে স্থান পেয়ে জনসাধারণের আতঙ্ক ও সরকারের উদ্বেগ বৃদ্ধি করল।

অর্থনৈতিক ভাঙ্গন

আইন শৃংখলার দ্রুত অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক ভাঙ্গন গৌদের উপর বিষফোঁড়া হিাবে দেখা দিল। রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পে লোকসান ও উৎপাদন হ্রাসের খতিয়ানে প্রকাশ পেল। ১৯৭২-৭৩ সনে মোট ৩৮ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে। এর মধ্যে জুটমিল কর্পোরেশনে ২৫ কোটি, সুগার মিল কর্পোরেশনে ৭ কোটি ৯ হাজার, পেপার মিলস কর্পোরেশনে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টীল মিল কর্পোরেশনে ১ কোটি ৫০ লক্ষ এবং মিনারাল গ্যাস কর্পোরেশনে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিবেশিত তথ্যে জানা গেল ১৯৬৯-৭০ এর অশান্ত বৎসরের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সনে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ২০ ভাগ, সূতার উৎপাদন ১৮ ভাগ, চিনির উৎপাদন ৭৮ ভাগ, কাগজের উৎপাদন ৩০ ভাগ, নিউজপ্রিন্টের উৎপাদন ২০ ভাগ, সিমেন্টের উৎপাদন ৪২ ভাগ ও বরফজাত মাছের উৎপাদন শতকরা ৪৬ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

www.pathagar.com

দেশের অভ্যন্তরে যেটুকু সম্পদ উৎপন্ন হলো এবং ঘাটতি পুরণের জন্য দুষ্প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে যে মালামাল আমদানী হলো তাও পুরাপুরি দেশের মানুষের উপকারে লাগলো না। রক্ত চুষার দল সতের শত মাইল বিস্তৃত সীমান্তের চার পাশে পাইপ লাগিয়ে চুষে নিয়ে গেল। ইত্তেফাকের 'ওপেন সিক্রেটে' ধারাবাহিক ভাবে চোরাচালানীর ভয়াবহ তথ্য পরিবেশিত হ... সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন পাট, মাছ, চাউল, কাঁচা চামড়া, আটা, ছোলা, আমদানীকৃত ঔষধ, খুচরা যন্ত্রাংশ, তেতুল, কাঁসা-পিতল ইত্যাদি ব্যাপকভাবে হচেছ। সীমান্ত ফাঁড়িগুলোর নাকের ডগা দিয়ে নাকি এই সমস্ত পাচার চলছে। তবে কাজ দেখানোর জন্য সংশ্লিষ্ট মহল কিছু কিছু ধরপাকড়ও করছেন। শুধুমাত্র যশোহর সেক্টরের ১৯৭৩ সসের জানুয়ারী আগষ্টের খতিয়ানে বলা হলো এই সময়ের মধ্যে ২২৮৭ জন চোরাচালানীকে আটক, ১০ জনকে হত্যা, ১০ জনকে জখম করা হয়েছে এবং ১২৫৫টি মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। এদের কাছ থেকে ১৭ লক্ষ ৯ হাজার ৪২৭ টাকা ২৯ পয়সার ভারতীয় মালামাল ও ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪০৭ টাকা ৬১ পয়সার দেশী মালামাল আটক করা হয়। 'চোরা চালান শতকরা ৯৯ ভাগ বন্ধ হয়েছে'--দেশের সিকি অংশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে বি. ডি. আর. প্রধানের এই মহাজন উক্তি চিন্তা করলে মনে হয় সাত কোটি মানুষের সঙ্গে যেন ব্যঙ্গ করা হচেছ। অবশ্য এই উক্তি সহজভাবে গ্রহণ করা কারো পক্ষেই সম্ভবপর হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকেও মুখ খুলতে হলো এর প্রতিবাদে। ১লা সেপ্টেম্বর লায়ন্স ক্লাবের ভোজ সভায় তিনি বললেন 'মুদ্রাস্ফীতি নয়, আশংকাজনকভাবে চোরাচালন এবং ভীতিজনকভাবে সম্পদ পাচারই বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের প্রধান দু'টি কারণ। এছাড়া অন্য যে সব কারণ রয়েছে তার মধ্যে কল কারখানায় উৎপাদন হ্রাস অন্যতম'।

শিক্ষক ধর্মঘট

এসব সমস্যার সঙ্গে বোঝার উপর শাকের আটি হয়ে উদ্ভব হল শিক্ষকদের ধর্মঘট। ৬৫০টি বেসরকারী কলেজের ১,০০০ অধ্যাপক এবং ৭,৫০০টি মাধ্যমিক স্কুলের ৮০ হাজার শিক্ষক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের প্রাপ্য মর্যাদার প্রশ্নে সম্মিলিত শক্তি নিয়ে আওয়াজ তুললেন। শাসনতন্ত্রের ১৭ নং ধারা অনুযায়ী একই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য গোটা ব্যবস্থার রাষ্ট্রায়ত্বকরণ এবং সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈষম্য তুলে দিয়ে একইরূপ বেতন ও চাকুরীর শর্ত প্রবর্তনের জন্য প্রফেসর ও শিক্ষক সাহেবানরা শুধু হুমকি দিলেন না ছাত্রদের লেখা পড়া ও পরীক্ষা ছিকায় তোলার ব্যবস্থা করে ধর্মঘট করে বসলেন। অর্থের অপ্রতুলতা, সরকারের এই সাধারণ কৈফিয়ত যুক্তির কষ্ঠি পাথরে মোটেই টিকসই হলো না। যে সরকার বিদেশী ডিলিগেশন ও বিভিন্ন মিশনের পিছনে খরচার বিলাসতায় প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিচেছন, যারা গণ ভবন, বঙ্গ ভবন, মন্ত্রী ভবনগুলোর রাজসিক খরচে বিশ্বের সেরা ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিচেছন, যারা প্রতিরক্ষা ও পুলিশ

www.pathagar.com

বাহিনীর বাইরেও অতিরিক্ত একটি প্যারা মিলিটারী (রক্ষী বাহিনী) বাহিনী বাবদ ১৫ কোটি টাকা খরচ করছেন এবং যাদের বাজেটে একটি দফার খরচের খাতে ১০ কোটি ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় বাবদ ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয় তারা শিক্ষা খাতে অন্যান্য ব্যয় সংকোচ করে হলেও আরও ৮/১০ কোটি টাকা খরচ করতে পারেন না এটা শিক্ষক সমাজ মোটেই বুঝতে চাইলেন না। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে ভাঙ্গন ধরেছে অনেক আগেই। ছাত্র শ্রমিক সবাই ভেঙ্গেছে কিন্তু শিক্ষকরাই ছিলেন সংঘবদ্ধ। সমিতির প্রেসিডেন্ট সরকারী দলের হলেও শিক্ষকদের স্বার্থে প্রতিই তিনি ছিলেন বেশী নিষ্ঠাবান। কিন্তু ভাঙ্গনের আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে। চিরন্তন 'ভাঙ্গো আর শাসন কর' নীতি কার্যকরী হল এবং সরকার ফলও পেলেন হাতে হাতে। ২০/৮/৭৩ তারিখের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদ থেকে বলা হলো ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আরও বলা হল ২০ জন সদস্য বিশিষ্ট সংগ্রাম পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সভাপতি ও সম্পাদকের এক প্রতিনিধি দল শেখ সাহেবের সাথে ঘরোয়া বৈঠকে সাক্ষাৎ করেন এবং শেখ সাহেবের ব্যক্তিগত অনুরোধে ধর্মঘট প্রত্যাহার করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ধর্মঘটী শিক্ষকদের জন্য এ সিদ্ধান্ত ছিল বিরাট আঘাত ও অত্যন্ত অপমানজনক। পরদিন ঢাকায় অবস্থানরত শিক্ষকরা দলে দলে হাজির হলেন সমিতির কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের ৬০ নং মিউনিসিপ্যাল স্ট্রীটে অবস্থিত অফিসে। নতুন সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো এবং পুরনো নেতাদের উপর অনাস্থা জারী করা হলো। পুরনো পরিষদ ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকদের স্কুলে যোগদানের আহবান জানালেন, আর নতুন পরিষদ আওয়াজ তুললেন 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই, চলবে'। ২৩/৮/৭৩ তারিখে পুরনো পরিষদ অফিস দখল করতে আসলে নুতন পরিষদের সঙ্গে কয়েক রাউন্ড লড়াই, কুস্তি, ঘুষাঘুষি করে বিনা টিকিটে পথচারীদেরকে এ দৃশ্য উপভোগ করবার সুযোগ করে দিলেন। মারমুখো নতুন দলের আক্রমণের তীব্রতা ছিল বেশী কিন্তু সরকারের পুলিশ বাহিনী পুরনো দলকে শুধু রক্ষাই করলেন না, সেই সঙ্গে অফিস ঘরে তালা লাগিয়ে ধর্মঘটীদের আন্দোলনেও তালা লাগিয়ে দিলেন। সংগ্রামে জয়ী হবার পূর্বেই সংগ্রাম পরিষদ নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করে হয়রান হয়ে পড়লেন আর সেই সঙ্গে মৃত্যু হল দেশ গড়বার, কারিগরদের বহু ত্যাগের বিনিময়ে গড়া বলিষ্ঠ একটি আন্দোলনের।

রক্তের আখরে লেখা শাসনতন্ত্রের সংশোধন

বিভিন্ন সমস্যার মুখে সরকার কঠিন মনোভাব নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন। দেশে নাকি বেশী বেশী গণতন্ত্র দেওয়া হয়েছে। বেশী স্বাধীনতা নাকি মোটেই সহ্য হচ্ছে না নাগরিকদের। তাই সরকার সীমিত করে বর্তমান ও উঠতি সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য শাসনতন্ত্রের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল আনয়ন করলেন এবং সাত তাড়াতাড়ি করে, ক্ষীণ বিরোধী দলের আওয়াজের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ না

www.pathagar.com

করে ২০/৯/৭৩ তারিখে ২৬৭-০০ ভোটে বিল পাশ করিয়ে নিলেন। বিরোধী ও স্বতন্ত্র সদস্যদের জনমত যাচাই এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হওয়ায় ৬ জন সদস্য বিলটিকে সংবিধান বিরোধী বর্ণনা করে একযোগে ওয়াক আউট করলেন এবং তাদের অনুপস্থিতিতে ২৬৭-০০ ভোটে বিলটি গৃহীত হলো। নূতন সংশোধনীতে সংসদকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান সম্বলিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হল এবং আভ্যন্তরীণ আইন শৃংখলা জায় রাখবার জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হলো। যে আওয়ামী লীগ ১৯৫৭ সনে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের উপদেশ উপেক্ষা করে নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করে রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়, স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান পাশ করাবার সময় নিবর্তনমূলক আইনের কোন বিধান না রেখে দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিল, তারা মাত্র সাড়ে দশ মাসের মধ্যে রক্তের আখরে লেখা শাসনতন্ত্রের বিরাট রদবদল করে কালাকানুন সৃষ্টির দরজা উন্মুক্ত করে দিল। অতীতে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের ভূমিকায় থেকে সরকারী দলের যে সমস্ত কার্যকলাপ ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, মিছিল করেছে, জনসভায় বক্তৃতার ফোয়ারা ফুটিয়েছে তার সবগুলোই স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের দ্বারা একটির পর একটি অনুষ্ঠিত হলো এবং এই সংশোধনীর মাধ্যমে তা ষোলকলায় পূর্ণ হলো।

লেজ ও লেজুড়ের অশুভ আঁতাত

সাপের বিষদাঁত ছাড়াও লেজটাও মারণাস্ত্র কম নয়। লেজের ঝাপটাও কম নয় কাউকে ধরাশায়ী করবার জন্য। সাংবিধানিক সংশোধন করে সরকার দংশনের জন্য দাঁতগুলোকে বিষের থলি দিয়ে পূর্ণ করলেন এবং সেই সঙ্গে লেজ ও লেজুড়কে আরও ধারাল করবার চেষ্টা করলেন। বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়ার পথে বাধাসমূহ দূর করা, জাতীয় শত্রুদের প্রতিহত করার সংগ্রাম গড়ে তোলা এবং জনগণের আশু সমস্যাগুলোকে অবিলম্বে দূর করার শুভ ও মহত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে লেজ ও লেজুড়দের এক অশুভ আঁতাত গড়ে উঠল। ১৪ই অক্টোবর '৭৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, মোজাফফর ন্যাপ ও বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি সমন্বয়ে ৪টি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ভিত্তিতে একটি ত্রিদলীয় ঐক্যজোট গঠনের কথা ফলাও করে প্রচার করা হলো। ঐক্য জোটের ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিষদের নামও ঘোষিত হলো। এই ঐক্যের কোন প্রতিফলন সরকার পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণে দেখা গেল না, তবে সরকারী দলের এতে কিছুটা স্বস্তি ছিল কারণ সাত পাকে বাঁধা অপর দু'টি দল ঘরের কথা পরকে বলবেনা।

হত্যা ও পাল্টা হত্যা

কিন্তু এত করেও শান্তি বা স্বস্তি কোনটাই ফিরে এল না। সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে সরকারের মনোভাব ছিল এক তরফা। আইন নিজেদের বা সমর্থকদের জন্য

www.pathagar.com

প্রযোজ্য ছিল না সুতরাং কঠিন থেকে কঠিনতর পদক্ষেপে সমর্থকদের দুশ্চিন্তা ছিল না। আর 'গণ ঐক্যজোট' এদেশের গণমানুষের জন্য ছিল না। লেজ ও লেজুড়দের আঁতাতকেই নাম দেওয়া হলো 'গণ ঐক্যজোট'। হয়ত সরকারের দৃষ্টিতে এরাই ছিল 'গণ' আর অবশিষ্ট বিপুল জনতা ছিল কুচক্রী, স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশী চর ও দুষ্কৃতিকারী। দেশের মানুষের মধ্যে কোন ঐক্যই প্রতিষ্ঠিত হলো না, মানুষে মানুষে বিভেদ বেড়ে গেল আর জনতা সরকার থেকে সরে গেল অনেক দুরে। হত্যা ও পাল্টা হত্যা ভয়াবহ গতিতে বেড়ে চলল। সরকারের সমর্থক ও বিভিন্ন স্বশস্ত্র সংস্থার হাতে যারা হত্যা হল তারা ছিল নামহীন, পরিচয়হীন কুখ্যাত দুষ্কৃতিকারী আর সরকারী দলের যারা হত্যা হল তারা পেল খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে তাদের মৃত্যু সংবাদ, মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে জানাজা, ফুলের মালা বা পাপড়ির স্তবক, ওয়ারিশদের জন্য কিছুটা আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং দুষ্কৃতিকারীকে খুঁজে বের করে কঠিন শাস্তিদানের সরকারী ওয়াদা। কিন্তু উভয় দলের মৃত্যুতেই ছিল বাপ, মা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির জন্য বুক ফাটা হাহাকার, অশ্রুর মাতম আর ওয়ারিশদের জন্য চরম অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা। এই মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সরকারের উচিত ছিল এর মূল কারণ নিশ্চিহ্ন করা। অর্থাৎ দলমত নির্বিশেষে সবার নিকট থেকে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করা ও আইন সমানভাবে প্রয়োগ করা। দুঃখের বিষয় পুলিশ ও রক্ষী বাহিনীর পক্ষে আইন সমানভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব ছিল না। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবীদদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণে গড়া রক্ষী বাহিনী দেশের সাধারণ আইন শৃংখলা ভঙ্গকারী দুষ্কৃতিকারীদের পিছনে ব্যবহৃত না হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাছিলের জন্যই বেশী তৎপরতা প্রদর্শন করল। ভারতীয় সামরিক বাহিনী রং-এ রঙ্গিন বাহিনী একটি জাতীয় বাহিনী বা গণবাহিনী হিসাবে পরিচয়দানে ব্যর্থ হল। অবশ্য এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী রক্ষী বাহিনী নয়, দায়ী ছিল ক্ষমতার মসনদে আসীন নিয়ন্ত্রণকারী হাত ও মস্তিষ্ক আর সেই সঙ্গে পিছনের সুতার শক্ত টান। ফৌজদারী কার্যবিধি ও পুলিশ কোডের নিগড়ে বাধা পুলিশ বাহিনীর গতি রক্ষী বাহিনীর মত উদ্যাম নয়। তবুও প্রদত্ত শক্তিটুকু সরকারী দলের প্রভাবমুক্ত ছিল না। সমাজের সাধারণ ও নেতৃস্থানীয় মানুষের সঙ্গে কর্তব্যের তাগিদেই পুলিশকে মেলামেশা করতে হয়। এই মেলামেশার ছিদ্র দিয়ে মানবীয় দুর্বলতাগুলো প্রবেশ করে সততা ও কর্তব্য নিষ্ঠার পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মেলামেশার সুযোগ সরকারী দলের সমর্থকদের পক্ষেই বেশী সুতরাং কিছুটা সামাজিকতা, কিছুটা মানবীয় দুর্বলতা আর কিছুটা সরকারী রোষাণলে পতিত হবার ভয় ইত্যাদি কারণে শুধুমাত্র পুলিশের শক্তি দেশের শান্তি শৃংখলার এই বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই পরিস্থিতি মোকাবিলায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ডাক পড়ল বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর।

সেনাবাহিনী নিয়োগ

এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হল ৭৩ এর জুনের শেষ ও জুলাইয়ের প্রথম

www.pathagar.com

দিকে। যশোহর কারাগারে একদিনেই এল প্রায় ১০০ বন্দী বেআইনী হাতিয়ার রাখার অভিযোগে। কারফিউ করে ঘরে ঘরে তল্লাশী চালিয়ে সামরিক বাহিনী বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করলেন বিপুল সংখ্যায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গৌরবময় অংশ, ১৯৬৫ সনের যুদ্ধে লাহোর, খেমকারান সীমান্তে লৌহ প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী বাংলার মাটির নরশার্দুলরা, মুছা, তারেক, খালেদ, সালাউদ্দিনের উত্তরসূরীরা দুষ্কৃতিকারীদের রূপ ও চেহারার দিকে লক্ষ্য না করে এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নিরপেক্ষ মন ও বলিষ্ঠ চিত্ত নিয়ে এগিয়ে চললেন বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে। অভিযান সাফেল্যর দিকে এগিয়ে নিল কিন্তু থেমে গেল মাঝ পথে। নতুন আমদানী করা হাজতীদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক মুজিববাদী সেনাবাহিনীর জালে আটকা পড়ে কারাগারে মেহমান হয়ে এসেছে। জেলের সর্বত্র বিরাট চাঞ্চল্য, বাঘ খাচায় আটকা পড়েছে। গোটা জেলের হাজতী কয়েদীরা ভেঙ্গে পড়ল মুজিববাদী মেহমানদের দেখবার জন্য। মুজিবের কারাগারে মুজিববাদী নেতাদের আগমন এবং তাও আসামী হয়ে। সত্যই বোধহয় এতদিনে সরকারী দন্ড দলমত নির্বিশেষে 'দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনে' ব্যবহৃত হবে। নিজের উৎসুক্য দমিয়ে রাখা গেলনা-মোলাকাতের ইচছা নিয়ে আমিও এগিয়ে গেলাম। জনৈক মুজিববাদীর নিকট থেকে সেনাবাহিনী রিভলবার উদ্ধার করে জেলে পাঠিয়েছেন। সেনাবাহিনীর প্রতি অত্যন্ত ক্ষীপ্ত সরকারের দয়া দাক্ষিণ্য ও আশীষভোগী এই তরুণ মুক্তি যুদ্ধে নিজের শৌর্য্যবীর্য্যের মালা গেঁথে বক্তৃতার ফোয়ারা ছুটাচ্ছে আর নিজের বর্তমান অপমানকর অবস্থার গ্লানি ঢাকবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। একই কারাগারের সহযাত্রী হিসাবে দরদভরা মন নিয়ে এগিয়ে গেলাম, বিপর্যয়ের কারণ জেনে নিলাম এবং সেই সঙ্গে আইনজীবী হিসাবে প্রয়োজনীয় উপদেশ দানের জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করলাম। উত্তর এল মুজিববাদী গর্বিত তরুণের তরফ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে কোন কেস হবেনা- তোফায়েল ভাইকে আমাদের লোক টেলিফোন করেছিল, তিনি বলেছেন সামান্য ক'দিন ধৈর্য্য ধর ১০ই জুলাই এর পর সেনাবাহিনী আর ময়দানে থাকবেনা তখন ব্যবস্থা হবে।' বিশ্বাস করতে মন চাইল না, হাতেনাতে রিভলবার ধরা পড়েছে সুতরাং বিনা বিচারে ক'দিনের মধ্যে কিভাবে মুক্তি পাবে। তাছাড়া প্রেসিডেন্টের ৫০ নং আদেশে জামিনের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু তবুও বিশ্বাস করতে হল কানে শুনে নয়, চোখে দেখে বিশ্বাস করতে হল। ১০ই জুলাই এর পর মুজিববাদীরা কারাগারের জন্য বদ হজম হয়ে গেল, কারাগহ্বর এদের উগলিয়ে বাইরের মুক্ত আকাশের নীচে ফেলে দিল। আইনের দৃষ্টিতে বেআইনী অস্ত্রধারীরা ছিল সবাই দুষ্কৃতিকারী, কিন্তু কারাগারের বিশাল লৌহ কপাটকে আর দেশের আইনকে ব্যঙ্গ করে বের হয়ে গেল ব্রাহ্মণরা আর রয়ে গেল কারা অভ্যন্তরে বৈষ্ণ, ক্ষত্রিয় ও শুদ্ররা।

মুজিববাদীরা কারাগার থেকে বের হয়ে গেল

মুজিবাদীরা কারাগার থেকে বরে হয়ে গেল কিন্তু একই অপরাধে অপরাধী জাসদ সমর্থক ছাত্র তরুণরাই রয়ে গেল কারা অভ্যন্তরে। বেআইনী অস্ত্র রাখার

www.pathagar.com

অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের মধ্যে জাসদ সমর্থকরাই ছিল বেশী। আর কিছু ছিল পূর্বপাক কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী বা সমর্থক যাদের অপর পরিচয় নকসাল। সেনাবাহিনী নিয়োগের ফলে যারা জালে আটকা পড়ল তার মধ্যে থেকে রুই-কাতলা ছেড়ে দিয়ে চুনো পুটিদের রেখে দেওয়া হল। যারা মাছের চাষ করে তাদের অবশ্য আচরণ অন্যরূপ। ছোট জালে বড় মাছ ধরা পড়েনা। বড় জাল দিয়ে যখন ঘেরাও করা হয় তখন তার মধ্যে ছোট বড় সবই আটকা পড়ে। ছোটগুলো ছেড়ে দেওয়া হয় আর বড় রুই, কাতলা মৃগেল চড়া মুনাফা লাভের আশায় বাজারে পাঠানো হয়। পুলিশের জালে কাজ হল না দেখে সেনা বাহিনীর বিশাল জাল ফেলা হল কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধচরণ করে চুনো মাছ আইনের বাজারে পাঠানো হলো। এতে মুনাফা লাভের কোন আশা করা যায় কি? দেশের জন্য কোন মুনাফা হল না বটে কিন্তু মুজিববাদীদের জন্য এল মাহেন্দ্রক্ষণ। মুজিববাদীদের শক্তি রইল অটুট, আর বিরুদ্ধবাদীদের শক্তি হল ক্ষয়। কারাগারের বাহিরে যেটুকু বিরুদ্ধ শক্তি বর্তমান ছিল তাদের নিশ্চিহ্ন করবার জন্য মুজিববাদীরা হিংস্র উন্মত্ততায় মেতে উঠল। পরবর্তী মাসগুলোতে পরিচয়হীন, নাম না জানা ঘাতকের হাতে প্রাণ দিল দেশের অনেক তরুণ, যুবক ও প্রতিভাবান ব্যক্তি শুধু মাত্র রাজনৈতিক মত পার্থক্যের কারণে। ঝিনাইদহ কলেজের ২ জন ছাত্র নেতা খুন হল, প্রকাশ্য দিবালোকে বগুড়ায় ৫ জন কলেজের ছাত্রকে হাইজ্যাক করে নিয়ে হত্যা করা হল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারী বোরহান উদ্দিন রোকনকে তার কর্মময় জীবন থেকে অবসান দেওয়া হল, রাজশাহীর জাসদ নেতা ও পার্লামেন্টের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভবিষ্যতের নির্বাচনী জ্বালা থেকে চিরতরে রেহাই দেওয়া হল, জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যশোহর জেলা জাসদের সভাপতি এ্যাডভোকেট মোশাররফকে তার চেম্বারে গুলী করে হত্যা করা হল, আর বহু অর্ধ মৃত আদম সন্তানকে ঘাতকের দল দয়া করে কারাগারে থালাবাটি কম্বলকে সম্বল করে শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার সুযোগ দিল। মৃতদের কি জবানবন্দী আল্লাহ'র দরবারে লিখা রয়েছে তা আমাদের জানার কোন পথ নেই তবে অর্ধ মৃতদের জবানবন্দী থেকে যা জানা গেল তা অতীতের সমস্ত বর্বরতার ইতিহাসকে ম্লান করে দেয়। ক্ষমতাসীন চক্রের সহযোগিতায় রক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়া সরকার বিরোধী সোনার দেশের এই সন্তানদের হাত পা বেঁধে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ঘন্টার পর ঘন্টা, সারা শরীরের উপর লোমহর্ষক অত্যাচার, কখনও মাটিতে শুইয়ে দিয়ে বাঁশ বা কাঠ দিয়ে পাড়ান হয়েছে। নাকে মুখে লবণাক্ত বা সাবানযুক্ত গরম পানি, পেটের উপর ভারী চাপ, বুটের লাথি, পায়ের নীচে পিন ঢুকিয়ে দেওয়া, খেতে না দিয়ে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি এমন এমন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে যা হয়ত হিংস্র হায়েনা, নেকড়ে, কুটিল কেঁওটে অথবা পশুরাজ সিংহের জানা নেই।

সরকারের সমর্থক দল ও সরকারী যন্ত্রের হাতে যারা নির্যাতিত হল তারা ছিল বেশীর ভাগই জাসদপন্থী। কয়েক মাস ধরে যে নির্যাতন চলল তাতে উপর স্তরের

www.pathagar.com

নেতৃবৃন্দের গায়ে হাত পড়ল না বটে, তবে নীচের স্তরের নেতা ও কর্মীদের মাশুল জোগাতে হল প্রচুর। এগুলোকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে চালিয়ে দেওয়া বা ভুলে থাকা কারও পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। তাই নিজ অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই জাসদ নেতৃবৃন্দকে রাজপথে নামতে হল জুলুম, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। দুঃখের বিষয় স্বাধীন দেশের অনেক কিছু সম্পর্কে জাসদের কোন সুস্পষ্ট মতামত ছিল না বা এদের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা বিবৃতির মধ্যেও ঐক্য সূত্রের সন্ধান পাওয়া যেত না। ছাত্র তরুণ ছাড়া প্রবীণ নেতা ও কর্মীদের প্রাচুর্য ছিল না এই দলে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করা বা বক্তৃতা বিবৃতির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া যাচাই করবার অভিজ্ঞতারও অভাব ছিল তাদের। স্বাধীনতা সংগ্রামে ও পরবর্তী কয়েক মাস এরা ছিল শাসক গোষ্ঠির অংশ সুতরাং এদের নিজস্ব কোন বক্তব্য বা মতবাদের প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু বিরোধী দল হিসাবে এরা শুধু সরকারেরই বিরাগভাজন হয়নি, জনসাধারণের বিরাট একটি অংশের অশ্রদ্ধাও কুড়িয়েছে বিভিন্ন অবাস্তব ও অসংলগ্ন উক্তির কারণে। আইনের শাসন সবারই কাম্য এবং বিরোধী দলেরই হওয়া উচিত এর অতন্দ্র প্রহরী। দালাল আইনের ছদ্মাবরণে যে নির্যাতন চলছিল আইনের নামে তার বিরুদ্ধে এদের কোনই বক্তব্য ছিল না, বরং লঘু শাস্তিদানের সরকারী বিধানের বিরুদ্ধে এরা ছিল সোচচার এবং দালালদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও ছিনিয়ে নেবার পক্ষপাতী ছিল জাসদ নেতৃবৃন্দ। পূর্বদেশ পত্রিকায় ইং ১৭/৮/৭২ তারিখে এ. এস. এম. রব-এর বিবৃতি ছাপা হল "দেশের জনগণের ভাগ্যের কথা চিন্তা করে দালালদের আইন এমন করা উচিত যাতে করে এই সব ব্যক্তিরা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না পায়।" কোন সভ্য দেশ বা সমাজ এই নীতি গ্রহণ করতে পারে না। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রতিটি ব্যক্তির নিকট জাসদের নেতৃবৃন্দের চেহারা পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ক্ষমতায় আসীন হলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ওরা কি নজরে দেখবে, জনসাধারণ বর্তমান সরকারের চেহারা ও কল্পনায় আঁকা ক্ষমতাসীন জাসদের চেহারা তুলনামূলক ভাবে বিচার করবার সুযোগ পেল, উভয় দলের আমলনামার মধ্যে।

সরকারী দলের অত্যাচার জাসদকে ময়দানে নামতে বাধ্য করলো। গণসংযোগ অভিযান নাম দিয়ে নিজেদের পুরো শক্তিকে জাসদ নিয়োজিত করে জনসমর্থন কুড়াবার চেষ্টায় রত হল। নিজেদের আদর্শ প্রচারের চাইতে জনসাধারণকে সরকার বিরোধী করাই ছিল এই অভিযানের মূখ্য উদ্দেশ্য এবং এই কারণে নিজেদের কথা বাদ দিয়ে জনসাধারণের মনের কথারই প্রতিধ্বনি করতে হল। এসব গণজমায়েতে পাটের চোরাকারবার ও ভারতীয় মোড়োয়ারীদের অর্থনৈতিক শোষণের কথা বলতে গিয়ে ভারত বিরোধী সুরই ধ্বনিত হল, ত্রিদলীয় ঐক্য জোটের কথা বলতে গিয়ে ভারত-রাশিয়া চক্রের ষড়যন্ত্রের কথা প্রচারিত হল এবং নিজেদের উপর অত্যাচার ও নিষ্পেষণের স্টীম রোলারের গতিকে স্তিমিত করার প্রয়োজনে আইনের শাসনের কথা জোরে সোরে প্রকাশ করা হল। রাশিয়ার নৌবহর ও হাওয়াই শক্তির

www.pathagar.com

উপস্থিত, ভারতীয় কারিগর ও কর্মচারীদের এদেশের মাটিতে অনুপ্রবেশ, সরকারের উপর এসব শক্তির প্রভাব ইত্যাদি, সম্পর্কের আলোচিত হল জাসদের ডাকে অনুষ্ঠিত গণসমাবেশে। শাসনতন্ত্রকে অবহেলা করে রক্ষী বাহিনীকে প্রদত্ত অপরিসীম ক্ষমতারও সমালোচনা করলেন জাসদ নেতৃবৃন্দ কঠোর ভাষায়। দেশের আইন-শৃংখলা ভঙ্গের যাবতীয় দায়িত্ব সরকারের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে-'থানা লুট করে দুষ্কৃতিকারী কিন্তু সাসপেন্ড নয় পুলিশ' এই উক্তি করে পুলিশ বাহিনীর প্রতি মৌখিক দরদও প্রকাশ করা হল কৌশলে। বিভিন্ন সমালোচনার মধ্যে চরিত্র সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথাও ধ্বনিত হল, কোন কোন বক্তার জবান থেকে। সরকারীদলের নেতা ও কর্মীদের চরিত্রের অভাবই হয়ত চরিত্র সংশোধনের উপর বক্তৃতার খোরাক জোগাল। এসব গণজমায়েতে এত বেশী প্রশ্নের অবতারণা করা হল যে জাসদ সম্পর্কে এবং জাসদ নেতৃবৃন্দের প্রচারিত আদর্শ সম্পর্কে মানুষের দ্বিধাই বৃদ্ধি পেল। বক্তৃতার খোরাক বেশী থাকায় শ্রোতার অভাব হয়নি অনেক জনসভাতেই, কিন্তু জনমনে কোন উত্তাপ সৃষ্টি হল কিনা এবং সৃষ্ট উত্তাপ বিস্ফোরণ ঘটানোর মত প্রচন্ড শক্তি পাবে কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ রইল আমাদের অনেকের মনেই। তবে একটি হালকা বিস্ফোরণ যে ঘটবে এ বিষয়ে সন্দেহ করাবর কিছুই ছিল না। আওয়ামী লীগের ক্ষমতা দখলের পথ এবং জাসদের বর্তমান ত্বরীকা একই কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এ পথে অধিক অগ্রসর হতে দেবে বলে মনে হয় না। সুতরাং আওয়ামী লীগই এ বিস্ফোরণ ঘটাবে, লক্ষ্যবস্তু হবে জাসদ আর অপেক্ষা শুধু একটু সুযোগের।

দালাল আইনের সমালোচনা তীব্রতর হচ্ছে

স্বাধীন বাংলাদেশের দ্বিতীয় জন্ম বার্ষিকী এগিয়ে আসছে এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘ কারাজীবনের মেয়াদও অত্যন্ত মন্থর গতিতে নিঃশেষ হতে চলেছে। যে দিন, সপ্তাহ ও মাসটি চলে গেল তা আমার দীর্ঘ মেয়াদী কারাজীবনে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করলেও বাহিরের জীবনে যেখানে আলো, হাওয়া ও সূর্য্যের কিরণ মুক্ত সেখানে প্রতিক্রিয়া হয়েছে ব্যাপক। দালাল আইনে দন্ডপ্রাপ্ত হয়ে অনেকে হাজতীই কয়েদীর জীবনে প্রবেশ করছে আবার দালালদের মধ্যে অনেকেই বিচারে মুক্তিলাভ করে বাহিরের স্বাধীন পরিবেশে ফিরে যাচেছ। মানবীয় অধিকার বর্জিত দালাল আইনের কঠোরতা সত্বেও দেশে ও বিদেশে এর নগ্নতা এবং এই আইন জারীর পিছনে শাসকদের হীন মনোবৃত্তি উৎকটভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বিচার বিভাগের উপর প্রভাব সৃষ্টির অপচেষ্টা সাময়িকভাবে কিছু সাফল্য লাভ করলেও ইনসাফের মশাল শাসক গোষ্ঠীর সৃষ্ট অন্ধকারকে দূর করে দিল আর সেই আলোয় মজলুমরা মুক্তির পথ খুঁজে পেল। দালাল আইনে যে কোন ব্যক্তিকে ৬ মাস কাল আটক রাখার অধিকার ছিল মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং এই মেয়াদের বৃদ্ধি ছিল সরকারের ইচছাধীন। বহুক্ষেত্রে আটকের এই মেয়াদ বৃদ্ধির কোন সরকারী হুকুম না থাকায় দেশের সর্বোচচ আদালতে আটকের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মোকদ্দমা পেশ করা হল দালালদের পক্ষে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য বিচারপতিগণের আদেশে বহু দালাল জামিন পেয়ে

www.pathagar.com

মুক্তিপ্রাপ্তদের তালিকায় আমার নাম

মুক্তিপ্রাপ্তদের তালিকায় আমার নামও দেখতে পেলাম মনের চোখ দিয়ে। দন্ডবিধির ১২১ ধারায় আমার শাস্তি ছিল ২০ বছর, উপনির্বাচনের অভিযোগে ৫ বছর, জিলা কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার অভিযোগে ৫ বছর এবং শেষোক্ত দুই ধারায় দশ-দশ করে কুড়ি হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের জেল। যদিও মোট ৩১ বছর তবে শাস্তিগুলো যুগপৎ চলবার হুকুম থাকায় শাস্তির মোট মেয়াদ ছিল ২১ বছর। খবর অনুযায়ী আমিও মুক্তিপ্রাপ্তদের অর্ন্তগত। পাঁচটি বিশেষ অপরাধের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। অবশ্য ৩৬৪ ধারার অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ করবার জন্য সরকারী প্রচেষ্টার কসুর হয়নি। কিন্তু মাননীয় বিচারক এই অভিযোগ মিথ্যা মন্তব্য করে আমাকে রেহাই দেন। কারা বন্ধু ও কারা সহযাত্রী সবার কাছেই জানা জানি হয়ে গেল অন্যান্যদের মধ্যে আমিও মুক্তি পাচ্ছি। সবাই এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমিও হারিয়ে গেলাম ওদের বুকের উষ্ণতায়। যশোহর কারাগারে আমিই ছিলাম সর্বাধিক শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, কিন্তু কেউ আমার মুখে কালিমা দেখেনি, চোখে অশ্রুর রেশ পায়নি। হাসি মুখে স্রষ্টার তরফ থেকে পরীক্ষা হিসাবে এই শাস্তিকে গ্রহণ করেছিলাম। তাই এই মহা পরীক্ষায় অকৃতকার্য না হই, এই আশঙ্কায় বিশ্ব প্রভুর রহমতের প্রতিক্ষায় ছিলাম নিবেদিত প্রাণ। কিন্তু আজ বন্ধুদের বুকের উষ্ণতায় শুধু নিজেকে হারিয়েই ফেললাম না, সেই সঙ্গে জোয়ার ভাঙ্গা প্লাবনের ঢল নেমে এল দুই চোখের কূল বেয়ে। বহু দালাল বন্ধু রয়ে গেলেন মিথ্যা অভিযোগের শিকার হয়ে। আইনের শানিত অস্ত্র দিয়েই এদের মুক্ত করতে হবে। আমি আইনজীবী মুক্ত জীবনে দালাল ভাইদের কথা ভুলবনা আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির সদ্ব্যবহার করে দালাল ভাইদের মুক্ত করবার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করব এই প্রতিশ্রুতি দিলাম সবাইকে। আমি রাজনৈতিক কর্মী, আমি সংস্কারবাদী, যারা আমায় আঘাত দিয়েছে, যারা আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ সৃষ্টি করেছে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিজ আবাসস্থল থেকে বের করে দিয়েছে তাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। সব আক্রোসকে কারাগারে ফেলে রেখে, নির্যাতনের দিনগুলির কথা ভুলে গিয়ে দেশকে গড়বার সংকল্প নিয়ে ঘুনে ধরা পচা সমাজকে সংস্কারের মহান ব্রত গ্রহণ করে মুক্ত জীবনে ফিরে যাব এই অঙ্গীকার করলাম নিজের মনে। আর শীর নত করলাম সেই মহান কৌশলী প্রভুর দরবারে--যার বাণী সত্য--ওয়াদা সত্য--"ফাজতাবনা লাহু ওয়া নাজ্জায়নাহু গামমে ওয়া কাজালিকা নুনজিল মো'মেনিন' (কোরআন)।

গ্রহর গোণা শেষ হল

ডিসেম্বরের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই মুক্তিপ্রাপ্তদের তালিকা প্রস্তুত করে জেল কর্তৃপক্ষ পাঠিয়ে দিলেন স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে। স্থানীয় মহকুমা হাকিমের সহিসাক্ষর পেলেই দালালদের ছেড়ে দেওয়া হবে। জেল থেকে মাত্র কয়েক

www.pathagar.com

আশে পাশের সবাই লুফে নিল খবরটা। কয়েদী পাহারার পক্ষে সম্ভব ছিল না অত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। জেল কর্তৃপক্ষের হুকুম তামিল করতে সে দৌড় দিল, কিন্তু আমাদের মনে ধরিয়ে দিল কৌতুহলের আগুন। কামরা থেকে কামরা, ওয়ার্ড থেকে ওয়ার্ড ইথারের গতির চাইতেও দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ল। বন্ধুরা সবাই দিবা নিদ্রা পরিত্যাগ করে কয়েদী পাহারার দেওয়া কৌতুহল উদ্রেককারী অসম্পূর্ণ খবরটি নিয়ে রিসার্চ করতে লেগে গেলেন। হাতাশাবাদীরা বললেন অসম্ভব। আশাবাদীরা মন্তব্য করলেন-- নিশ্চয়ই সম্ভব; এছাড়া সরকারের কোন উপায় নেই। দুই পক্ষের যুক্তিতর্কের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক বক্তা ও সমালোচক এগিয়ে এলেন। উভয়পক্ষের জানা শোনা মেট, পাহারা, সিপাইদের অনুরোধ করে পাঠান হল কারাগারের পয়লা আসমান ভেদ কের, কারা অফিসের দ্বিতীয় আসমানে সওয়ার হয়ে ডেপুটি জেলারের তৃতীয় আসমানে রক্ষিত টেবিল থেকে কে সর্ব প্রথম কাগজটি নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু অফিস থেকে ডাক না পড়লে কারো পক্ষেই যাওয়া সম্ভব নয়। বন্ধুদের কৌতুহল ও অস্থিরতা বেড়েই চলল। যদি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত সঠিক হয় তবে সবাইকে ছেড়ে দেবে কি? কেননা সরকার এর পূর্বেও একবার এ্যামনিষ্টি দিয়েছিল যার ফলাফল মাত্র মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক দালাল ভোগ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই খবরটি সঠিকভাবে জানবার আগ্রহ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের আকাশের প্রান্ত সীমায় কিছু মেঘও জমতে শুরু করল। খবরটি সত্যি হলেও যদি আংশিক হয়! এই মুক্তির আদেশ যদি সবার জন্য প্রযোজ্য না হয়!

বিকেল ৫টার দিকে সিপাই খবরের কাগজ দিয়ে গেল। আমার ওয়ার্ডের বিশ জোড়া চোখ সার্চ লাইট ফেলে প্রথম পৃষ্ঠার ব্যানার অক্ষরে ছাপা খবরটি উদ্ধার করল। বিশেষ কয়েকটি অপরাধ ছাড়া অর্থাৎ দন্ডবিধির ৩০২, ৪৩৬, ৩৬৪, ৩৭৬, ৩৯৬ ধারা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ধারায় বিচারাধীন বা দন্ডপ্রাপ্ত দালালদের মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে। জেল কর্তৃপক্ষকে মুক্তিযোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সহি স্বাক্ষর নিয়ে দালালদের ছেড়ে দেবার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কৌতুহলের শেষ হল। যা কিছু দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছিল যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তারও ইতি হল। ওয়ার্ডে দালালদের ভীড় জমতে শুরু করেছে। সবাই ওয়ার্ড থেকে বের হয়ে এলাম। খবরের তরজমা করে হাজারো দালালদের শোনাতে আমরা ব্যস্ত হয়ে গেলাম। কারাগারের প্রিয়জন হারা জীবনে আমদের সবার মধ্যেই গড়ে উঠেছিল একাত্মতা। আমাদের সবারই সব চাইতে বড় পরিচয় ছিল আমরা মজলুম। কিন্তু এই খবরটি আমাদের দুই ভাগে বিভক্ত করে দিল। কারও মুখে চাপা আনন্দের অভিব্যক্তি, কারও মুখে নিরানন্দের মেঘ। মুক্তিপ্রাপ্তদের আনন্দ চাপা পড়ছে সহযাত্রীদের সাময়িক হতাশার কারণে। যারা মুক্তি পাচ্ছেন না তারাও দুঃখ ও হতাশা চেপে যাচ্ছেন না জানি তাদের আচরণে মুক্তিপ্রাপ্ত সহযাত্রীদের মনে চোট না লাগে, তাদের চোখের অশ্রু যেন মুক্ত জীবন পথে যাত্রীদের অমঙ্গলের কারণ না হয়।

www.pathagar.com

বসে। হাঁসি এল বাচচাটির চিঠি পড়ে--গর্বও বোধ হল নিজ আত্মীয় পুত্রের ছোট্ট অথচ মহৎ ও বলিষ্ঠ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে। উত্তর দিলাম কারাগারে থেকে 'লক্ষী আজুমনি তোমাদের ঐ এ্যামেনিষ্টি ইন্টারন্যাশনাল দেখে আমাদের সরকার আদৌ ভয় পায় না। তার চাইতে তোমার ছোট্ট দু'টি হাত তুলে স্রষ্টার কাছে আরজী পেশ করো তোমার ফুফা বেরিয়ে আসবেন। বড় হয়ে তুমি যেন মানুষের মঙ্গল করতে পার এই দোয়া করি'।

দেওয়াল ঘেরা জীবনে মুক্তির পয়গাম এলো

দেওয়াল ঘেরা জীবনে বাহিরের তাজা খবর পাওয়ার কোন উপায় নেই। সব খবরই এখানে বাসি খবর দুই-চার হাত হয়ে এখানে প্রবেশ করে। প্রতিটি খবরেরই আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনা হয় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। কোন একটি নূতন খবর এসে জায়গা দখল না করা পর্যন্ত পুরনোটির উপর দিয়ে অস্ত্রপাচার চলে বিভিন্ন কলাকৌশলে। কারাগারে সময় কাটানোর এ-এক অপূর্ব কৌশল। এই অস্ত্রপচারের প্রয়োজন হয় এই কারণে যে সঠিক খবরের অভাবে গুল চলে বেশী। জেল গেটে যে খবরটি ডিমের পর্যায়ে, ভিতরে এসে তা থেকে হাজারো পাখীর ছানা উড়তে থাকে। হয়ত কেউ বাহিরে রেডিও সংবাদ শুনে ইন্টারভিউ-এর সময় কিছুটা বলে গেলেন। হাজতী বা কয়েদীরা পাওয়া খবরের কিছু অংশ অফিস থেকে ফেরার পথে সংক্ষেপে কাউকে আংশিক উপহার দিলেন। যিনি শুনলেন তার বুদ্ধি ও মগজের শক্তি অনুযায়ী অন্যের কাছে পরিবেশন করলেন। আসল খবর তার নিজস্ব রূপ ও রস হারিয়ে ফেলে, তাইতো এর উপর অস্ত্রপাচারের প্রয়োজন হয়। খবরটি সঠিক কিনা এবং এর মধ্যে আমাদের জন্য কোন ফায়দা আছে কিনা তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়। বিভিন্ন সমালোচক নিজ নিজ বিশ্লেষণের উপর অচল অটল থাকেন অন্ততঃ বিকেল পর্যন্ত। বিকেলের দিকে খবরের কাগজ সেন্সর হয়ে ভিতরে প্রবেশ করে এবং একমাত্র তখনই সমস্ত সত্য মিথ্যার যাচাই হয়ে যায়। সকালের দিকে প্রথম ফ্লাইটে ঢাকা থেকে পেপার এসে পৌঁছিলেও লৌহ কপাটের অন্তরালে প্রবেশ করতে বিকেল হয়ে যায়।

দিনটি ছিল ৩০শে নভেম্বর ৭৩ সন। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নামাজ শেষ করে কেস টেবিলের কাছে নীমতলায় পায়চারি করছি আর পরিচিত দুই-চার জনের সঙ্গে কথা বলছি। অফিস থেকে কারা অভ্যন্তরে যাওয়ার রাস্তা নীমতলার পাশ দিয়ে জনৈক কয়েদী পাহারা অফিস থেকে ফিরছে--আমাকে দেখে এগিয়ে এল। বলল- 'স্যার অফিসে সবাই খবরের কাগজ পড়ছে দালালদের ছেড়ে দেবার কি যেন খবর আছে'।

প্রচন্ড অবিশ্বাসের উত্তর এল যাঃ কি বলছ--সত্যি নাকি--তুমি নিজ কানে শুনেছ--কে পড়ছে কাগজটা-- কবেকার কাগজ--কি নাম কাগজের--কোন সময় এলো'?

www.pathagar.com

বাহিরের মুক্ত জীবনে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেল। কয়েকটি ফাঁসির হুকুমও মহামান্য বিচারপতিদের রায়ে রদ হয়ে গেল।

দালাল আইন জারীর পিছনে সরকারের হীন মনোবৃত্তি ছাড়াও সরকারী যন্ত্রের নিজ স্বার্থে এই আইন ব্যবহারের কলাকৌশল প্রকটভাবে দেখা দিল। প্রতিটি সরকারী উকিলকে বিচারাধীন দালাল মোকদ্দমা উঠিয়ে নেবার ক্ষমতা দেওয়া হল। বিচার শুরু হবার পূর্ব মুহূর্তেও বিশেষ কারণে মোকদ্দমা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং পুনঃতদন্তের নামে আসামীকে পুলিশের রিপোর্টে খালাস দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারী উকিল বহুক্ষেত্রেই এরূপ দয়া দেখিয়েছেন এবং তদন্তকারী পুলিশ অফিসারও সরকারী উকিল সাহেবের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। আসামীদের পক্ষে কেমন করে এই দয়া পাওয়া সম্ভব হয়েছে সেটা আসামীদের আত্মীয় স্বজন যারা বাহিরে 'তদবীর' করেছেন তারাই ভালো জানেন। গোপন কথা প্রকাশ না করাই ভাল। তবে এটা বাস্তব সত্য আইনের কড়াকড়ির মধ্যে এই ছিদ্র দিয়ে বহু দালাল বিচার ছাড়াই বের হয়ে গেল।

দেশে বিদেশে প্রতিক্রিয়া

বিচার বিভাগের বাহিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে ও জনতার কাতারে দালাল আইনের সমালোচনা তীব্রভাবে দেখা দিল। শ্রদ্ধেয় নেতা মওলানা ভাসানী দালাল আইনকে ছিড়ে ফেলবার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানালেন বহু জনসভায়। দেশের সেরা আইনবিদদের অন্যতম জনাব আতাউর রহমান খান একে আইনের ছদ্মাবরণে 'ডাইনী শিকার' বলে অভিহিত করলেন এবং আইনবিদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কঠোর সমালোচনা করে এর অযৌক্তিক ও পাশবিক ধারাগুলোকে জনসমক্ষে তুলে ধরলেন। জোয়ার ভাটার দেশে জনতার মন ও মেজাজেও পরিবর্তন আসে। দালাল আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করলেই এখন বক্তারা হাতে তালি পান। সরকারী দলের বক্তৃতার কোন উপাদান দালাল শব্দটিকে ব্যবহার করে সংগ্রহ করার দিন বাসি হয়ে গেছে। যে সমস্ত রাজনৈতিক দল দালাল আইনের কঠোরতার জন্য বক্তৃতার বিবৃতি দিয়েছেন তারাও এখন দালাল আইনের অপব্যবহার সম্পর্কে সরকারের প্রতি হুসিয়ারী উচচারণ করছেন। সুখের বিষয় সরকারী দলের পার্লামেন্ট সদস্যারও খবরের কাগজে দালালদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করে কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সবাইকে মুক্ত করে দেবার জন্য প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছেন। আত্মীয়-পুত্র লন্ডনের হ্যারো স্কুলে পাঠরত আজুমনি লিখেছে 'ফুপা' এদেশের সংবাদপত্রে দালাল আইনের তীব্র সমালোচনা হচেছ। আমি 'এ্যামেনিষ্টি ইন্টারন্যাশনালের' কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছি আপনার জন্য। ওরা সমস্ত দালালদের ছেড়ে দেবার জন্য সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করছে। ওদের প্রতিনিধিরা আগেও বাংলাদেশ সফরে গেছেন এবং পুনরায় যাচেছন'। স্কুলের একটি ছোট্ট ছেলে নিজের কচি মনে তার আপনজনের কারাজীবনের দুঃসহ দিন যাপনের কথা চিন্তা করেছে আর তাকে মুক্ত করবার পন্থা খুঁজেছে কয়েক হাজার মাইল দূরে

www.pathagar.com

শত হাত দুরে অবস্থিত মহকুমা হাকিমের অফিস থেকে তার স্বাক্ষর করা কাগজ ডিসেম্বর ১১ তারিখেও ফিরে এলা না। বিকেল ৪টার সময় স্থানীয় আইনজীবী বন্ধু সাক্ষাৎ করে খবর দিলেন মহকুমা হাকিমের কাছে এখনও ফাইল পেশ করা হয়নি। তদবীর না করলে কেরানী সাহেবানরা মহকুমা হাকিমের কাছে ফাইল পেশ করতে গড়িমসি করছেন। এই তদবীরের অর্থ অজানা ছিল না, কিন্তু মুক্ত জীবনে যাত্রা পথের সূচনায় মসীলিপ্ত করতে মন সায় দিলনা। তাই তদবীরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কারা অভ্যন্তরে ফিরে এলাম। শোষণের রূপ দেখে আঁতকিয়ে উঠলাম। যেখানে শোষণের কথা চিন্তাই করা যায় না সেখানেও নূতন নূতন রাস্তা উদ্ভাবন করা হয়েছে। ঢেউগুণে অর্থ আদায়ের কাহিনীও এখানে তুচছ। মনে সংশয় এল বাহিরের যে দেশ পিছনে ফেলে এসেছি পৌনে সাত'শ দিন আগে আর যে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রহর গুণছি তা কি এক!

প্রহর গোণা শেষ হল। বিকেল ৫টার দিকে অফিস পিয়ন দৌড়ে এসে খবর দিল 'আপনার স্ত্রী কুষ্টিয়া মহকুমা হাকিমের আদেশ নিয়ে এসেছেন, মালমাত্তা নিয়ে অফিসে চলুন'। মন আনন্দে ভরে উঠল। পৌনে সাত'শ দিনের কারা জীবনকে পিছনে ফেলে লৌহ কপাটকে অতিক্রম করে যে নতুন যাত্রা শুরু হবে তার প্রতিটি পদক্ষেপে উভয়েরই পায়ের চিহ্ন গড়বে এক সাথে। মনের প্রস্তুতি ক'দিন থেকেই ছিল তাই অফিসে পৌছাতে দেরী হলনা। কারাগারে প্রবেশ করা এবং কারাগার হতে বের হয়ে যাওয়া উভয়ই কঠিন। বাঁধন এক জায়গায় পড়ে না--বহু বাঁধন মুক্ত না করে বের হওয়ার উপায় নেই। আমার মুক্তির হুকুম পরীক্ষা করতে ডেপুটি জেলার ও জেলারের এক ঘন্টার বেশী সময় লেগে গেল এবং অফিস রেকর্ড ঠিক করতে লাগল আরও কয়েক ঘন্টা। ১৯৯৪ সনের জন্য তৈরী মোটা খাতা টেনে নিলেন ডেপুটিসাহেব। কেননা এর মধ্যেই আমার আমল নামা লিখা ছিল। আমার মুক্তির জীয়নকাঠি ছিল এর মধ্যেই রক্ষিত যা স্পর্শ করার হুকুম ছিল এই শতাব্দী শেষ হওয়ার কয়েক বছর পূর্বে। রাত সাড়ে নয়টার দিকে সমস্ত আনুষাঙ্গিক কাজ সারা হওয়ার পর যশোহর কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রথম লৌহ কপাটের ভারী তালা আমার জন্য খোল হল।

আহ! আমি মুক্ত

আহ! আমি মুক্ত--কোন বেড়ী নেই। কোন শৃংখল নেই-নীচে রাজপথ সুদুর বিস্তৃত, পাশে শ্যামল তৃণদল, নির্মল শিশিরে স্নাত, উপরে মুক্ত আকাশ, স্নিগ্ধ চাঁদের আলো, হাস্যোজ্জল তারার ঝিকিমিকি, সবই মধুর সবই উজ্জল। বাহন এগিয়ে চলেছে আমরা উভয়ে পাশাপাশি বসা আমি আর সৈয়দা। কোন ব্যবধান নেই আজ। পৌনে সাত'শ দিনের ব্যবধান যে দূরত্বের প্রাচীর খাড়া করে রেখেছিল তার অস্তিত্ব আর নেই। গাড়ী এগোচেছ যাত্রী আমরা দু'জন। সৈয়দার ডান হাত আমার বাম হাঁটুর

www.pathagar.com

উপর চরম ক্লান্তি অথচ নির্ভরতার চিহ্ন পরিস্ফুট। চেয়ে আছি সৈয়দার দিকে--মুখে ক্লান্তির ছাপ, পৌনে সাত'শ দিনের নিরাপত্তাহীন জীবন, দারিদ্র ও অবহেলা আয়ুর গতিকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। জীবনের এই খাতটুকুতে যতটা শলিতা বরাদ্দ ছিল তার চাইতে পুড়েছে বেশী। সহজ, সরল, প্রৌঢ়ত্বের ছাপ ঢাকবার কোন প্রচেষ্টা নেই। দৃষ্টি দিলাম সৈয়দার মনের গভীরে। প্রেম, ভালোবাসা, করুণায় ভরা একটি উজ্জল মন, সেবার প্রকৃতি নিয়ে গড়া নিবেদিত একটি প্রাণ, সুখ ও দুঃখের অংশীদার এক সহযাত্রী, লাভের অংক কষায় ব্যস্ত নয়, লোকসানের বোঝা টানতেই সদা ব্যগ্র। এই আমার পারিবারিক জীবনের ভিত্তি। কৃতজ্ঞতা জানালাম স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। 'খালাক্বা লাকুম মিন আনফুসিকুম আযওয়াজান লিতাছকুনু ইলায়হা ও জায়ালা বায়নাকুম মাওয়াদ্দাতাও ওয়া রাহমা'-আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া বানিয়ে দিয়েছেন যাতে তোমরা শান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও করুণার সঞ্চার করে দিয়েছেন (কোরআন)। গাড়ী এগিয়ে চলেছে। যাত্রী আমরা দু'জন। দূরের ক্ষীণ আলো রশ্মি ক্রমশঃ উজ্জল হচ্ছে, দূরের সরু পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে মনের আকাংখা, জাগছে নূতন নূতন আশা আর প্রশস্ত হচ্ছে কর্তব্য ও দায়িত্বের অনুভূতি।

অধ্যায়-১৫

নিজের আবাসস্থলে ফিরে এলাম

কুষ্টিয়া থেকে ১৯৭১ সনের ডিসেম্বরে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার সাতশত চল্লিশ দিন পর কুষ্টিয়ায় নিজের আবাসস্থলে ফিরে এলাম। কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে যশোহরের স্বনামধন্য শিল্পপতি ও বন্ধু জনাব এস. এম. এ আহাদের বাসভবনে আতিথিয়েতা গ্রহণ করে উনার ব্যক্তিগত কারে আমি ও সৈয়াদা নিঃশব্দে কুষ্টিয়ার বাসায় পৌছলাম। এক রাশ সংসয় ছিল মনে। পরিবেশ কেমন হবে - প্রতিবেশীদের আচরণ কেমন হবে - নিজের পেশা যা একমাত্র রোজগারের মাধ্যম চলবে কিনা - ইত্যাদি চিন্তাভাবনাগুলি মনের মধ্যে লুকোচুরী খেলছিল। শীতের মওশুম কারাগারেই সর্দি কাশীতে ভুগছিলাম কুষ্টিয়ায় এসে বেড়ে গেল। ছোট ভাইএর বন্ধু ডা: হাসান ইমামের চিকিৎসায় এক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে গেলাম। বেকার অবস্থায় বিশ্রাম নিচ্ছি শূন্য মস্তিস্কে দুশ্চিন্তার ভীড়। স্ত্রী ও সন্তানেরা ২ বছর থেকে মোহাজেরের মত কালাতিপাত করেছে। ১৯৭১ এ দোতালা বাড়ীটি সম্পূর্ণ দগ্ধ হলে শুধু সিড়িঘরটি অক্ষত ছিল, সেখানেই তারা বাস করেছে। তারপর একটি কামরা বড় ছেলে সউদের স্কলারশিপের টাকায় মেরামত করে কোনরকমে দরজা জানলা লাগিয়ে বাসোপযোগী করেছে। এরই মধ্যে আমিও এসে আশ্রয় নিলাম। এ কদিন বাহিরে বের হইনি - ঘনিষ্ট বন্ধুবান্ধব কয়েকজন দেখাসাক্ষাৎ করেছেন। সমস্ত সংশয় ঝেড়ে ফেলে

www.pathagar.com

২০শে ডিসেম্বর জেলা বার সমিতিতে আইনজিবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। পুরানো সহযোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল তারা পেশা শুরু করতে বললেন। পুরানো মক্কেলরা অনেকেই ছুটে এলেন, অনেকেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। একজন এসে তার একটি মোকদ্দমা করার জন্য বায়না স্বরূপ ২০টি টাকা হাতে তুলে দিলেন। বাসায় ফিরে সেয়াদার হাতে টকাটা দিয়ে বললাম - ৩ বছর পর এই প্রথম রোজগার, টাকাটা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দান করে দাও। স্নেহাস্পদ জুনিয়ার বন্ধু এস. এম. এমদাদকে নিয়ে পরদিন থেকে নিজের পেশা শুরু করলাম। ডিসেম্বরের শেষ ক'দিনে আল্লাহর রহমতে এক হাজার টাকা রোজগার করে আস্থা ফিরে এলো। মহান আল্লাহতায়ালার বাণী মনে পড়ল 'নিশ্চয়ই কষ্টের পরে সুখ আছে---'। জানুয়ারীতে আল্লাহ মেহেরবান যে রুজী দিলেন তা ছিল পাকিস্তান আমলের সর্ব্বোচচ মাসিক আয় থেকে অনেক বেশী। এর পর আর পিছনে তাকাইনি শুধু মই বয়ে উপরেই উঠেছি এবং এখনও মহান প্রভুর করুণায় উপরেই রয়েছি।

প্রথমেই নজর দিলাম দালাল আইনে আটকে থাকা শত শত ভাইদের প্রতি। জানিয়ে দিলাম দালাল আইনে আটক ভাইদের কেস করার জন্য কোন পারিশ্রমিক চাওয়া হবে না। যেহেতু আমারও পুনঃর্বাসনের জন্য অর্থের প্রয়োজন সেহেতু যার যা ইচছা পকেটে দেবেন - গোনা হবেনা। কেও না দিলেও সমান আগ্রহ নিয়ে তার কেস করে দেওয়া হবে। এতদিন দালাল আইনের সমর্থক আইনজিবীরাই দালালদের চরম ভাবে শোষণ করেছে এবং জেলের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে এবার তার হল ব্যতিক্রম। হাইকোর্টেও শ্রদ্ধেয় বিচারপতিগণ উপযুক্ত ক্ষেত্রে দালালদের জামিন দেওয়া শুরু করেছেন, সেইসব নজীর দেখিয়ে কুষ্টিয়াতেও জামিন লাভ করা সম্ভব হল। বলতে গেলে কয়েকমাসের মধ্যেই জেলখানা দালালশূন্য হয়ে গেল এবং যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারাও বিচারে খালাস পেয়ে গেলেন। রুজী রোজগারে কিছুটা স্থীতিশীলতা এলে প্রকট সমস্যাগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলাম। ১৯৭১ সনে বাড়ী পুড়ে যাওয়ায় হাউজ বিল্ডিং করপোরেশন থেকে গৃহিত ঋণ ইনসুরেন্স কোম্পানী থেকে আদায়ের সিদ্ধান্ত ছিল কিন্তু বাংলাদেশ সরকার সে সিদ্ধান্ত বাতিল করায় কারাগারেই ঋণ পরিশোধের নোটিশ গিয়ে হাজির হয়। ঋণের নোটিশ নিয়ে মুক্ত হয়ে পোড়া বাড়ী সংস্কারের চরম প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। নিজ পেশার জন্য যে বইএর প্রয়োজন তার একটিও অবশিষ্ট ছিলনা। পেশায় যে পোষাক ব্যবহৃত হয় তাও ছিলনা। এ চাহিদাগুলো এমন ছিল যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অর্থের আশু প্রয়োজন ছিল কিন্তু হাতে কোন আলাদিনের চেরাগ ছিলনা। প্রায় ৩ বছর পর পেশায় নেমে আলাদিনের চেরাগের সন্ধান না পেলেও স্রষ্টার করুণা বর্ষিত হল অযুত ধারায় 'বিগায়রে হিসাব'। প্রতিদিনের রোজগারকে ৩টি খাতে বিভক্ত করে একভাগ খাদ্যের জন্য, একভাগ ঋণ পরিশোধের জন্য ও আর একটি ভাগ যাবতীয় সংস্কারের জন্য বরাদ্দ করে এক বছরের মধ্যেই নিজেকে একজন সফল অর্থনীতিবিদ হিসাবে প্রমাণ করলাম। একবছর পর

www.pathagar.com

যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করে প্রতিজ্ঞা করলাম জীবনে আর ঋণ গ্রহণ করব না। ঋণ বিশেষ করে সুদী ঋণ একটি অভিশাপ। ১৯৬৩ সনে বাড়ী নির্মাণের জন্য ঋণ নিয়ে ১৯৭০ এর শেষ পর্য্যন্ত কিস্তি পরিশোধ করার পরও কারাগারে বসে যে নোটিশ পেলাম তাতে দেখা গেল মূল ঋণের টাকা থেকে মাত্র ৫০০শত টাকা কমেছে।

নিজের পেশায় ব্যস্ততা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল। অবসর সময়টুকুতে খবরের কাগজ পড়া এবং অতীত ও বর্তমানের অবস্থা তুলনামূলক স্টাডি করে দীর্ঘ নি:শ্বাস ছাড়া আর কিই বা করবার ছিল। এ দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক আমি। সংবিধানের সমস্ত মৌলিক অধিকার থেকে আমি বঞ্চিত। আমার কোন রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম নাই-খোদা প্রদত্ত দায়িত্ব অনুযায়ী সংগঠন গড়ারও কোন অধিকার নাই। কারাগারে যে প্রাচীর দেখেছি, কারাগারের বাহিরে এসে মনে হলো কারাগারের প্রাচীরটা সম্প্রসারিত হয়ে দেশের চৌহদ্দিকে ঘিরে ফেলেছে। কারাগারে খবরের কাগজের মাধ্যমে যে হত্যা, রাহাজানী, শোষণ, জুলুম, দুর্নীতি, বিশৃংখলার ঘটনা শুনেছি বাহিরে এসে সেগুলি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। সর্বত্রই রক্ষী বাহিনী দৌরাত্ম, লাল বাহিনীর ঘোড়া দাবড়ানো এবং সরকারী দলের বেপরোয়া সন্ত্রাস ও শোষণ। আওয়ামী লীগের দুর্নীতি, কালোবাজারী, চোরাচালান আর রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে গণঅসন্তোষ ও রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। শেখ মুজিব তার রক্ষীবাহিনী আর সশস্ত্র রাজনৈতিক কর্মীদের দিয়ে তা প্রতিহত করছিলেন। বিপক্ষের হাতেও অস্ত্রের কমতি ছিলনা তারাও মুক্তিযুদ্ধের অংশীদার। তাই হত্যা ও পাল্টা হত্যা মিলিয়ে ১৯৭৩ সনের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে কেবল রাজনৈতিক হত্যার সংখ্যা ২০০০ অতিক্রম করে। (বাংলাদেশ রক্তের ঋণ - এ্যান্টনী ম্যাসকারেনহাস)।

বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ

১৯৭৪ সন। বাংলাদেশে মানুষের স্মৃতির পাতায় একটি জঘন্যতম অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আমদানী ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি, কালোবাজারী, চোরাচালানী ইত্যাদির বদৌলতে খাদ্য সরবরাহ অবনতির দিকে ধাবিত হতে লাগলো। চালের দাম অস্বাভাবিক ভাবে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে গেল। তারপরই দেশের প্রায় অর্দ্ধেক এলাকা প্রলয়ঙ্করী বন্যায় ডুবিয়ে দিল। মানুষ খেকো বাঘের মতো দুর্ভিক্ষ সদর্পে সারা দেশ ছেয়ে গেল। গ্রামগুলোতে মশা মাছির মত মানুষ মরতে শুরু করল। শেখ মুজিব নিজেই সরকারীভাবে পরে স্বীকার করেছিলেন যে খেতে না পেয়ে প্রায় ২৭ হাজার লোক মারা গেছে। এ হিসেবটা যথেষ্ট কম ছিল। কমপক্ষে ৩০ লক্ষ লোক উপোষ সীমার নীচে বসবাস করছিল। সুতরাং ঐ হিসেবে দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা লক্ষের ঘরেই হয়ে থাকবে। (বাংলাদেশ রক্তের ঋণ - এ্যান্টনী ম্যাসকারেনহাস)।

আর্মি অফিসারদের শেখ মুজিবের প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি

১৯৭৪ সনের জানুয়ারী মাসে কয়েকজন যুব আর্মি অফিসার এমন এক

www.pathagar.com

ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে যা পরবর্তীতে শেখ মুজিবের হত্যাকান্ডকে সরাসরি প্রভাবান্বিত করেছিলো। ঢাকা লেডিজ ক্লাবে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে মেজর ডালিম আর তার স্ত্রীকে নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। শেখ সাহেবের ডান হাত ও রেডক্রসের চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফার ভাই, মিসেস ডালিমের উপর কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করে। বাদানুবাদের এক পর্যায়ে গাজীর ভাড়াটে গুন্ডা বাহিনী যোগ দেয় এবং দম্পতিটিকে বেইজ্জতি করে। ঘটনা শুনে ডালিমের সহকর্মী আর্মি বন্ধুরা এর দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয় দুই ট্রাক ভর্তি সৈন্যসামন্ত নিয়ে গাজী গোলাম মোস্তফার বাংলো তছনছ করে। উভয় পক্ষ শেখ সাহেবের কাছে বিচার চাইলে তিনি মিলিটারী পর্যবেক্ষণ টিম গঠন করেন এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ ২২ জন যুবক আর্মি অফিসারকে চাকুরীচ্যুত করা হয় কিংবা জোর পূর্বক অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়। এদের মধ্যে মেজর ডালিম, মেজর নূর, মেজর হুদাও ছিলেন। এতে যুবা অফিসারদের মধ্যে শেখ মুজিবের উপর দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয় যার পরিণাম হয়েছিল অত্যন্ত মারাত্মক। (বাংলাদেশ রক্তের ঋণ - এ্যান্টনী ম্যাসকারেনহাস)

রক্ষী বাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ

মাও পন্থী সিরাজ শিকদার ১৯৭৪ এর ডিসেম্বরে পুলিশ কতৃক চট্টগ্রামে গ্রেফতার হন। পুলিশ পাহারায় তাকে ঢাকা এনে শেখ সাহেবের কাছে নিয়ে আসা হয়। তিনি তাকে আয়ত্বে আনতে চাইলেন কিন্তু সিরাজ শিকদার কোন আপোষে রাজী হলেন না। শেখ সাহেব পুলিশের হাতে তাকে দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বললেন। সিরাজ শিকদার কে হাতকড়া লাগিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় রমনা পুলিশ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে আসা হয়। তারপর গভীর রাতে এক নির্জন রাস্তায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। সরকারী প্রেস নোটে বলা হয় যে 'পালানোর চেষ্টা কালে' সিরাজ শিকদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

১৯৭৪ সনে বিচার বিভাগীয় একটি রায়ে রক্ষী বাহিনীর বর্বরতা এবং উদ্যাম ও বেপরোয়া নিপীড়ন মূলক কার্য্যকলাপের ঘটনাবলি জনসাধারণের দৃষ্টিতে আসে। ফরিদপুর জেলার নড়িয়া থানার চামটা থানায় মাত্র ১৮ বছরের একটি তরুণ শাজাহানকে পুলিশ ঢাকার গুলিস্তান সিনেমা হলের নিকট থেকে গ্রেফতার করে রক্ষীবাহিনীর হাতে সমর্পন করে। রক্ষী বাহিনীর শেরে বাংলা নগরস্থ হেড কোয়ার্টারে তাকে ২/১/৭৪ পর্যন্ত রাখা হয়। তারপর সে লাপাত্তা হয়ে যায়। শাজাহানের ভাই মহসীন শরীফ থানা পুলিশ কোর্ট, ইত্যাদি সর্বমহলে শাজাহানকে উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন (৪৬/১৯৭৪) দায়ের করেন। রক্ষী বাহিনীর তরফ থেকে বক্তব্য পেশ করে বলা হয় আসামী শাজাহান তদন্ত অভিযান কালে তাদের নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আইনে আওতা বর্হিভূত কার্য্যকলাপের বিরূদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট রক্ষীবাহিনীকে দোষী বলে চরম তীরস্কার করেন। সুপ্রিম কোর্ট দেখতে পান যে রক্ষী বাহিনী কোন আইনকানুন নিয়ম পদ্ধতি ইত্যাদি কিছুই মেনে

www.pathagar.com

চলতো না। এমকি গ্রেফতার কিংবা জিজ্ঞাসাবাদের কোন রেজিষ্টারও তাদের ছিলনা। (২৭ ডি. এল. আর ১৮৬ বিচারপতি ডি.সি ভট্টাচার্য্য ও বিচারপতি আব্দুর রহমান চৌধুরী) বিচার বিভাগীয় এসব রায়ে শেখ মুজিব আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না।

শেখ মুজিবের ক্ষমতার মোহ ঃ দু:খজনক পরিণতি

প্রধান মন্ত্রীত্বের বিরাট দায়িত্বে থেকেও শেখ মুজিবের ক্ষমতার মোহ কাটেনি। আরও বেশী ক্ষমতা হাতের মুঠোয় নেবার পরিকল্পনায় মত্ত হয়ে উঠলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ফ্রান্স/আমেরিকান কায়দায় রাষ্ট্রপতি সরকারে প্রবর্তন করবেন এবং তাই করলেন দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা জারী করে ১৯৭৪ সনের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে জনগনকে সকল মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। নিজের কাজে যেন কোন বাধা না আসে তার জন্য বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করলেন। তারপর জাতীয় সংসদে তার সর্বময় ক্ষমতার পক্ষে সকল আইন পাশ করিয়ে নিলেন। এক মাসের কম সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ সকল পরিবর্তনে রাবার স্ট্যাম্প প্রদানের কাজ শেষ করলো। শেখ মুজিব এই পরিবর্তনকে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যা দিলেন। তার মতে 'এ বিপ্লব শোষণ আর অন্যায় থেকে দুঃখী মানুষের মুক্তি বয়ে আনবে।' তিনি ১৯৭৫ সনের ২৫শে জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসাবে অভিষিক্ত হলেন। বাংলাদেশে চাটুকার ও সরকারের করুণাভোগী বুদ্ধিজিবী ও সংবাদপত্রের কোনদিনই অভাব হয়নি। তারা খুশীর চিৎকারে ফেটে পড়ল। লক্ষকোটি মানুষের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়া হল চাটুকারদের আওয়াজকে বুলন্দ করার জন্য। করুণাভোগীদের সরকারে উচ্ছিষ্ট খাওয়ার পথ আরও সুগম হল। এটা অবশ্যই দ্বিতীয় বিপ্লব বা কোন বিপ্লব ছিলনা। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল 'প্রাসাদ ষড়যন্ত্র' যা দেশ থেকে মূল্যবোধ, গণতন্ত্র, ন্যায় বিচার আর গণমানুষের আশা আকাংখাকে গলা টিপে হত্যা করেছিল।

এতেও মিটিলনা আশা। আরও ক্ষমতা চাই। শেখ মুজিব শুরু করলেন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় যাবতীয় ক্ষমতা তার হাতে কুক্ষিগত করতে। ১৯৭৫ এর জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে পাশ হয়ে গেলো সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী। এই সংশোধনীর বদৌলতে শেখ মুজিব পার্লামেন্টের উপরও ক্ষমতাসীন হলেন, দেশে একনায়কত্ব কায়েম করলেন এবং প্রেসিডেন্ট হিসাবে একটি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ক্বায়েমেরও ক্ষমতা পেয়ে গেলেন। ৭ই জুন ১৯৭৫ সন শেখ মুজিব বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করলেন। সকল বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকান্ডের দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেলো। বাকশালের সদস্য না হয়ে কারও পক্ষে কোন রাজনীতি করার সুযোগ আর রইলনা। ১৯৭৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে বাকশাল এর শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবার কথা ছিল। ইতিমধ্যেই সর্বস্তরে দলীয় কাঠামো এবং নির্বাহী ও কার্য্যকরী কমিটিসমূহ গঠনের কাজও সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। শেখ মুজিব নিজেই প্রেসিডেন্ট ও দলীয় চেয়ারম্যান রয়ে গেলেন। রাজনৈতিক দিকের সর্বোচচ পর্য্যায়ে তার নিকটতম লোকদের নিয়ে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট

www.pathagar.com

নির্বাহী কমিটি গঠন করেন যার ৩ জন পার্টি সেক্রেটারীর মধ্যে শেখ ফজলুল হক মনিও ছিল। বিভিন্ন পর্য্যায়ে আরও অনেক কমিটি গঠিত হল। এই ভাবে প্রতিটি জেলার জন্যও ৬১ জন গভর্নর শেখ মুজিব নিয়োগ করলেন। গর্ভনরগণ বাংলাদেশ রাইফেলস, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ এবং ঐ এলাকায় অবস্থিত সেনাবাহিনী ইউনিটের নিয়ন্ত্রন করার কথা ছিল। কুষ্টিয়া জেলা বোর্ড নির্বাচনে আমার প্রতিদ্বন্দ্বি যার জামানত বাজেয়াপ্ত হয় তিনি গর্ভনর হলেন কুষ্টিয়া জেলার। ১৪ই আগষ্ট গভর্নর সাহেবের কুষ্টিয়া আগমন উপলক্ষে কয়েকশত গাড়ীর বহর পাকশী ফেরী ঘাটে উপস্থিত হল। ১৫ই আগষ্ট কুষ্টিয়ার তার নুতন পদে আসীন হবার কথা। কয়েকদিন থেকে একটি ভয়াবহ গুজব শোনা যাচ্ছিল যে ১৫৯ জন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দীদের একটি তালিকা করা হয়েছে। গর্ভনর সাহেব আসীন হবার পর পরই এদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থাও নাকি চূড়ান্ত করা হয়েছিল। কিন্তু দেহলী হনুজ দূর আসত্। ১৫ই আগষ্টের ভোর বেলায় শেখ মুজিব নৃশংস ভাবে হত্যা হলেন তার নিজের লোক দ্বারা যারা ছিলেন বাংলোদশের সূর্য্য সন্তান, মুক্তি বাহিনীল নামকরা সিপাহসালার, শেখ সাহেবের অতি প্রিয় ভক্ত ও ঘনিষ্ট আপন জন। জালেমের নিস্পেশন ও জুলুম যখন সীমা অতিক্রম করে, মজলুমের আহাজারী ও গুমরে গুমরে কান্নার রোল যখন বাতাসকে ভারী করে তোলে, নিঃসহায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস যখন আছমান বিদীর্ন করে আল্লাহর আরশকে কাঁপিয়ে তোলে তখন অপ্রত্যাশিত গায়েবী মদদ দিয়ে স্রষ্টা তার সৃষ্টিকে রক্ষা করেন। সাদ্দাদ নকল বেহেশত তৈরী করে উদ্বোধন কালে ঘোড়া থেকে নামতে পারেনি, সেই মুহুর্তেই তার আয়ু শেষ হয়ে যায়। শেখ সাহেবও তার জন্য রাজাধিরাজের সিংহাসন তৈরী করে আসীন হবার পূর্বেই আল্লাহতায়ালার অমোঘ বিধানে দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। সত্যিই 'দেহলী হনুজ দূর আসত্'।

খন্দকার মোশতাক প্রেসিডেন্টের গদিতে

সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ সাহেবের বাকশাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে গেল। যাদেরকে স্বাধীনতার বিপক্ষশক্তি বলে অহরহ কটুক্তি করা হয় তারা আদৌ এ কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। না পরিকল্পনায়, না প্রস্তুতিতে, না বাস্তবায়নে - কোন পর্যায়েই 'স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি' এই উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা এই নির্মম কাজে বিন্দুমাত্র অংশ গ্রহণের কথা চিন্তাও করেননি। পূর্বেই বলেছি শেখ সাহেবের নিজের লোক, বাংলাদেশে সূর্যসন্তান, মুক্তি বাহিনীর নাম করা সিপাহসালার, শেখ সাহেবের অতি প্রিয় ভক্ত ও আপন জন পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছে। এরাই শেখ সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে প্রেসিডেন্টের গদিতে বসিয়ে দিলেন খন্দকার মোশতাককে যিনি আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ইতিহাসে ছিলেন সেখ সাহেবের ঘনিষ্ঠ সহচর, ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আঃ লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট, তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত মুজিব নগরের প্রবাসী সরকারে পররাষ্ট্র মন্ত্রী, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং ১৯৭৫ সনে শেখ মুজিবের বাংলাদেশের

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট হিসাবে শাসিত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী।

খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ

প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে শেখ মুজিবের সমালোচনা করলেন এবং সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিবের হত্যা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে করা হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন 'সকলেই এই শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন চাচ্ছিল কিন্তু প্রচলিত নিয়মের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় সরকার পরিবর্তনে সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। সেনাবাহিনী জনগনের জন্য সুযোগের স্বর্নদ্বার খুলে দিয়েছে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি বিংবা সামাজিক অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করা হবেনা ঘোষণা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের শতকরা ৯০ ভাগ তাওহিদী জনতার প্রাণের দাবী ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিতেও তিনি আদৌ কার্পণ্য করলেন না। তবে দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটি সহ অনেক মুলনীতি পাল্টাতে হবে এবং দেশটিকে ইসলামী 'প্রজাতন্ত্রে পরিণত করতে হবে এরূপ কোন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বা আশ্বাস খন্দকার মোশতাকের বেতার ভাষণে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত রইল। মোশতাক সাহেব ছিলেন আমার পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বন্ধু এবং আমরা আওয়ামী লীগের পতাকাতলে একসঙ্গে কাজ করেছি তাইতে অবস্থা কিছুটা স্থিতীশিল হলে আর্দশিক প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ইচছা হল। প্রেসিডেন্ট ভবনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ফোনের মাধ্যমেই পেয়ে গেলাম। আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগের পর তাঁর সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিল না - সুতরাং সাক্ষাৎটা অনেকদিন পর। উষ্ণ সম্বর্ধনার পর আলোচনা প্রসঙ্গে যখন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা প্রশ্ন এল তখন তিনি সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছেন বলে ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শাসকদল মুসলিম লীগের কঠোর সমালোচনা করে খন্দকার মোশতাক সাহেব বীরেচিত ভঙ্গীতে বললেন 'মুসলিম লীগ গত ২৩ বছরে ইসলামের কোন কাজ করেনি, আমিত একটা টুপি দিয়েছি, মনোরঞ্জন ধরকেও এখন টুপি মাথায় দিয়ে অফিসে আসতে হচেছ।" শাসকদের কাছে টুপি, পাজামা, সেরওয়ানী, কোর্মা, পোলাও, বিরিয়ানী, মূল্যবান ক্যালিগ্রামী ইত্যাদি বিষয়গুলি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, অনৈসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে জীবন ও সমাজ গড়ার কোন তাগিদ তাঁরা অনুভব করেননা। এই বিশ্বাস নিয়ে চা পানের পর বিদায় নিলাম যে খন্দাকার মোশতাক টুপির মোজেজা দিয়েই এ দেশের ইসলাম প্রিয় জনগনকে সন্তুষ্ট রাখতে চান। ইসলামী প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা আদৌ আন্তরিক নয়।

জিয়াউর রহমান সপ্তম প্রেসিডেন্ট

৩রা অক্টোবর ১৯৭৫ সন। খন্দকার মোশতাকের শাসন ৫০ দিনে উন্নীত হয়েছে। মোশতাক 'জনগনের হৃত অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত' রেডিও

www.pathagar.com

টেলিভিশনে ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা দেন ১৫ আগষ্ট ১৯৭৬ সন থেকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হবে আর পার্লামেন্টারী সরকার গঠনের জন্য ২৮শে ফেব্রুয়ারী (১৯৭৭) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। খন্দকার মোশতাক এ সুযোগ পাননি। সামরিক বাহিনীর মধ্যে অভ্যুত্থান, এবং পাল্টা অভ্যুত্থান, সিপাহী বিপ্লব, উচচভিলাসী সামরিক অফিসারদের উত্থান এবং পতন, আওয়ামী লীগ ও তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী সামরিক অফিসারদের ঘোলা পানিতে মাছ স্বীকার করার সুযোগের সদ্ব্যবহার ও তাদের বিরুদ্ধে তাওহিদী জনতা ও দেশদরদী সিপাহীদের পাল্টা আঘাত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যে চিত্র অঙ্কিত হল তা ছিল খন্দকার মোশতাকের পদত্যাগ, ৬ই নভেম্বর (১৯৭৫) প্রধান বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েমের দেশের পঞ্চম প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ এবং খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পন্থীদের যাবতীয় চক্রান্ত নস্যাৎ করে তাওহিদী জনতার সমর্থন পুষ্ট সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসেকের দায়িত্বভার গ্রহণ। ক্ষমতা গ্রহণ করে জেনারেল জিয়া ঘোষণা করলেন দেশের এই কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি সেনাবাহিনীর অনুরোধে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সর্বশক্তি দিয়ে তিনি এই দায়িত্ব পালন করবেন বলে ঘোষণা দেন। ৩রা নভেম্বর থেকে বন্ধ হয়ে যাওয়া অফিস, আদালত, মিল, কলকারখানা, বিমান বন্দর ইত্যাদি পুনরায় খুলে দিয়ে সবাইকে কাজ করতে অনুরোধ জানান। এদেশে 'জিয়া' ছিল একটি পরিচিত নাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তিনি জনমনে আশার সঞ্চার করেছিলেন। জিয়ার সময়োচিত ও আবেগপূর্ণ আহবান সারাদেশে জাতীয়তাবাদের জোয়ার বইয়ে দেয়। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সাড়ে ৩ বছরের অবিচার, অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে দেশের মানুষ পুনঃ স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ পেল। ১৯৭৭ সনের ২১শে এপ্রিল জিয়াউর রহমান ৪৩ বছর বয়সে বাংলাদেশের সপ্তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সংবিধান সংশোধন

১৯৭২ এর সংবিধানে জাতিকে দুইভাবে বিভক্তির যে পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এক অংশের জন্য কিছু মৌলিক অধিকার ছিল কিন্তু অন্য অংশের জন্য ছিলনা। দল গঠনের অধিকার যদিও ছিল কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ট তাওহিদী জনতার নিজেদের আদর্শ ও বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসারের জন্য দলগত প্রচেষ্টার উপর সাংবিধানিক বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে একজন মুসলিম না ব্যক্তিগত জীবন চালাতে পারে না সামষ্টিগত জীবন পরিচালনা করতে পারে। আবার এসব খোদাদ্রোহী মূলনীতির উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত দলের অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল তাও 'বাকশালের' শেল বর্ষণে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় নির্মুল হয়ে গলে। সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন ১৯৭৫ এর আশীষ পুষ্ট হয়ে রাজতন্ত্রের লেবাস পরে বাকশাল রাজ

www.pathagar.com

ক্বায়েম করে শেখ মুজিব দেশের যেটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল তা কেড়ে নিলেন যে সব দল ছিল তা নির্মুল করলেন, সংবাদপত্রগুলিকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করলেন, বিচারক ও বিচার বিভাগকে হাতে মুঠোর মধ্যে নিয়ে নিলেন এবং নিজেকে ও নিজের দলকে সমস্ত সমালোচনা ও জবাবদিহীতার উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সামরিক সরকারের দ্বিতীয় ঘোষণা (ষষ্ট সংশোধনী) আদেশ ১৯৭৬ (দ্বিতীয় ঘোষণা আদেশ নং ৩/১৯৭৬) এর মাধ্যমে সংবিধানের ৩৮ ধারার শর্তাংশটি বিলুপ্ত হল। নুতন বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের ধর্মাবিশ্বাস ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে দলগঠন ও দলীয় মতাদর্শ প্রকাশ ও প্রচারের বিরুদ্ধে যে কঠোর সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছিল তা এই ঘোষণা (দ্বিতীয় ঘোষণা আদেশ ৩/১৯৭৬) দ্বারা রহিত হয়ে গেল। সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সামরিক সরকারের এ ছিল এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন ১৯৭৫ এর মাধ্যমে তথাকথিত দ্বিতীয় বিপ্লবের ধ্বনি তুলে বাকশালের নামে যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাও সামরিক সরকারের দ্বিতীয় ঘোষণা (সপ্তম সংশোধনী) আদেশ ১৯৭৬ (দ্বিতীয় ঘোষণা আদেশ নং ৪/১৯৭৬ এর দ্বারা কার্য্যত বাতিল হয়ে গেল। দেশের মানুষ অনেক হারানো অধিকার ফিরে পেল বিচার বিভাগের হারানো গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল, আদালতের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির পথ সুগম হল। বাকশালী গণতন্ত্রের অভিশাপ থেকে জাতি মুক্তি পেল।

শৃংখলাবদ্ধ মানুষের কর্মের গন্ডী সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের মানুষের অবস্থাও তাই ছিল। সরকারী দলের নেতাকর্মী ও কিছু সংখ্যক সমর্থক ছাড়া স্বাধীনতার স্বাদ এদেশের আপামর জনসাধারণ ভোগ করতে পারেনি। স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতের সাহায্য উচ্চমূল্যে খরিদ করতে হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত তা সুদে আসলে ওয়াশীল করে নিয়েছে। শুধু তাই নয় ২৫ বছরের অসম চুক্তি করে বাংলাদেশকে তারা জিঞ্জিরে আবদ্ধ করেছে। দেশের সম্পদ এমন ভাবে পাচার হয়েছে যে অভাব ক্ষুধা ও মৃত্যু চাদর বিছিয়ে দিয়েছিল যার পরিনতি ছিল ১৯৭৪ এর দুর্ভিক্ষ। সরকারী দলের শোষণের বিরুদ্ধে উত্থিত আওয়াজ বুলন্দ ছিলনা কেননা দেশের তাওহিদী জনতা ছিল শৃংখলাবদ্ধ। সরকারী দল ও যারা বিরোধী দল হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন তারা সবাই একই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ এর সঙ্গে এদেশের রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির কোন পার্থক্য ছিলনা। সরকারী দল ও যারা বিরোধী দলে ছিলেন তারা সবাই এই মূলনীতির সমর্থক ও পূজারী ছিলেন। ভারতের পদ্মফুলের সঙ্গে আমাদের শাপলার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিলনা। এদেশের জাতীয় পতাকার বর্ণনায় 'সবুজের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত' থাকলেও তা অমুসলিমদের সূর্য্য দেবতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। জাতীয় সঙ্গীতের নির্বাচনে তাওহিদের প্রতিফলন ঘটেনি, ভারতবাসী রবীন্দ্রঠাকুরের দেশমাতার বন্দনাই স্থান পেয়েছে। সুতরাং তাওহিদী জনতার সমর্থন পুষ্ট নেতৃত্ব ছাড়া ভারতের ছোবল থেকে

www.pathagar.com

এদেশের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়। একটি জাতির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে তার আদর্শিক ভিত্তি। এ জাতির ৯০ শতাংশের আদির্শিক ভিত্তি হচ্ছে হেরার রোশনি যা বিশ্বের মানুষের চলার পথের একমাত্র ঐশী বিধান। সুতরাং এ জাতিকে যদি জীবন্ত থাকতে হয়, ভারতের শোষণ থেকে বেঁচে থাকতে হয়, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে স্বাধীন জাতি হিসাবে মাথা উচু করে চলতে হয় তাহলে অবশ্যই নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রেখে পথ চলতে হবে। এ স্বাতন্ত্র বিশ্বাসে, সংস্কৃতিতে, জীবনের মূল্যবোধে ও জীবন ধারনে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে।

নতন দল গঠনের চিন্তা ভাবনা

খন্দকার মোশতাকের ৩রা অক্টোবর ১৯৭৫ সনের ঘোষণার পর দেশের সুপ্ত রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছুটা প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। অতিতে এদেশে বিভিন্ন সময় মার্শাল ল জারী হয়েছে, রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়েছে কিন্তু মার্শাল ল উঠিয়ে নেবার পর আবার রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ শুরু হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সবাই এ সুযোগ গ্রহণ করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগঠন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেল। আশা ছিল সংবিধান জারীর পর সবার জন্য এই বন্ধ দুয়ার খুলে দেওয়া হবে কিন্তু সংবিধান জারীর পর এই দুয়ার কঠিন ভাবে শুধু বন্ধই হলনা বরং গোটা জাতিকে দুইভাগে বিভক্ত করার নূতন নূতন বিধান সংবিধানে সংযোজিত হল। কারাগারে বসে আমাদের মুক্তি সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ছিলাম কিন্তু রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে অংশ গ্রহণ করতে পারবনা এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলাম। ১৯৪৩ সন থেকে রাজনীতি করে আসছি সুতরাং ৩০ বছর সক্রীয় থেকে এই তৎপরতা বন্ধ হয়ে যাবে এটা ছিল অসহনীয়। তাইতে কারাগারে বসে চিন্তা ভাবনা করলাম কৌশল হিসাবে নৈতিকতার ছদ্মাবরণে ইসলামের বিধি বিধানের উপর ভিত্তি করে দল গঠন করা যায় এবং দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে আন্দোলন গড়ে তোল যায় কিনা। নূতন দল গঠনের উদ্দেশ্যে একটি গঠনতন্ত্র, একটি ঘোষণা প্রস্তুত করে ফেললাম ও কারাগারের সমমনা সাথীদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি খসড়া খাড়া করা হল।

কারাগারে আরও একটি বিষয় আমাদের আলোচনার বস্তু ছিল। যারা ইসলামী আদর্শে দেশ পরিচালনায় বিশ্বাসী এবং যারা ইসলামের কিছু মূলনীতি গ্রহণ করে মুসলিম রাষ্ট্র গড়তে চান তাদের মতপার্থক্য ও বিভেদ বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী। সুতরাং আগামী দিনে যদি সুযোগ আসে তাহলে মত পার্থক্য দূর করে একটি ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফরমে দাঁড়াতে হবে এবং অতীতের রাষ্ট্রনায়কের প্রদর্শনী ইসলাম নয় বরং আলকোরানের আলোকে রসুলুল্লাহ (দ:) এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিতে আপোষহীন সংগ্রামের মাধ্যমে এদেশে নূতন সমাজ গড়তে হবে। কারাগারের জীবনে নেতৃবৃন্দ এই সঙ্কল্প গ্রহণে উদার মনোভাব প্রদর্শন করলেন।

মাওলানা আব্দুর রহিমের চিন্তাধারা

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ব্যক্তিগত অসুবিধা ও সমস্যাগুলি দূর হওয়ায়

www.pathagar.com

প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ দলের নেতা ও সহকর্মীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ শুরু করলেন এবং খন্দকার মোশতাকের ৩রা অক্টোবর ১৯৭৫ এর ঘোষণার পর প্রকাশ্যে মিলামিশা শুরু হল। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর মওলানা আব্দুর রহীম কুষ্টিয়ায় খবর পাঠালেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। মওলানা আব্দুর রহীম উপমহাদেশের অবিভক্ত বাংলার ইসলামী আন্দোলনে যোগদানকারী প্রথম ব্যক্তিত্ব, তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনের পুরোধা, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, গবেষক, বাংলাভাষায় বিশাল ইসলামী সাহিত্যের স্রষ্টা এবং পরবর্তী আমলে বাংলাদেশ পার্লামেন্টের সদস্য ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও. আই. সি) ফেকাহ একাডেমীর একমাত্র বাংলাশী সদস্য, তাফহীমুল কোরআন সহ প্রায় ১৪০ খানি মৌলিক ও অনুদিত গ্রন্থের লিখক। ১৯৭১ এর ডিসেম্বরে মওলানা আব্দুর রহীম দেশের বাহিরে ছিলেন তাইতে তাঁকে কয়েকবছর বিদেশের মাটিতে বাস করতে হয়। মওলানার সঙ্গে দীর্ঘ মতামত বিনিময় হল। কারাগারে আমাদের যে চিন্তাধারা ছিল দেশের বাহিরে বসে এবং দেশে ফিরে এসে তিনি একই চিন্তাধারা লালন করতেন। মওলানা রহিমের বক্তব্য ছিল স্পষ্ট ও প্রান চাঞ্চল্যে ভরপুর। মওলানার বক্তব্য ছিল আমার হৃদয়ের স্পন্দন তুল্য। তার ভাষায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর দেশের শতকরা ৯০ জন তাওহিদী জনতা বুকভরা আশা নিয়ে, ইমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মনে করেছিল আত্মমর্য্যাদাশীন জাতি হিসাবে তারা বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাড়াবে। কিন্তু ১৯৭১ এর ডিসেম্বরে যে দলটি নুতন দেশে ক্ষমতাসীন হল তা ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ও সাংঘর্ষিক আদর্শবাদের ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকে সংবিধানের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করে দেয়। অন্ধকার যুগ পার হওয়ার পর স্বাধীনতা পূর্ব সমস্ত ইসলামী দল ও ব্যক্তির ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি মাত্র দল গঠন এবং এই দলে ইসলামী জনতার ব্যাপক অংশগ্রণের মাধ্যমেই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। এদেশে তাওহিদী জনতার এটাই দাবী পূর্বেও ছিল এখনও অটুট রয়েছে। পকিস্তান আমলে জামায়াতে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে শিক্ষিত সমাজের একাংশের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও ব্যাপক গণভিত্তি বা গণজোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। তাইতে মওলানা এদেশে জামায়াতে ইসলামী পুনঃর্গঠনের পরিবর্তে জামায়াত সহ একটি ঐক্যবদ্ধ নুতন দল গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টে যোগদান ও দল গঠন তৎপরতা

মওলানার আহবানে আমি নভেম্বর ১৯৭৫ এ আমার পেশার ক্ষেত্র কুষ্টিয়া জেলা কোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরীত করে ঢাকায় এসে মওলানার নেতৃত্বে নূতন দল গঠনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলাম। অতীতে ৩বার চেষ্টা করেছি সুপ্রিম কোর্টে যোগদান করতে কিন্তু সফলকাম হয়নি। এবার খুব সহজেই কুষ্টিয়া ছেড়ে ঢাকায় এলাম মূলতঃ রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে, আইনজিবী হিসাবে প্রসার ঘটনার উদ্দেশ্যে নয়। তবে রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে উদাও কণ্ঠে স্বীকার করছি

www.pathagar.com

আমার পেশায় তিনি সব সময়ই করুণার বারী সিঞ্চন করেছেন এবং এখনও এই বয়সে তিনি তাঁর দয়ার হাত সঙ্কোচন করেননি। রাব্বুল আলামীন আমার পেশায় রুজীর সঙ্গে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্তি যোগ করে দিয়েছেন।

আই.ডি.এল.(ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ) প্রতিষ্ঠা

বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে নুতন দল গঠনের কাজ শুরু হল। দলের গঠনতন্ত্র, ঘোষণা ইত্যাদি প্রণয়নের জন্য আমার নেতৃত্বে একটি সাব কমিটি গঠিত হল। প্রাক্তন জামায়াতের ১১০ জন সদস্য ঢাকাস্থ ১১০ নং ফকিরাপুলে ৪ দিন আলোচনার পর জামায়াতে ইসলামের পরিবর্তে একটি নূতন ঐকবদ্ধ ইসলামী দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১১০ জনে মধ্যে ৬ জন সদস্য এর বিরোধিতা করেন। তারা জামায়াতে ইসলামীর নামে দল গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু ১০৪ জন এর মতামত অত্যন্ত বাস্তব ও যৌক্তিক থাকায় তা গৃহিত হয়। এসব প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৬ সনের আগষ্ট মাসে ৬টি পূর্বতন ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দের ঐতিহাসিক ঘোষণার মধ্য দিয়ে একটি নূতন ঐক্যবদ্ধ দল ইসলামিক ডেমোক্রাটিক লীগ সংক্ষেপে আই. ডি. এল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেদিন নিম্নোক্ত ভাষায় একটি ঐতিহাসিক ঐক্যসনদও রচিত হয়েছিল ।

"আমরা অধুনালুপ্ত কতিপয় ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ আল্লাহকে হাজির নাযির জেনে ওয়াদা করছি যে আমাদের অতিতের পরিচিতি ভুলে গিয়ে মুসলিম উম্মার ঐক্য সাধনে সম্পূর্ণ নূতন নামে একটি মাত্র গল গঠন করবো"। নুতন দলে যোগদানকারী দলসমূহের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক ঐক্যসনদে সহি করেছিলেন প্রাক্তন জামায়াতের পক্ষ থেকে মওলানা আব্দুর রহীম, মওলানা এ. কে. এম. ইউসুফ, মওলানা আব্দুল সোবহান এবং এই ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঐক্যসনদে ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে আমারও স্বাক্ষর করার সুযোগ হয়েছিল"।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের নেতা, কর্মী সমর্থক সবাই পুরোপুরি দেহ মন সপেঁ দিয়ে আই.ডি. এলের ব্যাপক সম্প্রসারণের জন্য প্রচারে নেমে পড়েন। দিনাজপুর থেকে টেকনাফ এবং সিলেট থেকে সাতক্ষীরা সর্বত্রই জনসভা ও আলোচনা সভার মাধ্যমে আই. ডি. এলের ভিতকে শক্তিশালী করা হয়। আই. ডি. এলের মধ্যে অনান্য দল থাকলেও তাদের নেতা কর্মীদের সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ। তাইতে সর্বত্রই প্রাক্তন জামায়াতের নেতা কর্মীরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকেন। নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিটি জেলায় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আমি সফর করেছি এবং মানুষকে আহবান করেছি আই. ডি. এল এর পতাকাতলে সমবেত হতে। ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ সংসদের যে নির্বাচন হয় তাতে আই. ডি. এল হাজারো প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ৬টি আসন দখল করে। মওলানা আব্দুর রহিম ছিলেন সংসদের আই. ডি.এল এর দলনেতা। সংসদের ভিতরে ও বাহিরে আই. ডি. এল এর

www.pathagar.com

আওয়াজ উত্থিত হচ্ছিল এমনকি আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রেও এ আওয়াজ পৌঁছতে দেরী হলনা। পাকিস্তান আমলের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ যারা জামায়াতের সহযোগী হিসাবে ছাত্র ফ্রন্টে আন্দোলন করেছে তারাও নূতন পরিবেশে ইসলামী ছাত্র শিবির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ শুরু করল। আই. ডি. এল ও ইসলামী ছাত্র শিবির একই লক্ষ্য পানে অগ্রসর হচ্ছিল।

করাচীতে রাবেতার বিশ্বসম্মেলনে যোগদান

দুই বছরের মধ্যে আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে ইসলামী বিশ্বে আই. ডি. এল ইসলামী দল হিসাবে স্বীকৃতি পেল। এ সময়ের মধ্যে আই. ডি. এল এর অনেক অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। জাষ্টিস বাকের (অবসর) কে সভাপতি ও আমাকে সেক্রেটারী জেনারেল করে বাংলাদেশ ইসলামিক ল ইয়ারস এসোসিয়েশন নামে আই. ডি. এল সমর্থিত একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের নির্বাচনে আমি সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ায় বাংলাদেশের আইনজিবীদের বিধিবদ্ধ সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব মূলক পরিচিতি পেলাম যার ফলে এই অঙ্গনে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হল। ১৯৭৮ সনে করাচীতে রাবেতা আলম আল ইসলামীর (বিশ্ব মুসলিম লীগ) অধিবেষনে আই. ডি.এল এর চেয়ারম্যান মওলানা আব্দুর রহিম সহ আমরা ১২ জন প্রতিনিধি বাংলাদেশ থেকে যোগদান করার সুযোগ পেলাম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ৪০০ প্রতিনিধি সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত ৩দিনের অধিবেষনে এবং বিভিন্ন গ্রুপ মিটিংএ অনেক দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হল। এরূপ ধরনের একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করার সুযোগ ছিল আমার জীবনে এই প্রথম। বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য গড়ার উদ্দেশ্যে এবং তাদের একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী উম্মায় পরিণত করার প্রচেষ্টায় রাবেতা আলম আল ইসলামী নিয়োজিত। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ শতধা বিভক্ত। বিভিন্ন মতবাদ যথা রাজতন্ত্র পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্রমন্ত্রে বাঁধা পড়েছে মুসলিম দেশগুলোর শাসকরা। কেউ কেউ পরাশক্তির তাবেদার। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রতি যে অঙ্গীকার, ভালবাসা, মমত্ববোধ তা রাজাবাদশা ও শাসকদের মধ্যে অনুপস্থিত। অনেক দেশেই বাকস্বাধীনতা নেই বললেই চলে। শুধু সংখ্যালঘিষ্ট দেশেই নয় সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম দেশেও আল্লাহর বান্দারা নিগৃহিত হচ্ছে। তবুও বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য, তাদের পক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য রাবেতা আলম আল ইসলামীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। সম্মেলনের প্রতিটি বৈঠকেই মুসলিম উম্মার সমস্যাবলী আলোচিত হয়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গৃহিত হল, মুসলিম শাসক ও নেতৃবৃন্দের প্রতি কোরআন ও সুন্নার আলোকে সমাজ সংস্কারের জন্য অগ্রবর্তী ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানান হল এবং বিশ্বমুসলিমের দুবার ঐক্য গড়ে তোলার প্রচন্ড আশাবাদ ব্যক্ত করা হল। অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিন রাত্রে সিন্ধু প্রদেশের গর্ভনরের বাসভবনের খোলা চত্বরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক কর্তৃক প্রদত্ত ডিনার পার্টিতে মুসলিম বিশ্বের ৪০০ প্রতিনিধিদের যে

www.pathagar.com

মিলনমেলা বসল এবং বিচিত্র পোষাক, রং ও বর্ণের ঈমানদৃপ্ত মানুষের যে জোশ ও মহব্বতের বিচ্ছুরন হল তা আজও আমার স্মৃতির ভান্ডারে অমর অক্ষয় হয়ে আছে। **নূতন করে শিক্ষা নিলাম ইসলামী বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব আমার কাম্য। আমাদের মাটি ভাগ হয়েছে কিন্তু হৃদয় ভাগ হয়নি। হৃদয়ের আবেগকে শক্তিশালী করে আমরা বিশ্বমানচিত্রের বিভিন্ন রংগুলোকে সবুজের তুলি দিয়ে এক করে দেব।**

মাওলানা মওদূদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

রাবেতার সম্মেলন শেষে মওলানা আব্দুর রহিম সহ আমরা সবাই লাহোর সফরে গেলাম। ঐতিহাসিক স্থানগুলো পরিদর্শন এবং এই সুযোগে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা মওলানা আবুল আলা মওদুদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই ছিল উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগতভাবে মওলানা মওদুদীর বই 'ইসলামী রেনেসা আন্দোলন' পড়েই আমি আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করে ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করি। ১৯৭০ এর জানুয়ারির পর মওলানার সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি। ১৯৭১ এর ডিসেম্বরে রাজনীতির দৃষ্টিতে উনি বিদেশী হয়েছেন তবে জ্ঞান ও পান্ডিত্যের কোন বিভাজন নেই, কোন দেশের সীমানায় তা আবদ্ধ নয়। এক মস্তিস্ক থেকে উচ্ছরিত জ্ঞান অন্য মস্তিস্কে প্রবেশের জন্য কোন পাশপোর্ট ভিসার প্রয়োজন হয় না। তাইতে জ্ঞানীগুনিদের, পন্ডিতদের বিশ্বব্যাপী সমাদর। মওলানা মওদুদীর একটি লেখনী এই মুহূর্তে স্মরণ হচ্ছে। তিনি লিখেছেন 'আল্লাহর সৃষ্টি গোটা দুনিয়া একটি দেশ ছিল, কিন্তু মানুষ তাকে খন্ড খন্ড করেছে। যদি এই সংখ্যার উপর আরও দুই একটি সংখ্যা যোগ হয় তবে দোষের কি? শুধুমাত্র কয়বিঘা জমি নিয়ে একটি দেশের জন্য গর্ব অনুভব করার কিছু নেই। একটি দেশের আসল বস্তু হচ্ছে এর মানুষ। মানুষ এখানে সুখী কিনা, শোষণমুক্ত কিনা, সামাজিক বিচার ও ন্যায়নীতি এ সমাজে আছে কিনা, এটাই দেখবার বিষয়। বেইনছাফীতে ভরা একটি বিরাট ভূখন্ডের চাইতে ইনসাফ ও কল্যাণবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বর্গমাইলের রাষ্ট্রও অনেক শ্রেয়'।

লাহোরে মওলানার বাসভবনের তাঁর নিজস্ব ষ্টাডি রুমে আমরা ১২ জন ঘিরে বসলাম। অসুস্থতা ও বয়সের ভারে শারিরীক পরিবর্তন ছিল লক্ষ করার মত। বলতে গেলে কিশোর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর সাংবাদিকের কাজ নিয়ে লেখালেখি দিয়ে জীবন শুরু এবং তারপর সারাজীবন লিখেই চলেছেন। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি আল কোরআনের উর্দু ভাষায় লিখিত তাফহিমুল কোরআন যা বাংলায় অনুবাদ করেছেন মওলানা আব্দুর রহীম। এই তাফসীরের ভূমিকায় অনেক কথার মধ্যে মওলানা মওদুদীর কয়েকটি লাইন শুধু আমাকে নয়, বিশ্বের বহু ভাষাভাষী যুবকদের মনে কোরআনী সমাজ গড়ার জোশ সৃষ্টি করেছে। কোরআন অধ্যয়ন কিভাবে করতে হবে সে সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মওলানা শেষে লিখেছেন "এত করেও কোরআনের আসল ধর্ম অনুধাবন করা যাবেনা আরাম কেদারায় বসে বা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা,

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরআন পড়েও কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্যে হৃদয়াঙ্গম করা যাবেনা। যে উদ্দেশ্যে কোরআন নাযিল হয়েছিল সে উদ্দেশ্যে বাস্তাবায়নের জন্য পথ চলা শুরু করলে আবু লাহাব, আবু জেহেলদের সঙ্গে দেখা হবে, বদর ওহোদ হুনায়ুন সামনে আসবে, হোদায়বিয়া কঠিন মুহূর্ত্তে আসবে আবার মক্কা বিজয়ের চিত্রও সামনে এসে উপস্থিত হবে। বিশ্বে কোটি কোটি কোরআন পাঠক আছে কিন্তু কেন এসব চিত্র সম্মুখে আসেনা তার মর্ম উপলব্দি করলাম এই কটি বাক্যে। কুশল বিনিময়ের পর এবং আমরা বাংলাদেশে আই. ডি. এল এর মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন শুরু করেছি জেনে মওলানা সংক্ষিপ্ত উত্তরে বললেন - 'নামমে কিয়া হ্যায়, আস্‌লী চিজতো কাম হ্যায় - কাম করতে যাও' - নামের মধ্যে কি আছে, আসল হচেছ কাজ, তোমরা কাজ করে যাও, ইসলাম সার্বজনীন বিশ্বমানবের কল্যানের জন্য ইসলাম, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে তোমরা কাজ করে যাও।

অধ্যায়-১৬

দুবাই, ইরান ও পাকিস্তান সফর

১৯৭৯ সনে বিশ্বের তাগুতি শক্তিদের ভীতি ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টিকারী ও বিশ্বের মুসলিম উম্মার জন্য অকল্পনীয় শুভ সংবাদ ছিল বিশ্ব মোড়লের দাবীদার আমেরিকার পদলেহী ইরানের শাহানশাহর দেশ থেকে পলায়ন এবং ইরানের সফল ইসলামী বিপ্লবের বিজয়। ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নেতৃত্বে ইরানের লক্ষ কোটি জনতা রক্তের দরিয়া পার হয়ে বিনা অস্ত্রে শুধুমাত্র ঈমানী শক্তিতে পরাশক্তির নযরকে ভোঁতা করে, রাজতন্ত্রের হিংস্র থাবাকে পরাভূত করে, এক সফল গণ-বিপ্লবের মধ্যেমে আর্য্য মেহেরের আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসকে ধূলিস্যাৎ করে তাওহিদের মশাল জ্বালিয়ে দিল এবং কালেমা তাইয়েবার আওয়াজে দেশের জমিন ও আছমানকে সমৃদ্ধ করে ইসলামী পতাকা উড়িয়ে দিল। 'ইসলামী রাজতন্ত্র', 'ইসলামী গণতন্ত্র', 'ইসলামী সমাজতন্ত্র', 'ইসলামী একনায়ত্ব' ও ইসলামী মার্শাল ল তন্ত্র করে যে সব রাজা, বাদশা, শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধান যুগ যুগ ধরে দেশের মানুষের রক্ত, আয্যাদী ও ইজ্জত নিয়ে খেলায় মেতেছিল তাদের জন্য এ ছিল প্রচন্ড চপেটাঘাত এবং মৃত্যুর তীব্র ঘন্টাধ্বনি। বিপ্লবের বিস্ময়কর নেতা ইমাম খোমেনীর প্রতি মোবারকবাদ প্রেরিত হল বিশ্বের প্রতিটি কোন থেকে। ইরানের ইসলামী বিপ্লব কি করে সফল হল, বিশ্বের দুই পরাশক্তির মধ্যে তৃতীয় শক্তি হিসাবে ইরান তৃতীয় শক্তি হিসাবে কিভাবে আর্বিভূত হল এ জানবার দুর্দমনীয় আকাংখা ছিল বিশ্বের সব দেশের মানুষের। বাংলাদেশে গত ৩ বছরের আই. ডি. এল ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। ইরানে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের মধ্যেও এদেশের ইসলামী আন্দোলনের আই. ডি. এল এর প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি হয়েছে। ইরানের এই বিপ্লবে সেখানে বসবাসরত হাজারো বাংলাদেশী ইরানী ভাইবোনদের সাথে মিলিত হয়ে বিপ্লবে অংশ গ্রহন করেছে। তাদের চিঠি

www.pathagar.com

পত্রের মাধ্যমেও আমরা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের খবর পাচ্ছিলাম।

ইতিমধ্যে এল আনন্দদায়ক ও উত্তেজনাকর দাওয়াতের সুসংবাদ। আই. ডি. এল এর চেয়ারম্যান মওঃ আব্দুর রহিম সংগঠনের পক্ষ থেকে ইমাম খোমেনী ও ইরানের ইসলামী বিপ্লবের প্রতি মোবারকবাদ জানালে তা বিশেষ ভাবে সমাদৃত হল এবং বিপ্লবী সরকারের ঢাকাস্থ দূতাবাস মারফত সংগঠন থেকে ২জন প্রতিনিধির সরকারী মেহমান হিসাবে ইরান সফরে দাওয়াত এল। মওলানা এ দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং আই. ডি. এল এর সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবে আমাকে ও সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা আব্দুস সোবহানকে ইরান সফরের জন্য মনোনীত করলেন। পরাশক্তি হিসাবে বিশ্ব মোড়লের দাবীদার আমেরিকা ও তার চেলা চামুন্ডারা ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিরামহীন অপপ্রচারের বন্যা বইতে শুরু করায় বিপ্লোবত্তর ইরানকে নিকট থেকে পর্য্যবেক্ষণের জন্য ইমাম খোমেনীর নির্দেশে ইরান সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে দাওয়াত দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ইরান সফরে রওয়ানা দেবার দিনটি সত্যিই এলো। তারিখ ছিল ১৬/৯/৭৯। স্কুলে ফার্সি পড়েছি। বহু জ্ঞানীগুনি, সাধক, কবি, দার্শনিক বিশ্বজোড়া সুনামের অধিকারী প্রতিভার জন্ম হয়েছে ইরানের উর্বর মাটিতে। ফার্সি ও ইসলামের ইতিহাস পড়তে গিয়ে তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। হাফিজ, রুমী, সিরাজী, ফেরদৌসী, গাজ্জালী, ওমর খৈয়াম, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) ও হাজারো প্রতিভার অমর কীর্ত্তির সুঘ্রাণ ও সুবাশ আজও দুনিয়ার বায়ুমন্ডলকে মাতোয়ারা করে রেখেছে। ইরানে পারস্য সভ্যতার মৃত্যু হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) অপূর্ব ত্যাগ ও কোরবানীর ফলে অর্জিত ইমানদৃপ্ত বিজয়ের ফলে ইরানে যে ইসলামী সভ্যতার পত্তন হল তার গৌরব গাঁথা ইতহিাস নিজ বক্ষে ধারণ করে রেখেছে। সে দেশ দেখবার সাধ কার না মনে জাগে? তাছাড়া ইসলামী বিপ্লবের বিজয় ইরানকে নূতন পরিচিতি দিয়েছে - ইমাম খোমেনীকে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এরূপ একজন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ কে না কামনা করে?

দুবাই-তে বিরতি

ইরানী দূতাবাসের চার্জ ডি এফেয়ার্স জনাব কাওসারী বিমান বন্দরে আমাদের বিদায় জানালেন। আমাদের রুট ছিল দুবাই হয়ে তেহরান এবং দুবাইতে ৩দিনের বিরতি ছিল। দুবাই বিমান বন্দরে মধ্যরাতে জনাব ব্যারিষ্টার কোরবান আলি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রনেতা জনাব আব্দুল হাই ফারুকী ও অনান্য বাংলাদেশী পরিচিতি জন আমাদের সম্বর্দ্ধনা জানালেন। ১৯৭১ এর পর জনাব কোরবান আলি নাগরিকত্ব হারা হয়ে দুবাইতে বসবাস করছিলেন এবং আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর বাসাতেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হল। ১৯৭১ সনে কোরবান সাহেব ঢাকা ছেড়ে মংলা বন্দরে আত্মগোপন করেছিলেন এবং কিছুদিন পর

www.pathagar.com

শ্রমিকের বেশে বর্ডার পার হয়ে ভারতের বোম্বেতে অবস্থান নেন। কোরবান সাহেব ব্যক্তিগত জীবনে কর্মঠ, কষ্ট সহিষ্ণু এবং অসম্ভব বেপরোয়া। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে উনি নৌকায় আরব সাগর পাড়ী দিয়ে দুবাই উপস্থিত হন। আরবী ভাষায় কথা বলার অবিশ্বাস্য দক্ষতা নিয়ে দুবাইতে মওলানা কোরবান আলি কাম ব্যারিষ্টার কোরবান আলির আইনের পেশায় বিশিষ্ট স্থান দখল করতে খুব দেরী হয়নি। প্রায় ৯ বছর পর সাক্ষাৎ, তাইতে দেশের মাটিতে উনার আতিথিয়েতা ছিল চরম। উনি নিজেই কামরা পরিস্কার করেন, বাথরুমে স্প্রে করেন, গ্যাসের চুলোতে রান্নার কাজটি সামারী ওয়েতে সম্পন্ন করেন, নিজেই গাড়ী চালান উল্কার বেগে, পথের মাঝে হঠাৎ গাড়ী খারাপ হলে প্রয়োজন গাড়ীর নিচে শুয়ে পড়েন। অর্থাৎ জ্ঞান, শ্রম ও মেধা সবাই ভীড় করে উনার মনমগজে ও দেহে স্থান করে নিয়েছে। এরকম নামজাদা মানুষের অতিথি হওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

বিশ্বের প্রথম সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক

কোরবান সাহেবের নিজস্ব গাড়ী থাকায় দুবাইএর বিভিন্ন অঞ্চল ও স্থাপত্য পরিদর্শন সহজ হল। ২/১২/১৯৭১ সাতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ নিয়ে এই আরব অঞ্চলটি U.A.E সংযুক্ত আরব আমীরাত নামে স্বাধীন দেশের মর্য্যাদা নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মরুভূমির তেল সম্পদ এই অঞ্চলের চেহারা বদলিয়ে দিয়েছে। 'ফ্রি পোর্ট' ব্যবসা বাণিজ্যের গতিকে করেছে উদ্যাম। এখানে দিরহাম বাতাসে উড়ে বেড়ায় আর তাইতে এখানে বিদেশী মানুষের ভীড়। সমগ্র দেশেই কর্মচাঞ্চল্য ও অর্থনৈতিক প্রবাহ দেশটিকে বিশ্বে অন্যতম ধনী দেশের মর্যাদা দিয়েছে। এদেশের স্থায়ী নাগরিকরা পেয়েছে অনেক সুযোগ সুবিধা তবে রাজনৈতিক দল গঠন এখানে নিষিদ্ধ। দুবাই ভ্রমণে আমার আগ্রহ ছিল শুধু মাত্র একটি কারণে। বর্তমান পুজিবাদী বিশ্বে সুদভিত্তিক ব্যাকিং ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে দুবাইতে সুদ বিহীন লাভ লোকশানের ভিত্তিতে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতির ভিত্তিতে বিশ্বের প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোরবান সাহেবের মাধ্যমে দুবাই ইসলামী ব্যাংকের কার্য্যপদ্ধতি জানবার ও দেখবার সুযোগ পেলাম। ১৮/৯/১৯৭৯ তারিখে সকালের দিকে বিশাল ব্যাংক ভবনের মেইন গেটের দুটি কাঁচের পাল্লা আমাদের দেখে আপনা আপনি দুদিকে সরে গিয়ে আমাদের প্রবেশের পথ করে দিল এবং তারপর নিজে নিজেই আবার বন্ধ হয়ে গেল। এটা প্রথম চমক। ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব আহমদ সাইদ লুতা তার অফিসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন এবং কফি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। প্রশস্ত টেবিলের উপর শর্ট সার্কিট টি. ভি. রক্ষিত ছিল এবং সেখানে ব্যাংকের গেট থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি অফিস, কাউন্টার ও স্থানে লাইভ ছবি ক্রমান্বয়ে ঘুরে ঘুরে টি. ভি. পরদার উপর প্রতিফলিত হচ্ছিল। অর্থ্যাৎ অফিস বসের দৃষ্টির মধ্যেই সব সম্পন্ন হচ্ছে এবং তাঁকে ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই - এটা ছিল দ্বিতীয় চমক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মাস ও অর্থনীতির ছাত্র ছিলাম। ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের বাইরে ইসলামী অর্থনীতি জানবার ও বুঝবার চেষ্টা

www.pathagar.com

করেছি। ১৯৪৫ সনের দিকে ডক্টর আনোয়ার ইকবাল কোরায়শীর 'ইসলামী অর্থনীতির' বই পড়েছি। এ বই লিখতে তিনি আবুল আলা মওদূদীর উর্দু ভাষায় লিখা ইসলামী অর্থনীতি বইএর সাহায্য নিয়েছিলেন। ষাটের দশকে মওলানা মওদুদীর বইটি বাংলায় তরজমা হলে পড়েছি এবং এ সম্পর্কে মওলানা আব্দুর রহিম লিখিত পান্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক বই ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং ষাট দশকের শেষের দিকে প্রকাশিত হলে তা গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়েছি। কিতাবী জ্ঞান ছিল কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যাংকিং এর জগতে ইসলামী আইনের প্রয়োগে দেখবার সুযোগ হয়নি। সেই সুযোগ পেয়ে আল্লাহতায়ালার শোকর গোজার করলাম। ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব লুতার সঙ্গে আলাপ করে এবং কাগজ পত্র দেখে জানলাম দুবাই ইসলামী ব্যাংক বিশ্বের প্রথম সুদবিহীন ব্যাংক, লাভ লোকসানের ভিত্তিতে ও অন্যান্য শরিয়ত সম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৭৮ সনে ব্যাংকের মুনাফা শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সনে শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ট আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠার সময় ছিল ১৬০০ জন শেয়ার হোল্ডার, কিন্তু তা পরবর্তী ২ বছরে ১১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠা বছর ১৯৭৬ সনে নিট মুনাফা ছিল সাড়ে ৬ মিলিয়ন দিরহাম এবং তা দ্বিতীয় বর্ষ ১৯৭৭ এ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮.৪ মিলিয়ন দিরহাম ও ১৯৯৮ সনে ১০.৭ মিলিয়ন দিরহাম। দারিদ্র বিমোচনে দুবাই ইসলামী ব্যাংক জাকাত প্রদান করেছে ১৯৭৬ সনে ৩ লক্ষ ২০ হাজার দিরহাম, ১৯৭৭ সনে ৫ লক্ষ ৮৯ হাজার দিরহাম ও ১৯৭৮ সনে ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার দিরহাম। দুবাই ইসলামী ব্যাংক প্রমাণ করেছে ইসলামী বিধান ব্যাকিং জগতে শুধু মাত্র কার্যকরীই নয় বরং অত্যন্ত প্রশংসসিত জনকল্যাণ মূলক পদ্ধতি। আজ যখন এসব কথা লিখতে বসেছি তখন বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বহু দেশে এমন কি অনেক অমুসলিম দেশেও সুদ বিহীন লাভ লোকসানের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং সুদী ব্যাংকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করে সাফল্যজনক ভাবে এগিয়ে চলেছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ১৯৮৩ সনে যাত্রা শুরু করে সমস্ত বেসরকারী ব্যাংককে পিছনে ফেলে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ২০০১ সনে এসে ইসলামী ব্যাংকের অবস্থা নিম্নরূপঃ পরিশোধিত মূলধন ৬৪ কোটি টাকা,শেয়ার হোল্ডার ৮০০০,ডিভিডেন্ট ২৫%,ডিপেজিট ৩৫০০ কোটি টাকা,বিনিয়োগ ৩৪০০ কোটি টাকা,১২০টি শাখা, নিজস্ব গগণচুম্বী ২০তলা ভবন, যাকাত তহবিল থেকে সাস্থ্য,শিক্ষা,দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা। তাওহিদী জনতার দাবী মিটাতে আল-আরাফাহ, আল বারাকা সহ আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের জমিনে সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে চলেছে।

তেহরান বিমানবন্দরে উপস্থিতি

৩ দিন ধরে দুবাই সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং ইসলামী ব্যাংকিং এর সাফল্যের আনন্দে মনকে ভরপুর করে ২০/৯/৭৯ তারিখ দুপুর ২টার দিকে দুবাইএর বিশাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উপস্থিত হলাম। কোরবান সাহেবকে বিদায়

www.pathagar.com

জানাতে হলনা উনি নিজ খরচে আমাদের সাথী হয়ে ইরান সফরে চললেন। প্লেন ছাড়তে ২ ঘন্টা বিলম্ব হওয়ায় দুবাই এয়ারওয়েজের দোতলা জাম্বোজেট বৈকাল সাড়ে ৫টায় রওয়ানা দিয়ে তেহরান আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরের রানওয়ে স্পর্শ করল সন্ধ্যা ৭টায়। ইরান সরকারের ওয়াকফ বিভাগের অফিসার জনাব আলি ফতোয়াতী বিমান বন্দরে গাড়ী সহ উপস্থিত ছিলেন। বিশাল বিমানবন্দর যাত্রীদের প্রচন্ড ভীড়। তার মধ্যে মাইকের আওয়াজ পেলাম। দলের সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবে ডেলিগেশনে আমার নেতৃত্ব ছিল । তাইতে মাইকে আমার নাম উচচারিত হতে শুনে সেখানেই আমরা ৩ জন উপস্থিত হলাম। জনাব ফতোয়াতী আমাদের সাদর সম্ভাষন জানালেন এবং অতি সত্তর বিমান বন্দরের ফরমালিটিজ সমাপ্ত করে বের হয়ে আসতে সাহায্য করলেন। আমরা বাংলাদেশ থেকে ইমাম খোমেনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি জেনে বিমান বন্দরের প্রতিটি কর্মকর্ত্তা ও কর্মচারী আমাদের খোশ আমদেদ জানালেন এবং আমাদের সফর শুভ হোক এই কামনা করলেন। বিমান বন্দরের বাহিরে একদল বাংলাদেশী শ্রমিক আমাদের সম্বর্দ্ধনা জানালেন এবং শ্রমিক নেতা জনাব মতিউর রহমান আমাদের ৩ জনকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে দুই দেশের প্রায় ৪ হাজার মাইল স্থানের দুরত্ব ঘুচিয়ে দিলেন। শাহের আমলে তাদের অনেক সমস্যা ছিল, এখনও সমস্যা রয়েছে কিন্তু সামান্য কয়েকমাস পূর্বে ইসলামী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় তারা সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে সমস্যাগুলি যথাস্থানে তুলে ধরবার জন্য। আমরা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব এবং তাদের সমস্যাগুলো জেনে নিয়ে সর্বোচচ স্তরে অর্থ্যাৎ ইমাম খোমেনীর কাছে পেশ করব এই আশ্বাস দিয়ে তাদের নিকট থেকে বিদায় নিলাম। তেহরানে সব চাইতে নামী দামী পাঁচতারা হোটেলে ৩টি পৃথক পৃথক কামরায় আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হল।

জুম্মার নামাযের মধ্য দিয়ে সফর প্রোগ্রাম শুরু

তেহরানে ভোর হল। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ৫২৯ নং কামরার প্রশস্থ জানালার কাচের মধ্য দিয়ে তেহরানের বিরাট অংশ চোখের সামনে ধরা পড়ল। আকাশচুম্বী অট্টালিকগুলি গর্বোন্নত মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে সুউচচ পর্বত মালা তেহরানকে ঘিরে রেখেছে। শহরের মধ্যে সবুজের সমারোহ। কদিন দুবাইএর রুক্ষতা চোখে যে জ্বালা সৃষ্টি করেছিল তেহরানে সবুজের সমারোহ, সর্বত্রই রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝরণার পানি স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দিল। শহরের সর্বত্রই বৃক্ষের সারি এবং মাঝে অনেক জায়গা নিয়ে ঘন বনরাজি সৃষ্টি করা হয়েছে। ইরানের বিপ্লবী সরকার ইউনিভার্সিটি ময়দানের বিশাল চত্বরে আমাদের জুম্মার নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে প্রোগ্রাম শুরু করার ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের সার্বক্ষীনক গাইড জনাব আলি ফতোয়াতী জুম্মার নামাজের প্রায় দেড় ঘন্টা পূর্বে আমাদের ময়দানে নিয়ে গেলেন। ময়দান উপচে পড়েছে নামাজীদের ভীড়ে। এছাড়া আশে পাশের সমস্ত রাজপথ ভরপুর। গাড়ী পার্ক করা হয়েছে কোথায়ও আধা মাইল দূরে কোথায়ও ১ মাইল দূরে রাস্তায় ৩ সারী করে গাড়ী রাখা। নামাজের পূর্বে বিশেষ মেহমান হিসাবে আমদের ৩

www.pathagar.com

জনকে নিয়ে যাওয়া হল ইমামের ক্যাম্পে। পরিচয় হল জুম্মা নামাজের ইমাম আয়াতুল্লা মোনতাজেরীর সঙ্গে। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ভরে ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আরও পরিচয় ও সাক্ষাৎ হল প্রধানমন্ত্রী মেহেদী বাজারগান, বৈদেশিক মন্ত্রী মোহাম্মদ ইয়াজদি, ডাঃ আলি শরিয়তী মাদারী, কুতুবজাদেহ, বহুল প্রচারিত কায়হান পত্রিকার সম্পাদক মেহেদীয়ান ও অন্যান্য ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে যারা সবাই বসা ছিলেন ঘাসের উপর বিছানো সাধারণ ফরাসের উপর। সশস্ত্র বিপ্লবী মোজাহিদরা সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে সারিবদ্ধ ভাবে। সর্বত্রই পাহারা দিচ্ছেন ও শৃংখলা বজায় রাখছে - দেখে মনে হল যেন এটা জেহাদের ময়দানে মোজাদিদদের নামাজ। ইমামের খোতবার সময়ও তাঁর একহাতে আলকোরআন ও অন্য হাতে রাইফেল শোভা পাচ্ছিল।

নামাজ শুরু হল। ঈমামের পিছনে প্রথম সারিতে আমাদের জায়গা করে দেওয়া হল। মন্ত্রী পরিষদ সদস্য, ৩ বাহিনীর অধিনায়ক ও সদস্যগণ সরকারী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র, জনতা, তেহরানবাসী সবাই যেন সাপ্তাহিক মহামিলন কেন্দ্রে উপস্থিত হয়েছেন। সর্বত্রই শ্লোগান, কালেমা তাইয়েবার উচচারণ, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উচচারিত হচ্ছে নাছারা আবদাহু হাযামা বাছাহু (আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সাহায্য করলেন, দুষমনদের নিপাত করলেন), লা শিয়া ওয়ালা সুন্নী নাহনু মুসলিমুন (আমরা শীয়া নই, আমরা সুন্নী নই আমরা মুসলিম)। বিশাল ক্রেনের মত উঁচু স্প্রে মেসিন দিয়ে সর্বত্র গোলাপ পানি ছিটানো হচ্ছে। এই নামাজে শুধু পুরুষরা শরীক হয়নি। প্রায় ১৫ লক্ষ নামাজীর সমাবেসে কাল চাদরে মাথা থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঢেকে শুধু মুখমন্ডল অনাবৃত রেখে মা হাওয়া (রা:) মা আয়েশা (রা:) মা ফাতেমার (রা:) উত্তরসূরীরা এসেছেন কয়েক লক্ষ। তাদের মধ্যে অনেকের হাতেই রাইফেল, মেয়েদের চারপাশে সশস্ত্র পাহারা কাজে ও শৃংখলা রক্ষায় ব্যস্ত।

ইমাম খোতবা শুরু করলেন। প্রথম খোতবা দিলেন প্রায় ১ ঘন্টার বেশী সময় ধরে এবং ছানী খোতবা ছিল আমাদের দেশের মত। ফার্সি ভাষায় প্রদত্ত খোতবার কিছুই বুঝতে পারিনি কিন্তু খোতবায় নামাজীদের মধ্যে যে উচছাস ও বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টি হচ্ছিল তাতেই কিছু আন্দাজ করতে পারছিলাম। তবে পরদিন ভোরে খবরের কাগজে ইংরাজী ভাষায় খোতবার যে তরজমা ছাপান হয়েছে তা পড়ে অভিভূত হলাম। ইদানিং কালে আমাদের দেশে জুম্মার খোতবার বক্তব্যের মধ্যে কিছু পরিবর্তন এলেও পূর্বে এ খোতবা ছিল মৃত ব্যক্তিদের জন্য। খোলাফায়ে রাশেদার পর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে রাজাবাদশার মুখের দিকে তাকিয়ে সরকারী অনুগ্রহ পুষ্ট ইমামগণ যে খোতবা দিতেন তাতে কোন বিপ্লবের আহ্বান ছিলনা। সমাজ সংস্কারের জন্য চেতনা সৃস্টি করা হতনা, রাজাবাদশাদের গুণগান করা হত খোতবার মধ্যে তাদের সুকৃতির প্রচার করার উদ্দেশ্যে নয় বরং তাদের দুস্কৃতিকে আড়াল করার জন্য। যার ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন,

www.pathagar.com

রাজাবাদশাদের চোখরাঙানীকে পরোয়া করতেন না তাদের নিগৃহিত হতে হয়েছে, নিস্পেষিত হতে হয়েছে। কারাগারের নির্জন কক্ষে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। ইরানেও শাহের আমলে নামাজ ছিলনা, নৈতিকতার চাষ ছিলনা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার প্রসার ঘটানোর ব্যবস্থাছিল। প্রদত্ত খোতবার ইংরেজী তরজমা পড়ে জানলাম খোতবার মধ্যে মহান আল্লাহতায়ালার গুনগান ও রসুল (দ:) এর প্রতিদরূদ পাঠকরার পর বিপ্লবোত্তর ইরানের অবস্থা, বিপ্লবের ফসলকে নস্যাৎ করবার আর্ন্তজাতিক চক্রান্ত, চক্রান্তের মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপ, বিপ্লবী মুজাহিদ বাহিনীর কর্তব্য, গ্রামগঞ্জ সহ দেশকে পুর্নগঠনের প্রস্তুতি, অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যে আলোচনা হয়েছিল তা নামাজীদের মনে শিহরণ সৃষ্টি করছিল এবং বর্তমানে ইরান যে জাগ্রত জাতি আল্লাহর রাহে ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য যে কোন কোরবানরি জন্য প্রস্তুত তার ইঙ্গিত দিচ্ছিল তাদের গগন বিদারী 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনির মধ্য দিয়ে। দুই দশকের বেশী সময় পার হয়ে এসেছি কিন্তু এখনও তেহরানের ময়দানে ১৫ লক্ষ নরনারীর জুম্মার নামাজ ও ঈমামের বাস্তবমুখী ও বিপ্লবাত্মক খোতবার আওয়াজ আমার স্মৃতিচিহ্ন থেকে মুছে যায়নি। এরূপ খোতবা তখনই সম্ভব যখন একটি রাষ্ট্রকে ইসলামী লেবাস পরিয়ে দেওয়া হয়, রাষ্ট্র নায়কদের মন মগজে শুধুমাত্র তাওহিদী চেতনা বাসা বাঁধে এবং এই চেতনার বিরুদ্ধে গৃহিত রাষ্ট্রনায়কদের কোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনতা যখন হয় অপোষহীন। ইরানের অত্যাচারী শাহ ও তাদের পূর্বসূরীদের আড়াই হাজার বছর কালের কুশাসন ইরানের ইসলামী জনতা, নরনারী মিলিত ভাবে কাফনের লেবাস পরে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা নিজেদেরকে জীবন্ত জাতি হিসাবে প্রমাণিত করেছে। তাই তারা শ্লোগান তোলে 'হর জমীন কারবালা, হররোজ আশুরা' - প্রতিটি জমি করাবালার প্রান্তর, প্রতিটি দিনই আশুরা, আল্লাহর প্রিয়তম হাবিবের (দ:) নাতির (রা:) জীবন থেকে, তার ত্যাগ ও কোরবানী থেকে ইরানী জাতি শিক্ষা গ্রহণ করেছে, তাইতে তারা প্রতিটি দিনকে আশুরা ভেবে তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে আদৌ ভয় পায়না। নিজের দেশে ও মুসলিম বিশ্বের অবস্থার কথা মনে পড়ে গেল অশ্রুসিক্ত চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি মুসলিম বিশ্বের শাসকরা প্রায় সবাই প্রতিটি দেশের কারবালার প্রান্তরকে দখল করে রেখেছে, ফোরাতের কূল তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনতা জীবনের মায়ায়, সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষার লোভে কারবালার প্রান্তর থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে গতিহীন, বাকহীন, নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ। এই জড়তা ভাঙ্গতে প্রয়োজন হযরত ইমাম হোসাইন (রা:) এর মত নেতৃত্ব। বিংশ শতাব্দীর ষাটএর দশকে ইরানের মুসলিম জনতা ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ত্যাগ, কোরবানী ও রক্ত ঝরানোর মধ্য দিয়ে যে বিস্ময়কর বিজয় ছিনিয়ে এনে সে দেশের কারবালার প্রান্তরকে মুক্ত করেছে বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম বিশ্বে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

www.pathagar.com

বাংলাদেশী শ্রমিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

বিকেল ৬টার দিকে তেহরানের উপকণ্ঠ রাজমারায় মোমতাজ স্পিনিং ও উইভিং মিলস এবং রে মিলস এর বাংলাদেশী ১৫০ শত শ্রমিকের সঙ্গে মিলিত হলাম। জনাব ফতোয়াতী আমাদেরকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে এলেন। বাংলাদেশী শ্রমিক মহঃ আব্দুল কুদ্দুস ভূঞার সভাপতিত্বে শুভেচ্ছা বৈঠক শুরু হল। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে মহম্মদ ফজলুল হক, সুপারভাইজার মোফাজ্জল হোসেন, সাইফুল হক, মতিউর রহমান, নুরুল ইসলাম, নুরুল হুদা বক্তব্য পেশ করলেন। আমাদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের পাশাপাশি তারা নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করলেন। শাহের আমলে তারা কোন প্রতিকার পায়নি - বিপ্লবের পর উর্দ্ধতন মহলে তারা বক্তব্য পেশ করার কোন সুযোগ পাননি। বাংলাদেশ এ্যমবেসীর বিরুদ্ধে তারা অত্যন্ত সমালোচনা মুখর। এ্যমবেসী তাদের কোন সমস্যার কথা উর্দ্ধতন মহলে তুলে ধরেননা। আমরা যেহেতু সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি সেজন্য শ্রমিকদের দাবী সেখানে সমস্যাগুলো পেশ করা। অনেক সময় নিম্নপর্যায়ে সমস্যার কথা বললে তা মাঝরাস্তায় গিয়ে হারিয়ে যায়। শ্রমিকদের অনুরোধে জনাব আলি ফতোয়াতী সাম্প্রতিক ইসলামী বিপ্লব এর বিজয়ের প্রতিধ্বনি করে বললেন 'দুনিয়ার মুসলিম ভাই ভাই'। নবী (দঃ) এই নীতি নিয়েই দুনিয়ার সমস্ত অবিচার ও অনিয়মের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ন হন। এই নীতি অবলম্বন করে ইমাম খোমেনী ইরানে বিজয়ী হয়েছেন। ইসলাম আত্মা ও বৈষয়িক উন্নতির শিক্ষা দেয়। আজ (শুক্রবার) আয়াতুল্লাহ মোনতাজেরী খোতবায় বলেছেন মানুষ মরে যাবে কিন্তু সত্য বেঁচে থাকবে। সত্যের উপর ইরান বোঁচে থাকবে। আপনারা আমাদের মেহমান। আপনাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনেছি। বর্তমানে ইরান যে সঙ্কটের মধ্যে চলছে তা ইনশায়াল্লাহ শীঘ্রই দূর হয়ে যাবে। সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত। মওলানা সোবহান, ব্যারিষ্টার কোরবান আলি ও আমি বক্তব্য রাখলাম। আমরা ওয়াদা করলাম যে তাদের বক্তব্য অবশ্যই সাক্ষাতের সময় ইমাম খোমেনীর কাছে পেশ করা হবে। তাছাড়া ইরানে বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশে ইরানী রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য মহলে জানানো হবে। সমস্যা যদিও আছে তবুও বিপ্লবী সরকার বিপ্লবের মাত্র কয়েকমাসের মধ্যে যে টুকু করেছেন তা প্রশংসার যোগ্য। সর্বনিম্ন মজুরী প্রায় ৪গুণ বাড়ানো হয়েছে, শ্রমিকদের জন্য সুন্দর বিছানা, প্রতি ২০ জনের জন্য একজন বাবুর্চি, রেডিও, টিভি ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছে। প্রধান সমস্যার মধ্যে ছিল দেশে টাকা পাঠান, চাকুরীর স্থায়ীত্ব। কেউ মারা গেলে তার মৃত দেহ দেশে প্রেরণ, চাকুরী আমলে মাহিনার সুযোগ সহ দেশে যাওয়ার জন্য ছুটির ব্যবস্থা ইত্যাদি।

শাহী প্রাসাদ সমূহে কিছুক্ষন

ইমাম খোমেনীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের দিন ধার্য্য হয়েছিল ২৪/৯/৭৯ সকাল ১০টায়। হাতে সময় ছিল ২ দিন তাইতে জনাব আলি ফতোয়াতী আমাদের জন্য তেহরানে শাহএর প্রাসাদ সহ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করলেন। তেহরান

www.pathagar.com

শহরের উত্তরাঞ্চর আলবুরুজ পাহাড় দিয়ে ঘেরা। উত্তরাঞ্চল ধনীদের এবং দক্ষিণাঞ্চল মধ্যবিত্ত ও গরীবদের। আছমানের গায়ে তারকারাজীর অবস্থানের মত উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ের গায়ে আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের সবটুকু সৌন্দর্য্য ঢেলে গড়া হাজারো ইমারত ও হর্মরাজী পাহাড়ের ঢালু থেকে শুরু করে উপরে আরও উপরে, তার চাইতে উপরে চূড়ার কাছাকাছি অবস্থান করছে। সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্য্যন্ত এ দৃশ্য তারকা খচিত আছমানের মতই মনে হয়। শাহের প্রাসাদগুলি এই অঞ্চলেই বেশী, পাহাড়ের মতই উন্নত শীর, পাহাড় ও পাহাড়ী ঝরণার সব সৌন্দর্য্যই লুন্ঠন করে প্রাসাদের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। রেজা শাহ পাহলভীর পিতা ছিলেন একজন সৈনিক তারপর সৈনিক থেকে সেনা প্রধান ও তারপর স্বঘোষিত বাদশা। তিনি শুরু করেন প্রাসাদ নির্মাণ কাজ শাহদাবাদ দিয়ে তারপর তার আমলে এবং পিতার মৃত্যুর পর পুত্র রেজা শাহ পাহলভীর আমলে একটি পর একটি করে বহু প্রসাদ তৈরী হয়েছে স্ত্রী ফারাহ দিবার জন্য, শাশুগড়ী ফরিদা দিবার জন্য, মেয়ে শাহনাজের জন্য, দুই ভাই মাহমুদ রেজা ও গোলাম রেজার জন্য, ভগ্নি পিন্সেস শামস ও প্রিন্সেস আশরাফের জন্য এবং আরও অনেক। শিল্প ও সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে একটি অন্যটির থেকে উন্নততর এবং বিশ্বের মনি মুক্ত জহরত, বিরল বৃক্ষ গুল্ম লাতাপাতা, পশু পক্ষী জন্তু জানোয়ার, পাহাড়ের গাত্র থেকে নানা বর্ণের পাথর, সুদ্রের গভীরে লুকিয়ে থাকা শৈবালরাজী সবকিছু এনে প্রাসাদগুলোকে নয়নাভিরাম করা হয়েছে। দৃষ্টি ফেললে যেন মনে হয় এই প্রাসাদগুলি দর্শকদের কাছে বাকরুদ্ধ ভাষায় বলছে 'বিশ্বে যদি কোথায়ও বেহেশত থাকে তবে এখানেই রয়েছে, এখানেই রয়েছে, এখানেই রয়েছে। পাহাড় কেটে বৃক্ষরাজীকে পিছনে ফেলে সৌন্দর্য্যের ডালি পরিয়ে এক একটি প্রসাদপোম ভবন তৈরী করা হয়েছে যেন মনে হয় কোন সৌন্দর্য্যের রাণী এলায়িত কেশে স্থীর হয়ে স্ফীত বক্ষ ও আবেশমাখা চাহনী নিয়ে কারও প্রতিক্ষায় উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকার মত বসে রয়েছে। প্যালেস গার্ড সব কিছু খুটিয়ে খুটিয়ে আমাদের দেখাল। মিঃ ফতোয়াতী বললেন তিনি জীবনে এসব দেখবার সুযোগ পাননি। বিপ্লবের পর ইসলামী সরকার এসব প্রাসাদের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে শুধু দেশবাসীর জন্য নয় বিদেশীদের জন্যও। সৌন্দর্য্যের মধ্যেও আরও যে বিষয়টি চোখে পড়ল তা হল শাহের নিরাপত্তার নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। শাহের নিজস্ব প্রাসাদের চূড়ায় টেলিভিশন চোখ যা সব সময় ছবির মাধ্যমে পরিবেশ ও পরিস্থিতির খবর দিত, ছাদের উপর হেলিপ্যাড, চর্তুদিকে যুদ্ধাস্ত্রের ব্যাপক সরঞ্জাম, গ্যারেজে প্রায় ২ ডজন বুলেট প্রুফ রোলস রয়েস গাড়ী যেগুলোতে রয়েছে বিশ্বের যে কোন রাষ্ট্রপ্রাধনের সঙ্গে মুহুর্ত্তের মধ্যে সরাসরি টেলি যোগযোগের ব্যবস্থা। আমেরিকা ও ইস্রাইলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হাজার হাজার সৈনিক ও সেনাকর্মকর্ত্তা, বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাভাক বাহিনী শাহের প্রাসাদ রাতদিন পাহারা দিত। এসবের আর কোন অস্তিত্ব নাই। সব ফেলে শাহকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে। যুদ্ধাস্ত্র গুলো সব মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে, টেলিভিষনের চোখও অন্ধ হয়ে গেছে। আর একটি বিষয় না লিখলেই নয়। শাহের প্রাসাদে তাঁর কুকুরের কবরে

www.pathagar.com

দেখলাম লিখা রয়েছে জন্ম ১৩৪৩ সন মৃত্যু ১৩৫৩ সন। শাহের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তার মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কুকুরের কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মাথা নত করে তারপর শাহের দরবারে প্রবেশ করতে হত। এর পিছনে দর্শন ছিল কুকুরের নিকট থেকে প্রভূভক্তির শিক্ষা গ্রহণ কর'। বহু রাজা বাদশার ইতিহাস পড়েছি জীবনে কিন্তু এরূপ দর্শনের প্রয়োগ দেখিনি। যারা এসব দর্শন মেনে সম্মান প্রদর্শনের চরম পরকাষ্ঠা দেখিয়েছে তারা আজ কেউ ইরানের মাটিতে নেই। আল্লাহতায়ালার বাণী জীবন্ত হয়ে আমার মনমানসে ভেসে উঠল, "বল ঃ হে খোদা, সমস্ত রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মালিক ঃ তুমি যাকে চাও রাজ্য দান কর, আর যাহার নিকট ইচ্ছা কাড়িয়া লও। যাহাকে চাও সম্মান দান কর, আর যাহাকে ইচ্ছা অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর। সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যান তোমারই ইখতিয়ারে রহিয়াছে, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান"। সুরা আলে ইমরান : ২৬ আয়াত

ইমাম খোমেনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার :

২২/৯/৭৯ সকাল সাড়ে ছয়টায় তেহরান থেকে রওয়ানা হলাম কোমের উদ্দেশ্যে। ১৪০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে। যাত্রী আমরা ৩ জন সোবহান ভাই, ব্যারিষ্টার কোরবান ভাই ও আমি - পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন আমাদের গাইড জনাব আলি ফতোয়াতি এবং গাড়ীর চালক ইসলামী বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী মানুচেহের এগনায়ে দোসত। আমাদের সবার মধ্যে উত্তেজনা। বর্তমান বিশ্বের কঠিনতম বিরুদ্ধ পরিবেশে সফল ইসলামী বিপ্লবের রূপকার, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা, দুর্জয় পরশক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সোচচার কণ্ঠস্বর, স্বৈরতন্ত্রী শাসকদের জন্য ত্রাস ও কম্পন সৃষ্টিকারী অকুতোভয় যোদ্ধা, দুনিয়ার নির্য্যাতিত মানবকুলের বন্ধু এবং বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের প্রতিক ইমাম খোমেনীর সঙ্গেঁ সাক্ষাতের জন্যই আমাদের এই সফর। আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য এ এক অবিস্মরণনীয় সুযোগ। তেহরানের সবুজ শ্যামলিমা ছেড়ে শহরের গন্ডী পেরিয়ে, আল বুরজকে দূরে রেখে বাহিরে এসে সুবজের কোন নাম নিশানা পেলাম না। চোখ জুড়ানো গগণ স্পর্শী অট্টালিকাও চোখে পড়লনা। ধূসর মাঠ, নাঙ্গাঁ পর্বত, পাথর ও কঙ্করের টিলা কোথায়ও উঁচু, কোথায়ও নিচু যেদিকে চোখ যায় একই চিত্র। আরও দূরে সুউচচ পাহাড় বিস্তৃত বৃক্ষ ময়দান, কোথায়ও পানির লেশ মাত্র নেই, চাষাবাদের কোন চিহ্ন নাই। ১৪০ কি: মিটার পথে মাত্র দুই জায়গায় ছোট্ট পল্লীর মত নজরে পড়ল এবং আরও নজরে পড়ল ভেড়ার পাল নিয়ে চলেছে ২/৪ জন গরীব ইরানী। মনে প্রশ্ন জাগল এ শাহের ইরানে কি দেশের সমস্ত সম্পদ তেহরানেই ঢেলে দেওয়া হয়েছে? তেহরানেও দেখলাম প্রচুর প্রাচুর্য্যের মধ্যেও দারিদ্র। লাখে লাখে মটর গাড়ীর ভিড়ের মধ্যে হাজার-হাজার গরীব রাস্তার ধারে ঝরণা পাশে দাঁড়িয়ে থাকে এবং মটর মালিকের গাড়ী পানি ও সাবান দিয়ে পরিস্কার করে কিছু তুমান সংগ্রহ করছে।

www.pathagar.com

কোম শহর চোখে পড়ল। মসজিদের উঁটু মিনার দেখিয়ে জনাব ফতোয়াতী বললেন ঐ যে কোম শহর। যে শহরের উপর গোটা ইরানবাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ আমরা বিস্ময়ভরা চোখ দিয়ে তাকালাম সেই শহরের দিকে। সাড়ে তিন কোটি ইরানীদের নয়নমনি ইমাম খোমেনী তেহরান ছেড়ে রাজধানীর প্রাচুর্য্য ও আরাম আয়াশ ছেড়ে এখানেই বাস করেন। এখানেই তাঁর জীবনের বহু বছর কেটেছে। এখান থেকেই জালানো হয়েছে আন্দোলনের চেরাগ, এখানেই বিপ্লবের দানা বেঁধেছে, এখান থেকে বিপ্লবের বাণী উচচারিত হয়েছে, এখান থেকেই নির্বাসিত হয়েছেন আর সফল বিপ্লব শেষে এখানেই ফিরে এসেছেন, রাজকীয় লেবাসে নয়,ময়ুর সিংহাসনের অধিকারী হয়ে নয়, রাষ্ট্রীয় জৌলুষে ভরপুর হয়ে নয় বরং তিনি সাধারণ মানুষের লেবাসে, সাধারণ পরিবেশে, সাধারণ মানুষের মধ্যে আপনজনের মধ্যে ফিরে এসেছেন।

ইমাম খোমেনীর বাড়ীর আঙ্গিনায় এলাম। বাড়ীর ছাদে ও চারপাশে ইসলামী মোজাহিদ রাইফেল, ওয়ারলেস সজ্জিত অবস্থায় দন্ডায়মান। গেটে কড়া পাহারার ব্যবস্থা তবে আমাদের সাক্ষাৎ ছিল পূর্বনির্দ্ধারিত তাইতে প্রবেশের অনুমতি পেতে দেরী হলনা। হাজারো নারী পুরুষ ইমামের গৃহের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু এক নজর দেখবার প্রতিক্ষায় মোজাহিদরা আমাদের মেহমান খানায় নিয়ে যাওয়ার পথে ভীড়ের মধ্যে পড়ে গেলাম। ইমাম দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন ভক্তদের সাক্ষাৎ দানের জন্য মানুষের উত্তাল তরঙ্গ দোলায়িত হল এবং তরঙ্গের আঘাত আমাদের উপর এসে পড়ল। অতিকষ্ট করে মোজাহিদরা আমাদের মেহমান খানায় নিয়ে আপ্যায়ণ করলেন। চারদিকে গুঞ্জন বাংলাদেশ থেকে মেহমান এসেছেন সবাই রাস্তা ছেড়ে দাও। ঠিক ১০ টায় জনাব ফতোয়াতী আমাদের নিয়ে সাক্ষাতের নির্দ্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করলেন। কামরা জুড়ে সাধারণ ফরাস বিছানো কোন চেয়ার বা সোফার ব্যবস্থা নেই। ইমামা খোমেনী কামরায় প্রবেশ করলেন দুই জন সহকারী সহ। আমরা সবাই ফরাসে বসে পড়লাম -সালাম বিনিময় হল, আমাদের সফর ও কুশল সম্পর্কে জনাব ফতোয়াতীর নিকট খোঁজ নিলেন। আই. ডি. এল চেয়ারম্যান মওলানা আব্দুর রহীমের লিখিত চিঠি হস্তান্তর করা হল। তিনি ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং মওলানার উদ্দেশ্যে সালাম জানালেন উনি ফারসী ভাষায় এবং আমাদের ইংরেজী ভাষায় যে আলোচনা হল তার দো-ভাষীর কাজ করলেন জনাব ফতোয়াতী।

বাংলাদেশী জনসাধারনের জন্য খোমেনীর সালাম

অনেক কথার মধ্যে আমাদের বক্তব্য ছিল 'বাংলাদেশের মুসলমানরা ইরানের ইসলামী আন্দোলনের বিজয়কে ইসলামের বিজয় বলে মনে করে। কিন্তু ইহুদী ও পশ্চিমা জগতের এজেন্টরা অপপ্রচারে মেতে উঠেছে এবং এজন্য বাংলাদেশে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হওয়া প্রয়োজন। ইমাম জিজ্ঞাসা করলেন কোন ভাষায়? আমরা বললাম বাংলা ও ইংরেজীতে। মুমতাজ কটন মিলস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশী শ্রমিকদের সমস্যা সম্পর্কে উনাকে অবহিত করা হল। ইমাম বললেন লিখিত দিন - ফরেন মিনিষ্টি ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। যাওয়ার পথে দুবাই থেকে

www.pathagar.com

একটি ছোট্ট টাইপ মেসিন খরিদ করে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। বিভিন্ন সমস্যার কথা টাইপ করেই রেখেছিলাম সেগুলো ইমামের নিকট হস্তান্তর করা হল। সাক্ষাৎ শেষে ইমাম খোমেনী বললেন 'দেশে ফিরে দেশের জনসাধারণকে আমার সালাম পৌঁছে দেবেন'। জনাব ফতোয়াতীকে নির্দেশ দিলেন মেহমানদের যাবতীয় প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতে। কামরা থেকে বের হয়ে এলাম বটে কিন্তু দীর্ঘদেহী ইমাম খোমেনীর গাম্ভীর্য, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, উজ্জ্বল চেহারা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, চুম্বকের মত আর্কষণী শক্তি, স্পষ্টবাদীতা, সহজ সরল আড়ম্বরহীন জীবন যাপন অথচ বিশ্বের শোষকদের বিরুদ্ধে তার আপোষহীনতা ও ব্রজ্য কণ্ঠস্বর - এসব গুণাবলীর পরিচয় আমাদের স্মৃতির ভান্ডারে জুড়ে রইল।

ইমাম খোমেনীর অসাধারণ ব্যাক্তিত্বের উদাহরন

কামরা থেকে বের হবার পথে খোশ আমদেদ জানালেন ইমামের একমাত্র পুত্র আহমদ। বড় সন্তান বিপ্লবে শাহাদত বরণ করেছেন। পৃথিবীতে সব চাইতে কঠিন ও ভারী বোঝা হচেছ পিতার জিবীত অবস্থায় সন্তানের লাশ বহন করে গোরস্তানে যাওয়া। জেহাদের ময়দানে ইমাম তার বড় সন্তানকে নজরানা হিসাবে পেশ করেছেন। ছোট সন্তান আহমদের সঙ্গে সালাম বিনিময় হল। বাংলাদেশে দাওয়াত দিলাম, ডেলিগেশন পাঠানর কথা বলা হল। উনি দাওয়াত কবুল করলেন এবং বললেন শীঘ্রই দুই এক মাসের মধ্যে ডেলিগেশন যাবে। ফেরার পথে জনাব ফতোয়াতীর মুখে ইমামের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের এক কাহিনী শুনলাম। ইতালীর প্রখ্যাত মহিলা সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাসী ইমামের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেয়ে ৬দিন ধরে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তুখোড় মহিলা সাংবাদিক পশ্চিমা সভ্যতার অর্ধনগ্ন পোষাক পরে গিয়েছিলেন সাক্ষাৎকার নিতে। ইমামের কামরায় ঢুকতেই তিনি বললেন 'পাশের কামরায় তোমার জন্য শালীন পোষাক রয়েছে সেই পোষাক পরে এসো। ইমামের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সামনে ওরিয়ানা ফালাসী কোন প্রতিবাদ করতে পারেননি বা পশ্চিমা নারীদের পোষাকের পক্ষে কোন যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেননি, সুবোধ বালিকার মত হেজাব পরিহিতা অবস্থায় ইমামের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এই সাক্ষাৎকারের পুরো বর্ণনা আমি পত্রিকায় পড়েছি। পোষাক পরার বাধ্যবাধকতায় ক্ষুব্ধ ওরিয়ানা ফালাসী ৬দিন ধরে প্রশ্নের পর ইমামকে কোনভাবেই দুর্বল করতে পারেননি। ইমাম প্রদত্ত নানান প্রশ্নের বলিষ্ঠ উত্তরের মধ্যে বিশ্বের ক্ষমতাগর্বী শাসকদের জন্য ও খোদাদ্রোহী শক্তির জন্য যুগোপযোগী শিক্ষা ও নছিহত নিহীত ছিল।

ইরান সফর পরবর্তী আমলে আরও কয়েবার করেছি। কয়েকটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করেছি এবং বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়েছি। এসব সমাবেশে বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ের উপর নিজের বক্তব্য পেশ করেছি। শুধু শিয়া অধ্যুসিত অঞ্চল নয় সুন্নী সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্তান সংলগ্ন প্রদেশেও সুন্নী সম্প্রদায়ভূক্ত সুধী সামাবেশে

www.pathagar.com

বক্তব্য রেখেছি কিন্তু প্রথম বারের সফরই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু ইমাম খোমেনীর সঙ্গে সাক্ষাৎই নয় বরং শাহের আমলে গড়া মেকী সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ও ইসলামী বিধান অনুযায়ী রাজতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিয়ে একটি নুতন সভ্যতার প্রতিষ্ঠায় বিজয়ী ইরানী নারী পুরুষের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও উন্মাদনা দেখেছি। রসুল (দঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগ পার হওয়ার প্রায় সাড়ে তেরশত বছর পর ইরানী জাতি বাতিলের যাবতীয় মডেল প্রত্যাখান করে সেই সোনালী যুগে প্রত্যাবর্তনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যাওয়া শতাব্দীগুলিকে মনের আয়নায় এনে গভীর ভাবে চিন্তা করেছি বর্তমান আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে এ বিজয় কি করে সম্ভব হলো?

ইমাম খোমেনীর বিজয় কিভাবে সম্ভব হলো?

অর্দ্ধশতাব্দীকাল ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ইসলামী নেতৃত্বের নেয়ামত ভোগ করার পর খেলাফতের ছদ্মাবরণে রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র মুসলিম উম্মাহকে পতনের দিকে ঠেলে দেয় ও ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শিক ভিতকে দুর্বল করে ফেলে। এরপর বিজাতীয়দের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধীতা, উম্মার ঐক্য বিনষ্টকারী সর্বনাশা জাতীয়তাবাদ, ধর্মবিবর্জিত সেকুলার ভাবধারা এবং সর্বশেষ জাহেলিয়াত সমাজতন্ত্র - ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে নামধারী মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথকে ত্বরান্বিত করে দেয়। কয়েকশতাব্দী ধরে এই অবস্থা চলার পর উনবিংশ শতকে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক পুনঃজাগরণের দানা বাঁধতে থাকে এবং বিংশ শতাব্দীতে এসে ইসলামী নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অপরিহার্য্যতার উপর কলমের জেহাদ শুরু হয়ে যায় কিন্তু গোটা বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইমাম খোমেনীর বিস্ময়কর নেতৃত্ব এবং কঠিনতম বিরুদ্ধ পরিবেশে ইরানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মার মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ ও গণজোয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

ইসলামী বিপ্লবের বিভিন্ন পর্য্যায়ে ইমাম খোমেনীর বিস্ময়কর ভূমিকা অবশ্যই পর্য্যালোচনার দাবী রাখে। ইমাম খোমেনী বিপ্লবের শত্রুদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং তাদের সকলের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে আপোষহীন ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ইসলামের গোড়ার কথা হচেছ তাওহিদ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যখনই দুনিয়াতে তাওহিদের আওয়াজ বুলন্দ করার চেষ্টা করা হয়েছে তখনই ৩টি বিরুদ্ধ শক্তি বাধার পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১) ক্ষমতাসীন মহল ২) অর্থনৈতিক শোষকের দল ও ধর্ম ব্যবসায়ী মহল। এরা দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন লেবাসে ও বিভিন্ন শ্লোগান নিয়ে আর্বিভূত হয়েছে। রসুল (দঃ) এই ৩ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। ইমাম খোমেনী শেষ নবী (দঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন - শত্রুদের চিহ্নিত করতে ভুল করেননি। এই ৩ শত্রুর বিরুদ্ধেই তিনি বিদ্রোহ করেছেন ও দেশবাসীকে সজাগ করেছেন।

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের লক্ষ্যে উম্মার ঐক্যের দিকে তিনি গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী ও মুসলিম নামধারী শাসক ও বাদশাদের সৃষ্ট শিয়া সুন্নী বিভেদের ফেতনাকে একটি বলিষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে মিটিয়ে দিয়ে তিনি বিপ্লবের সৈনিকদের সীসাঢালা প্রাচীরের মত দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। 'লা শিয়া ওয়ালা সুন্নী নাহনু মুসলেমুন' - 'আমরা শিয়া নই আমরা সুন্নী নই আমরা মুসলিম'। এই শ্লোগান শুধু ইরানে নয় মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ইসলামের মধ্যে ফেরকাবাজী মেটানোর জন্য বলিষ্ট ভূমিকা রেখে চলেছে। ইসলামের প্রাথমিক কালে এসব ফেরকাবাজীর কোন অস্তিত্বই ছিলনা। মুসলিম বিশ্বে একটি বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে কোন আন্দোলন বিশেষ করে মুক্তিকামী মানুষের আন্দোলন দুই পরাশক্তির যে কোন একটির লেজুড় বৃত্তি অপরিহার্য। তাইতে বিংশ শতাব্দীর সাত দশক পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন রাষ্ট্র এমনকি মুসলিম রাষ্ট্র কোন না কোন পরাশক্তির দারস্থ হয়েছে, নিজেদের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়েছে। ইসলাম যে আজও বিশ্বের বুকে অতুলনীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে, পরাশক্তি নয় ইমানই যে মুসলমানদের একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র নির্ভরশীল শক্তি - এ সত্য মুসলিম উম্মাহ সম্পূর্ণ ভূলে গিয়েছিল। তাইতে বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে ইমাম ঘোষণা দিলেন 'neither east nor west Islam is the best পূর্ব নয় পশ্চিম নয় ইসলামই শ্রেষ্ঠ, বিশ্বের নির্য্যাতিত মুসলিম এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দিনের ঘুম থেকে জেগে উঠার জিয়ন কাঠি পেয়েছে।

এই মন্ত্রে ইরানে যেমন ইসলামী বিপ্লবের বিস্ময়কর সাফল্য এসেছে তেমনি গোটা বিশ্বে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার আকাংখা জোরদার হয়েছে এবং ইসলামী নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফিলিস্তিনের মোজাহিদরা এখন জাতিসংঘের প্রস্তাবের পরোয়া করেনা, কাশ্মীরের শার্দুলরা আর গনভোটের অপেক্ষায় বসে নেই, শ্বেত ভল্লুকের দেশে বিভিন্ন স্থানে মুসলিম মোজাহিদরা ভল্লুকের রক্তপিপাসু চেহারা ও বিশাল বপু দেখে ভীত নয়, আলজেরিয়া, তুরস্ক, মিশর, ফিলিপাইন, আরাকান সর্বত্রই মৃত্যুকে জয় করার উদগ্র বাসনা, সবার কণ্ঠস্বর আজ সোচচার, জেহাদের ময়দানে আজ সবার অবস্থান, শাহাদতের তামান্না আজ লাখো হৃদয়ে। বাংলাদেশের জমিনে কান পাতলেও এখন জেহাদী আযানের সুর শুনতে পাওয়া যায়।

মুরতাদ সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে প্রচন্ড সাহসী ভূমিকা ইমাম খোমেনীকে বিশ্বের দেড়শ কোটি উম্মার নেতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। বিশ্বে অনেক মুসলিম দেশ রয়েছে , শাসক রয়েছেন, বাদশাহ রয়েছেন, গ্র্যান্ড মুফতী রয়েছেন কিন্তু কেউ মুরতাদ রুশদীর বিরুদ্ধে শাস্তির ঘোষণা দেননি। সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে মৃত্যু দন্ডের ঐতিহাসিক ফতোয়া প্রদান করে ইমাম খোমেনী বিশ্বমুসলিমের অন্তরের ইচছার প্রতিধ্বনি করেছেন। এই ফতোয়ার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ছিল ব্যাপক। বিশ্বের সর্বত্র এমনকি বাংলাদেশেও গ্রামগঞ্জের লাখো কোটি মানুষ বজ্রকণ্ঠে ইমামের রায়ের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন হয় শাহাদাতের তামান্না এবং হাজারো লাখো তাজা প্রাণের কোরবানী। এক্ষেত্রে ইমাম খোমেনী হোসাইনী (রাঃ) আদর্শ থেকে ও কারবালার প্রান্তরে সংঘটিত চরম আত্মত্যাগ ও কোরবানী থেকে প্রেরণা নিয়েছেন এবং 'তালোয়ারের উপর রক্তের বিজয়' - এই মন্ত্রে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইমাম খোমেনীর বিপ্লবের বিস্ময়কর বিজয় ও চরমতম সাফল্য এখানেই। তার প্রেরণায় ইরানের নরনারী হোসাইনী আদর্শকে গ্রহণ করে শাহাদাতের পিয়ালায় চুমুক দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে।

মাওলানা মওদূদীর মৃত্যু ও পাকিস্তান সফর

তেহরানে বসেই খবর পেলাম বিংশ শতাব্দীর উজ্জলতম জ্যোতিষ্ক, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী ২২শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় বিকেল পৌনে সাতটার সময় যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো হাসাপাতালে ইন্তে কাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইনা ইলাইহি রাজেউন)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার জন্য ২৬শে মে তিনি লাহোর ত্যাগ করেন, ৪ঠা সেপ্টেম্বর বাফেলো হাসাপাতালে কিডনীতে অস্ত্রোপচার করা হয়। কিন্তু ৮ই সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং ২২শে সেপ্টেম্বরে তাঁর সংগ্রামী জীবনের অবসান হয়। ১৯০৩ সনে স্বাধীন হায়দারাবাদের আওরঙ্গবাদে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র প্রাথমিক শিক্ষা ও আলিম পরীক্ষা পাশ করে ১৫ বছর বয়সে বিজনুর থেকে প্রকাশিত - 'আখবারে মদীনা' প্রতিকার সম্পাদনা বিভাগে যোগদান করে লেখনীর মাধ্যমে তাঁর কর্মময় জীবনের শুরু এবং একজন জ্ঞানের বিশ্বকোষ হিসাবে বিশ্ব পরিচিতি লাভ করে পৌনে একশতাব্দীর একবছর বেশী সময়ের জন্য অবিস্মরণীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে ৭৬ বছর বয়সে 'কুল্লি নাফসিন যায়েকাতুল মাওত', আল্লাতায়ালার এই অমোঘ বিধানের কাছে নিজেকে সঁপে দিলেন। সংবাদ পত্রের মাধ্যমেই জানলাম উনার মৃতদেহ লাহোরে সমাহিত করা হবে।

তেহরান থেকে দুবাই হয়ে ঢাকায় ফিরে যাওয়ার কোন টিকেট না থাকায় ইরান কতৃপক্ষ আমাদের রুট তেহরান-করাচী-ঢাকা করলেন এবং ২৬/৯/৭৯ তারিখে আমাদের যাত্রার দিন নির্দ্দিষ্ট হল। টিকেট কনফার্ম ছিল করাচী পর্যন্ত তারপর সেখানে থেকে সুবিধামত ঢাকা ফ্লাইটের দিন নির্দ্দিষ্ট করার সুযোগ ছিল। যাত্রার পূর্ব দিন সংবাদপত্রে মাধ্যমে জানা গেল মরহুম মওলানার লাশ ২৬ তারিখেই লাহোর পৌছবে এবং সেদিনই দাফন করা হবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম করাচী পৌছে ট্রেনে লাহোরে গিয়ে মওলানার কবর জিয়ারত করব, তার পরিবার পরিজন এবং সংগ্রামী জীবনের সাথীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, সমবেদনা জ্ঞাপন করব। ২৬/৯/৭৯ তারিখ তেহরানের হোটেল ইন্টারকন্টিন্টোল থেকে সকাল ৭টায় বের হয়ে পাকিস্তান এয়ার লাইন্সের ৭০৭ বেয়িংএ করাচীর পথে রওয়ানা হলাম সকাল ১০টায়। বন্ধু মোস্তফা বিন ইব্রাহিম এয়ারপোর্টে তার উষ্ণ সম্বর্দ্ধনা দিয়ে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন ও তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। মোস্তফা আমার আলীগড়ের ছাত্রজীবনের বন্ধু তার কথা ইতিপূর্বে

www.pathagar.com

উল্লেখ করেছি। অনেক পরিশ্রম করে মোস্তফার প্রচেষ্টায় পরদিন সকাল ১০ টায় লাহোরগামী ট্রেনে আমাদের যাত্রার ব্যবস্থা হল। লাহোরে আমার জন্য তখন আরও একটি আকর্ষণ ছিল। আমার তৃতীয় জামাতা ডাক্তার ফিরোজ মাহবুব কামাল সেসময় লাহোরে সস্ত্রীক অবস্থান করছিল। ২৮/৯/৭৯ সকাল ৮টায় লাহোর ষ্টেশনে পৌছালাম এবং আধা ঘন্টার মধ্যে ফিরোজের বাসায় উপস্থিত হয়ে আমার তৃতীয় মেয়ের ৪দিন বয়সী প্রথম কন্যাসন্তানকে দেখে দোওয়া ও শুভেচ্ছা জানিয়ে কোলে তুলে নিলাম। এক মৃত্যুর বেদনা নিয়ে, জীবনে চলার পথে যে জ্ঞানের বিশ্বকোষের সাক্ষাৎ পেয়ে চিন্তা ও কর্মের জগতে দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পরিবর্তন এনেছিলাম তার বিচ্ছেদের ব্যাথা নিয়ে লাহোরে পৌছালাম। আবার লাহোরে পৌছেই পৃথিবীর মাটিতে একটি নূতন জন্মের সুসংবাদ পেলাম, অত্যন্ত স্নেহের আদরের ভালবাসার এক নয়ন পুত্তুলির জীবন্ত ছবি দেখতে পেলাম, আগামী দিনের এক সৈনিকের ছোট্ট কমল হাতের পরশ পেলাম আর তার ছোট্ট দুটি মিটিমিটি তারকা সদৃশ্য চোখে আগামী দিনে বড় হওয়ার প্রত্যয় লক্ষ্য করলাম। স্রষ্টার কি অপূর্ব সৃস্টি, অপূর্ব কৌশল, জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি অবস্থান, হাসি ও কান্না দিয়ে মানুষের জীবনকে জড়িয়ে রাখা হয়েছে।

ইসলামী পুনঃজাগরণের ক্ষেত্রে মওলানা মওদূদীর অবদানের স্বীকৃতি

সকাল ১০-৪৫ এ মওলানার বাসভবনে পৌছলাম। এই বাসভবনের সম্মুখস্থ লনে তাঁর কবর দেওয়া হয়েছে। মাত্র একবছর পূর্বে রাবেতা আলম আল ইসলামীর বিশ্বসম্মেলন শেষে মওলানা আব্দুর রহীমের নেতৃত্বে আমরা ১২ জন লাহোর এসে এই বাসভবনে মরহুম মওলানার স্টাডিরুমে তার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করে যাই। তিনি এই বাড়ীটি ইসলামী আন্দোলনের গবেষণা কাজের জন্য দান করে গেছেন। তাইতে এই বাসভবনের মাটিতেই তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করলাম। মওলানা মৃত্যুর পর লাহোরে এবং পাকিস্তানের সর্বত্র তখনও তাঁর জীবন ও জীবনের অবদান সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে প্রত্যহই বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে দোওয়া মহফীল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। খবরের কাগজেও প্রত্যহ সে সব সংবাদ গুরুত্বের সঙ্গে ছাপান হচ্ছিল। যে কথাগুলো ছিল সবার মুখে মুখে সর্বজন স্বীকৃতি তা ছিল মওলানা সাইয়েদ আবুল আল মওদুদী জীবনভর বিশ্বব্যাপী ইসলামের গৌরব, সৌন্দর্য্য ও প্রাধান্য প্রমাণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা ও প্রচেষ্টা করে গেছেন। বিশ্বব্যাপী ইসলামী রেনেসাঁর সূচনায় তাঁর মৃত্যুতে সৃষ্ট শূন্যতার অনুভূতি সবার হৃদয় স্পর্শ করবে।

লাহোর হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের মওলানার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত প্রস্তাবে বলা হয় 'মওলানা ছিলেন একজন অসাধারণ ইসলামী চিন্তাবিদ, আইনজ্ঞ, অত্যন্ত উচচস্তরের ইসলামী পন্ডিত, ইসলামী আন্দোলনের স্বীকৃত বলিষ্ঠ নেতা, বিশিষ্ঠ ইসলামী দার্শনিক এবং বিশ্বমুসলিমের

www.pathagar.com

সংস্কার ও পুন:গঠনের পথে প্রেরণার উৎস। বর্তমান যুগে ও সময়ে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ও ইসলামী আইনের রূপরেখা প্রণয়নের ক্ষেত্রে মওলানার রচিত ইসলামী সংবিধানের মূলনীতি বর্তমান ইতিহাসে একটি মূল্যবান সংযোজন। এই উপমহাদেশে তিনিই হলেন ইসলামী আন্দোলনের রূপকার এবং ইসলামী পুন:জাগরনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান নজিরবিহীন।

বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনঃজাগরণের ক্ষেত্রে মওলানার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিভিন্ন ভাষায় মওলানার সাহিত্য ভান্ডার অনুদিত হয়ে বিশ্বের বহু দেশের বুদ্ধিজিবীদের ও সত্যের সন্ধানে হাতড়িয়ে চলা মানুষের কাছে ইসলামের সঠিক পরিচিতি পৌছানোর এক দুর্লভ সুযোগ মওলানা তাঁর জীবদ্দশাতেই পেয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ ক্ষেত্রে তিনি স্রষ্টার করুণা কুড়ানোর অপূর্ব সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছেন। অনেক সাধকের জীবনের ফুল মৃত্যুর বহু পরে প্রস্ফুটিত হয়, অনেকের জীবনের কীর্তির গাঁথা বহু যুগ পরে প্রকাশ পায়, অনেকের পান্ডুলিপি শতাব্দীর অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বদ্ধ থাকার পর হঠাৎ ঝলসিয়ে উঠে আলো বিকীরন শুরু করে কিন্তু মওলানা মওদুদীর সাহিত্যকর্ম তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রায় সবকটি মহাদেশের দুরত্ব পাড়ি দিয়ে এর সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দিয়েছে। জগতজোড়া খ্যাতির জন্য মওলানা মওদূদী কোন নুতন চিন্তাধারা বা মতাদর্শ পেশ করেননি। মানবরচিত বিভিন্ন বেড়াজালের সৃষ্ট ভ্রান্তিকে বলিষ্ঠ কলমের আঘাতে ছিন্ন করে, অপসারণ করে তিনি হেরার রোশনীকে সঠিক আভায় ও উজ্জলতায় বিশ্বমানবের দুয়ারে পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং সমাজ বদলের সংগ্রামে যারা প্রতিটি যুগে জীবন ও মৃত্যুর মখোমুখী দাঁড়িয়ে সবচাইতে প্রিয়তম বস্তুটি আল্লাহর পথে নজরানা হিসাবে পেশ করে সেই যুব সমাজকেই তিনি বেশী আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কাছে ইসলামের ইবাদত শুধুমাত্র কতকগুলি অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধতা নয়, ইসলামের রাজনীতি মুসলিম নামধারী ব্যক্তির পরিচয় বহন করে রাষ্ট্রেয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া নয়, ইসলামী অর্থনীতি শুধুমাত্র রাষ্ট্রের বা ব্যক্তির পার ক্যাপিটা আয় বৃদ্ধি নয়, ইসলাম অন্যায়-অবিচার মুক্ত সুখী সুন্দর পৃথিবী রচনার একমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, সর্বক্ষেত্রে রাব্বুল আলামীন, জগত প্রভুর আনুগত্য দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করা এবং আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ সহ বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির সেবাকে অপরিহার্য মনে করা ও এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমগ্র জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। জীবন একটি অবিভাজ্য সত্ত্বা, সমস্ত দৃশ্য ও অদৃশ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন তেমনি ব্যক্তি ও সমাজমানুষের চাহিদাগুলিও অবিভাজ্য আর তাইতে অবিভাজ্য মানুষের জন্য জীবন বিধানও হতে হবে অবিভাজ্য ও পূর্ণাঙ্গ, হতে হবে একই উৎস হতে উৎসারিত। সে উৎস হচ্ছে আলকোরআন ও তার একমাত্র ও চুড়ান্ত ব্যাখ্যাকারী রাসুল (দ:)এর সুন্নাহ।

www.pathagar.com

অধ্যায়-১৭

জেনারেল জিয়া নিহত হলেন

আশির দশক এদেশের জন্য ও আমার নিজের জন্য ছিল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। এই দশকের প্রথম বছরের ৩০শে মের দুর্যোগপূর্ণ রাতে জেনারেল জিয়া চিটাগাং এর এরিয়া কমান্ডার ও ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) জেনারেল মঞ্জুরের অনুগত অফিসারের এক ক্ষুদ্র বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত সাড়ে তিন বছর ধরে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার এই জাতির মধ্যে ঘৃণা, বিভেদ ও বিভাজনের যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিল জেনারেল জিয়া ১৯৭৭ থেকে ৮১ পর্যন্ত ৫ বছর ধরে নিরলসভবে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বুনিয়াদ স্থাপন করে সেই বিষবৃক্ষ উপড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধারা সূচনা করে তিনি স্বাধীনতার পক্ষের ও বিপক্ষের শক্তিগুলোকে একই সামিয়ানার নীচে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হচেছ শেখ সাহেবের মতই জেনারেল জিয়া হত্যা হলেন বাংলাাদেশের সূর্য সন্তানদের দ্বারা যারা ছিলেন স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি, মুক্তিযুদ্ধের নামকরা সীপাহসালার ও অগ্রগামী সৈনিক এবং জেনারেল জিয়ার সহকর্মী ও সহযাত্রী হিসাবে দেশের সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যাদের দালাল বলে গালিগালাজ করা হয়েছে, স্বাধীনোত্তর কালে যাদের অহরহ স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি হিসাবে চিত্রিত করা হয় তারা আদৌ এই নির্মম হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না - না ষড়যন্ত্রে, না পরিকল্পনায়, না প্রস্তুতিতে, না বাস্তবায়নে কোন পর্যায়েই তাদের দূরতম কোন সম্পর্ক ছিল না। জেনারেল জিয়া নিহত হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার দেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেনারেল জিয়া হত্যার পর চিটাগাং অঞ্চল গোটা দেশ থেকে প্রায় বিচিছন্ন হয়ে পড়েছিল এবং দেশে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ার প্রচন্ড সম্ভাবনা ছিল কিন্তু এ সময় সশস্ত্র বাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ সংবিধানিক প্রক্রিয়া চালু রাখা নিশ্চিত করেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে পূর্ণ সহযোগিতা দান করেন। জেনারেল এরশাদের সময়োচিত ও সাহসী পদক্ষেপ সশস্ত্র বাহিনীর ঐক্য বজায় রাখতে ও দেশে একটি গৃহযুদ্ধ এড়াতে সক্ষম হয়।

দালাল আইনে শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলের রায়

১৯৮১ সনের প্রথম বছরই আমার বিরুদ্ধে দালাল আইনে প্রদত্ত ৩১ বছরের শাস্তির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী আপিলের নিস্পত্তি হয় মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কুষ্টিয়ার দায়রা জজ ও স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল মি. আর. কে. বিশ্বাস আমাকে বিভিন্ন ধারায় ১২-৩-৭৩ তারিখে ৩০ বছরের কারাদন্ড ও জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর কারাদন্ড প্রদান করেন। একই সনের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকার আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে

www.pathagar.com

দিলেও হাইকোর্ট ডিভিশনে আমার দাখিলকৃত আপীল মোকদ্দমা আমি প্রত্যাহার করি নাই। যদিও মোকদ্দমাটি ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং শাস্তির মাত্র কয়েকমাস পর সরকার আমাকে মুক্ত করে দেয় তবুও এই রায়কে আমি কখনও ন্যায়সঙ্গত বলে গ্রহণ করতে পারিনি। এজন্য উচচ আদালতের দরজায় নাড়া দিয়ে আমি এই রায়ের যর্থার্থতা পরখ করতে চেয়েছিলাম। মহামান্য বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও বিচারপতি মোস্তফা কামালের আদালতে ১৯৮১ সনের ২৯ অক্টোবর, ৩০ অক্টোবর ও ২রা নভেম্বর শুনানী হয় এবং ৩রা নভেম্বর রায় ঘোষণা হয়। হাইকোর্ট ডিভিশনে আমার আপীলের শুনানী আমি নিজেই করি এবং আমাকে সাহায্য করেন আমার ছোট ভাই তুল্য এ্যাডভোকেট এ. টি. চৌধুরী ও এ্যাডভোকেট সেখ আনসার আলি। ৩ দিনের একটানা শুনানীতে নিম্ন আদালতের রায় সহ যাবতীয় বিষয়াদি পুংখানুপুংখরূপে মহামান্য বিচারপতিদ্বয়ের সম্মুখে আমি তুলে ধরার সুযোগ পাই এবং রায়ের অন্তঃসারশূন্যতা প্রমাণের চেষ্টা করি। মহামান্য বিচারপতিদ্বয় ৩রা নভেম্বর তাঁদের সুচিন্তিত ও সুলিখিত রায় প্রদান করেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে সা'দ আহমদ কোনদিন রাজাকার ছিলেন না রাজাকার বাহিনীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না বা রাজাকার বাহিনী পরিচালনা করেন নাই। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন নাই, বা সহযোগিতা করেন নাই, পিস কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে কোন অন্যায় অবৈধ কার্যকলাপ করেন নাই বরং ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের মধ্যে ত্রাণ ও সাহায্য প্রদান করেছেন। মোকদ্দমায় অভিযোগ ছিল যে পান্টি ইউনিয়নের পিস কমিটির চেয়ারম্যান খেলাফত হোসেন একটি লিখিত পত্রে মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে লড়াই এর জন্য ১০০ রাজাকার পাঠানর অনুরোধের প্রেক্ষিতে সা'দ আহমদ ঐ চিঠির পাশে সিল স্বাক্ষর করে এস. পি.-কে নির্দেশ দেন, 'সেন্ড ফিফটি টেন্ড রাজাকার টু পানটি ইউনিয়ন এ্যাট ওয়ান্স', - এ সম্পর্কে মহামান্য বিচারপতিগণ মন্তব্য করেন যে চিঠিখানি জাল, এতে সা'দ আহমদের কোন স্বাক্ষর বা মন্তব্য নাই, চিঠিখানি যে সা'দ আহমদের হাতে পৌছেছিল তারও কোন প্রমাণ নাই, চিঠিখানি জাল যা তদন্ত আমলে জব্দ হয়নি, পরবর্তীতে বিচারামলে নথীভূক্ত করা হয়েছে।" এ সমস্ত বানোয়াট অভিযোগ থেকে মহামান্য বিচারপতিগণ আমাকে খালাস প্রদান করেন। এই রায় আমার জন্য আনন্দের ছিল এই কারণে যে আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষগণ মাঠে ময়দানে সর্বত্র ঢালাওভাবে আমার বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, রাজাকার পরিচালনা, পাক বাহিনীর সহায়তা ইত্যাদি যে সব মিথ্যা অভিযোগ করতেন তার সমুচিত জবাব ছিল এই হাইকোর্টের রায়। ৩৫ ডি. এল. আর. ৪১, ৩ বি. এল. ডি ৭৫ এবং ২ বি. সি. আর. ৩৯৩ পৃষ্ঠায় এই রায় প্রকাশিত হয়েছে।

সস্ত্রীক হজ্ব পালন

আল্লাহ মেহেরবান এই বছরেই আমার একটি নিয়ত পূরণ করেন - তা ছিল সস্ত্রীক হজ্ব পালন ও আল্লাহ তায়ালার পেয়ারা হাবীব রাহমাতুল্লিল আলামীন

www.pathagar.com

মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর রওজা মোবারক জিয়ারত। নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাওহিদের অনুসারীদের এ একটি ফরজ ইবাদত। ১৯৭১ সনে আমার আম্মা ইন্তে কালের পর থেকে আমার স্ত্রী সৈয়দাও উচচ রক্তচাপ জনিত ব্যারামে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তবুও আমাদের উভয়ের আকাংখা ও সিদ্ধান্ত ছিল স্বামী স্ত্রী একত্রে হজ্ব পালন করা। আমার দাদা ও আব্বা এই ফরজ পালন করেছেন কিন্তু দাদী ও আম্মা জীবনে এ সুযোগ পাননি। সৈয়দার আব্বা (আমার শশুর) অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে হজ্ব করতে গিয়ে সাফা মারওয়ায় সায়ী করার সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। সৈয়াদার আম্মার জীবনে হজ্ব পালনের সুযোগ আসেনি। সৈয়দারও প্রচন্ড আকাংখা ছিল হজ্ব পালন করা এবং সেই সঙ্গে তার পিতার মৃত্যুর স্থানটি দেখা ও পিতামাত উভয়ের জন্য মাগফেরাত কামনা করা। হজ্ব একটি ইবাদত - হজ্বের অনুষ্ঠান, হজ্বের স্থানসমূহ, এসব স্থানের পাহাড়, টিলা, কঙ্কর, বালুকা কণা সর্বত্রই স্মৃতি বিজাড়িত, পৃথিবীর বুকে মানব মানবীর আগমনের পর থেকেই নরনারীর পদচিহ্ন পড়েছে একসাথে, উভয়ে মিলেই বহু ইতিহাস রচনা করেছে যে সবের স্মৃতি আজও সজীব হয়ে আছে। কোন ইতিহাস, যেমন মা হাজেরার (রাঃ) শিশু পুত্রের পানির জন্য সাফা মারওয়ার মধ্যে দৌড়ানো, শুধু নারী একাই গড়েছে যা আল্লাহ'র হুকুমে বিশ্বের নারী পুরষ উভয়কেই অনুসরণ করতে হচেছ - অনুসরণ করতে হবে পৃথিবীর শেষ দিনটি আসার পূর্ব পর্যন্ত। এসব কারণে আমার ও সৈয়দার একসঙ্গে হজ্বের সফর ছিল বিশ্ব প্রভুর তরফ থেকে প্রদত্ত একটি নেয়ামত, আমাদের উভয়ের জীবনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

প্রায় সড়ে চার হাজার বৎসর পূর্বে হজরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহর আদেশে, আল্লাহর আহ্বানকারী হিসাবে বিশ্ববাসীর প্রতি সার্বজনীন আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন ঃ "আল্লাহ'র বান্দাগণ! আল্লাহ'র ঘরের দিকে আস, পৃথিবীর প্রতি কোন থেকে ছুটে আস, পায়ে হেটে কিংবা যানবাহনে চড়ে আস।" জওয়াব স্বরূপ আজ পর্যন্ত খানায়ে কাবার প্রতিটি মুসাফির উচচস্বরে আওয়াজ তোলেন, 'প্রভু হে আমি আসিয়াছি, হে খোদা আমি হাজির। কেও তোমার শরীক নাই, অমি কেবল তোমার আহ্বানেই আসিয়াছি, সব তারিফ, প্রশংসা তোমারই - কোন কিছুতেই তোমার কেহ শরীক নাই'। তখন থেকেই খানায়ে কাবার সঙ্গে মিল্লাতে ইসলামীর নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। মানবদেহে হৃদপিন্ডের মর্যাদার মতই ইসলামী বিশ্বে খানায়ে কাবার মর্যাদা। হৃদপিন্ড যেমন বিভিন্ন শিরা উপশিরার সাহায্যে রক্ত টেনে নিজের কাছে নিয়ে আবার পরিশুদ্ধ করে যথাস্থানে পৌছিয়ে দেয়, মিল্লাতে ইসলামীর দেহেও খানায়ে কাবা অনুরূপ ভূমিকাই পালন করে থাকে। প্রতি বছর বিশ্বের প্রত্যন্ত প্রান্তর থেকে মুসলমানদেরকে টেনে আনে নিজের কাছে। তাদেরকে পাপ পংকিলতা থেকে এবং বিভিন্ন চারিত্রিক দুর্বলতা থেকে পবিত্র করে তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে এক নূতন জীবনী শক্তি তারপর তাদেরকে পাঠিয়ে দেয় বিশ্বের দিকে দিকে নিজ নিজ কর্মস্থানে। এ এমন এক প্রাণ স্পন্দন, এমন এক আন্দোলন যা দুনিয়ার তাওহিদ পন্থীদের একত্রিত

www.pathagar.com

করে এবং জীবন্ত ও সক্রীয় ইসলামী প্রাণসত্তা উপহার দিয়ে তাদেরকে ফেরত পাঠায়। হৃদপিন্ডের স্পন্দন যতক্ষণ সবল থাকে মানুষ ততক্ষণই বেঁচে থাকে, অনুরূপভাবে হজ্বও গোটা মুসলিম জাহানের হৃদপিন্ডের স্পন্দন।

আমরা উভয়ে ঢাকার বাসা থেকে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ বিমানের হজ্ব ফ্লাইটে জেদ্দা পৌছে মোয়াল্লেমের ব্যক্তিগত তদারকীতে মক্কা পৌছে ওমরার মাধ্যমে তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন করে মোয়াল্লেম প্রদত্ত পৃথক একটি ছোট্ট কামরায় অবস্থান নিয়েছি। হজ্ব ও জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর সম্পর্কে অনেকের লিখা বই পড়েছি। এগুলো নূতন করে লিখার কোন প্রয়োজন বোধ করছিনা। মক্কা ও মদিনায় আমরা নিজেরাই রান্না করে খাওয়া দাওয়া করেছি। বাজার করার বিশেষ কোন ঝামেলা ছিলনা কেননা প্রায় সব এলাকাতেই ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরের মত দোকান পাট যেখানে প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাওয়া যেত। আনুষ্ঠানিক ইবাদত হিসাবে হজ্ব সুসম্পন্ন হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে এ বিশ্বাস মনে জন্মেছে কিন্তু হজ্বের আসল উদ্দেশ্য বর্তমান বিশ্বে ও সমাজে পালিত হচেছ কিনা, হজ্বের আসল তাৎপর্য বর্তমান মুসলিম উম্মা অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হচেছ কিনা সে বিষয়ে মনের কোনে বহু প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে।

হজ্ব একটি নিছক অনুষ্ঠান সর্বস্ব ইবাদত নয়, এর আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক রয়েছে। হজ্বের আধ্যাত্মিক দিক হচেছ মানুষের অনন্ত জীবনের চাবিকাটি এবং তা মানুষকে একত্ববাদের দিকে ধাবিত করে এবং তার জীবনের পবিত্রতাকে করে তোলে অজেয়। হজ্বের ধর্মীয় বিধি নিষেধ পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তাবায়িত করা না হলে উপরোক্ত মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব নয়। হজ্বের রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করা তখনই সম্ভব হবে যখন এর আধ্যত্মিক ও খোদায়ী দিকগুলি প্রতিপালিত হবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর দাওয়াতে সাড়া প্রদান এবং তাঁর দেওয়া বিধানগুলি সঠিকভাবে পালন করলেই আমরা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছতে পারব।

হজ্ব এমন একটি বিরাট ও মহতী বিশ্ব সম্মেলন যেখানে দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশ থেকে নিপীড়িত, নির্যাতিত মুসলমানরা এসে সমবেত হয় যেখানে বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বর্ণের লোকেরা একই পোষাক পরে উপস্থিত হয় এবং কারও মধ্যে পার্থক্যের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকেনা। এই মহাসম্মেলন যদি মুসলমানদের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধানে ব্যর্থ হয় বা রাজনৈতিক বিষয়গুলির প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করে তাহলে আঞ্চলিক ভিত্তিতে আয়োজিত সম্মেলনগুলি মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে আদৌ কোন অগ্রগতি সাধিত হতে পারেনা।

ইসলামের সোনালী যুগে হাজী সাহেবানরা মক্কায় সমবেত হয়ে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্ন্তজাতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করতেন এবং এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতেন। খোলাফায়ে রাশেদার আমলে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত হাজীদের নিকট স্থানীয় শাসকদের আচার আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হত এবং অভিযোগ পেলে তৃড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। সর্বযুগে বিশ্ব মানবের নিপীড়ন ও

www.pathagar.com

জুলুম শোষণের মূলে রয়েছে খোদাদ্রোহী শক্তিদের আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি অস্বীকৃতি। নিজেরা সার্বভৌম সেজে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহ'র বান্দাদের উপর অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালিয়েছে। এসব নির্মূলের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার মহাপরিকল্পনায় হজ্ব অনুষ্ঠানের মধ্যে কি কোন বিশেষ সমাধান রয়েছে? হজ্ব যে শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, এর উর্দ্ধে অনেক কিছু তা আল কোরানের ঘোষণায় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মোমিনদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। "যারা হাজী সাহেবানদের পানি সরবরাহ করে এবং মসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করে তোমরা কি তাদেরকে এসব লোকের সমজ্ঞান কর যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে? আল্লাহর নিকট তারা সমতুল্য নয় এবং আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না" (সুরা তওবা ঃ ১৯) এখানে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান সহ জেহাদ ফি সাবীলিল্লাহকেই সর্বোত্তম করণীয় কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং দুইটি বাহ্যত সেবামূলক কাজ হিসাবে জনসাধারণের দৃষ্টিতে আদৌ গুরুত্ব পায়নি।

হজ্বের ময়দানে শুধু কি বিশ্বের মুসলমানরা দীর্ঘ সফর করে উপস্থিত হবে এবং কিছু আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে দেশে ফিরে যাবে? কোরআনের আয়াত জলদগম্ভীর আওয়াজে স্মরণ করিয়ে দেয় বিশ্ব মুসলিমের এই ময়দানে খোদাদ্রোহী শক্তির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা অবশ্যই উচচারিত হতে হবে। হিজরী নবম সালের হজ্ব প্রাক্কালে কাফের ও মুশরেকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের নির্দেশ দিয়ে সুরা তওবার প্রথমাংশ নাজিল হলে রসুলে করীম (দঃ) হযরত আলি (রাঃ) কে মক্কায় প্রেরণ করেন। তিনি দ্রুতগতিতে মক্কায় উপস্থিত হয়ে হাজীদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদের নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রচার করেন -

"আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ হতে সাধারণ ঘোষণা (সমস্ত মানুষের প্রতি) হজ্বের বড় দিনে এই যে আল্লাহ মোশরেকদের সাথে সম্পর্কহীন এবং তাঁর রসুলও (সুরা তওবা :৩)।

সম্পর্কচ্ছেদের এই ঘোষণা প্রচারের জন্য হজ্বের ময়দানই প্রকৃষ্ঠস্থান স্থান হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কোরআনের আহ্বান কি শাশ্বত নয়? সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজেই যদি সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে থাকেন এবং এই ঘোষণা প্রচারের জন্য যদি রসুলে খোদা (দঃ) হজ্বের ময়দান বেছে নিয়ে থাকেন তাহলে আজ কেন বিশ্বের ইবলিশী শক্তি, খোদাদ্রোহী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে মুর্দাবাদ ধ্বনি উচচারণ করা যাবেনা? মুসলিম জাগরণের কেন্দ্রস্থলে, ওহি নাযিলের স্থানে, বিশ্ব মুসলিমের মিলন কেন্দ্রে ইহুদীবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ ও অনান্য কুফুরী মতবাদের বিষসমূহ ধ্বংসের জন্য 'বিশ্ব মুসলিম এক হও' 'তাওহিদের ঝান্ডাধারী এক হও' এ আওয়াজ কোন তোলা যাবেনা?

বর্তমান বিশ্বের জেহাদ বিবর্জিত অধিক সংখ্যক মুসলিম রাষ্ট্রে ও সমাজে শাসক, সামজপতি, রাষ্ট্রনায়ক ও তাদের ছত্রছায়ায় লালিত ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজিবী ও

www.pathagar.com

দরবারী আলেমদের মতলবী ব্যাখ্যার কারণে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতগুলো তাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হারিয়ে প্রানহীন, আনুষ্ঠানিক ইবাদতে পরিণত হয়েছে। কালেমা, নামাজ, রোজা ও জাকাতের মতই ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত পবিত্র হজ্বের অনুষ্ঠানও তার প্রকৃত তাৎপর্য্য হারিয়ে ফেলেছে। একটি সুস্থ ও সবল হৃদপিন্ডের স্পন্দন আর অনুভূত হয়না।

বিশ্বের বিভিন্ন কোন থেকে নদী সমুদ্র পাহাড় পর্বত মরুভূমি পাড়ি দিয়ে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে লক্ষ লক্ষ হজ্বযাত্রী আল্লাহর ঘরের মেহমান হয়ে বিশ্ব মুসলিমের মিলন কেন্দ্রে উপস্থিত হন তাঁরা বর্তমানে কোন বাণী, কোন শিক্ষা নিয়ে ফিরে যান? হজ্বের ৩ ফরজ - নিয়েত, তাওয়াফ ও আরাফাতে অবস্থান। হাজীদের একই সময় নিয়েত বা তাওয়াফ করা প্রয়োজন হয়না কিন্তু সবাইকে ভোর থেকে আছর পর্যন্ত অবশ্যই আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত থাকতে হয়। একই সময়ে একই ময়দানে সবার অবস্থান - এই খোদায়ী বিধানের কি কোন মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য নিহীত নাই? রসুলুল্লাহ (দঃ) এই বিশ্ব সম্মেলনে কি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক কিছু বক্তব্য রাখতেন? ১০ই হিজরী সনের ৯ই জিলহজ্জ আরাফার দিনে দুপুরের পর রসুলুল্লাহ (দঃ) লক্ষাধিক সাহাবার সমাবেশে যে ঐতিহাসিক বিদায়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তার প্রতিটি অক্ষর ইতিহাস বক্ষে ধারণ করে রেখেছে। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণরাজী বর্ণনার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁর ভাষণে মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। সর্বাবস্থায় আল্লাহর বন্দেগীর নির্দেশ দিয়ে, জাতিভেদ, শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্যের কবর রচনা করে, জাহেলী যুগের রক্তের দাবী নির্মুল করে, অর্থনৈতিক শোষণের পথ সুদী ব্যবস্থা রচিত করে, মানুষের রক্ত, ইজ্জত, সম্পদের অধিকার নিশ্চিত করে, অপরাধের দায়িত্ব শুধুমাত্র অপরাধীর উপর বর্তিয়ে, নারী নির্যাতন বন্ধ করে সুখী দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনের তাগিদ দিয়ে, ব্যাভিচারের প্রতি কঠোরতা আরোপ করে, অধীনস্থদের জন্য সমান মানবিক অধিকারের নিশ্চয়তা দান করে, বিশ্বমুসলিমকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে, আমানতকে খেয়ানত না করার আদেশ দিয়ে, জুলুমের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করে, শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাবের অনুসারী নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়ে, নামাজ আদায়, রোজা পালন ও সম্পদের জাকাত প্রদানের আদেশ দিয়েম শয়তানের অনুসরণ থেকে লক্ষ যোজন দূরে থাকার আদেশ দিয়ে এবং জীবনের সর্ববস্থায় গোমরাহীর পথ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ'র কিতাব ও ও রাসুলের সুন্নাহ আঁকড়ে থেকে বিদয়াত থেকে দূরে থাকার তাগিদ দিয়ে তাঁর ভাষণ পেশ করেন। যুগ যুগ ধরে অনাগত ভবিষ্যতে তাঁর এই বাণী পৌঁছে দেবার জন্য আমাদের পূর্বসূরীরা আরাফার ময়দানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে যে ওয়াদা করেছিলেন আমরাও তার অংশীদার।

আজকের দিনের আরাফার ময়দানে লক্ষ লক্ষ হাজীদের সমাবেশ হয়,

www.pathagar.com

আরাফার ময়দানের বিশালতা এতটুকু কমেনি, জবলে রহমত যার উপর দাঁড়িয়ে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁর ভাষণ দিয়েছিলেন সে পাহাড়ের উচচতা এতটুকু হ্রাস পায়নি কিন্তু সে ভাষণ এখন আর প্রতিধ্বনিত হয়না, মানুষের জীবন সমস্যার সমাধানের কোন বাণী এখন আর উচচারিত হয়না, দুনিয়ার নমরুদ, ফেরাউন, আবু জেহেলদের বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ উত্থিত হয়না, বিশ্ব মুসলিম স্বৈরশাসনের অক্টোপাশ থেকে মুক্তির কোন দিক নির্দেশনা পায়না, লক্ষ লক্ষ মুসলিমের সমবেত কণ্ঠে বাতিলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কোন ঘোষণা হয়না, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম সম্মেলনে কোন তাপ বা উত্তাপ সৃষ্টি হয়না। আরাফার ময়দান কবরের পথযাত্রীদের বিশ্রামস্থল নয়, আরাফার ময়দান বিশ্বমুসলিমের প্যারেড গ্রাউন্ড। উকুফে আরাফাতের ফরজ হওয়ার তাৎপর্য এর মধ্যেই নিহীত রয়েছে। একটি সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ গঠনের জন্য হজ্বসহ ইসলামের স্তম্ভগুলো থেকে আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্ব লেবাস ছিড়ে ফেলে তাকওয়ার লেবাসে ঐশর্য মন্ডিত করা অপরিহার্য। সত্যিকারের হজ্বই পারে বিশ্ব মুসলিমকে জাগ্রত করতে। ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য পূরণ করতে, বিশ্বমুসলিমকে একত্ববাদের দিকে ধাবিত করতে এবং বিশ্বগ্রাসী অত্যাচারী ও শোষকদের নিপীড়নমূলক শাসন থেকে মুক্ত করে স্বাধীন বান্দাহ হিসাবে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করতে।

জেনারেল এরশাদের মার্শাল ল জারী

১৯৮১ সনের ৩০শে মে জেনারেল জিয়া চিটাগাংএ নির্মমভাবে হত্যা হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তার সংবিধান অনুযায়ী দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই হত্যার সঙ্গে সামরিক বাহিনীর কতিপয় অফিসার ও তাদের আজ্ঞাবাহী সমর্থকগণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল বিধায় আর্মির মধ্যে অনেক্য ও বিভাজনের আশঙ্কা ছিল কিন্তু সেনা প্রধান জেনারেল এরশাদ সংবিধান প্রক্রিয়া চালু রাখা নিশ্চিত করেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেন। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এ ব্যাপারে জেনারেল এরশাদ আন্তরিক ছিলেন না বা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া চালু রাখার প্রদত্ত আশ্বাসের প্রতি তিনি নিষ্ঠাবান ছিলেননা। সমস্যাবহুল এই দেশে সরকারের সমালোচনার জন্য ত্রুটি বিচ্যুতির তালিকা প্রস্তুত করতে আদৌ কষ্ট হবার কথা নয় বিশেষ করে আর্মি জেনারেলদের জন্য। সরকারের সমালোচনা করে জেনারেল ইরশাদের কিছু বিবৃতি খবরের কাগজে পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে আসতে শুরু হল। এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মহল কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে এ সব বন্ধ করার তাগিদ দিলেন। জেনারেল ইরশাদ এ সবের মোকাবিলায় তাঁর পুর্বসূরী আয়ুব ও ইয়াহিয়ার পথ অবলম্বন করলেন অর্থ্যাৎ তিনি দেশের প্রধান সেনাপতির ভূমিকায় থাকার সুযোগে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দেশটাকেই জয় করে নিলেন। এ ঘটনা ঘটল ১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চ তারিখে সমগ্র দেশে মার্শাল ল জারীর মাধ্যমে।

www.pathagar.com

দেশে মার্শাল ল জারী করার আদৌ কোন পরিস্থিতি বা প্রয়োজনীয়তা ছিলনা। সামরিক শাসনে ব্যধির নিরাময় হয়না সাময়িকভাবে মলমের প্রলেপ দেওয়া হয় মাত্র। রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে জনগণের একাংশের তাৎক্ষণিক সমর্থনের সুযোগ নিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষ রাজনীতিবিদদের স্থান দখল করেন কিন্তু পরবর্তী আমলে সামরিক শাসকগণ রাজনীতিবিদদের চাইতেও অধিক দুর্নীতিগ্রস্থ ও অত্যাচারী শাসকরূপে পরিগনিত হন। অবশ্য রাজনীতিবিদরাও এদেশে ধোয়া তুলশীর পাতা নন। সামরিক শাসকদের ষ্টাইলে তারা ক্ষমতা মসনদে যেতে পারেন না - তবে গণতন্ত্রের নামে সময়োপযোগী নিজেদেরকে বিভিন্ন লেবাছে আবৃত করে এমনকি মাথায় টুপি ও হাতে তসবিহ নিয়ে মিথ্যা আশ্বাসের জালে আবদ্ধ করে জনগণের ভোট নিয়ে অথবা খরিদ করে ক্ষমতা দখল করে চরম স্বৈরাচারী হতে পারেন বাংলাদেশে এ উদাহরণ বিরল নয়, তবে পার্থক্য এইটুকু একটি মেয়াদ অন্তে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে অপসারণের সুযোগ আসে কিন্তু সামরিক বাহিনী সমর্থিত সামরিক সরকারকে অপসারণের কোন মেয়াদ নেই। সামরিক সরকারের পবির্তনের জন্য আর একটি সামরিক অভ্যুত্থানেরই প্রয়োজন।

সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য জেনারেল এরশাদ নূতন কিছু করতে চাইলেন যা আজও পশ্চিম বঙ্গের বা ভারতের অন্য প্রদেশের বা পাকিস্তানের কোন প্রদেশে হয়নি। তিনি থানা গুলোকে প্রমোশন দিয়ে উপজেলা বানালেন, প্রতিটি উপজেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত বসালেন, সুপ্রিম কোর্টকে ভেঙ্গে পর্যায়ক্রমে ৭টি জেলা সদরে স্থানান্তর করলেন এবং তড়িঘড়ি করে ম্যাজিষ্ট্রেট, সহকারী জজ ইত্যাদি নিয়োগ করে বিচার ব্যবস্থা জনগণের দোরগোড়ায় এনে হাজির করলেন বলে দাবী করলেন। থানা পর্যায়ের নবীন আইনজিবীরা সিনিয়রদের সাহচর্য হতে এবং ম্যজিষ্ট্রেট ও সহকারী জজ গণ উচচ পর্যায়ের বিচারকদের দৈনন্দিন পরামর্শ প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। দক্ষতা সৃষ্টি ও জ্ঞান বৃদ্ধির রাস্তা রুদ্ধ হয়ে গেল এবং বিভিন্ন কারণে ও পরিবেশের চাপে সততা নিম্নগামী হল। বিভিন্ন কারণে এই ব্যবস্থা সৎ ও দক্ষ আইনজিবী ও বিচারক তৈরী করতে সক্ষম হয়নি। ব্রিটিশ ভারতে বিচার ব্যবস্থায় যে সততা ও দক্ষতা ছিল তা এখন স্বপ্ন এমনকি পাকিস্তান আমলেও উভয় শ্রেণীর মধ্যে যে সততা ও দক্ষতা ছিল তাতে যে ঘাটতি হয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। হাইকোর্ট ডিভিশন ভাগ হয়ে গেলে আমাকেও বাধ্য হয়ে মক্কেলদের স্বার্থে পুরানো ফাইলের স্তুপ নিয়ে যশোহর হাইকোট ডিভিশনে চলে আসতে হল ১৯৮২ সনের মে মাসে। দুইজন বিচারকের সমন্বয়ে ১টি ডিভিশন বেঞ্চ ও ১ জনের সিঙ্গেল বেঞ্চে যাবতীয় পুরানো ও নুতন মামলা স্বল্প সময়ের মধ্যে নিস্পত্তি করা সম্ভব ছিলনা। সামরিক প্রশাসক শুধু এটুকু দেখলেন যে আদালত ঢাকা থেকে কয়েকটি জেলা সদরে স্থানান্তরিত হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক না হলে মোকদ্দমার দ্রুত নিস্পত্তি সম্ভব নয় একথা তার চিন্তাতেও আসেনি। একটি ফাঁসির কেসের আপীলে কমপক্ষে এক সপ্তাহের প্রয়োজন, অর্থাৎ একটি ডিভিশন বেঞ্চে ফাঁসীর মামলা শুরু হলে অন্য

www.pathagar.com

কোন কেসের শুনানী হওয়া সম্ভব নয় এবং অন্য আইনজিবীরও কোন কাজ থাকে না। এছাড়া মাঝে মাঝে নূন্যতম বিচারকের সংখ্যা না থাকার কারণে শুধুমাত্র দিন পরিবর্তন ছাড়া আর কোন কাজ হতনা। রাজধানী থেকে দূরে অবস্থানের কারণে আই. ডি. এল. এর প্ল্যাটফরমে যে রাজনৈতিক কার্যক্রম সক্রীয়ভাবে চলছিল তাতে ভাটা এল। যশোহরে অবস্থানের কারণে আশেপাশের বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ সেসন কেসগুলোতে আমার নিয়োগ বৃদ্ধি পেল। যশোহর হাইকোর্টে ব্যক্তিগত কাজের চাপ কম থাকায় সময়টুকু বিভিন্ন জেলার সেসন আদালতে দেওয়া সম্ভব হল। পেশা জীবনে প্রায় ৩০ বছর পার হওয়ার পর বিভিন্ন জেলায় সেসন মোকদ্দমায় আমার চাহিদা বৃদ্ধি পেল এবং অভিজ্ঞতার এক বিশাল পুঁজি গড়তে সক্ষম হলাম। সুপ্রিম কোর্টের প্রথিতযশা আইনবিদ জনাব সিরাজুল হক, জনাব জাষ্টিস আব্দুল মালেক (অবঃ) সহ বহু শুভাকাংখী, সহকর্মী ও বিচারপ্রার্থী জনগণের সপ্রশংস দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে আমার পেশা জীবনের মান হয়ত সততা ও দক্ষতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কঠিন পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরীকতার সাথে সুষ্ঠ বিচারকার্যে সহায়তা প্রদান, ছোট বড় আইনজিবীর সবার নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ এবং সর্বোপরী আমার স্রষ্টা যিনি আমাকে জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি দিয়ে ধন্য করেছেন, প্রতিটি মুহূর্তে যিনি তাঁর দয়া ও করুণার হস্ত দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁর দরবারে কামিয়াবীর জন্য করজোড়ে নগণ্য বান্দা হিসাবে উপস্থিত হওয়া - এগুলোই হল আমার জীবনে ধাপ বয়ে উপরে উঠার চাবিকাঠি।

৩৩ বছরের জীবন সাথী সৈয়দাকে হারালাম

এই দশকের এক শোক জড়ানো রাতে আমার ৩৩ বছরের জীবন সাথী, আমার জীবনের সুখ দু:খের সহচরী স্ত্রী সৈয়দাকে আমার মাত্র ৫৫ বছর বয়সে হারিয়ে ফেললাম। ব্যাথা ভরা হৃদয়ের দাম্পত্য জীবন শুরুর দিনগুলোর উদাসীনতা, পেশা জীবন শুরুর প্রাথমিক দিনগুলির আর্থিক সীমাবদ্ধতা, সক্রীয় রাজনৈতিক ব্যস্ততার কারণে সৃষ্ট অনিচ্ছাকৃত অবহেলা, আমার ৪বার কারাজীবনের প্রবল ঝাপটা এবং মৃত্যু পূর্ব ১২ বছরের অসুস্থতা সৈয়দার উপর দিয়ে নিদারুন ভাবে প্রবাহিত হয়েছে। হয়ত সে কারণে কাছে থাকা সত্বেও তার জীবনের শেষ কথাটি শুনবার সুযোগ না দিয়ে দারুণ অভিমান নিয়ে এই নশ্বর দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল জীবনের পঞ্চাশ বছর পূর্তির পূর্বেই। যশোহরে হাইকোর্ট ডিভিশন চালু হওয়ার পর সপ্তাহে ৫ দিন সেখানে থাকতে হত এবং ২ দিন কুষ্টিয়ার বাসায় থাকতাম। সৈয়দার ইচ্ছায় যে বাড়ীটি খরিদ করা হয় সেখানেই থাকতে ভালবাসত। তাইতে যশোহরে একত্রে বসাবাস করা সম্ভব হতনা। সৈয়দার ইচ্ছা ছিল তার পছন্দের খরিদ করা বাড়ীটাকে মনের মত করে সাজানো। সৈয়দা ছিল ঘোরতর সংসারী। পশুপক্ষী পালন থেকে শুরু করে বাগবাগিচা তৈরী করায় ছিল প্রবল আগ্রহ। এসব কাজ থেকে তার মত ব্লাড প্রেশারে ১২ বছর ধরে আক্রান্ত রোগীকে থামিয়ে রাখা যায়নি। সৈয়দা ছিল একজন মনের সার্জন। দুনিয়ায় হাড়, মাংস জোড়া দেবার বহু সার্জন রয়েছে কিন্তু ভাঙ্গা মন জোড়া লাগানোর সার্জনের

www.pathagar.com

সংখ্যা খুবই কম। আমার জীবনে না চাইতেও এটা ছিল আল্লাহতায়ালার দুর্লভ দান যা সবসময় চেয়েও পাওয়া যায়না। চুম্বকের কিছু শক্তি দিয়ে আল্লাহতায়ালা নারী পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন। মনে হয় আল্লাহ মেহেরবান আমার ভাঙ্গা মন জোড়া লাগানো জন্য চুম্বকের মাত্রা কিছু বেশী করে সৈয়দার মধ্যে সপেঁ দিয়েছিলেন। হাজারো গুণের অধিকারিনী সৈয়দা নিজেকে সংসার জীবনে একটি শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। তার নামের পাশে আমার নাম জুড়ে না দিলে (বেগম সৈয়দা সা'দ) সে অসন্তুষ্ট হত। এজন্য বাড়ী ও জমির দলিলে, খাজনা ট্যাক্সের রশিদে, চিঠি পত্রের ঠিকানায় ব্যাংক একাউন্টে সর্বত্রই এই যুক্ত নাম ব্যবহৃত হয়েছে। প্রচন্ড ব্যস্ততার জীবনে কিছুক্ষণের সান্নিধ্যে, একত্রে ভ্রমণে তার চেহারার উজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেত। হজ্বের সফরে ৪০ দিনের সময় ছিল সংসারের কোলাহল থেকে মুক্ত, সন্তান সন্ততি আপনজনের আকর্ষণের বাহিরে পেশা জীবন ও রাজনীতির হৈ চৈ থেকে নির্লিপ্ত হয়ে আমাদের উভয়ের জীবনে অত্যন্ত একান্ত করে পাওয়া, অত্যন্ত আপন করে পাওয়া।

দিনের শেষে যশোহর হাইকোর্ট থেকে কুষ্টিয়া ফিরে এসে ৯ই মার্চ ৮৩ বাসায়ই ছিলাম। সন্ধ্যার পর মাগরেবের নামাজ শেষে চেম্বারে বসে প্রতিবেশী আইনজিবী বন্ধু আলি আজগরের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সৈয়দাকে দেখলাম নামাজ শেষে নিজের হাতে ফুলের গাছে পানি দিতে। বেশ কিছুক্ষণ পর কাজের মেয়েটি হঠাৎ চেম্বারে হাজির হয়ে বলল, 'আব্বা শীঘ্রি আসেন আম্মা কেমন করছে'। দৌড়ে গেলাম কামরায় দেখলাম অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে কালেমা পাঠ করছে - 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। কাছে গেলাম শরীরে হাত দিলাম কি হয়েছে জানতে চাইলাম - উত্তর না পেয়ে দৌড়ালাম ডাক্তার ডাকতে - সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার পেয়ে গেলাম - এসে দেখি মুখে কোন আওয়াজ নেই - অজ্ঞানাবস্থা - ডাক্তার ইনজেকশন পুশ করলেন - কোন সাড়া নেই - ততক্ষণে জীবন ও মৃত্যুর মালিক রাব্বুল আলামীনের দূত সৈয়দার রুহকে নিয়ে উর্দ্ধজগতে রওয়ানা হয়ে গেছে (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি স্তব্ধ, আমি দিশেহারা, আমি হতবাক - নিজের প্রতি একটাই অভিযোগ এত কাছে থেকেও আমার বন্ধুকে, আমার সাথীকে আমার, হাসি-কান্নার অংশীদারকে হাসিমুখে বিদায় জানাতে পারলাম না কেন!

১৯৫০ সনের ৩রা মার্চের রাত থেকে ১৯৮৩ সনের ৯ই মার্চ রাতের এই সময়ের ব্যবধানকে খুবই সামান্য বলে মনে হল। গোটা সময়টা যেন একটি ক্ষুদ্র ক্যাসেটে জড়ানো ছিল। দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি ছোট বড় ঘটনা চিত্রের রূপ নিয়ে স্মরণের দরজায় প্রতিফলিত হয়ে আমার ব্যাথার দরিয়ায় বাঁধ ভেঙ্গে অশ্রুর প্লাবন সৃষ্টি করল। এ অশ্রু শুধু ব্যাথার বহিঃপ্রকাশ নয়, অশ্রু ব্যাথার নিরাময়কারীও বটে। বুক ভরা ব্যাথা অশ্রু হয়ে ঝরে বুককে হালকা করে দেয়। বন্ধুবান্ধর, আপনজন, শুভাকাংখীদের সান্তনা বাক্য ব্যথিত হৃদয়ে সান্তনা দিতে সহায়তা করে। শোকের বাড়ীতে উপচে পড়া ভীড়ের মধ্যে সবার মুখে সৈয়দার জীবনের বিভিন্ন গুনাবলীর

www.pathagar.com

উচচারণ হচেছ শুনতে পাচিছ। সৈয়দা ছিল খোদাভীরু, নামাজী, ছিল দানশীলা, পরোপকারী, তার বিশেষ গুণ ছিল আসন্ন সন্তান প্রসবা নারীর কাছে ছুটে যাওয়া ও প্রসবে সাহায্য করা, এ বিষয়ে কিছু ধাত্রীবিদ্যার জ্ঞানও আয়ত্ব করেছিল। তার পছন্দের বাড়ীর সম্মুখের অংশ থেকে ধর্মীয় ও মানবকল্যান কাজের জন্য ৮ কাঠা জমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে দান করে যায় যার মূল্য আজ কমপক্ষে ২৪ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশে একমাত্র কুষ্টিয়া শহরে দানকৃত জমির উপর ইসলামিক ফাউন্ডেশন সরকারী ভবন তৈরী করে যাবতীয় কার্য পরিচালনা করছে। অনেক অভাবগ্রস্থ মেয়েকে বড় করে সৈয়দা তাদের বিয়ে দিয়েছে। অনেক বৃদ্ধা, বিধবা, ও অনাথদের মাতা ছিল সৈয়দা যাদের জন্য তার সাহায্যের হাত খোলা থাকত। সৈয়দা সম্পর্কে ১৯৭৩ সনের ১১ই ডিসেম্বর দীর্ঘ কারাজীবনের অবসানে মুক্তির পর যশোহর কারাগার থেকে একসঙ্গে রিক্সায় চড়ে আসাকালীন সময়ে যে চিত্র একেছিলাম আজও সাক্ষ্য দিচিছ সেটাই ছিল আসলচিত্র যার রং এখনও ওজ্বল্যে ভরপুর - সেদিন লিখেছিলাম "গাড়ী এগোচেছ যাত্রী আমরা দু'জন। সৈয়দার ডান হাত আমার বাম হাটুর উপর, চরম ক্লান্তি অথচ পরম নির্ভরতার চিহ্ন পরিস্ফুট। চেয়ে আছি সৈয়দার দিকে - মুখে ক্লান্তির ছাপ, পৌনে সাতশ দিনের নিরাপত্তাহীন জীবন, দারিদ্র ও অবহেলা আয়ুর গতিকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। জীবনের এই খাতটুকুতে যতটা শলিতা বরাদ্দ ছিল তার চাইতে পুড়েছে বেশী। সহজ সরল প্রৌঢ়ত্বের ছাপ ঢাকবার কোন প্রচেষ্টা নেই। দৃষ্টি দিলাম সৈয়দার মনের গভীরে। প্রেম, ভালবাসা, করুণায় ভরা একটি উজ্জ্বল মন, সেবার প্রকৃতি দিয়ে গড়া নিবেদিত একটি প্রাণ, সুখ ও দুঃখের অংশীদার এক সহযাত্রী, লাভের অংশ কমায় ব্যস্ত নয়, লোকসানের বোঝা টানতে সদা ব্যগ্র। এই আমার পরিবারিক জীবনের ভিত্তি"।

জীবন বহমান - একটি বহতা নদীর মত। স্রোত আছেত জীবন আছে নইলে জীবন নেই। শোক, মৃত্যু, জরা, ব্যাধিতে জীবন নদীতে যে পলি জমা হয়, জীবনের দায়িত্ব বোধ, সমাজের কাছে অঙ্গীকার, বেঁচে থাকার জন্য উপজিবীকা তালাশের বাধ্য বাধকতা সবই জীবন নদীতে স্রোতের সৃষ্টি করে পলির বাঁধকে ভেঙ্গে ফেলে। ক্ষণিকের জন্য থমকে যাওয়া জীবন নদী আবার সম্মুখের দিকে নিজেই গতি সৃষ্টি করে এগিয়ে চলে। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। আমার পেশার সঙ্গে জড়ানো বহু বিচার প্রার্থীর স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা, ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী হিসাবে আমার দায়িত্ববোধ, আমার ও সৈয়দার ওয়ারিশদের প্রতি মমত্ববোধ এবং আমার জীবন প্রবাহে গতি সৃষ্টির তাগিদে শোক তাপকে পিছনে ফেলে আবার শুরু হল পথ চলা। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সৈয়দা নিজের উপর তুলে নিয়ে আভ্যন্তরীণ ঝামেলা থেকে আমাকে মুক্ত রেখেছিল। তাইতে পেশার কারণে হাইকোর্ট সহ বিভিন্ন জেলায় সফর, রাজনীতির কারণে মাঠে ময়দানে পদচারণা, কারা জীবনে দুশ্চিন্তাহীন জীবন যাপন ও রাত্রে সুনিদ্রা এসবই আমার জন্য স্বাভাবিক ছিল। আমার জীবনের সবচাইতে বড় সৌভাগ্য আমার কোন কাজে বা সিদ্ধান্তে সৈয়দা কোনদিন কোন প্রশ্ন করেনি, কষ্টের

www.pathagar.com

পথকে বেছে নিবার কারনে কোন বিরক্ত বা অসহিষ্ণু মনোভাব প্রকাশ করেনি। তাইতে সৈয়দার মৃত্যুর পর অভাবটা তীব্রভাবেই অনুভূত হল। সংসার ও সন্তানদের দিকে দৃষ্টি দিতে হল। পেশার সময়টাকে সঙ্কুচিত করা সম্ভব ছিলনা তাইতে স্বাভাবিক ভাবেই রাজনীতির ময়দানে যে সময় ব্যয় হত তা থেকেই কাটছাঁট করতে হল। সমগ্র বাংলাদেশে যে পদচারণা ছিল তা কমে গেল।

মওলানা আব্দুর রহীমের নেতৃত্বে পরিচালিত আই. ডি. এল এ আমার বিদেশ সফর সহ সমগ্র বাংলাদেশে পদচারণা ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। সৈয়দার মৃত্যু ছাড়াও আরও একটি কারণে রাজনীতির ময়দানে আমার গতি শ্লথ হয়ে গেল। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে অন্ধকার যুগ পার হওয়ার পর এ দেশের ইসলামী জনতার এটাই ছিল সুচিন্তিত অভিমত যে স্বাধীনতা পূর্ব সমস্ত ইসলামী দল ও ব্যক্তির ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি মাত্র দল গঠন এবং এই দলে ইসলামী জনতার ব্যাপক অংশগ্রহণকে সহজ ও সম্ভব করার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে। এই ফলশ্রুতিতে আই. ডি. এল গড়ে উঠেছিল এবং কিভাবে এই ঐক্যবদ্ধ দলের সম্প্রসারণ ঘটেছিল তা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। মাত্র ২ বছর সাংগঠনিক তৎপরতার শেষে ১৯৭৯ সনে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে আই. ডি. এল মওলানা আব্দুর রহীম সহ ৬ জন সদস্য লাভে সমর্থ হয়। এই দলের কারণেই ১৯৭৮ সনে রাবেতা আলম আল ইসলামীর করাচী অধিবেবনে যোগদান এবং ১৯৭৯ সনে ইরান সফর সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু এদেশের ইসলামী আন্দোলনের দুর্ভাগ্য যে ১৯৭৯ সনেই এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বিরাট ধ্বস নেমে এলো। পাকিস্তান আমলের ৫/৬টি ইসলামী দলের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে তুলনামূলকভাবে জামায়াত ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং আই. ডি. এল নামে যে নুতন ইসলামী দলের জন্মলাভ হল তাতে জামায়াতের নেতা কর্মী ও সমর্থকদের সংখ্যা ছিল তিন চতুর্থাংশ। পাকিস্তান আমলের ১১০ জন সদস্যদের (রোকন) কয়েকদিন ব্যাপী অধিবেষনে আই. ডি. এল গঠনের যে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় তাতে সমর্থকদের ভূমিকায় ছিলেন ১০৪ জন এবং বিপক্ষে ছিলেন মাত্র ৬জন। এই বিপক্ষে থাকার প্রধান কারণ ছিল পুরানা দলীয় নামের প্রতি মোহ। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান আমলে প্রায় সব সময় সরকার বিরোধী ভূমিকায় থেকে ১৯৭১ এর দিনগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানে অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে কেন সামরিক শাসনকে সমর্থন করে তার পক্ষে অবশ্যই যুক্তি ছিল। ভারতের সাহায্য ও সমর্থনে স্বাধীনতার আন্দোলনে যে শৃংখলিত স্বাধীনতা আসবে যা পরবর্তীতে বিজাতীয় লৌহ বেড়ীতে এই জাতিকে আবদ্ধ করবে মূলত এই কারণেই ১৯৭১ এর আন্দোলনে জামায়ত সক্রীয় ভূমিকা রাখতে পারেনি। কিন্তু ঐ দিনগুলিতে গোয়েবলসের কায়দায় এত বেশী অপপ্রচার হয়েছে যে মিথ্যা প্রচারের আছর থেকে বাংলাদেশ গত ৩০ বছরেও মুক্ত হতে পারেনি। পুরাতন নামের আকর্ষণ কাটিয়ে নূতন নামে নূতন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে আত্মপ্রকাশ করাই ছিল সমিচীন। তাছাড়া ৫/৬টি দল মিলে ঐক্যবদ্ধ দল গঠন করলে

www.pathagar.com

নুতন নামই সবার জন্য গ্রহণযোগ্য হয়। পাকিস্তান আমলের ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী ছাত্র সংঘ, বাংলাদেশ আমলে ইসলামী ছাত্রশিবির নামে আত্মপ্রকাশ করে। লাহোর সফরকালে এদেশে আই. ডি. এল প্রতিষ্ঠার পটভূমি বিবেচনা করে মওলানা মওদুদি বলেছিলেন," নামমে কিয়া রাখখা হ্যায়, আসলি চীজত কাম হ্যায়' কাম করতে যাও'।

জামায়াতে ইসলামীর পুনরুত্থান

অধ্যাপক গোলাম আযম পাকিস্তান পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে এলেন ১৯৭৮ সনের দিকে। আমার সঙ্গে তাঁর বহু আলোচনা হয়েছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত সম্পকে। সে সময় পর্যন্ত অনেকেই যারা সরকারী আদেশে নাগরিকত্ব হারিয়েছিলেন তাদের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার হল, যারা সরকারী আদেশে পেলেন না তারা সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা করে নাগরিকত্ব পেয়ে গেলেন। আইনজিবী হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের ঐসব রায় পড়ার পর জনাব গোলাম আযম সাহেবকে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম আইন আদালতের সাহায্য নিতে। তিনি তাই করলেন তবে অনেক পরে বিরুদ্ধবাদীদের লেলিহান শীখা আরও উত্তপ্ত ও তাদের বিষাক্ত নখর আরও তীক্ষ্ণ করার পর। আই. ডি. এল. প্রতিষ্ঠার ৩ বছর পর এবং ১৯৭৯ সনের জাতীয় সংসদের নির্বাচনে আই. ডি. এলের অংশগ্রহণের পর আই. ডি. এল ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে জামায়াতের পুনরুত্থান ঘটল। তারপর স্বাভাবিক ভাবে যা হবার তাই হল। বিভিন্ন কারণে আই. ডি. এল দুর্বল হয়ে একটি সম্ভাবনাময় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন পিছিয়ে গেল এবং অন্যদিকে 'জামায়াতে ইসলামী' নামের সুযোগ নিয়ে বিরুদ্ধবাদীরা ১৯৭১ এর মিথ্যা প্রচারনার আগুনে ঘি ঢেলে দিয়ে গোয়েবলসকেও হার মানিয়ে দিল। আমাদের কিছু সংখ্যক বন্ধুদের এই পদক্ষেপ এদেশে একটি সফল ইসলামী আন্দোলনকে কিছুদিনের জন্য হলেও পিছিয়ে দিয়েছে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে এবং আই. ডি. এল এর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনকে দুর্বল করা হয়েছে কিনা একথা আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও চিন্তাভাবনা করার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। দল ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে নেতা ও কর্মীদের পারস্পারিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ বিনষ্ট হয় এবং অবিশ্বাস ও সন্দেহ ঝড়ো হাওয়ার মত উড়ে এসে শূন্যস্থান পূরণ করে নেয়। স্বাভাবিক কারণেই আই. ডি. এল থেকে পৃথক হয়ে জামায়াতের পুনর্জীবনকে মেনে নিতে না পারায় মওলানা আব্দুর রহীমের নেতৃত্বে আমরা অনেকেই আই. ডি. এল রয়ে গেলাম। পরবর্তীতে হাইকোর্ট ডিভিশন স্থানান্তর হওয়ায় এবং আমার রাজধানী থেকে দূরে অবস্থানের কারণে রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকটায় কিছুটা ভাটা পড়ে গেল। ১৯৮৭ সনে হাইকোর্ট ডিভিশন যশোহর থেকে ঢাকায় ফিরে যাওয়ায় এবং একই সময়ে মওলানা আব্দুর রহীম ইন্তেকাল করায় তাঁর অবর্তমানে আমাকে আই. ডি. এল এর সভাপতির দায়িত্ব কিছুদিন পালন করতে হয়েছিল কিন্তু পুনরায় হাইকোর্ট ডিভিশন

www.pathagar.com

যশোহরে পুনঃস্থানান্তরিত হওয়ায় ঢাকার বসতি উঠিয়ে নিয়ে আমাকে যশোহরে ফিরে যেতে হল। এসব বিভিন্ন কারণে রাজনৈতিক ময়দানে আমার সক্রীয়তা হ্রাস পেল। তাই বলে ইসলামী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আমার আকর্ষণ আদৌও কমেনি।

ইসলমী রাজনীতির ময়দানে উলামাদের তৎপরতা

আশির দশকেই বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির ময়দানে হাফেজ্জী হুজুর সহ কিছু সংখ্যক শ্রদ্ধেয় উলামাদের নেতৃত্বে গণভিত্তিক আন্দোলনের নূতন অধ্যায় শুরু হয়। তাওহিদী জনতার মধ্যে হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন আশানুরূপ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। কিন্তু জেহাদী কার্য্যক্রম পরিহার করে হাফেজ্জী হুজুর নির্বাচনী তৎপরতা গ্রহণ করায় এই আন্দোলনে ভোটের ফলাফলের কারনে ভাটা পড়ে। রাজনীতির ময়দানে উলামাদের পদচারণা সম্ভবত ইরানে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের জয়লাভ তাদেরকে এই পথে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু বহুদিন রাজনীতির ময়দান থেকে দূরে থাকায় এবং সেকুলার রাজনীতির নিকট ময়দানের দখল ছেড়ে দেওয়ায় তার তাওহিদী জনতাকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হননি। তাছাড়া ইরানী নেতৃত্বের পক্ষে ইসলামের দুষমনদের যেভাবে চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়েছে এ দেশে তা হয়নি। পূর্ব ও পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তাদের লেজুড় মুসলিম নামধারী রাজা, বাদশা ও শাসক, দরবারী আলেম, মুসলিম নামধারী বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজিবী সবাইকে এক কাতারে রেখে ইসলামী ইরানের নেতৃবৃন্দ আপোষহীন সংগ্রাম করেছেন যা ইসলামী বিপ্লবকে সাফল্যের দুয়ারে পৌছিয়ে দিয়েছে। জেহাদের খুনে রাঙা পথই ইরানী বিপ্লবীদেরকে সাফল্যের বুলন্দ দরওয়াজাতে পৌছে দিয়েছে। আফগানিস্তানের বীর মোজাহিদরা জেহাদের পথ ধরেই প্রাচ্যের পরাশক্তিকে নিজ দেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করেছে। বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশেই ইসলামী আন্দোলনের আযান শুনা যাচেছ যেখানে মুয়াজ্জীনরা নির্যাতিত মুসলিমদের মধ্যে জেহাদের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য গণচেতনা, গণসংগঠন, গণপ্রতিরোধ ও গণ অভ্যুত্থান সৃষ্টির প্রচেষ্টায় বিরামহীন কাজ করে চলেছেন। বাংলাদেশে উলামাদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠির এ ধরনের চেতনার উন্মেস ঘটলেও পাশাপাশি বিরাট গোষ্ঠির রাজনীতির প্রতি অনীহা, শাসকদের রাহনোমায়ী এবং শাসকদের সামান্যতম ইসলামের প্রদর্শনী মুলক কাজকে ইসলামের লেভেল লাগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি জেহাদী চেতনা সৃষ্টির পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছে।

ইসলামী আন্দোলনে তরুণ ও যুবশক্তির অভ্যুত্থান

আশির দশকে বাংলাদেশে ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্য থেকে একটি নুতন শক্তির অভ্যুত্থান হয়েছে যা এদেশে ইসলামী আন্দোলনের উজ্জল ভবিষ্যত সম্পর্কে ইঙ্গিতবহ। স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের নুতন প্রজন্মকে শাশ্বত সত্য ও ন্যায়ের দিকে আহ্বান করা এবং নৈতিক গুণাবলীর মোড়কে মানবীয় গুণাবলীর লালন ও বিকাশের জন্য তারণ্যের মেলায় এই সংগঠনের সূত্রপাত যার নাম ইসলামী ছাত্র শিবির। এই

www.pathagar.com

সমাজে যেখানে তরুণ ও যুবকদের ভীড় অসামাজিক ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপে পরিলক্ষিত হয়, যেখানে বিজাতীয় শিল্প সংস্কৃতির মাদকতায় তারা উন্মাদ হয়ে আছে, যেখানে খোদা প্রদত্ত জীবনের লক্ষ্যকে পরিহার করে মানব রচিত মতবাদের বিভ্রান্তির দরিয়ায় তারা হাবুডুবু খাচ্ছে সেখান ইঃ ছাঃ শিবির ঐশী বিধান ও নবী রসুল (দঃ) গণের শিক্ষাকে গ্রহণ করে, নিজেদের সংস্কৃতিকে আঁকড়িয়ে ধরে, সমস্ত প্রকার তাগুতি বিধানকে প্রত্যাখান করে এক ব্যতিক্রমধর্মী অভিযান পরিচালন করছে। এই অভিযান তাদের যেমন সুহৃদ জুটিয়েছে তেমনি ক্বায়েমী স্বার্থবাদীদের মধ্য থেকে লাখো দুষমনও পয়দা করেছে। শিবিরকে নির্মুল করার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে এরা বিভিন্নস্থানে শিবিরের উপর সশস্ত্র আক্রমন পরিচলনা করে তাদের প্রচার কৌশলের মাধ্যমে শিবিরকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। তবে বিরুদ্ধ পরিবেশেও বিভিন্নস্থানে আদালতের ন্যায় বিচারে তারা মুক্তি পেয়েছে। সমস্ত প্রচার উর্দ্ধে যে সত্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত তা হল ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৩৯ জন নেতা কর্মী ১৯৯০ সন পর্যন্ত এবং ১১১ জন নেতা কর্মী ২০০০ সন পর্যন্ত শাহাদত বরণ করেছে এবং হাজারো কর্মী বিরুদ্ধবাদীদের আস্ত্রের আঘাতে পঙ্গু বা জখমপ্রাপ্ত হয়েছে যা আক্রমনকারীর পরিচয় বহন করেনা, আক্রান্ত হবার সাক্ষ্য বহন করে। এসব শহীদান ও আক্রান্তদের ঝরানো রক্ত এদেশে ইসলামী আন্দোলনের দুর্গম পথকে অনেকখানি সহজতর করেছে - তাওহিদী জনতার ম্রিয়মান কণ্ঠকে সোচচার করেছে।

বাংলাদেশে সম্পদের অভাব নেই - প্রচন্ড অভাব রয়েছে সৎ ও দক্ষ মানুষের। প্রশাসন, বিচার বিভাগ, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প কলকারখানা, শিক্ষা, সম্পদ আহরণ সর্বত্রই অভাব রয়েছে নৈতিকতা সমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তির। এই দক্ষতা অর্জন ও নৈতিকতার সবক অবশ্যই ছাত্রজীবনে গ্রহণ করতে হবে এবং ছাত্রজীবনের পাঠ শেষ করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে কান্ডারী হয়ে হাল ধরতে হবে। এছাড়া দেশের মঙ্গল ও উন্নতির কোন বিকল্প নেই। উন্নত মেধা প্রদর্শন, সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা, দুর্জয় সাহসী পদক্ষেপ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বলিষ্ঠতা এসবের মাধ্যমেই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে এবং সে উদ্দেশ্যে দেশের প্রতিটি ঘর থেকে উন্নত চরিত্রের কিশোর ও যুবকদের আকৃষ্ট করারই মৌলিক কাজ হবে ইসলামী ছাত্র শিবিরের। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে শিবির কোন ধরনের রাজনীতির লালন করবে? শুধুমাত্র 'ইসলামী রাজনীতি' বললে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যথেষ্ট হবেনা। ইসলামী রাজনীতি কোন পেশা নয়, এ রাজনীতি কোন নেশা নয়, এ রাজনীতি হচেছ খালেছ ইবাদত। ইসলাম বিরোধী সংগঠনের মত ইসলামের নাম নিয়েও পেশাদারী রাজনীতি করা যায় কিন্তু সেখানে নিজেদের আরাম আয়েশের সন্ধান ছাড়া শেষ নবীর (দঃ) প্রদর্শিত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়া যায় না। এখানে ত্যাগ নেই, আপোষহীন সংগ্রাম নেই, তাইতে আল্লাহতায়ালা মদদও নেই। রাজনীতি যদি নেশা হয় তাহলে নেশাগ্রস্থরা কোনদিনই সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবেনা। রাজনীতি

www.pathagar.com

যেখানে ইবাদত সেখানে রয়েছে খুলুসিয়াত, সেখানে রয়েছে ত্যাগ, রয়েছে কোরবানী, রয়েছে মানুষের প্রতি হামদরদী ও ভালবাসা। রাজনীতি যেখানে ইবাদত সেখানে নেতা প্রভু নয়, নেতা খাদেম, আল্লাহর পথের অনুসারীদের সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ করে রাখার প্রেরণাদায়ক শক্তি। রাজনীতি যেখানে ইবাদত সেখানে কর্মীরা কেউ দাস নয়, তারা সবাই আল্লাহর পথে সন্নানিত সৈনিক, আন্দোলনের ময়দানে উজ্জল নক্ষত্র। রাজনীতি যেখানে ইবাদত সেখানে বিষয়বস্তুর চাইতে ব্যক্তি বড় নয়। ব্যক্তির গুরুত্ব অবশ্যই ছিল, আছে এবং থাকবে কিন্তু সেখানে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সবকিছু আবর্তিত হয়না, ব্যক্তির বিপর্যয়ে আন্দোলন তার গতি হারিয়ে ফেলেনা। ইবাদতের রাজনীতিতে অবশ্যই নেতা থাকবে, নেতৃত্ব থাকবে কিন্তু তা ব্যক্তির স্বার্থে ও প্রয়োজনে নয়, তা থাকবে সমষ্টির স্বার্থে, আল্লার বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য, সালাতে ইমামের রূপ নিয়ে তার অস্তিত্ব বিরাজমান থাকবে।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের এই ইবাদতের রাজনীতির অনুশীলন গ্রহণ করতে হবে ছাত্র জীবন থেকেই। ছাত্রজীবনেই এরা ঐশী গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেছে, শেরক ও তাওহিদের পার্থক্য উপলব্ধি করে সঠিক পথে পা বাড়িয়েছে এবং ছাত্রজীবনেই এসব তরুণরা সমাজে আবু লাহাব, আবু জেহেলদের সাক্ষাৎ পেয়েছে। এদের অগ্রগামী নেতা ও কর্মীরা খুনে রাঙা পথ বয়ে শাহাদাতের পেয়ালা থেকে পান করে সংগঠনকে মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে। অনেকেই অভাব, অনটন ও দারিদ্রের মাঝেও শুধুমাত্র ত্যাগ, কোরবানী ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে বিদ্যার্জনের সাথে সাথে ইবাদতের রাজনীতির সবক নিচেছ। তাইতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস এদেশের পেশার রাজনীতিকে বিদায় দিয়ে, নেশার রাজনীতিকে নির্মুল করে ইবাদতের রাজনীতি চালু করতে এসব এবং নিকট ভবিষ্যতে আগত তাজা প্রাণ কিশোর ও যুবকরাই সক্ষম হবে। মানবতার মুক্তির জন্য বর্তমান পরিস্থিতি দাবী করে দ্রুত অনুশীলন সমাপ্ত করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইবাদতের রাজনীতির নেতৃত্বে গ্রহণ করা। এ নেতৃত্বে প্রয়োজন সুস্পষ্ট ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী, দূরদর্শীতা, রাষ্ট্রনায়কের বুদ্ধিমত্তা, রাজনৈতিক দক্ষতা, আলেমের ধীশক্তি, সেনাপতির বীরত্ব ও লাখো কোটি মানুষের হৃদয় জয় করার ক্ষমতা।

দুই দশকের (১৯৭১-১৯৯০)রাজনীতির হালচাল

বিশ্বে ইসলামী আদর্শবাদের বিরুদ্ধে দুষমনদের সংখ্যা কোনদিনই কম ছিলনা। এর প্রধান কারণ ছিল ইসলামের আপোষহীন আদর্শ, যুগে যুগে খোদাদ্রোহী শক্তিদের মোকাবিলা করে, পরাভূত করে কল্যাণমূলক সমাজব্যবস্থা গড়তে হয়েছে। হেরার রোশনীই এ পথকে আলোকিত করেছে, সমাজ ব্যবস্থা কল্যাণকামী ও ইনছাফভিত্তিক করেছে। ইসলামের অগ্রগতির পথে মূলত ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিক এই ৩ শক্তি প্রবল বাধা সৃষ্ট করেছে। নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও ইসলামের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে এরা ঐক্যবদ্ধ। পরবর্তীতে শুধুমাত্র অস্ত্রের বলেই এরা ইসলামের অনুসারীদের পরাভূত করেনি বরং কুটকৌশল প্রয়োগ করে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, জাতীয়তাবাদের ধুয়া তুলে ঐক্যবদ্ধ উম্মাহর মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়েছে, অর্থ সম্পদ নারী দিয়ে ঈমান খরিদ করেছে, চাকচিক্যময় খোদাদ্রোহী বিভিন্ন আকর্ষণীয় মতবাদ সৃষ্টি করে মগজ ধোলাই করেছে, বিজাতীয় সংস্কৃতির জৌলুষে মোহগ্রস্থ করেছে এবং পরিশেষে মুসলামানকেই ইসলামের শত্রুতে পরিণত করেছে। তাইতে ইসলাম বা মুসলমানদের শত্রুদের বিভিন্ন ফ্রন্টে অবস্থান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন যদিও ইসলামের বিরুদ্ধে ছিলনা কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের কুটকৌশলের শিকার হয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত নুতন দেশের শাসকরা কার্যত ভারতের রাষ্ট্রপরিচালনার ৪ মূলনীতি গ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাওহিদী জনতার হৃদয় থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। এদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইসলামের সঙ্গে অবশ্যই সংঘর্ষশীল ছিল। তবে ভারতের শাসকরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ছদ্মাবরণে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়েছে, হিন্দুধর্মের উপর আঘাত হানেনি কিন্তু বাংলাদেশের নব্য শাসকরা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলামানদের ঈমান ও আক্বিদার উপর বার বার আঘাত হেনেছে এবং তাদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সুতরাং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি, সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য যারা শতকরা ৯০ জন।

সত্তর ও আশির দশকের বাংলাদেশের প্রায় ২০ বছরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মোটামুটি ৩ ব্যক্তির সরকার ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়েছে। শেখ মুজিব সাড়ে তিন বছর, জেনারেল জিয়া প্রায় ৪ বছর এবং জেনারেল ইরশাদ এক দশকের কিছু কম সময় ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। ৩ ব্যক্তির সরকার এজন্য বলা হচেছ যে এখানে ব্যক্তির ভূমিকাই মূখ্য ছিল - দলের ভূমিকা গৌণ, পার্লামেন্ট, বিচার বিভাগ, প্রাশাসন কোন বিভাগই তার নিজস্ব মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে গৌরবময় ভূমিকা পালন করতে পারেনি। গণতন্ত্র, পার্লামেন্টারী সরকার, মার্শাল ল, প্রেসিডেন্সিয়াল সরকার, জরুরী অবস্থার সরকার ইত্যাদির মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও চেহারা বা জৌলুষে কোন পরিবর্তন ছিলনা।

শেখ মুজিবের শাসন সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে। তাঁর দু:খজনক মৃত্যুর পর কার্যত যিনি ক্ষমতায় ছিলেন তিনি হলেন জেনারেল জিয়া। সেখ মুজিবের সময় থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ভাঙ্গন শুরু হয় তার গতি রোধ করা জেনারেল জিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়নি, দেশে পূর্নাঙ্গ শান্ত অবস্থাও সৃষ্টি হয়নি, শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন বিশৃংখলা ও অর্ন্তদ্বন্দের অবসান হয়নি, রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতির পরিবর্তন হয়নি

www.pathagar.com

কিন্তু ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অবস্থার মধ্যেও জেনারেল জিয়া যেটুকু পরিবর্তন এনেছিলেন তাতে এ দেশের মানুষের উন্মুক্ত আবহাওয়ায় শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছিল. জেনারেল জিয়া একদলীয় শাসনের পরিবর্তে বহুদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন করেন, রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতির ক্ষেত্রে ব্যাখা বিশ্লেষণের পরিবর্তন করে গণমানুষের ধর্মীয় চেতনার প্রতি তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে সজাগ করার যেটুকু সুযোগ জেনারেল জিয়া পেয়েছিলেন তাতে তার জীবনের কঠিনতম দিনে সিপাহী জনতার মিছিলের পুরোভাগে তাওহিদী জনতাই অবস্থান নিয়েছিল। জেনারেল জিয়া এদেশের তাওহিদী জনতার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কোন উপহাস করেননি। ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা জিয়ার আমলে রাজনৈতিক দল গঠন করে বাংলাদেশের তাওহিদী জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল তাদের বিরুদ্ধে দেশের অগ্রগতি রোধের কোন অভিযোগ তিনি বা তার সরকার উত্থাপন করেননি।

এর পর জেনারেল এরশাদ গণতন্ত্রের খোঁড়া সন্তানটিকে হত্যা করে দেশের ডিকটেটর হিসাবে নিজেই নিজেকে অধিষ্ঠিত করলেন। পূর্বতন সরকার সমূহের যাবতীয় ব্যর্থতা প্রকটভাবে দেখা দিল। একব্যক্তির শাসন জগদ্দল পাথরের মতে চেপে বসল। গণতান্ত্রিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত, অর্থনৈতিক দৈন্যদশা সুবিদিত, মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত, সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠা অতিত দিনের কাহিনী, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের করালগ্রাসে দেশ নিমজ্জিত, তাওহিদী জনতার ধর্মবিশ্বাস উপহাসের বস্তু এবং দেশ এক সর্বনাশা ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলল। জেনারেল এরশাদের আমলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিয়োজিত দলগুলি আন্দোলন মুখর হয়ে উঠল। ইসলামী দল গুলি ছাড়াও তাওহিদের অনুসারী ছাত্র, যুবক, উলামা, দ্বীনদার বুদ্ধিজিবীদের সমন্বয়ে গঠিত 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' সমাজ থেকে অশ্লীলতা, বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, ত্রাণকার্য্যের আবরণে বিদেশী মিশনারী ও এন. জি. ও দের অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে উঠল। ইরশাদ সরকারের পুলিশ ও পেটুয়া বাহিনীর আক্রমণে ঢাকার মতিঝিল এলাকা ছাত্র, যুবক বিশেষ করে বহু শ্রদ্ধেয় উলামাদের দেহ থেকে ঝরা রক্ত রাজপথ রঞ্জিত করে দিল।

এই নুতন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে মোকাবিলা করার জন্য জেনারেল এরশাদ বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন। দেশে দমননীতি আরও কঠোর করা হল। ইরশাদ সাহেব ধারণা করলেন বিদেশ থেকে ইসলামী বিপ্লব আমদানী করা হচ্ছে। তাইতে তিনি বর্হিবিশ্বে ইসলামী বিপ্লবী দেশ বলে পরিচিত স্থানগুলিতে সফরের উপর কড়াকড়ি আরোপ করলেন। ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ সনে ইরানের রাজধানী তেহরানে পর পর অনুষ্ঠিত দুইটি আর্ন্তজাতিক সেমিনারে আমার যোগদানের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হল। অন্যান্য নেতৃবৃন্দও একই অবস্থার সম্মুখীন হলেন। পাসপোর্ট, ভিসা, বিমানের টিকেট থাকা সত্বেও এয়ারপোর্টের বর্হিগমন বিভাগের দরজা আমাদের জন্য রূদ্ধ হল। দেশের যে সমস্ত স্থানে উরুস ও বাৎসরিক মাহফিলের নামে পীর সাহেবদের 'দরবারে' লাখো মানুষের ভীড় জমে যে সব স্থানে এরশাদ সাহেবের

www.pathagar.com

আনাগোনা বৃদ্ধি পেল। ভক্তদের দ্বারা বর্ডার পার করে বিদেশ থেকে উট এনে এসব উরুসের জৌলুস বৃদ্ধি করা হল শতগুণে। এতে এরশাদ সাহেবের প্রভাব বৃদ্ধি পেল পীর পূজারী মানুষের মধ্যে এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্রনায়কের উপস্থিতিতে পীর সাহেবদের ইজ্জত ও গুরত্ব বেড়ে গেলো অসীম। জেনারেল ইরশাদ আরও কিছু ইসলামের কাজ করলেন। ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম, শুক্রবারকে ছুটির দিন, মসজিদের জন্য বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা ইত্যাদি ঘোষণা দিয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করার পথ প্রশস্থ করলেন। ইরশাদ সাহেব আরও একটি পথ অবলম্বন করলেন ইসলামের চিহ্নিত বিরুদ্ধবাদীদের তার স্বপক্ষে আনবার জন্য। ১৯৯০ সনের আগষ্ট মাসে শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হিন্দু প্রতিনিধিদের জাতীয় সম্মেলনে তাঁর ভাষায় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে আক্রমানাত্মক বক্তব্য রাখলেন। এ জাতীয় সম্মেলন ছিল হিন্দুদের শত্রু সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার অধিকার, নিজেদের জাতীয় পর্যায়ে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ এবং তাদের নিজস্ব সমস্যাবলী সমাধানের উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে মৌলবাদ বিরোধী প্রেসিডেন্ট এরশাদের বক্তব্য অবশ্যই প্রাসঙ্গিক ছিলনা। তাঁর বক্তব্যের সারকথা ছিল তিনি মৌলবাদীদের অপছন্দ করেন, মৌলবাদীরার দেশের অগ্রগতির প্রভূত ক্ষতি করেছে, তিনি মৌলবাদীদের বাংলাদেশের মাটি থেকে পর্যায়ক্রমে নির্মূল করবেন ইত্যাদি।

বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার সিদ্ধান্তকে সরলপ্রাণ মুসলিম জনতা তাদের প্রানের দাবী এদেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের উদ্যোগ হিসাবে মনে করলেও সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে বলা হলো যে মৌলবাদকে প্রতিহত করার জন্য, মৌলবাদকে রুখবার জন্য ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হল। অর্থাৎ এদেশে হিন্দু, খৃষ্টান বা বৌদ্ধধর্ম দিয়ে মৌলবাদের ভূত তাড়ানো যাবেনা, এজন্য ইসলামকে ব্যবহার করতে হবে। অপূর্ব আবিস্কার! বিশ্ব ইতিহাসের পরিক্রমায় যারা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা ইসলাম বা অন্য কোন আদর্শিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন তারা কি শুধু ঘোষণার মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন নাকি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন?

জেনারেল এরশাদ ইসলামী মৌলবাদ বলতে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন? উনার বক্তব্য এবং জীবনদর্শন পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে উনি ইসলামকে ব্যবহার করতে চান, রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে দূরে রাখতে চান এবং ব্যক্তিগত জীবনেও ইসলামকে প্রদর্শনীর মধ্যে রাখতে চান। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বাংলাদেশের অনেক নামী দামী ফলের মধ্যে কাঠালকে জাতীয় ফল হিসাবে ঘোষণা দেন। কাঠালের মতই ইসলামকেও জাতীয় ধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে অন্ত:ত কাঠালের মতই ব্যবহার করা হয়েছে। যারা কাঠালকে জাতীয় ফল হিসাবে ঘোষণা করেছেন তারা কেউ কাঠাল খাননা, রাষ্ট্রীয় ভোজে কাঠাল পরিবেশিত হয়না, জাতীয় বা আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে কাঠালের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা করেননা তদ্রুপ তারা ইসলামকেও রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে ঘোষণা দিয়ে ইসলামের সাথে কাঠালের মত ব্যবহার করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ রাষ্ট্র

www.pathagar.com

ধর্ম করে ইসলামী জীবন বিধানের স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য যাবতীয় সার্বভৌমত্ব নির্দ্দিষ্ট করেননি, ইসলামী আইন প্রবর্তন করেননি, অনৈসলামী আইন বাতিল করেননি, কোরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন বা আদেশ বাতিল করার কোন অধিকার বিচার বিভাগ বা উচচক্ষমতা সম্পন্ন কোন পরিষদের নিকট ন্যস্ত করেননি, সুদ প্রথা বাতিল করেননি, জাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু করেননি, সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টির কোন ব্যবস্থা করেননি বা খেলাফতের আদর্শে তার সরকার পুর্নগঠনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। সুতরাং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা আল্লাহর দ্বীনের সঙ্গে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রতিটি আদর্শই কতকগুলি মৌলিক নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই সব নীতিমালার প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা আদর্শের লক্ষ্য হয়ে থাকে। ইসলামের অনুসারী মুসলিমকে অবশ্যই কিছু নীতিমালা মেনে চলতে হয়। তাকে তাওহিদ, রেসালত, আখেরাতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়শীল হতে হয়, আল্লাহর জমীনে খেলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কল্যাণকামী সমাজ গড়ার কাজে সদাসর্বদা সচেষ্টা থাকতে হয়, জুলুম ও অনাচারের সমাপ্তি ঘটিয়ে ইনছাফ ও ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠায় তৎপর থাকতে হয়, আল্লাহর দাসত্ব ও নবী (দ:) এর আনুগত্য জীবনের অপরিহার্য্য কাজ বলে গ্রহণ করতে হয় এবং জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই, ব্যক্তিগত বা সমাজবদ্ধ বা রাষ্ট্রীয় - আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ঝান্ডা ও নবী (দ:) এর নেতৃত্বকে সমুন্নত রাখতে হয়। এই মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলোকে বাদ দিয়ে বা হ্রাস করে নিজেদের খাহেশ ও প্রবৃত্তির পূজা করে নিজেদের লিবারেল মুসলিম হিসাবে স্বঘোষিত উপাধি ধারণের কোন অবকাশ নাই পানিরও মৌলিক গুণাগুণ রয়েছে। যে পরিমান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে পানির মোলিকত্ব নিহীত রয়েছে তার কোন ব্যতিক্রম আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। পানি বয়কট করে জীবন ধারণ করা যায় কিনা সেটা অন্য কথা, কিন্তু পানির প্রয়োজনে তার মৌলিকত্বকে স্বীকার করতেই হবে। ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য ধর্ম বা আদর্শ গ্রহণের অবকাশ রয়েছে কিন্তু ইসলামের নামে ইসলাম বিরোধী কোন কার্য্যকলাপের কোন অবকাশ নেই। মুসলিম নামধারী কোন ব্যক্তি ইসলাম বিরোধী বা মানবতাবিরোধী কাজ করলে তা ইসলাম হয় না। যার প্রমাণ দাউদ হায়দার, সালমান রুশদী, তাছলিমা নাছরিন প্রমুখ।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন রুখবার জন্য এরশাদের আমলে ও পরবর্তী আমলে স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তিদের প্রতি আর্তনাদের সুরে আহ্বান জানান হয় ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার। ইসলামী আদর্শ বিরোধী দলের অনেক নেতা নেতৃ প্রায়ই তাদের বক্তব্যে জাতিকে দুই ভাগে ভাগ করে মৌলবাদীদের স্বাধীনতার বিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিদের প্রতি উস্কানীমূলক বক্তব্য রাখেন। অতিতেও বাংলাদেশের সর্বোচচ শক্তিধর ব্যক্তি সাংবিধানিক ভাবে জাতিকে দুই-ভাগে বিভক্ত করেছেন। মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা-এই বিভাজনও সর্বত্রই প্রবল। যারা জাতির মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি

www.pathagar.com

করে রেখেছেন তাদের প্রশ্ন করা চলে "স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষের শক্তি কি অটুট রয়েছে?" "১৯৭১ এ যে সংখ্যায় এই শক্তি পাকিস্তানী সেনাদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন - আজ বাংলাদেশে মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কি ঐ সংখ্যায় তাঁরা ঝাপিয়ে পড়বেন?" "বাংলাদেশের মৌলবাদীরা কি বাহির থেকে আমদানী করা বিদেশী শক্তি - নাকি তারা এদেশের শতকরা ৯০ জন তাওহিদী জনতার সোচচার কণ্ঠস্বর?"

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও এ যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে ছিলনা। এ ছিল বঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তাই নিজ নিজ আদর্শ বিশ্বাস ও শিক্ষাঅনুযায়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষের শক্তি আজ এক শিবিরে - নিশ্চয়ই অবস্থান করছেন না। কেউ ১৯৭২ এর চার মূলনীতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পথে চলেছেন, কেউ মৌলবাদী দলের সদস্য বা কর্মী হিসাবে নাম লিখিয়েছেন আর কেউবা মৌলবাদী দল গঠন করে তার নেতৃত্ব দিচেছন। এদেশের মানুষ বাঙালী না বাংলাদেশী এ তর্ক আজও চলছে। আদর্শের পরিবর্তন দুনিয়ায় নুতন কোন আবিস্কার নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষের শক্তিসমূহের বহু ব্যক্তিই বিভিন্ন ইসলামী দলের নেতা ও কর্মী হিসাবে কাজ করছেন, বহু আওয়ামী লীগ, সমাজতন্ত্রী, কমুনিষ্ট ও জাতীয়তাবাদী দলের শ্রদ্ধেয় নেতা ও কর্মী ইসলামী দলের অর্ন্তভূক্ত হয়ে এদেশের জমীনে ইসলামের আওয়াজকে বুলন্দ করছেন। মাওলানা সাইদীর মাহফিলে যে লক্ষ লক্ষ জনতা দুই হাত তুলে বজ্রকণ্ঠে ইসলামী সমাজ বাস্তবায়নের পক্ষে রায় দেন তাদের মানসিক ও আদর্শগত অবস্থান ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় কোথায় ছিল? আমার নিজের জীবনেরও ১৪/১৫ বছর আওয়ামী লীগের আন্দোলন, ৬ দফার আন্দোলন ইত্যাদিতে কেটেছে। সুতরাং এটা অনস্বীকার্য যে একটি জাতির আদর্শগত অবস্থানের রূপ, রং বদলায়, ব্যক্তির জীবনেও লক্ষ্য ও আদর্শের পরিবর্তন ঘটে। ইসলামের ঘোরতর বিরোধী, কট্টর শত্রুরাও তাওহিদের নিশান বরদার হয়ে পৃথিবীর বুকে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। আজকের বিশ্বেও দেশের নাম বদলায়, পতাকা, জাতীয় সঙ্গীতে পরিবর্তন আসে এ উদাহরণ বিরল নয়।

দুঃশাসনের এক ইতিহাস রচনা করে, দুর্নীতি ও অনাচারের কালিমা মাথায় নিয়ে, বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য দল সমূহের যৌথ আন্দোলনের নির্মম আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে জেনারেল এরশাদ অত্যন্ত কলঙ্কজনক ভাবে মসনদ ছাড়তে বাধ্য হলেন কিন্তু মসনদ ছেড়েও স্বাধীন জীবনে ফিরে যেতে পারলেন না বা বিরোধী দলের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারলেন না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্টে তার স্থান নির্দ্দিষ্ট হল অন্ত:ত কয়েক হাজার দিনের জন্য।

আল্লামা আব্দুর রহিম (রহ:) এর জীবন প্রদীপ নিভে গেল

ঘটনাবহুল আশির দশকের কথাগুলি লিখতে গিয়ে স্মৃতির ভান্ডারে সদা জাগ্রত এক মর্দে মোমেনের জীবন, জীবনের অবদান, আমাদের সবার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণের ব্যথাভরা কাহিনী পৌনে এক শতাব্দীর এই ইতিহাসে অবশ্যই স্থান পাবে। ১লা অক্টোবর ১৯৮৭ সন।

www.pathagar.com

আল্লামা আব্দুর রহিম এই দিনটিতে আমাদের অনেককেই ডেকেছিলেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। এ দেশের সমস্ত জেলা থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মীরা রাজধানীতে দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন এই দিনে বাদ আছর অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণের জন্য। কারও জানা ছিলনা এই মর্দে মোমিনের জীবন প্রদীপ পূর্ব দিন থেকে হায়াত ও মওতের মাঝে দোদুল্যমান ছিল। মুষ্টিমেয় আপনজন ও নিকটবর্তী শুভাকাংখী ছাড়া আর কারও জানা ছিলনা তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে রাজধানী ঢাকা শহরের এক আরোগ্য নিকেতনে ভর্ত্তি হন এবং মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যেই তিনি আল্লাহতায়ালার নির্দ্ধারিত মওতের চরম মুহূর্তের সম্মুখীন হন (ইন্নালিল্লাহ .....) তাঁর আহ্বানে আমরা আলোচনা বৈঠকে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি বটে তবে তাঁর নির্দ্ধারিত দিনেই আমরা তার জানাজায় ও জীবনের শেষ সফরে শরীক হয়েছি।

এই ক্ষণজন্মা মর্দে মোমিন ছিলেন এদেশে ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সবার উস্তাদ আল্লামা মুহাঃ আব্দুর রহিম যিনি কলমের জেহাদ করে আছমানের নীচে ২০ কোটি বাংলাভাষী মানুষের ইসলামী জীবন বিধান বুঝবার জন্য সাহিত্যের এক বিশাল ভান্ডার সৃষ্টি করে গেছেন যা যুগ যুগ ধরে অন্ধকারে হাতড়িয়ে চলা এ দেশের মানুষের জন্য জ্ঞানের আলো বিতরণ করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে দিয়েছিলেন ৬৯ বছরের একটি গৌরবময় জীবনের মেয়াদ। যদি বিশ্বপরিক্রমায় এ মেয়াদ খুবই ক্ষুদ্র তবুও এই সময়ের মধ্যে তাঁর কাজের পরিধি ছিল ব্যাপক, পদচারনা ছিল বিস্তৃত এলাকায় এবং সমাজ থেকে যা পেয়েছেন তার চেয়ে দিয়েছেন অনেক বেশী-শুধু এই সমাজকে নয় -আমাদের উত্তরসূরী, অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্যও রেখে গেছেন অনেক কিছু।

আল্লামা আব্দুর রহিম ছিলেন উপমহাদেশের অবিভক্ত বাংলার ইসলামী আন্দোলনে যোগদানকারী প্রথম ব্যক্তিত্ব। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনের পুরোধা, দার্শনিক,রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, গবেষক, বাংলাভাষায় ইসলামী সাহিত্যের স্রষ্টা, পার্লামেন্টারিয়ান, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ও. আই. সি) ফেকাহ একাডেমীর একমাত্র বাংলাদেশী সদস্য, তাফহীমুল কোরআন সহ প্রায় ১৪০ খানি মৌলিক ও অনুদিত গ্রন্থের লিখক। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে এক পরাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে যদিও বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন মাদ্রাসার চার দেওয়ালের মধ্যে কিন্তু হাজারো ফুল থেকে মৌমাছির মধু আহরণের ন্যায় তিনি জ্ঞান আহরণ করেছেন হাজারো ভান্ডার থেকে। এই বহুবিধ জ্ঞানের আলোকেই তিনি নিজ দেশের মানুষকে দেখেছেন, যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন, জাতির পতনের কারণ সমূহ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করেছেন, সমাজের শাসক ও শোষক শ্রেণীর দম্ভোক্তি ও নির্যাতিত মানুষের হাহাকার শুনেছেন এবং এর মধ্য থেকেই তিনি গবেষণার ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছেন ও কলমের খোরাক সংগ্রহ করেছেন।

www.pathagar.com

ঐশী জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের দারিয়াতেও অবগাহন করেছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে কোন জ্ঞানটি সত্য এবং বিশ্বমানবতার জন্য কল্যানকামী? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর অনুসন্ধানই ছিল তাঁর আজীবন সাধনা। এই প্রচেষ্টাকে তিনি নাম দিয়েছিলেন 'মহাসত্যের সন্ধান' তিনি এই পথ খুজে পেয়েছিলেন এবং জীবনভর এই পথেই মানুষকে ডেকেছেন। জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তাঁর 'মহাসত্যের সন্ধান' অমূল্য গ্রন্থটি অনাগত যুগের মানুষকে এই মহাসত্যের দিকেই ডাকবে। এই গ্রন্থটিতে আল্লামা আব্দুর রহিম আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে প্রমাণ করেছেন 'যতদিন পৃথিবী জীবন বিধান ইসলামকে যথাযথভাবে অবলম্বন না করবে, ততদিন এখানে শান্তি ও স্বস্তি অকল্পনীয় হয়ে থাকবে এবং মানুষের জীবন তাৎপর্যহীন হয়ে কালের স্রোত প্রবাহের ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও চুর্ণ বিচুর্ণ হতে থাকবে"। তিনি আল্লাহর দিকে বিশ্বমানবতার প্রত্যাবর্তনের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন এবং এই পথেই মানবজীবনের সকল পর্যায়ে পুনর্গঠনকেই সর্বোত্তম ও একমাত্র ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই ভিত্তির উপর যে জীবন প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর ভাষায় তাই হচ্ছে উন্নত জীবন। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে লিখেছেন 'মানবজীবনের মৌলিক বিষয়াদির একটি স্পষ্ট ও অকাঠ্য বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছে মহান সৃষ্টিকর্তার বিশেষ অবতীর্ণ গ্রন্থ আল কোরআন। বিশ্ববাসীরা ছাড়াও যারা তা স্বীকার করতে নারাজ তারাও এই গ্রন্থে উন্নত জীবনের একটি স্পষ্ট চিত্র দেখতে পাবেন এবং তা অর্জনের উপায় ও পন্থার সঠিক ও কার্য্যকর পথনির্দেশও পাবেন এই গ্রন্থে। প্রায় ৩ দশকের প্রচেষ্টায় আল্লামা আব্দুর রহিম বাংলাভাষায় তাফহীমুল কোরআনের কয়েক হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী যে অনুবাদ এই দেশের মানুষকে উপহার দিয়েছেন তার ফলশ্রুতি স্বরুপ সার্থক রূপকার হিসাবে তিনি তাঁর 'আল কোরানের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ' নামক পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠার আরও একটি অমূল্য গ্রন্থে এই উন্নত জীবনের নীল নকসা একেছেন।

ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসাবে আল কোরআনের পরই হাদীসের স্থান। রসুলুল্লাহ (দ:) এর সমগ্রবানী ও আচরণই হাদীসে সংরক্ষিত হয়েছে। হাদীসের চর্চা ও অধ্যয়ন ছাড়া আল কোরানের উন্নত জীবনের পথের সন্ধান পাওয়া যাবে না। একশ্রেণীর শিক্ষিত ও প্রশাসনিক প্রতিপত্তিসম্পন্ন লোকদের মধ্যে হাদীসের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন ও কোথায়ও সোচচার উপেক্ষা প্রদর্শনের মনোবৃত্তি লক্ষ্য করে আল্লামা আব্দুর রহিম ৫ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে 'হাদীস সঙ্কলনের ইতিহাস' নামক প্রায় সাড়ে ছয়শত পৃষ্ঠার যে গ্রন্থটি মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন তা হাদীস সম্পর্কে যাবতীয় দ্বিধাদ্বন্দের অবসান ঘটিয়েছে। বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ১৭৩ খানি অমূল্য ও দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে ১১৫১ উদ্ধৃতি দিয়ে প্রামানিক যুক্তি ও দলিলাদির ভিত্তিতে লিখিত এই গ্রন্থটি শুধু বাংলাভাষাকেই সমৃদ্ধ করেনি বরং বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডারকেও উন্নত করেছে।

www.pathagar.com

উন্নতজীবনের এই নীল নকসাকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনে আধুনিক বিশ্বের নানা মত ও পথ যা মানুষকে আলকোরানের শাশ্বত জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে তারও স্বরূপ উদঘাটন করেছেন আধনিক জ্ঞান, তথ্য ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই। পাশ্চাত্য সভ্যতার ৩টি মৌলিক চিন্তাধারা যথা ডারউনের বিবর্তনবাদ কার্লমার্কসের কমিউনিজম এবং ফ্রয়েডের মনঃস্তত্বকে গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়নের পর তিনি অত্যন্ত সাহসিকতা ও নিপুনতার সঙ্গে প্রমাণ করেছেন ডারউইনের মতবাদ আল্লাহতালার অস্তিতের প্রচন্ড অস্বীকৃতি, কার্লমার্কসের মত রেসালাতের অস্বীকৃতি এবং ফ্রয়েডের মনঃস্তত্ব নৈতিক চরিত্রের ইসলামী ধ্যান ধারনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ডারউইনের বিবর্তনবাদ, মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও ফ্রয়েডের অচেতনবাদে প্রত্যয় রেখে ইসলামে বিশ্বাস করা ও বিধি বিধান পালন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই নীতিগত ও আদর্শগত ভাবে ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এই মতবাদ তিনটির ভিত্তিহীনতা যুক্তির ভিত্তিতে প্রমাণ করার জন্য তার ক্ষুরধার লেখনী চালিয়েছেন। একই সঙ্গে ইসলামের সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের উপর তাঁর লিখিত কয়েক ডজন গ্রন্থরাজী ও অসংখ্য প্রবন্ধ একদিকে যেমন উন্নত জীবনের পথ পরিক্রমা সহজ করে দিয়েছে, অন্য দিকে এ পথের ধারে ধারে, বাঁকে বাঁকে, চড়াই উৎরায়ে যে সমস্ত বাতিল শক্তিদের অবস্থান এবং যারা সত্য পথের পথিকদের পদস্খলন ঘটাতে চায় তাদের মুখোস উম্মোচন করেছেন।

আল্লামা আব্দুর রহীম চেয়েছিলেন মহাসত্যের সন্ধান পেয়ে আলকোরানের আলোকে যারা উন্নতজীবন গড়তে আগ্রহী তারা একটি বিশেষ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্ত মিথ্যা ও তাগুতি শক্তির জালকে ছিন্নভিন্ন করে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। আল্লামা তাঁর অপূর্ব কীর্তি প্রায় ৬০০ পৃষ্টার 'ইসলামে জিহাদ' গ্রন্থে এই কর্মপদ্ধতির দিকেই সত্যের অনুসারীদের আহ্বান জানিয়েছেন। আল্ কোরআন ও রাসুল (দঃ) এর সুন্নার আলোকে জেহাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে আলোচনা করে লিখেছেন কোরআনী সমাজ প্রতিষ্ঠায় জিহাদ হচ্ছে একটি অব্যাহত ও সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা। ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রকেই এই জিহাদে লিপ্ত হতে হয়। এই জিহাদে আন্তরিকভাবে লিপ্ত না হয়ে কোন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে ঈমানদার হয়ে থাকাই সম্ভবপর হতে পারেনা। জিহাদ হচ্ছে ঈমানের ঐকান্তিক তাগিদ, জিহাদ হচ্ছে ইসলামী জীবনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য, সর্বোচচ ধাপ।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকৃত চিন্তাধারার বিরুদ্ধেই শুধু আল্লামা আব্দুর রহীম সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ন হননি বরং তাঁর নিজের সমাজেই ইসলামের নামে বহু বিকৃত চিন্তাধারা, রসম ও রেওয়াজ, কুসংস্কার ও স্রষ্টার নাফরমানী মূলক শেরক্ ও বেদয়াতী কার্যকলাপ তাঁর দৃষ্টির বাহিরে ছিলনা। ইসলামের নামে বিনা মূলধনে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাজারো শোষণের চেহারা দেখে এবং বংশ পরম্পরায় এর বিস্তৃতি দেখে তিনি শুধুমাত্র শিউরিয়ে ওঠেননি বরং কোন 'ফতোয়ার' ভয় না করে ক্ষুরধার কলম চালিয়েছেন জেহাদের অঙ্গ হিসাবে।

www.pathagar.com

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় দুনিয়ার বুকে যখনই কালেমা তাইয়েবার আওয়াজকে বুলন্দ করার চেষ্টা করা হয়েছে তখনই সমাজে ৩ শ্রেণীর মানুষ বাধার পাহাড় সৃষ্টি করেছে। ক) ক্ষমতাসীন মহল খ) অর্থনৈতিক শোষকের দল এবং গ) ধর্মব্যবসায়ী মহল। কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাকে তিনি ভিক্ষার মন্ত্র হিসাবে বা সকাল সন্ধ্যায় শুধুমাত্র তসবীর দানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে রাজী ছিলেন না। এই কালেমা হচ্ছে 'প্রথমত একটি বিপ্লবী আকিদা ও বিশ্বাস, চিন্তা ও মতবাদ মাত্র। দ্বিতীয়ত স্তরে বাস্তব জীবনের আদর্শ ও চরিত্র গঠনের মৌলিক মানদন্ড, তৃতীয় স্তরে ইসলামী আন্দোলনের মূল দাওয়াত, গণসংগঠন ও সমাজ সংগঠনের হাতিয়ার এবং চতুর্থ স্তরে এই কালেমা একটি বিপ্লব, একটি সমাজের ভিত্তি, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা, সরকারী নীতি নির্দ্ধারণের মূলনীতি, বৈদেশিক জাতি ও রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের মাপকাঠি'। রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর লিখিত গ্রন্থগুলিতে উপরোক্ত ২টি শক্তির শাসন ও শোষণের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন। তৃতীয় শক্তির বিরুদ্ধে ও তাঁর শানিত কলমের তলোয়ারের সাহায্যে জেহাদ করতে হয়েছে। তিনি কালেমা তাইয়েবার সহজবোধ্য অথচ বিপ্লবী ব্যাখা পেশ করে তাওহিদী আকিদায় শিরক ও বেদায়াতের অনুপ্রবেশের পথ রুদ্ধ করেছেন। আল্লামা আব্দুর রহীমের নির্ভিক সৃষ্টি 'সুন্নত ও বিদয়াত', গ্রন্থ এই তৃতীয় শক্তির হামলা থেকে ইসলামকে তার নিজস্ব গৌরবোজ্জল আসনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং গণমানুষের এই শক্তির অব্যাহত শোষণ থেকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখানোর এক বলিষ্ট পদক্ষেপ।

মুসলিম সমাজে অধ:পতন, জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অংশের নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বনের কারণ হিসাবে আল্লামা আব্দুর রহীম চিহ্নিত করেছেন রাজনীতি না করার বিদায়াতকে। তিনি প্রমাণ করেছেন রাজনীতি না করার বিদায়াত ইসলামকে এক বৈরাগ্যবাদী ধর্মে পরিণত করেছে, শুধু তাই নয়, মুসলিম সমাজের উপর ফাসেক, ফাজের ও কোরআনী জিন্দেগীর সঙ্গে সম্পর্কহীনদের কতৃত্ব ও জুলুম শোষণ চলার স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সুন্নাত ও বিদায়াত গ্রন্থে পীর মুরিদীর বিদায়াত, গদীনশীন হওয়ার বিদায়াত, কবর পূজার বিদায়াত, মৃত লোকদের নিকট সাহায্য চাওয়ার বিদায়াত, তাবিজ ও কবজ বাঁধার বিদায়াত, মিলাদ অনুষ্ঠানের বিদায়াত, কদমবুসীর বিদায়াত, পোষাক পরিচছদের বিদায়াত সহ সমাজে বহু প্রকার প্রচলিত বিদয়াতের ভয়াবহ রূপের কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং সমাজে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে সতর্ক করেছেন।

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা, তাওহিদ এই জীবন ব্যবস্থার বুনিয়াদ। এই জীবন ব্যবস্থা আল্লাহতায়ালার সার্বিক এককত্ব অনন্যতা ও নির্ভেজাল বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল। সুতরাং ইসলামী সমাজ গড়তে হলে তাওহিদকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে। শিরক এই তাওহিদী আকিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, সোজা বিপরীত দিকে এর অবস্থান। শিরককে সমূলে উৎপাটিত ও শিরকের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিকড়সহ ধ্বংস করে তাওহিদী জীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা কোরআনের লক্ষ্য।

www.pathagar.com

পাহাড়ের উচচতায় বা শৃঙ্গে আরোহনকারীকে যেমন পথের বিপরীতে গভীর খাদ ও গিরিগহ্বরকে এড়িয়ে চলতে হয় সামান্য পথ ভুললে যেমন মৃত্যু অনিবার্য তেমনি তাওহিদের পথের যাত্রীদেরকেও তাওহিদী সরল পথের বিপরীতে অবস্থিত যাবতীয় শেরক ও বেদায়াতের প্রকাশ্য ও চোরাগুপ্তা হামলাকে এড়িয়ে চলতে হয়। প্রচলিত ধারণার শেরক শুধু মাটির পুতুলকে পূজা করা নয়, মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি ছোট বড় মঞ্জিলে শেরক ও বেদায়াতের অবস্থান কি ভাবে, কত বিচিত্ররূপে তা আল্লামা আব্দুর রহীম তাঁর রচিত 'আলকোরানের আলোকে শিরক ও তাওহিদ' নামক প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার এক অনবদ্য গ্রন্থে মুসলিম জাতিকে সজাগ করে দিয়েছেন। এই গ্রন্থে তিনি আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাওগিদ এর গুরুত্ব ব্যাখায় শুধু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণেরই আশ্রয় নেননি, আলকোরআন থেকে প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত দক্ষতা ও নিপুনতার সাথে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহতায়ালা যেমন সৃষ্টিকর্তা ও মৃত্যুদাতা তেমনি তিনিই আইন ও বিধান দাতা, রিযিকদাতা ও মঙ্গলদাতা। এই গুনরাজীগুলি বিচ্ছিন্ন নয় বরং একটি অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা এবং সেই সূত্রটির নামই তাওহিদ। সুতরাং তাওহিদকে গ্রহণ করলে আল্লাহতায়ালার এই গুনরাজীর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা চলবেনা, করলে তা হবে শিরকের অর্ন্তভূক্ত।

ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ও শুধুমাত্র জীবন ব্যবস্থা। রাষ্ট্র ও সরকার এ জীবন ব্যবস্থার দুটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আলকোরআন মানুষকে শুধু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, বরং মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের জন্য দিয়েছে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা। এই নির্দেশনাতেই সুষ্ঠ প্রতিভাত হয়ে উঠেছে দেশ-কাল নির্বিশেষে মানুষের জন্য কল্যাণকর এবং গতিশীল রাষ্ট্র ও সরকারের এক অনবদ্য চিত্র। উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক আল্লামা আব্দুর রহীম ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের এ সুবিস্তৃত চিত্র একেছেন তাঁর, 'আলকোরানের রাষ্ট্র ও সরকার গ্রন্থে। ৪২০ পৃষ্ঠাব্যাপী এই অমূল্য গ্রন্থে রাষ্ট্র ও সরকারের অপরিহার্যতা, ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা, শাসক-প্রশাসকের গুনাবলী, ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ, ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট, অর্থনীতি, বৈদেশিক নীতি, সামরিক বিভাগ ইত্যাদি সহ বহু খুটিনাটি বিষয়ে পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং একই সঙ্গে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্বের বিশিষ্ট মুফাসসীর ও গবেষকদের মতামত সমূহের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইসলামী আন্দোলনের কন্টকীর্ন পথে যারা প্রচলিত রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থার রং ও রূপ বদলিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আখেরী মনজিলে পৌঁছানোর জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ তাদের জন্য এই অমুল্য গ্রন্থ একই সঙ্গে অস্ত্র ও ঢাল হিসাবে কাজে লাগবে।

আল্লামা আব্দুর রহীম ইসলামী সাহিত্যের বিশাল ভান্ডার সৃষ্টির মাধ্যমে শুধু কলমের জেহাদ করেই তাঁর দায়িত্ব পালন শেষ হয়েছে বলে আদৌ মনে করেননি। তিনি চেয়েছিলেন মাঠে ময়দানেও এই জেহাদের বিস্তৃতি ঘটাতে।

www.pathagar.com

উপমহাদেশের এই প্রান্তে তিনিই সর্বপ্রথম জামায়াতে ইসলামের আদর্শিক ভিত্তি রচনা করেন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থার অপরিহার্যতা সম্পর্কে লাখো মানুষের মনে চেতনা সৃষ্টি করেন এবং তাদেরকে কর্মী হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা সৃষ্টি করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বেশীর ভাগ সময় তিনি এদেশে জামায়তে ইসলামীল নেতৃত্ব দিয়েছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এবং ১৯৭৬ সনের আগষ্ট মাসে ৬টি ইসলামী দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে আই. ডি. এল গঠন সম্পর্কে পূর্বেই আলোচন হয়েছে। বাংলাদেশে যদিও এসব প্রচেষ্টা 'দলীয় রাজনীতি' হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল বা চিহ্নিত হয়েছিল কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে তিনি ছিলেন দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে। জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি এদেশের হক্কানী উলামা, পীর মাশায়েখ, দ্বীনদার বুদ্ধিজিবীর নেতৃত্বে কয়েকটি সমমনা দল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ১৯৮৭ সনে ৩রা মার্চ তারিখে 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন নামে একটি জেহাদী আন্দোলনের সূচনা করেন। বহুধা বিভক্ত উম্মাকে এই প্ল্যাটফরমে এনে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর জমিনে তাঁর দ্বীন ক্বায়েমে সর্বাত্মক জেহাদের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ-এটাই ছিল এই মর্দে মোমিনের জীবনের শেষ অবদান, তাঁর এই অবদান এদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বহু হক্কানী আলেম, উলামা, পীর মাশায়েখ, দ্বীনদার বুদ্ধিজিবী ও তাওহিদী জনতার মধ্যে যারা কোনদিন ইসলামী আন্দোলনের পথে পা বাড়াননি, যারা রাজনীতির ময়দান থেকে লক্ষ্য যোজন দূরে অবস্থান করেছেন, মসজিদে রাজনীতির আলোচনাই করা যাবেনা বলে সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে রেখেছেন তাদের মুখেও আজ ইসলামী শাসনতন্ত্র ক্বায়েমের দাবী ধ্বনিত হচ্ছে, তারাও পুলিশের গুলি বুটের লাথি, বেয়নেট ও লাঠির সামনে বুক পেতে দিচ্ছেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্র, খোদদ্রোহী শক্তিদের মোকাবিলা করছেন নূতন প্রজ্বলিত ঈমানী শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে।

আল্লাম আব্দুর রহীম সাংগঠনিক শৃংখলার প্রয়োজনে দলীয় রাজনীতি করলেও তিনি সব সময় দলের উর্দ্ধে ছিলেন। বিশ্বের যে কোন প্রান্তে ইসলামী আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেছেন এবং আন্দোলনের সাফল্যে মোবারকবাদ পাঠিয়েছে। মাযহাবী ফের্কাগত চিন্তাধারার মধ্যে তিনি নিজেকে কখনও আবদ্ধ রাখেননি। কালেমার মূল আওয়াজের সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন তাইতে তিনি ছিলেন বিশালবক্ষ, কোন সংকীর্নতা তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করেনি। ব্যক্তিস্বার্থকে কখনও প্রাধান্য দেননি-তিনি তাওহিদী জনতার প্রাণের স্পন্দন উপলব্দি করে উম্মাহর স্বার্থকে সব সময় বড় করে দেখেছেন। এদেশে ইসলামী আন্দোলনের ভিত তিনিই গড়েছেন, লাখো কোটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তিনি আন্দোলনের প্রভাত সূর্যের লালিমা দেখেছেন কিন্তু মধ্য গগণের সূর্যরশ্মির প্রচন্ড আলো দেখে যেতে পারেননি, পূর্ণ বিজয়ের মিছিলে শরীক হতে পারেননি যদিও মিছিলের সূচনা তিনিই করে গেছেন। তবুও কোটি কণ্ঠে একথা ধ্বনিত হবে, এই ক্ষণজন্মা মর্দে মোমিনের জীবন ছিল সাফল্যে ভরপুর।

www.pathagar.com

দ্বীনের সেবায় তিনি ছিলেন একই সঙ্গে দরবেশ ও মোজাহিদ, জ্ঞানের রাজ্যে চির নির্ভিক সৈনিক আর প্রচন্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মহান মানুষটি ছিলেন সর্বপ্রকার গৌরব, অহঙ্কার ও রিয়া থেকে মুক্ত। মৃত্যু তাকে করেছে আরো মহিয়ান, গরিয়ান, তাঁর কর্মজীবন এবং তাঁর জীবনের অবদান, তাঁর স্মৃতি আমাদের কাছে এবং ইসলামী আন্দোলনের দুর্গম পথে চলা সবার জন্য হয়ে থাকবে চির প্রেরণার উৎস।

অধ্যায় -১৮

বাংলাদেশের নারী সমাজের অবস্থান

নারীর মর্যাদা কি হওয়া উচিত ছিল?

বিশ্বের প্রতিটি মানব সন্তানই সে নারী হোক বা পুরুষ হোক একজন নারীর গর্ভ থেকেই জন্মগ্রহণ করেছে। মাতৃক্রোড়ে ও শৈশবে মায়ের দুধ পান করে সবাই বড় হয়েছে। মায়ের স্নেহ আদর সন্তানের জন্য তুলনাবিহীন। সমাজে নারীর অবস্থান গর্ভধারিনী ও স্তন্যদায়িনী মাতা, প্রেম, ভালবাসা ও সহমর্মিতার সঞ্চারকারিনী স্ত্রী, নয়নের পুত্তুলী কন্যা, খেলার সাথী ভগ্নি হিসাবে এবং সে কারণে নারীর মর্যাদা দেয়া উচিত ছিল অনেক উর্দ্ধে এবং প্রয়োজনীয় মানবিক ও যাবতীয় অধিকার প্রাপ্তিতে কোন সংশয় বা দ্বন্দ সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু ইতিহাসের পাতা উল্টালে এবং বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় নারীকে অধম দাসীতে পরিণত করা হয়েছে, সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করে জীবজন্তুর ন্যায় ক্রয় বিক্রয় করা হয়েছে, পাপ পঙ্কিলতার উৎস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং নারীর অন্ত র্নিহিত গুণরাজী বিকাশের কোন সুযোগ-সুবিধা তাকে প্রদান করা হয়নি। কোন কোন সমাজ ও সভ্যতা (?) নারীকে উচ্ছৃংখলতা ও চরিত্রহীনতায় নিমজ্জিত করে পাশবিক প্রবৃত্তির ক্রীড়নকে পরিণত করেছে। বিভিন্ন সভ্যতায় নারী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী এবং নারীর প্রতি আচরণ সম্পর্কে যে সব তথ্য বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও জ্ঞানীগুণীদের বইপুস্তকে লিখা হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া আমার উদ্দেশ্যে নয়। অতীতের মত আজকের বিশ্বেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে নারী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী সুখী সমাজ গঠনে আদৌ আশাপ্রদ নয়। এসব দৃষ্টিভঙ্গী ভারসাম্যবিহীন। ইসলামের স্বর্ণযুগে আল-কোরআনের আলোকে রাসুল (দঃ) নারী পুরুষের মিলিত সমাজে যে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন বিজাতীয় সভ্যতার মিশ্রনে ও আধুনিক প্রগতি ও নারী স্বাধীনাতর মন মাতানো শ্লোগানের জোয়ারে সে সমাজব্যবস্থাও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আল্লাহ ও তার রাসুল (দঃ) এর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে মুসলিম সমাজও নানা দলে ও মতে বিভক্ত হয়ে গেছে। নারীর অধিকার কতটুকু, তার আসল পরিচয় কি, তার অবস্থান কি সম্পূর্ণ গৃহাভন্তরে নাকি প্রয়োজনে বাহিরেও পদচারণা করার অধিকার রয়েছে, মসজিদে ও ঈদগাহের জামায়াতের নামাজে যোগদানের অধিকার আছে কি, উচচশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে কিনা, চাকুরী শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যে বা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

www.pathagar.com

করেব কিনা ইত্যাদি বিষয়ে আজকের মুসলিম সমাজও বহু দলে ও মতে বিভক্ত। সমাজ সম্পর্কে লিখতে বসে এই বাস্তব বিষয়গুলি এড়িয়ে যাওয়া সঠিক হবে না বলেই নিজের পড়াশুনা ও জীবনভর চোখে যা দেখেছি, মন দিয়ে যা উপলব্ধি করেছি, মানুষের জন্য যা কল্যাণকর বলে বিবেক সায় দিয়ে তার আলোকেই এই অধ্যায় লিখবার জন্য তাগিদ অনুভব করছি।

আল কোরআনে নারী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী

আলকোরআনে নারী সম্পর্কে যে বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করা হয়েছে সেই আলোকেই রাসুল (দ:) ২৩ বছর ধরে গড়া সমাজে নারীর স্থান নির্দ্ধারণ করেছিলেন এবং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। এমন এক যুগে ও সমাজে এই অধিকার নিশ্চিত করা হল যখন বিশ্বের যে কোন সমাজে নারীর কোন অধিকারই স্বীকার করা হত না। প্রাক ইসলামী আরব সমাজে ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দুসমাজে নারীর প্রতি অবমাননা ও অমর্যাদা এবং নারী শিশুর প্রতি যে অমানবিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা হতো তা আমাদের সবার জানা। এই অন্ধকার যুগের ইতিহাসকে স্মরণে রেখে যদি মানব জীবনের সামগ্রিক মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (দ:) এর অবদানকে পর্যালোচনা করা যায় তাহলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। অতীতকে বাদ দিয়ে আমরা বর্তমান বিশ্ব সমাজের প্রেক্ষাপটেও বিষয়টি অবশ্যই বিচার করব। আধুনিক বিশ্বে সভ্যতাগর্বী মানুষের সমাজে, আধুনিক মেকী সভ্যতার পিছনে ছুটে চলা তৃতীয় বিশ্বের সমাজে প্রগতির নামে, সভ্যতার নামে নারীর প্রতি যে জুলুম বর্বরতা চলছে তা ১৪০০ বছর পূর্বে মহানবী (সা:) এর অবদানের সঙ্গে, মহানবী (সা:) প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে দেখব সত্যিকার অর্থে এটা প্রগতি কিনা, সভ্যতা কিনা।

রাসুল (দ:) বিশ্বের বুকে আল্লাহ প্রদত্ত কোরআনী বিধান কার্যকর করেছেন। সে বিধানে কোন অসম্পূর্ণতা নাই। নারী হচেছ মানব জাতির অর্দ্ধেক। দুই অর্ধেক মিলেই আল্লাহ তায়ালার অমোঘ নিয়মে মানব জাতির বংশধারা চালু রয়েছে। এই দুই অর্দ্ধেকের জন্যই আল কোরআনে ৪টি মূলনীতি বিধৃত হয়েছে। ১) নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহ'র সৃষ্টি সমান মর্যাদার অধিকারী ২) নারী ও পুরষ পরস্পর পরস্পরের প্রতিরক্ষাকারী বন্ধু, সহযোগী, জীবনে চলার পথে একান্ত নির্ভরযোগ্য সহযাত্রী ৩) নারী ও পুরুষ উভয়েরই শালীনতা বজায় রাখতে হবে, তাদের যৌন আবেদনশীল অঙ্গপ্রতঙ্গগুলো কখনও প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয় এবং ৪) বৈবাহিক জীবনের বাহিরে যে কোন প্রকার যৌন সংশ্রব অবৈধ।

নারী প্রগতিবাদীরা নারীকে কি দিয়েছে

আল কোরআনের এই মূলনীতিগুলি অস্বীকার করে বর্তমান বিশ্বের নারী প্রগতিবাদীরা সমাজ বা নারীকে কি দিয়েছে? স্রষ্টা প্রদত্ত নারীর সন্তান ধারণের দায়িত্ব থেকে কি তারা নারীকে মুক্তি দিতে পেরেছে?

www.pathagar.com

জীববিজ্ঞানের তথ্যানুসারে নারী আকৃতি, প্রকৃতি, বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মনমানসিকতার পার্থক্য ইত্যাদি অস্বীকার করে পুরুষের সাথে সমান হবার পাল্লা দিতে গিয়ে পুরুষের হৃদয়ের আসন থেকে নারীকে উৎখাত করেছে, মাতার সুউচচ আসন থেকে তাকে পদদলিত করেছে, মাতৃত্বকে মর্য্যাদাহীন করা হয়েছে, নারীর দেহ ও রূপকে বাণিজ্যিকিকরণ করা হয়েছে, অবৈধ সন্তান প্রসব, গর্ভপাত, তালাকের আধিক্য, যৌন অপরাধ, নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা এবং এইডসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ নারীকে ঘর থেকে বের করে বিশ্বের পাঁচতারা হোটেলগুলোতে ও লাখো নাইটক্লাবে তাদেরকে খেলনা ও ভোগের বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী অবাধ যৌন ও গর্ভপাতের অধিকার নিশ্চিত করে দেশে দেশে আইন প্রণয়নের জন্য জাতিসংঘের মোড়লেরা আজ পেরেশান। উন্নত চিকিৎসাবিদ্যা ও আলট্রাসনোগ্রাফীর সাহায্যে ভারত, চীন ও অন্যান্য তথাকথিত সভ্য দেশে ভ্রুণ ছেলে না মেয়ে জেনে নিয়ে প্রাক ইসলামী আরবের জাহেলিয়াতের মত আজকের এই আধনিক বিশ্বে কন্যা শিশু হত্যা করা হচেছ দুই একটি নয় - লাখে লাখে। দাম্পত্য জীবন প্রেম, ভালাবাসা ও মমতার দরিয়া নয়, অসম যুদ্ধের ঘৃণ্য ক্ষেত্র।

রাসুল প্রতিষ্ঠিত সমাজে নারী কি পেল

পক্ষান্তরে আল কোরআনের আলোকে মহানবীর (স:) প্রতিষ্ঠিত সমাজে নারী কি পেল? নারী মহিয়সীর মর্যাদা পেল, মাতার পদতলে সন্তানের নাজাত পাওয়ার আশ্রয়স্থল হল, বিবাহে মোহরানার বাধ্যতামূলক বিধান করে এবং নারীকে স্বামীর, সন্তানের, পিতামাতার ও অন্যান্য আত্মীয়দের সম্পত্তিতে ওয়ারেশ বানিয়ে নারীর অর্থনৈতিক স্বচছলতার ব্যবস্থা করা হল, নারী ও তার সন্তানের খোরপোষ ও ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত হল, পারিবারিক সাম্রাজ্যে পুরুষ প্রেসিডেন্ট আর নারী হল প্রধানমন্ত্রী, স্বামী বাহিরের জীবনে কর্মমুখর স্ত্রী সংসারে অভ্যন্তরে কর্মচঞ্চল এবং উভয় উভয়ের জন্য প্রেম, করুণা ও ভালবাসার উৎস হল। পুরুষের মত নারীর আধ্যত্মিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হল। কোরআনের শিক্ষা অনুসারে নারী পুরুষের মতই ধর্মপরায়নতা ও আধ্যত্মিকতার সর্বোচচ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। "মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।" (সুরা নাহল ৯৭)

মুসলিম নারী ইসলামী উম্মার অংশ বিশেষ এজন্য ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া ও ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষেত্রে আল কোরআন নারীকে পুরুষের অংশীদার মনে করে। আলে ইমরানের ১৯৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে "আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মে নিষ্ঠাবান নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করি না, তোমরা একে অন্যের অংশ। সুতারাং যারা হিজরত করেছে, নিজগৃহ থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের মন্দ কাজগুলো অবশ্যই দূরীভূত করব এবং অবশ্যই তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত।"

www.pathagar.com

ইবাদত, আরাধনা ও নৈতিক শিক্ষা চর্চার মাধ্যমে অর্জিত জীবনে ধারার ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের পরিপূর্ণ সমতা ঘোষণা করা হয়েছে। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীর জন্যও শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। "আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজাপালনকারী পুরুষ ও রোজাপালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহ-কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী - অবশ্যই এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। (সূরা আহযাব-৩৫)

নারীসত্ত্বার জটিলতা

একথা অবশ্যই সত্য নারীসত্ত্বা পুরুষ সত্ত্বার চেয়ে জটিল। নারীকে আল্লাহতায়ালা প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির উপযোগী একটি স্পর্শকাতর ও সূক্ষ দৈহিক কাঠামো দিয়েছেন যা পুরুষের দেহ কাঠামোর সাথে সাদৃশ্যহীন। নারীর স্নায়ুবিক ও মনঃস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থাও অত্যন্ত জটিল ও গভীর তা পুরাপুরি ভাবে প্রজনন কেন্দ্রিক। কিন্তু এই দৈহিক পার্থক্যের কারণে নারীর অধিকার অর্জনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়নি। নারী ও পুরুষের দৈহিক বিভিন্নতা কোন ক্রমেই পরিবর্তন যোগ্য নয়। পুরুষের পিতৃত্ব ও নারীর মাতৃত্ব পরিবর্তন ও হস্তান্তর যোগ্য নয়। এই কারণেই নারী ও পুরুষের কর্তব্য, দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রে বিধি বিধানের কিছু পার্থক্য রয়েছে। যেমন পুরুষ তার স্ত্রী সহ গোটা পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য দায়িত্বশীল এবং নারীর উত্তরাধিকার পুরুষের তুলনায় অর্দ্ধেক। ইসলামের বিধান অনুসারে একটি পরিবারে পুরুষ অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল আর নারী সন্তানাদি পালন, প্রাথমিক প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল বিশেষ করে সন্তানের শৈশব কালে। জন্মের পর শিশুর জন্য যে তরল, উষ্ণ, মিষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন তা পিতার কাছে নেই, স্রষ্টা মায়ের বুকেই তা ভরপুর করে দিয়েছেন। শিশুর জন্য যে কোমল স্নেহের প্রয়োজন তা মায়ের মমতাভরা বুকেই রক্ষিত রয়েছে। সন্তান পালনের জন্য যে ত্যাগের প্রয়োজন, যে রাত্রি জাগরণের কষ্ট সহ্যের প্রয়োজন, যে অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন তা মায়ের সহনশীলতার মধ্যেই নিহীত রয়েছে। চঞ্চল শিশুর নিরাপত্তার জন্য যে সর্তক ও সদাজাগ্রত দৃষ্টির প্রয়োজন তা দিয়েই স্রষ্টা মায়ের স্বভাবকে গড়েছেন। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মহানবী (সা:) নারীর এই স্বভাবজাত বৈচিত্র ও গুণাবলীকে অস্বীকার করেননি, বিকশিত করেছেন। ভবিষ্যত জীবনে চলার পথে যে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন হবে প্রতি পদে পদে তা মায়ের উপরোক্ত আচরণ ও দায়িত্বপালনের মধ্য দিয়েই শিশুর মধ্যে ক্রমবিকাশ লাভ করে। চারাগাছকে পানি, সার, রোদ্রতাপ দিয়ে বড় করা যায় সেখানে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মানব শিশু শুধু পানীয় ও খাদ্যের কারণে মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় না, তার জন্য নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন যার প্রাথমিক বিদ্যালয় হচেছ মায়ের বুক ও কোল।

www.pathagar.com

আজ বিশ্বজোড়া শিশুকে তার জন্মের পর থেকেই দুবছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানোর যে তাগিদ অনুভূত হচ্ছে তার মধ্যে রাব্বুল আলামীনের বিধানের শ্রেষ্ঠত্বের বিজয় ঘোষিত হচ্ছে। মানব শিশুকে সুস্থ, সবল, রোগমুক্ত ও বুদ্ধিমান করে গড়ে তোলার জন্য শালদুধ সহ মায়ের বুকে স্রষ্টা প্রদত্ত যে পুষ্টিকর খাদ্য সঞ্চিত রয়েছে তার সুষ্ঠু ব্যবহারের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই মায়ের উপর বর্তায়। মায়ের এই কঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য দেহ ও মনের যে সুস্থতা প্রয়োজন, অভাবমুক্ত ও স্বচ্ছল জীবন প্রয়োজন, যে নিরাপত্তার প্রয়োজন তার জিম্মাদার করা হয়েছে পিতাকে অর্থাৎ পুরুষকে। তাই আল কোরআনের দৃষ্টিতে নর ও নারী, স্ত্রী ও পুরুষ জীবন সংগ্রামে স্বামী ও স্ত্রী হিসাবে পরস্পরের সহযোগী, অত্যন্ত নিকটতম বন্ধু যেমন শরীরের পরিচ্ছদ। সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে "তারা (স্ত্রী) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা (পুরুষ) তাদের পরিচ্ছদ।" সুতরাং পারিবারিক জীবনে পুরুষ দাস নয়, নারী দাসী নয় - পারিবারিক সাম্রাজ্যে পুরুষ প্রেসিডেন্ট - নারী প্রধানমন্ত্রী। মহানবী (সা:) এর প্রতিষ্ঠিত সমাজে নারীর যে মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের (মুসলিম নরনারীর) তা অজানা রয়ে গেছে। পরাধীনতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ইসলামী রাষ্ট্রশক্তির অনুপস্থিতি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসুলের (সা:) সুস্পষ্ট ও সহীহ বিধানের উপর কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ বা ব্যক্তির মতামতের প্রাধান্য মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থানকে বিতর্কিত করে ফেলেছে। রাসুলের (সা:) সময় ইসলামী সমাজের কাঠামো তৈরী হচ্ছিল। রাসুল (সা:) এর দৃষ্টির সামনে, তাঁর নিকট থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে মুসলিম নারী সমাজ গড়ে উঠছিল। এই সমাজেই মুসলিম নারীরা সামাজিক কর্মকান্ডে সক্রীয় ভূমিকা পালন করেছেন। রাসুলের (দ:) যুগে নারীরা মসজিদে নামাজের জামায়াতে উপস্থিত হতেন যা এখনও দেখতে পাই কাবার মসজিদে, মদিনার মসজিদে (১৯৮১ ও ১৯৮৬ হজ্ব সফরে) ও আধুনিক ইরানের হাজারো স্থানে (১৯৭৯, ১৯৮০ ও ১৯৯২ ইরান সফরে)। মুসলিম নারীরা রমজানের শেষ দশদিনে মসজিদে ইত্তেকাফ করতেন, মসজিদে নববীতে সাধারণ অধিবেষণে উপস্থিত হতেন, পুরুষের সৎ কাজে আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ করতেন, মুসলিম মেয়েরা একাকী নয় স্বামী ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলে মেহমানদের অভ্যর্থনা করতেন, যুদ্ধে রাসুল (সা:) এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন, তৃষ্ণার্তকে পানি পান করাতেন, আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন, আহত ও নিহতদের মদিনায় নিয়ে আসতেন, নারীরা ঈদের জামায়াতে অংশগ্রহণ করতেন এবং খোতবার পর রাসুল (সা:) তাদের জন্য বিশেষ ওয়াজ নছিহতের ব্যবস্থা করতেন। মুসলিম কিশোরী ও উঠতি যুবতীদের রাসুল (সা:) ঈদের জামায়াতে বের হওয়ার এবং কল্যান ও মুমিনদের সমাবেশে অংশগ্রহণ করার আদেশ দিতেন; হযরত উম্মে হারাম (রা:) সমুদ্র পথে জিহাদে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শহীদ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করলে রাসুল (সা:) তাঁর জন্য দোওয়া করেন এবং পরবর্তীতে তিনি শহীদ হন। অনেক নারীরা নিজ হাতে উপার্জন করতেন এবং নানাবিধ বৈধ সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতেন।

www.pathagar.com

(এ সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ুন কুরআনুল করিম এবং সহীহ বোখারী ও মুসলিমের সুস্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে আব্দুল হালিম আবু শুককাহ রচিত গবেষণামূলক বই 'রাসূলের (সঃ) যুগে নারী স্বাধীনতা। সম্পদনা আব্দুল মান্নান তালিব, অনুবাদক - মওলানা আব্দুল মুনয়েম, অধ্যাপক ডক্টর আবুল কালাম পাটোয়ারী ও মওলানা মুনাওয়ার হোসাইন। প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫ সন, স্বত্তাধিকারী - ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশন অব স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন)।

ইসলামী ফেকাহ অনুসারে মহিলারা তাদের পছন্দমত যে কোন বৈধ কর্ম ও পেশা গ্রহণ করতে পারেন তবে শর্ত হল নারীকে নারী হিসেবেই থাকতে হবে অর্থ্যাৎ শালীন পোষাকে থাকতে হবে এবং কর্ম ও পেশা স্থানে অথবা প্রয়োজনে বাহিরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের মত যৌন আবেদন সৃষ্টিকারী কোন আচরণ করা যাবে না। এই বিধান শুধু নারীর জন্য নয় পুরুষের জন্যও। শালীন পোষাক ও সংযত আচরণ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক। সূরা নুরের ৩০ ও ৩১ নং আয়াতদ্বয়ে মুমিন নারী ও পুরুষ উভয়ের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে ও লজ্জাস্থানকে হেফাজত করতে আদেশ করা হয়েছে। পাশ্চাত্যে নারী অধিকারের নামে নগ্নতার পিছনে কি কোন যুক্তি আছে? পাশ্চাত্যের পুরুষ যদি মুখমন্ডল ছাড়া তার সমস্ত দেহ পোষাকের দ্বারা আকৃত রাখতে পারে এবং তাতে যদি কর্মক্ষমতা হ্রাস না পায় তাহলে কোন যুক্তিতে তারা নারী সমাজকে নগ্নতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে? এটা যৌন বিকৃতি ও নারীকে পণ্যদ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমানে ইরানের নারী সমাজ শালীন পোষাকে নিজেদেরকে আবৃত করে বিমান চালনা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাজে নির্ভয়ে ও নিরাপদে অংশগ্রহণ করছেন। বর্তমান নগ্নতার স্রোতে ভেসে চলা উগ্র প্রসাধনে জর্জরিত বিকারগ্রস্থ মহিলাদের জন্য ইরানী মহিলাদের শালীন পোষাক ও মার্জিত আচরণ অবশ্যই একটি অনুসরণযোগ্য উদাহরন।

রাসুল (সাঃ) এর যুগে নারীর যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল ভারসাম্যপূর্ণ, কোরআনী জিন্দেগীর সঠিক বাস্তবায়ন, কিন্তু বর্তমান মুসলিম সমাজে এই ভারসাম্য হারিয়ে দুটি পরস্পর বিরোধী ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ করে অশ্লীলতা সৃষ্টিকারী উচ্ছৃংখলতার দিকে গেছে এবং অন্যটি অতিরিক্ত বিধিনিষেধ আরোপ করে নারীকে গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ করে দিয়েছে। রসুল (সাঃ) এর শিক্ষা থেকে সরে এসে কোথায়ও লাগামহীন স্বাধীনতা এবং কোথায়ও অধিকার হরণ করে অতিরিক্ত কড়াকড়ি করার ফলে পর্দা বা হেযাব সম্পর্কে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার বদলে অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তী আমলে নুতন নুতন যুক্তির অবতারণা করে বিভিন্ন ফেতনার অজুহাতে রসুল (সাঃ) প্রদত্ত অধিকার খর্ব করা হয়েছে। এর প্রতিকারের উপায় কি? মহাগ্রন্থ আল কোরআন এ সম্পর্কে পথ নির্দেশ দিয়েছে "যদি কোন ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নিকট তা উপস্থাপিত কর (অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিধানকে অনুসরণ কর) যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনে প্রতি ঈমান এনে থাক, এটাই কল্যাণকর ও পরিনামের দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট।" (সুরা নিসা ৫৯)

www.pathagar.com

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক সচেতনতা

রাসুলের (সা:) যুগে নারীর যে অধিকার ছিল তা আজকের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন তবে নারীকে অবশ্যই তার অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। এ ব্যাপারে ইসলামী ইরানের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে। ১৯৭৯ সনে ইসলামী বিপ্লবের পরপরই ইমাম খোমেনীর (রহ:) দাওয়াতে ইরান সফর করেছিলাম। তারপর ১৯৯২ সন পর্যন্ত কয়েকবার বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সেমিনার উপলক্ষে তেহরান, কোম, ইস্পাহান, জাহেদান প্রভৃতি অঞ্চল সফর করেছি ও নারী পুরুষের উভয়ের সঙ্গে মিশেছি ও মত বিনিময় করেছি। যেখানেই গেছি নারীদের চাদরে আবৃত দেখেছি শুধু মুখমন্ডল খোলা। তারা শালীন পোষাকে সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছে। জুম্মার নামাজে তেহরানের বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের জামায়াতে ৪/৫ লক্ষ্য নারীকে সামিল হতে দেখেছি, লক্ষ লক্ষ নারীকে হিযাব পরিহিতা অবস্থায় রাজনৈতিক মিছিলে শরীক হতে দেখেছি, চাদরে আবৃত সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী প্রত্যক্ষ করেছি, হাজারো লাখো নারীকে রাজপথে হিযাব পরিহিতা অবস্থায় হাঁটতে দেখেছি, সেমিনার উপলক্ষে আয়োজিত একটি এগজিবিশন সম্পূর্ণ নারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেখেছি, বিপ্লব দিবসের সমাবেশে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের ছাড়িয়ে গেছে এবং বাতিলের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রু পরাশক্তির বিরুদ্ধে তাদের সোচচার কণ্ঠের আওয়াজ শুনেছি। ইরানের মহিয়সী নারীরা সত্যই অর্দ্ধাঙ্গিনী - অর্থ্যাৎ সক্রীয় জনসংখ্যার অর্দ্ধেক। কোথায়ও কোন অশ্লীলতা নেই, অশ্লীল ছবি বা প্রচারপত্রের প্রদর্শনী নেই, নগ্ন নারীদেহের ছবির অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই, মডেলিং এর নামে বেহায়াপনা নেই, টিভি রেডিও অশ্লীলতামুক্ত আর মনে হয় শাহের আমলের সিনেমা যেন তাওবা করে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। এসব যন্ত্র দেশ গড়ার কাজে, আদর্শ নরনারী গড়ার কাজে, মারুফ কাজের প্রসার ও মুনফার কাজের নির্মুলকরণে উৎসর্গকৃত। শহর বা কোন স্থানে এক প্রান্ত হতে প্রাপ্ত পর্যন্ত নারীর একাকী চলার পথে কোন বিঘ্ন নেই, নারী নির্যাতনের সামান্যতম আশঙ্কাও নেই। মনে হয়েছে এ যেন রসুল (সা:) এর প্রতিষ্ঠিত কোরআনী সমাজের একটি ঝিলিক। ১৯৯৬ সনে হজ্বের মওশুমে মক্কা ও মদিনার মসজিদে ও বিভিন্ন প্রান্তরে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, তুরস্ক, ইরান ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের লাখো লাখো মহিয়সী মুমিনা নারীদের উন্মুক্ত চেহারায়, শালীন পোষকা ও তেজোদৃপ্ত আচরণে নবী (সা:) এর যুগকে ফিরিয়ে আনার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হতে দেখেছি।

বাংলাদেশের জমিন আজ অশ্লীলতা ও নগ্নতার সয়লাবে ভরপুর। এদেশের সিনেমা, টিভি, রেডিও অশ্লীলতা ছড়ানোর প্রচন্ড বাহন। বাস্তবতা বর্জিত সস্তা বাজারী প্রেমের কাহিনী প্রচারের মাধ্যমে যৌন উন্মাদনা সৃষ্টিকরে নারীত্বের, মাতৃত্বের অবমাননা করা এবং পরকীয়া প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা, নারী নির্যাতন ও দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি করা ছাড়া এ দেশের সিনেমা ও টিভির পরিচালকদের আর

www.pathagar.com

কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই। এসবের বিষময় ফল নরনারী উভয়কেই ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এ দেশের এক বিতাড়িত কুখ্যাত নামধারী মুসলিম লেখিকা তাছলিমা নাছরীন তার কুৎসিত সাহিত্যে জরায়ুর স্বাধীনতা ও পুরুষের মত যেখানে সেখানে বসে মূত্র ত্যাগের স্বাধীনতা দাবী করেছিল। এদের বিরুদ্ধে নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের পাহাড় সৃষ্টি করতে হবে নবীর (সা:) আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে।

সমাজে নারীর সংখ্যা অর্দ্ধেক। এ কারণে যে কোন আন্দোলনে বা সমাজ বদলের সংগ্রামে নারীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি ছাড়া কামিয়াবী সম্ভব নয়। সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনে এমনকি আমাদের দেশের প্রচলিত ভোট যুদ্ধ অর্দ্ধেক জনসংখ্যা নারীর নিষ্ক্রিয়তা, দেশ ও দেশবাসীর সমস্যা সম্পর্কে নারীর অসচেতনতা বা অজ্ঞতা বাঞ্ছিত ফলাফল লাভের ক্ষেত্রে প্রচন্ড বাধাস্বরূপ। পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সচেতন ভূমিকা রাখতে হবে এবং এজন্যই ইসলামে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মুমিন নারীরা অনেক পিছিয়ে রয়েছে এবং আরোপিত বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার কারণে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে কোন ভূমিকাই রাখা আদৌ সম্ভব হচ্ছে না। এদেশে মসজিদ ও ঈদগাহে মুমিনা নারীদের প্রবেশ কার্যত নিষিদ্ধ গুটিকয়েক স্থান ছাড়া। একজন সাধারণ মুসলিম পুরুষ ৫২টি জুম্মার নামাজ ও ২ ঈদের খোতবার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ ও বিধিবিধান সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান লাভের সুযোগ পায় কিন্তু সাধারণ মুসলিম নারীদের সে সুযোগ কোথায়? ইরানের নারী সমাজ অত্যন্ত সচেতন যে কারণে শাহের ইরানের অশ্লীলতা ও নগ্নতাকে দূর করে হেযাব চালু করা ইসলামী বিপ্লবের নেতাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পরপরই হিযাবের আইন চালু করার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বাহক উগ্র আধুনিকতার ধ্বজাধারী কয়েক হাজার নারী অর্ধনগ্ন পোষাকে মিছিল করে নারী মুক্তি ও স্বাধীনতার আওয়াজ তোলে। কিন্তু দুনিয়া অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করল পরদিন ইসলামী সংস্কৃতির আদলে গড়া প্রায় ১০ লক্ষ হিযাব পরিহিতা নারী হিযাবের পক্ষে মিছিল করে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিতে রাজপথে নেমে এসেছে। এরপর হিযাবের আইন চালু করার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা রইল না। হিযাব ইরানী মহিলাদের গতি কমিয়ে দেয়নি বরং তাদের আরও গতিশীল করেছে, জেহাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের পথে মহিলাদের পদচারণা শুরু

বাংলাদেশের সমাজ ঘুনে ধরা, জরা ও ব্যাধিগ্রস্থ। খোদদ্রোহীতা, দুর্নীতি, শোষণ, অনাচার, জুলুম, অশ্লীলতা, পাশ্চাত্যের সেবাদাসগিরী গোটা সমাজেকে অক্টোপাশের মত জড়িয়ে ধরেছে। এর উপর নূতন মাত্রায় যোগ হয়েছে ব্যাভিচার, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, নারী পাচার, নারী কেনাবেচা এবং চারদিক থেকে ঘর ভাঙ্গার আর্তনাদ। এ সমাজকে অবশ্যই বদলাতে হবে এবং নূতন সমাজ পত্তন করে তাকে হেরার রোশনীতে আলোকিত করতে

www.pathagar.com

সুখের বিষয় এদেশের শিক্ষিতা মুসলিম কিশোরী, যুবতী ও মহিলারা সমাজ বিপ্লবের লক্ষে ইসলামী আন্দোলনের পথে পদচারণা শুরু করেছে। এ পথে পুরুষরা অনেক পথ পাড়ি দিয়ে শাহাদতের নজরানা পেশ করে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। মুসলিম মহিলাদেরকে পিছিয়ে পড়া রাস্তাটুকু ঈমানী জোশ নিয়ে অতিক্রম করতে হবে। পৌনে এক শতাব্দীর দীর্ঘকাল পার হয়ে আজ একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে আমি সেই দিনের অপেক্ষায় রয়েছি যেদিন মহিয়সী নারীরা এদেশে ইসলামী আন্দোলনে গতি বৃদ্ধি করবে। ইসলামী সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ ইমানের তেজে বলিয়ান হয়ে অশ্লীলতা ও নগ্নতা সৃষ্টিকারীদের সামনে প্রতিরোধের পাহাড় সৃষ্টি করবে এবং কোন অস্ত্র না পেলেও শুধুমাত্র ঝাঁটা ও বাড়ুনের আঘাতে নারীদেহের নগ্নচিত্র ও প্রদর্শনীগুলোকে ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দেবে। আমি সেইদিনের অপেক্ষায় রয়েছি যেদিন বখতিয়ার খিলজী, তিতুমীর, শাহজালালের পদস্পর্শে ধন্য এই বাংলার জমিনে মুসলিম নারীরা তাদের সন্তানদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করার কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে আগামী দিনে সমাজ বদলের সংগ্রামে এগিয়ে দেবে। রসুল (সাঃ) এর আদর্শে গড়া ও উদ্বুদ্ধ ইসলামী সমাজেই এই সব মহিয়সী নারী ও মায়েদের জন্ম সম্ভব - অন্য কোন সমাজে নয়।

অধ্যায়-১৯

৯০ এর দশকে দুটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম

(১) আলহাজ্ব ডাঃ মনিরুদ্দিন ট্রাষ্ট পরিচালিত হালিমা বেগম একাডেমী গত শতাব্দীর ৪ দশকের প্রথমদিকে রাজনৈতিক অঙ্গনে হাতে খড়ি নিয়ে নানা ঝড়ঝঞ্জা অতিক্রম করে ৫০ বছর পর আট দশকের শেষে এসে রাজনীতির ময়দানে আমার সক্রীয়তা কেন হ্রাস পেল তার বিভিন্ন কারণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। রাজনীতি এদেশে নির্বাচন নির্ভর। যেহেতু নির্বাচন ছাড়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া যায় না, গদিও ধরে রাখা যায় না, গদিনশীনদের উচ্ছেদ করা যায় না তাইতে নির্বাচনের জয়লাভ করাই হয় একমাত্র লক্ষ্য। এজন্য আইন ও নৈতিকতার যে কোন বেড়া ডিঙ্গানো, যে কোন পন্থা অবলম্বন করা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীরা বৈধ মনে করেন। যারা আদর্শবাদী আন্দোলন করেন বা কোন আদর্শবাদের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক রাখেন তারা এই ভোটযুদ্ধে পিছিয়ে পড়েন। কিশোর বয়স থেকে নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেছি। সাত দশকের শুরুতে শক্তি প্রয়োগের পন্থা হিসাবে লাঠি ও ইটের টুকরার ব্যবহার দেখেছি, কিন্তু স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের সমাজতন্ত্রের নামে রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সরঞ্জাম ব্যবহৃত হতে দেখেছি এবং তাদের পোষ্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও যুবকদের হাতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের প্রদর্শনী দেখেছি। বিভিন্ন দল গঠনের প্রক্রিয়ায় দলীয় নেতারা এদেশে গনতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চাইতে গনতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্রকে নিজেদের দলে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার জন্য বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার আন্দোলনে ক্ষমতাসীনদের পাশাপাশি অবস্থান করে দেড় দুই দশকের মধ্যে যারা আলাদীনের চেরাগের দৈত্যটাকে হাতে মুঠোয় আনতে সক্ষম হলেন তারা প্রায় সবাই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের আর্থিক সচ্ছলতার নিশ্চয়তা প্রদান করলেন এবং যে সমস্ত ছাত্র যুবকরা অস্ত্রের ব্যবহার শিখেছিল তারাও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসাবে অর্ন্তভূক্ত হয়ে অলিখিত সেনাবাহিনীর রূপ ধারণ করল। অর্থ ও অস্ত্রের ব্যবহার কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদ, সামাজিক সংগঠন ও পার্লামেন্টের নির্বাচন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হল। যে কোন পূর্ববর্তী নির্বাচন থেকে পরবর্তী নির্বাচনে এই দুই 'মহাশক্তির' গুনগত ও সংখ্যাগত প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি পেতে লাগল। শাসক ও বিরোধীদল উভয়ই এই দুই অস্ত্রের অধিকারী যার বিরুদ্ধে জনগনের ও কোন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ নেই। নির্বাচনী রাজনীতির জন্য যে অর্থের প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন এবং যে অস্ত্রধারী সেবকদের সার্বক্ষনিক খেদমত গ্রহণের প্রয়োজন তা পূরণ করার পথে প্রচন্ড অনীহা থাকায় রাজনীতির এই পথ আমার জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল। কিন্তু ৫০ বছর সক্রীয় রাজনীতির ময়দানে থেকে এত জেল জুলুম পাড়ি দিয়ে কারও পক্ষে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা কি সম্ভব? সমাজে রাজনীতি ও নির্বাচনটাই শেষ কথা নয় সমাজে করণীয় অনেক কাজ রয়েছে। এসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার এক পর্যায়ে নিজের নাতি ও নাতনিকে নিয়ে একদিন এক ইসলামী কিন্ডার গার্ডেনে স্কুলে গেলাম ওদের ভর্তি করানোর জন্য। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক, ছেলেমেয়েদের পোষাক, পাঠগ্রহণে একাগ্রতা, স্কুলের, ডিসিপ্লিন ও সামগ্রিক পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হলাম। মনে হল সমাজের বর্তমান প্রজন্মকে ঘুনে ধরেছে এদের দিয়ে সমাজব্যবস্থা পাল্টানো যাবেনা। কোন স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে এদেশের সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থার কোন গলদ দূর করা যাবেনা। নূতন প্রজন্মকে শৈশাবস্থা থেকে যদি গড়া না যায় তাহলে বর্তমান প্রজন্ম বিজাতীয় সংস্কৃতির খোলস পরে যে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে তাদের অপসারণ করে নূতন সমাজ গঠনের হাল ধরবে কে? মনে একটি আকাংখার উদয় হল বর্তমান অশুভ রাজনীতির ময়দান হতে দূরে থেকে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার লক্ষ্যে আমার মেধা, শ্রম, সম্পদ, অর্থ, সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা কি নিয়োজিত করতে পারিনা? নিজের শুভাকাংখীরা ছাড়াও বুদ্ধিজিবী, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার এই নূতন পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ অনেকের সঙ্গে পরামর্শ করে আমার একমাত্র সহোদর ভাই ডাক্তার সৈয়দ আহমদের মতামত নিয়ে একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে শিশুদের মধ্যে আলো ছড়ানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে 'নৈতিক ও বৈষয়িক গুনাবলীর সমন্বয়ে একদল সৎ, যোগ্যও খোদাভিরু নাগরিক সৃষ্টি করা, যারা আখেরাতের জবাবদিহীর অনুভূতি সম্পন্ন হয়ে সাফল্যের সাথে সমাজ ও বিশ্বের বুকে আলাহর হুকুম মোতাবেক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবে ও অন্যায়ের প্রতিরোধে তৎপর হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভেড়ামারা উপজেলা শহরে হাইরোড সংলগ্ন পৈত্রিক ভিটায় আমার পিতামাতার কবরের পাশে ১৪,৪০০ বর্গফুট জমি দিয়ে আমরা ২ ভাই আলহাজ্ব ডাঃ মনিরউদ্দিন ট্রাষ্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়লাম এবং ট্রাষ্টের পরিচালনায় মায়ের নামে হালিমা বেগম একাডেমী

www.pathagar.com

(ইসলামী আদর্শ স্কুল) ১৯৯১ জানুয়ারী থেকে চালু করা হল। সংগঠক ও প্রধান শিক্ষক হিসাবে পেলাম মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী ও পরবর্তী আমলে ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ ক্বারী ওমর আলি যিনি ইসলামী কিন্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষকতা করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। জমি ছাড়াও ট্রাষ্টের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করার জন্য আমরা ২ ভাই ট্রাষ্ট ফান্ডে ৫ লক্ষ টাকা দান করলাম। মাত্র ৪৯ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ১৯৯১ সনের জানুয়ারী মাসেই সমাজের একটি বিবুদ্ধে পরিবেশে নূতন ধ্যান ধারণা নিয়ে একাডেমীর পথ চলা শুরু হল। গত দশ বছরে এই একাডেমী একটি পূর্ণাঙ্গ মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্য দাড়িয়েছে প্রায় সাড়ে পাঁচশত। গত ১০ বছর বহু বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এবং শিক্ষা বিভাগের সর্বস্তরের দুর্নীতির ছোবলকে মোকাবিলা করে সমাজের প্রচন্ড বৈরিতার মধ্য দিয়ে যে বৈশিষ্ট নিয়ে একাডেমী তার অগ্রযাত্রা চালু রেখেছে তা সরকারী ও বেসরকারী মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। বৈশিষ্টগুলি নিম্নরূপ : * আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় সাধন * শিশুকাল থেকেই মাতৃভাষা বাংলা, ধর্মীয় ভাষা আরবী এবং আর্ন্তজাতিক ভাষা ইংরেজীসহ বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত শিক্ষা প্রদান * ইসলামের গৌরবজ্জল ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতির সাথে পরিচিত করা * দৈহিক ও নৈতিক উৎকর্ষ বিধানের বাস্তব প্রদক্ষেপ গ্রহন * বিনয়ী, অধ্যবসায়ী ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, * দেশেপ্রেম ও মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ করন ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ জাগ্রত করা। * পরীক্ষার ভীতি দূর করার জন্য ও প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে তোলা লক্ষে বাৎসরিক পরীক্ষায় কমপক্ষে শতকরা ৮০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ট্রাষ্ট পরিচালিত 'বেগম সৈয়দা সাদ' বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা ও নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। ট্রাষ্ট ভাইস চেয়ারম্যান সউদ আহমদের অর্থানুকুল্যে তার মরহুমা মায়ের নামে এই বৃত্তি পরীক্ষা চালু হয়েছে। ৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সরকারী উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। অমুসলিম নাগরিকদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শিশু শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অমুসলিম ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হয় এবং পৃথকভাবে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থাও রয়েছে।

সরকারী সাহায্য সহযোগিতা ও অনুদান ছাড়াই গত দশবছরে যেভাবে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে তা আল্লাহ পাকের করুণার কারণেই সম্ভব হয়েছে। আল-হপাক প্রদত্ত রেজেক দিয়েই এই প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে তাইতে নতশীরে কৃতজ্ঞতাভরা চিত্তে তাঁর উদ্দেশ্যে শোকর গুজার করি। যে সমস্ত শুভাকাংখীরা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। ত্রিতল বিশিষ্ট নির্মানাধীন একাডেমীতে বিজ্ঞান ভবন, পাঠাগার, মিলনায়তন, ছাত্রছাত্রীদের পৃথক কমনরুম সহ দেশের রাজধানীতে অবস্থিত যে কোন উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতই এখানে সবকিছুর ব্যবস্থা করা হচেছ ইনশাআল্লাহ। আর ও একটি বৈশিষ্ট্য এই প্রতিষ্ঠানের রয়েছে। আমাদের শিশুদের বড় হবার প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছরই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কোন না কোন ব্যক্তিত্বকে একাডেমীতে আনবার চেষ্টা করা হয়। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, দূতাবাস, শিল্প বাণিজ্য, সাহিত্যিক

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে উলেখ যোগ্য কোন ব্যক্তিত্ব প্রধান ও বিশেষ মেহমান হিসাবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে প্রানবন্ত করে তোলেন। তাদের উপস্থিতি ও উপদেশ শিশুদের কাঁচামনে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে যা আগামী দিনে সুযোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক হয়।

(২) রিজিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার

ভেড়ামার উপজেলা শহরে একাডেমীর ক্রমবর্দ্ধমান উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে কুষ্টিয়া শহরের বন্ধুবান্ধব ও শুভাকাংখীরা জেলা শহরে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার কথা হালকা ভাবে কখনও কখনও উলেখ করতেন। অনেকে উপজেলা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে জেলা শহরে প্রতিষ্ঠা করলে অধিকতর ভালো হতো বলে উলেখ করতেন। এসব প্রস্তাব আমার মনে দাগ কাটেনি। জেলা শহরে নুতন কিছু করা ছিল আমার সাধ্যের বাহিরে। কিন্তু আল্লাহপাক তার কোন নগন্য বান্দাকে দিয়ে যখন কোন শুভ কাজ করিয়ে নিতে চান তার জন্য পরিবেশও সৃষ্টি করেন। যা ছিল আমার জন্য অকল্পনীয়, সাধ্যের অতীত, ঘটনা পরম্পরায় সময় ও কালের পরিক্রমায় বাস্তবে পরিণত হল। আমার জীবন থেকে সৈয়দার হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী পূর্বেই লিখেছি। ব্যস্ততম পেশা জীবনে প্রায় একবছর কাল শোকতাপ তাড়িত হয়ে ব্যথাভরা দিন পাড়ি দিয়ে একাকীত্ব ঘুচানোর উদ্দেশ্যে ও বাস্তবতার প্রয়োজনে শুভাকাংখী ও স্বজনদের তাগিদে জীবন সাথী হয়ে এল এক শিক্ষয়ত্রী যার জীবনেও একাকীত্ব ঘোচানোর প্রয়োজন ছিল। নাম রিজিয়া বেগম। কিছুদিনের মধ্যেই তার উদার ও প্রশস্থ মনের পরিচয় পেলাম। পৈত্রিক সম্পত্তি ছাড়া পেশা জীবনে নিজে যা কিছু সম্পত্তি অর্জন করেছিলাম তার প্রায় সবই ছিল প্রথম স্ত্রী সৈয়দার নামে, তার মৃত্যুর পর ঐসব সম্পত্তিতে আমি ও পুত্র কন্যারা যৌথ শরীক হয়ে গেলাম। রিজিয়ার প্রস্তাব ছিল আপার (সৈয়দা) নামে যা কিছু আছে সব তার সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দিতে এবং পরে সম্ভব হলে তার মাথা গোজার জন্য ছোট্ট একটি বাসভবন তৈরী করে দিতে। রিজিয়ার প্রস্তাবে অভিভূত হলাম এবং তা গ্রহণ করে নিজের অংশসহ সৈয়দার নামীয় যাবতীয় সম্পত্তি বাসভবন সহ ৩ পুত্র ও ৪ মেয়ের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে দিলাম। পরবর্তীতে ৬ কাঠা জমি খরিদ করে কয়েক বছর ধরে রিজিয়ার নামে একটি দ্বিতল বিশিষ্ট ভবন তৈরী করে সেখানে আমরা দুজনে বসবাস শুরু করলাম। আমাদের উভয়ের একাকীত্ব কাটল বটে কিন্তু নুতন দাম্পত্য জীবনে রিজিয়ার কোল জুড়ে বা আমাদের ঘর আলো করে কোন সন্তান এলনা। আশির দশকে আমার পেশার আরও বিস্তৃতি ঘটায় এবং এদেশের কয়েকটি বিভাগের বিভিন্ন জেলায় সম্প্রসারিত হওয়ায় ও ব্যস্ততা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার রিজিয়ার জীবনেও একাকীত্ব রয়েই গেল। তাছাড়া রিজিয়া পূর্ব থেকেই অসুস্থ ছিল এবং তা দিনদিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। দেশের ভিতরে ও বাহিরে যদিও চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি কিন্তু তবুও নব্বই দশকের প্রথম দিকে রিজিয়ার মেজর অপারেশনের প্রয়োজন দেখা দিল। নিজের অসুস্থতায় আমি খুব উদ্বিগ্ন হই না।

www.pathagar.com

পিতামাতার অন্তিম সময়ে তাদের শিওরে বসে মৃত্যু দেখেছি। প্রথম স্ত্রী সৈয়দার আকস্মিক মৃত্যু দেখেছি তাইতে আপনজনের অসুস্থতায় মনের দরজায় বিষাদের আলামত গুলিই শুধু উঁকি মারে। প্রায় ২ সপ্তাহ নিজের পেশা বন্ধ করে রিজিয়ার অপারেশনের জন্য ঢাকার একটি ক্লিনিকে তাকে সঙ্গ দিলাম। অন্য একটি কারনেও আমার মনটি ছিল বিষাদে ভরা। ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক ঢাকায় অপারেশনের জন্য যাত্রার প্রাক্কালে রিজিয়ার একটি ইচছা ও অনুরোধ আমার মনে রিজিয়ার দীর্ঘ জীবন সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করল। কুষ্টিয়া থেকে রওয়ানা দেবার কয়েকদিন পূর্বে রিজিয়া তার মনের ইচছা ব্যক্ত করল। "আমার মন বলছে আমি হয়ত আর বাঁচব না-অপারেশনের ধাক্কা আমার অসুস্থ শরীরে সইবেনা তাইতে আমার নামের বাড়ীটি আমি আলাহর পথে দান করতে চাই। অপারেশন টেবিলে যাওয়ার পূর্বেই তুমি দলিল রেজিষ্টেশনের ব্যবস্থা কর"-একটি শান্ত মুহূর্তে আমার কাছে, শুধু মাত্র আমার কাছে এক মহিয়ষী নারী যে সৈয়দার এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর স্ত্রী হিসবে আমার একাকীত্ব ঘুচিয়ে ভালবাসাও করুণা দিয়ে আমার শোকতাপ প্রশমিত করেছিল এ তারই মনের অভিব্যক্তি। আমি অভিভূত হলাম যার বহি:প্রকাশ ঘটল অশ্রুফোটার মধ্য দিয়ে। বিশ্বে সন্তানহীনা নারীর সংখ্যা অনেক। মা আয়েশাও (রা:) ছিলেন সন্ত ানহীনা-কিন্তু অনেকেই 'মা' এর পরিচয় লাভে সমর্থ না হলেও শুধু নারী হিসাবেই নিজ সমাজে ও বিশ্বে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। রিজিয়া সন্তানের 'মা' এর পরিচয় পায়নি কিন্তু দানশীলা মহিলার পরিচয়ে সে সমাজ ও দেশবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাইতে সেই মুহূর্তে আমি তার মনটাকে পরীক্ষা করে উপলব্ধি করলাম সে তার নামীয় বাড়ীটি দান করে 'সাদকায়ে যারিয়া' হিসাবে অক্ষয় করে রাখতে চায়। সন্তান যদি সুসন্তান হয় এবং পিতামাতার মাগফেরাতের জন্য আলাহর দরবারে অশ্রু ঝরায় তাতে যেমন মৃত্যুর পরও তা আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয় তেমনি সৎ ও মঙ্গলজনক কাজ প্রতিষ্ঠার জন্য চিরস্থায়ী দান আল্লাহর দরবারে সাদকায়ে যারিয়া হিসাবে গন্য হয়। রিজিয়ার এই উলেখযোগ্য দানকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠা করা হল একটি ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও জনকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠান 'রিজিয়া সাদ ইসলামিক সেন্টার' যা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন কল্যানমুখী কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং হয়ত আল-াহতায়ালার করুনা লাভে সমর্থ হবে। রিজিয়ার দানকে আরও মূল্যবান করার উদ্দেশ্যে দ্বিতল ভবনকে ত্রিতলে পরিনত করা হল। দান দলিলের শর্তানুযায়ী একটি ট্রাষ্টি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কর্মসূচী নিয়ে সেন্টারের কার্যক্রম শুরু হল যথা : ১) ইসলামী জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ২) ইসলামী সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ ৩) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার ৪) শিক্ষক ও ছাত্রদের গবেষণার সুযোগ ৫) মিলনায়তনে সভা, সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান ৬) নারীর অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ৭) স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার সুযোগ ৮) লিগ্যাল এইড প্রশিক্ষন ও পরামর্শ ৯) দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প। আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসেরে কোরআন, বাগ্মী, রাজনীতিবিদ, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রভাবশালী সদস্য আল্লামা দেলওয়ার

www.pathagar.com

হোসেন সাইদী ১৯৯৭ সনের ১লা মে তারিখে এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন হাজারো কুষ্টিয়া বাসী নরনারীর উপস্থিতিতে।

গত ৪ বছরে রিজিয়া সাদ ইসলামিক সেন্টার কুষ্টিয় শহরে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে বহুমুখী জ্ঞানের প্রসার ঘটানো ও গবেষনামূলক কার্যক্রমের সহায়তার লক্ষে আলকোরআন, আলহাদিস সহ ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন, সাহাবায়ে কেরাম ও ইতিহাস স্রষ্টা মনীষীদের উপর বিভিন্ন ভাষায় লিখা মূল্যবান বই এই স্বল্প সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে। সমাজে ইসলামী বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষে দলমত নির্বিশেষে যারা নিরলশ কাজ করে যাচেছন বিশেষ করেন তরুণ ও যুবকদের মাঝে, নিজেদের পারস্পারিক মিলন ঘটানো ও বিভিন্ন প্রকার সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে মতবিনিময় ও সুধী সমাবেশের জন্য একটি কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্দি করছিলেন এই সেন্টার সেই অভাব পূরন করেছে। সেন্টারে পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয় অত্যন্ত স্বল্প খরচে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ২০০০ সনে ২০০০, এবং ২০০১ সনে ৪০০০ নারী পুরুষের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ। সেন্টারের দারিদ্র বিমোচন কেন্দ্র ইসলামী ব্যাঙ্কের পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ঋণ সেবা প্রদান করছে। আলাহতাআ'লার করুণার উপর নির্ভর করে আশা করা যায় একদশকের মধ্যে রিজিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার আত্মনির্ভরশীল হয়ে দেশের এ অঞ্চলের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও জনকল্যানমুলক কাজে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

অধ্যায়-২০

আওয়ামী লীগের পুনঃরুত্থান

বাংলাদেশের নুতন রাজনৈতিক ভূখন্ডে আওয়ামী লীগের নব্য শাসকরা সেবা, ভালবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধনে সর্বস্তরের মানুষকে না বেঁধে শুধুমাত্র ঘৃনা, আক্রোশ ও প্রতিশোধের বহ্নি জালিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল এবং সাড়ে তিন বছর লুন্ঠন, শোষণ, হত্যা ও দু:শাসন করে ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখে প্রকৃতির অমোঘ বিধানে ইতিহাসে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হল। দেশের মাটি ও মানুষের মন থেকে এই দলটি মুছে গেল। ছিটে ফোটা যে অস্তিত্বটুকু ছিল তাও ১৯৭৫ সনের ৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপবের মধ্য দিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। একই সঙ্গে বাংলাদেশের মৌলদর্শন ও রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিতে আমূল পরিবর্তন হল। হযরত শাহজালাল, খান জাহান আলি, তিতুমীর, বার আউলিয়ার দেশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এই দলের আবার পুনরুত্থান হবে এ কেউ কল্পনাও করেনি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে যে দেশপ্রেমিক বলিষ্ট নেতৃত্বের অবসান হয়ে শূন্যতা সৃষ্টি হল এবং গনতন্ত্রের শ্বাসরোধ করে জেনারেল ইরশাদের মার্শাল ল জারী করায় যে অরাজকতা

www.pathagar.com

সৃষ্টি হল সেই সুযোগ নিয়ে বাকশালের উত্তরাধীকারিরা রাজনৈতিক ময়দানে পদচারণা শুরু করল। জনগনের মতামতের প্রতি কোন তোয়াক্কা না করে জেনারেল এরশাদ প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির আবরণে দেশের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে শৃংখলাবদ্ধ করে একদলীয় শাসনে নিজের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। স্বাভাবিক ভাবেই জনসাধারণের পক্ষে এই ব্যক্তি শাসন মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বেগম জিয়ার নূতন নেতৃত্বে নূতন গতি পেল। জেনারেল জেয়ার মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা পূর্ণতা পেল বেগম জিয়ার আপোষহীন আন্দোলনের মাধ্যমে। জামায়াতে ইসলামী সহ অন্যান্য ইসলামী দল ও সেকুলার পন্থী দলগুলিও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রীয় ভূমিকা গ্রহণ করল। বাকশালের অত্যাচার, নিস্পেষন ও জুলুমের কথা বিস্মৃত হয়ে দেশের মানুষ এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে এল। এই সুযোগে ভারত সরকারের আশ্রয় পুষ্ট ভারতের মাটিতে বসবাসকারী শেখ হাছিনা সুদূরপ্রসারী এক পরিকল্পনা নিয়ে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখলেন এবং ভাঙ্গা নৌকাকে জোড়া তালি দিয়ে মুজিবকন্যা হিসাবে নৌকার হাল ধরলেন। পিতার তৈরী বাকশালের মৃত্যু ঘটল সুযোগ্য কন্যার হাতে। আওয়ামী লীগকে পুনর্জিবীত করে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে তিনিও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শেষ পর্যায়ে শরীক হলেন। জোয়ার ভাটার দেশে মানুষের মনের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি অবশ্যই সজাগ ছিলেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে সক্রীয় করার দিকেই মানুষের দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ তাইতে বাকশালের কথা সাময়িকভাবে তাদের মনে চাপা পড়ে গেল। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি শেখ হাছিনার নেতৃত্বে হারানো দিন ফিরে পাওয়ার আশায় আওয়ামী লীগ বিভিন্নমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করল সুচতুর ভাবে। হিন্দুদের বারো মাসে ১৩ পার্বনের মত আওয়ামী লীগও প্রায় সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী গান, শেখ সাহেবের উত্তেজনাকর বক্তৃতা বিবৃতি, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য, ক্যাসেটের মাধ্যমে প্রচার শুরু করল। একই সঙ্গে দেশের মানুষকে দালাল ও দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তি, এই দুই ভাগে বিভক্ত করার যাবতীয় প্রচার প্রচারণার ঝড় সৃস্টি করা হল। সরকারী যন্ত্রের মধ্যেও বাকশালী প্রেতাত্মা লুকিয়ে ছিল। তারাও আওয়ামী লীগের অদৃশ্য এজেন্ট ও কর্মী হিসাবে প্রশাসনে,সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, সরকারী প্রচার যন্ত্রে, সাংবাদিকতায় প্রায় সর্বত্রই আওয়ামী লীগের প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য সক্রীয় ভূমিকা পালন শুরু করল। এরশাদের দীর্ঘ শাসন আমলে সরকারী প্রচার যন্ত্র অনেক কিছুই প্রচার করেছে যা আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যকেই এগিয়ে দিয়েছে। এরশাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় সীমাহীন ব্যর্থতা, জনগনের ধূমায়িত অসন্তোষ, বিপর্যস্ত জনজীবনের পুঞ্জীভূত সমস্যা ঢাকা দেবার কৌশল হিসাবে প্রতি বছর বিশেষ বিশেষ দিনে ঘটা করে 'দালালদের কে কোথায়' প্রচারের নামে রেডিও, টিভি, পত্রিকা মারফত ঘৃনা ও প্রতিশোধের বহ্নিকে জিইয়ে রাখার প্রচেষ্টা চলেছে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা প্রাপ্তির বহু পরেও এবং সুপ্রিমকোর্টের হইকোর্ট ডিভিশনে আমার পক্ষে মামলা নিস্পত্তি হবার পরও আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই প্রচরণার স্বীকার।

জাতীয়তাবাদী দল, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য দলের যুগপত আন্দোলনে জেনারেল এরশাদকে বাধ্য হয়ে গদি ছাড়তে হয়। আপাতদৃষ্টিতে বাকশালের কবর দিয়ে আওয়ামী লীগ পুনরুত্থান করে শেখ হাছিনা যে কৌশল অবলম্বন করে আশির দশকে রাজনৈতকি কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাতে আওয়ামী লীগের বিধ্বস্ত গৃহটিকে জোড়াতালি দিয়ে আবার খাড়া করতে সক্ষম হন। এর উপর হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টানদের অলিখিত অভিভাবিকা হিসাবে একটি উলেখযোগ্য অংশের অমুসলিম ভোটের তিনি দাবীদার ছিলেন। এই অংশটি ভারত মুখী ও ইসলাম বিদ্বেষী, তারা হাছিনা ও আওয়ামী লীগের মধ্যেই তাদের চিন্তা চেতনার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের উজ্জল সম্ভাবনা দেখতে পায়। এসব কারণে ১৯৯১ সনের সাধারণ নির্বাচনে একটি সুবিধাজনক অবস্থানে আসার সম্ভাবনা আওযামী লীগ তৈরী করেছিল। আওয়ামী নেতৃবৃন্দের মনে এ আশাও জাগ্রত হয়েছিল যে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তারাই ক্ষমতার মসনদে আসীন হবেন। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল তারা হতাশ হন এবং নির্বাচনে সূক্ষ কারচুপী মাধ্যমে তাদের হারানো হয়েছে বলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এই নির্বাচনে বিএনপি জামায়াতে ইসলামীর ১৬ জন সদস্যের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে এবং বেগম জিয়া প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। বি. এন. পির ক্ষমতাসীন হওয়াকে আওয়ামী লীগ আদৌ মেনে নিতে পারেনি তাইতে প্রথম থেকেই শুরু হয়ে যায় বি. এন. পি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলন।

জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে বি. এন. পি. সরকার গঠন করে ২ জন মহিলা সদস্যাকে জামায়াতকে দিয়ে নিজেরা ২৮ জন মহিলা সদস্যার সমর্থনে দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে সরকার পরিচালনায় জামায়াতের সহযোগিতার আর কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। জামায়াতের সমর্থন ছিল নি:শর্ত যা উদার মনের পরিচায়ক হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে ছিল একটি ভূল সিদ্ধান্ত। সরকার পরিচালনায় যে চেক এন্ড ব্যালান্সের প্রয়োজন ছিল, সমর্থন কারীদের প্রতি যে হামদরদীর প্রয়োজন ছিল ক্ষমতাসীন বি. এন. পি. তা ভূলে গেলেন। বি. এন. পির একশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ জামায়াতকে ভোটের প্রতিদ্বন্দি মনে করতেন। তাদের যুক্তি ছিল আওয়ামী লীগের ভোট রিজার্ভ তাতে ভাঙ্গন ধরানো যাবেনা, বি. এন. পির ও কেউ আওয়ামী লীগকে ভোট দেবেনা কিন্তু বি. এন. পি ও জামায়াতের মূলনীতি ও আদর্শবাদের মধ্যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে ধ্যান ধারণায় কিছু মিল থাকায় বি. এন. পির মধ্যে যারা অধিকতর ইসলাম প্রিয় ও দেশে ইসলামী বিধান বাস্তবায়নে আপোষহীন তারা বি. এন. পির যোগ্য প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে জামায়াতকে ভোট দেবেন। বি. এন. পির শাসক শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশই এই ধারণা পোষন করতেন এবং বি. এন. পির শাসনামলে জামায়াত ও অন্যান্য ইসলাম পন্থীদের উপর যে আক্রমন হয়েছে তা এই ধারণাই ফলশ্রুতি।

www.pathagar.com

জামায়ত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার প্রশ্নে বি. এন. পি সরকার সুবিচার করেনি, সুপ্রিম কোর্টের এপিলেট ডিভিশন পর্যন্ত লড়ে তা অর্জন করতে হয়েছে। সরকার গঠনে বি. এন. পিকে মূল্যবান সহযোগিতা দিয়েও জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে বি. এন. পি আমলেই বিনাবিচারে বৎসাধিক কাল কারাগারে কাটাতে হয়েছে। ইসলামী ছাত্র শিবিরের বহু ছাত্রকে ছাত্রদল নেতাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে, জখম হয়েছে শত সহস্র, মামলা মোকদ্দমায় জড়ানো হয়েছে বিপুল পরিমান জামায়াত ও ছাত্র শিবিরে নেতা কর্মীদের। বাবরী মসজিদের ভাঙ্গার প্রতিবাদে এ দেশের তাওহিদী জনতার বায়তুল মোকাররম মসজিদ হতে ১৯৯৩ সনের ২রা জানুয়ারী যে লক্ষ জনতার অযোধ্যাভিমুখে লংমার্চ শুরু হয় যশোহরে তাদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষনে ৬ জন সাহাদৎ বরণ করেন। মওলানা ভাষানী যখন ফারাক্কার বিরুদ্ধে লংমার্চ করেন তখন তদানীন্তন সরকার এরূপ অপ্রয়োজনীয় ও নির্মম আচরণ প্রদর্শনের প্রয়োজন বোধ করেননি। বি. এন. পি সরকারের কিছু ভারতমুখী নীতি মরহুম জিয়ার নীতি ও আদর্শ বিরোধী হওয়ায় দেশের বুদ্ধিজিবী ও সাধারণ মানুষ এগুলো সমর্থন করতে পারেননি। কিছু উপনির্বাচনে বিশৃংখলা ও ভোট কারচুপির যাবতীয় দায় দায়িত্ব বি. এন. পি সরকারের উপর পতিত হল। পরিস্থিতির চাপে পড়েই জামায়াতকে বি. এন. পি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে হয় কিন্তু আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ে জামায়াত আওয়ামী লীগের সঙ্গে একই প্ল্যাট ফরম থেকে বক্তব্য রেখে নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলল। জামায়াতের এই পদক্ষেপ দলীয় কর্মী, সমর্থক ও ইসলামপ্রিয় ভোটারদের হতাশাগ্রস্থ করেছে। আমার অভিজ্ঞতা ছিল এই যে জনতার মঞ্চে একই সঙ্গে দাড়িয়ে জামায়াত বি. এন. পি সরকারের সমালোচনা করেছে আর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বি. এন. পির কঠোর সমালোচনা করা ছাড়াও ১৯৭১ এর পাক আর্মীর যাবতীয় অত্যাচারের দায়-দায়িত্ব জামায়াতের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে জনতার হাততালি নিয়েছে। একই সঙ্গে ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটির অপপ্রচার ও উন্মুক্ত আসফালন এবং গনআদালত বসানো ও ফাঁসির আদেশ প্রদানের মত দেশদ্রোহী ও আইন বিরোধী কার্যকলাপ দেশে উচ্ছৃংখলতা ও অরাজকতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করল। ১৯৯৬ সনে তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে শেখ হাছিনা তার মোক্ষম ও সর্বশেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। ওমরা পালন করে, মাথায় টুপি দিয়ে ঘোমটা চড়িয়ে, হাতে সর্বক্ষন তসবিহ নিয়ে, ১৯৭২-৭৫ এর ঘটনাবলীর জন্য করজোড়ে মাপ চেয়ে, নেতা কর্মীদের মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায়ের নছিহত করে, বাকশালী রাজনীতির জন্য তওবা করে, আর একটিবার ভোট ভিক্ষা দিয়ে দেশ সেবার সুযোগ দেবার জন্য শেখ হাছিনা ময়দান চষে বেড়ালেন এবং কোথায় কোথায় কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করলেন। শেখ হাছিনা তার বহুরূপী চেহারার মোজেজা দিয়ে দেশের মানুষকে মোহগ্রস্থ করে তুললেন। মানুষের মনে দ্বিধাদ্বন্দ সৃষ্টি হল-'দেখিনা আর একবার ভোট দিয়ে কি হয়।' এ দেখা ছিল খড়ের বিপুল স্তুপে আগুন ধরিয়ে দিয়ে কেমন উত্তাপ হয় তা দেখার মত।

www.pathagar.com

জামায়াত সমর্থকরাও বিভ্রান্ত হলেন। জামায়াত এককভাবে হয়ত বেশী ভোট পাবেনা, বি. এন. পিকে দিলে হয়ত আবার চেপে বসতে পারে তাইতে তাদের মধ্যেও অনেক ভোট আওয়ামী লীগের পক্ষে পড়ে গেল। ফল হল সংসদে জামায়াতের আসন ১৬ থেকে নেমে এল ৩ এ। আওয়ামী লীগ ১৪৮টি আসন পেয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার দৌড়ে শীর্ষ অবস্থানে চলে যায় এবং অন্যদের সহায়তায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এই হল সংক্ষিপ্ত ভাবে বাংলাদেশের জমিনে ২১ বছর পর মৃত এক অপশক্তির পুনরুত্থানের কাহিনী।

আর একবার মাত্র ক্ষমতায় যাওয়ার আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে ভোটাররা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে আওয়ামী লীগ স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়। আওয়ামী লীগ নেত্রীর মাথার টুপি ও ঘোমটা বিদায় নিল, হাতের তসবিহ খসে পড়ল, নারী হৃদয়ের সুকুমার গুনাবলী দুর হয়ে গেল, হজ্ব, ওমরা, কবর জিয়ারতের অনুভূতি মন থেকে মুছে গেল এবং হালাকু ও চেঙ্গিস খানের তরবারীর চাইতেও ধারালো তরবারী নিয়ে, ক্ষুদ্ধার্ত নেকড়ের চাইতেও সুতীক্ষ্ণ নখর নিয়ে, কুটিল কেওটের চাইতেও বিষাক্ত ফনা নিয়ে পিতৃমাতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে দেশবাসীর উপর ঝাপিয়ে পড়ল। দেশবাসীর অপরাধ ১৯৭৫ এর ১৫ই আগষ্টের কালো রাতে তার পিতৃমাতৃ হত্যার জন্য কেউ চোখের পানি ফেলেনি। দু:শাসন থেকে রক্ষা পাওয়ায় সবার চেহারায় তৃপ্তির ঝলক দেখা গেছে। দেশবাসীর বিরুদ্ধে এক প্রচন্ড প্রতিশোধ গ্রহণের প্রোগ্রাম নিয়ে শেখ হাছিনার যাত্রা হল শুরু।

আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় মেয়াদের দু:শাসন

আওয়ামী লীগের দু:শাসন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর (ডক্টর) মোহাম্মদ আব্দুর রব গত ১৫ ই ডিসেম্বর ২০০০ দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় যে মসিলিপ্ত চিত্র একেছিলেন সেটাই সমস্ত ঘটনা প্রবাহের সার সংক্ষেপ বলা যেতে পারে। তাঁর ভাষায় "আওয়ামী লীগের সাড়ে ৪ বছরের দেশ শাসন রাজনৈতিক ব্যর্থতা, ওয়াদাভঙ্গ, অর্থনৈতিক অধোগতি, সন্ত্রাশ, রাহাজানী, হত্যা গুম নৈরাজ্য, আত্মীয়করণ, দলীয়করণ, ভারত তোষন, কুটনৈতিক পরাজয় আর দেশের স্বার্থ-সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেয়ার এক ভয়াল ও মর্মন্তুদ উপখানের কাহিনী। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ এর বাকশালী ফ্যাসিবাদী দৌরাত্মকেও ম্লান করে দিয়েছে। আওয়ামী লীগের সাড়ে ৪ বছরের ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শের ধর্মহীন শাসন-ত্রাসন এদেশে 'আওয়ামী জাহেলিয়াত' এরই এক বল্গাহীন অমানিশার ঘোর দুর্দিন আর হতাশার পরিবেশ ছড়িয়ে দিয়েছে। এখানে এখন যুবক, বৃদ্ধ, কিংবা মহিলা শিশু কোন বনি-আদমই জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে দিনের সূচনা করতে ভরসা পায়না,ধনী গরিব কিংবা হিন্দু মুসলিম কেওই এখানে শান্তির স্বপ্ন নিয়ে রাতে ঘুমুতে যেতে পারেনা। বাংলাদেশে এখন জুলুম-নিপীড়ন আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হামলা-মামলা আর পুলিশী নির্যাতন জনগনের মনের শান্তি আর শরীরের আরামকে হারাম বানিয়ে দেশের গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে হিংসা, বিভাজন, ঘৃনা আর জিঘাংসার সয়লাব বইয়ে দিচ্ছে। ২৪৮

www.pathagar.com

ফেনী থেকে ফটিকছড়ি আর নারায়নগঞ্জ থেকে জাকিগঞ্জ সারা বাংলাদেশের নানা জনপদই আজ মৃত্যু উপত্যাকায় পরিণত হয়েছে। এক সময়ের 'মসজিদের নগরী' বলে বিশ্বখ্যাত দেশের রাজধানী ঢাকা আজ ধর্মনিরেপক্ষতাবাদী আওয়ামী গোষ্ঠির নগ্ন ধর্মদ্রোহী উগ্রতায় 'মুর্তির নগরী'তে পরিণত হতে চলেছে। দেশে বিজাতীয় অপসংস্কৃতির আর অশ্লীলতা-নগ্নতার এক মহোৎসব শুরু হয়েছে দানবীয় তান্ডবে। দেশীয় পবিত্র দ্বীনি আদর্শ-কৃষ্টি উচেছদের উদ্দেশ্যে এখানে এখন মঙ্গল প্রদীপ, তিলক সংস্কৃতির পুর্নবাসনের আয়োজন চলছে মহাসমারোহে। পথে ঘাটে এমনকি মসজিদ মাজারে ঢুকে এখন সরকারী মস্তান এবং পুলিশ দাড়ী-টুপিধারীদের আর বরণ্যে ওলামা পীর মাশায়েখদের লাঠিপেটা করছে। এদের দানবীয় তান্ডব থেকে পর্দানশীল বোরখা হেজাবধারিণী মহিলারাও আজ তাদের ইজ্জত-আবরু বাঁচাতে পারছেন না। ধর্মনিরপেক্ষবাদী সরকার দেশে ইসলাম উচেছদের উদ্দেশ্যেই মাদ্রাসাও দ্বীনি শিক্ষার ওপর পরিচালনা করছে এক বিপুল হিংস্র মুলোৎপাটন যজ্ঞ। মসজিদে বুট-জুতা পায়ে মারমুখো পুলিশ ও লেলিয়ে দেওয়া গুন্ডা বাহিনী সদম্ভে ঢুকে পড়ছে নির্ভীক চিত্তে। কোথাও বা মসজিদে মাইকে আজান দেয়াও বন্ধ করে দেওয়া হচেছ। মিথ্যা ছল-ছুতায় নিরীহ মুসুলি আর মওলানা সাহেবদের 'মৌলবাদী' বা অন্য কোন অবিধায় অভিষিক্ত করে সাম্রাজ্যবাদী ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদী -খ্রীষ্ট বা ব্রাহ্মন্যবাদীদের সাথে সুর মিলিয়ে তাঁদেরকে 'লাদেন আনুসারী' কিংবা 'তালেবান' বলে অভিহিত করে নিতান্তই অন্যায়ভাবে ঢুকিয়ে দিচেছ কারান্তরালে, চালানো হচেছ তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আর জুলুম নির্যাতন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ চর দখলের মত সরকারী দলের ক্যাডাররা দখল করে নিয়ে সেখানে মাদক, মাস্তানী আর টেন্ডারবাজীর আখড়া স্থাপন করেছে। হলে হলে নামাজী ছাত্র-ছাত্রীদের কোরআন-হাদীস ও নামাজ পড়ায়ও বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর চালানো হচেছ বর্বর নির্যাতন, হামলা ও অত্যাচার, ভার্সিটির কোন কোন হলে সরকারী ছাত্র সংগঠন পুলিশের নাকের ডগার উপর নির্ভয়ে ভয়ঙ্কর সব মারনাস্ত্র নিয়ে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করে। কোথাও বা বসানো হয়েছে 'টর্চার রুম' বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। রাতের গভীরে ঐসব টর্চার সেন্টার থেকে আক্রান্ত নিরীহ ছাত্র কিংবা পনবন্দী ঠিকাদারদের করুন আর্ত চিৎকার আর আহাজারি আর্তনাদ ভেসে উঠলেও জীবনের ভয়ে ভীত কেউই ঐ দুর্ভাগাদের উদ্ধারে এগিয়ে যেতে সাহস করেনা। ..... আওয়ামী শাসনের বর্তমান উপদ্রুত বাংলাদেশে এখন 'বিচারের বানী নীরবে -নিভৃতে কাঁদে। ..... সরকারী দলের মন্ত্রী, এমপি, থেকে নিয়ে তথাকথিত পোষা বুদ্ধিজিবীরা পর্যন্ত হাইকোট সুপ্রিম কোর্টেও বিচারপতিদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করে। বাংলাদেশে আওয়ামী ধর্মনিরেপক্ষতাবাদী সরকারের বিগত সাড়ে ৪ বছরের শাসনামলে দেশে সন্ত্রাস, অপরাধ আর ধ্বংস-নৈরাজ্যের সয়লাব ও তান্ডব বয়ে গেছে।"

১৯৯৬ সনের ১৩ই জুলাই এরশাদের জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পরিষদে ১৪১ টি আসন পেলেও নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের

www.pathagar.com

শতকরা ৩৩ শতাংশ পায় আওয়ামী লীগ যার মধ্যে অমুসলিমদের ভোট ছিল ১৫ শতাংশ। মুসলিম অধ্যুসিত এই দেশে ১৮ শতাংশ মুসলিম ভোট পেয়ে শেখ হাছিনা দেশবাসীর বিরুদ্ধে যে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করলেন তা ছিল কার্যত ৮২ শতাংশ মুসলিম ভোটারের বিরুদ্ধে। তিনি এমন সব কার্যকলাপ শুরু করলেন যা ছিল সংবিধানের মৌলিক ও মূলনীতির বিরোধী, দেশের অধিক সংখ্যক মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও কার্যকলাপের উপর প্রচন্ড আঘাত সৃষ্টিকারী, গনতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকার সমূহ হরণকারী দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্নকারী, অর্থনৈতিক ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী ও দেশে শান্তি ও শৃংখলার পরিবেশ ধ্বংসকারী। দেশের সুধীজন, বুদ্ধিজিবী, রাজনীতিবিদ, অধ্যাপক, সাংবাদিকগন শেখ হাছিনা রাজত্বের বিভিন্ন ঘটনার করুণ চিত্র একেছেন যা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে। সে সব ঘটনাবলী এখনও মানুষের মনে বিভিষীকা সৃষ্টি করে। সমস্ত ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয় তবুও ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উলেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি।

১) ইসলামী মূল্যবোধের ভাঙ্গন প্রচেষ্টা ও ইসলামকে নিয়ে ভন্ডামী ঃ

সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' লিপিবদ্ধ থাকলেও তা বর্জন করা হয়। আওয়ামী লীগ ভারতীয় আদর্শ ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের (যা একটি কুফুরী মতবাদ) পূজারী হওয়ায় ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার কোন হীন কৌশলই গ্রহণ করতে কসুর করেনি। সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা না থাকলেও তারা সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ৮/১(ক) ধারা যথা" সর্বশক্তিমান আলাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যবালীর ভিত্তি" কে অস্বীকার করেছে। পুরো ৫ বছরের শাসনামলে আওয়ামী লীগ সব সময় ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী বা ইসলাম বিরোধীদের সঙ্গে একাত্ব থেকে এবং বিশেষ করে হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের স্বঘোষিত নেতৃবৃন্দ ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারতীয় চর ও সেবাদাস দের খাহেশ ও ইচছা পূরণ করেছে এবং তাদের দেশদ্রোহীমূলক পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে। আওয়ামী মন্ত্রীরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রমনা কালিমন্দির উদ্বোধন করে রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে পৌত্তলিকতা বা মুশরেকী দর্শন প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের মহাসুযোগ করে দিয়েছে। শেখ হাছিনার ধর্ম মন্ত্রী দুর্গা পূজা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন 'দুর্গাপূজা হিন্দুদের জাতীয় পূজা হলেও বাঙ্গালী হিসাবে এটা সকল মানুষের জাতীয় উৎসব। অনুরূপ আর একটি অনুষ্ঠানে মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে এ্যাডভোকেট সুধাংশ শেখর হালদার মৌলবাদীদের রক্ত দিয়ে মা কালির পায়ে অর্চনা না দেয়া পর্যন্ত কালী খুশী হবেনা বলে দম্ভভরে ঘোষনা করেছে। এসব কি ইসলাম ও মুসলমানদের নির্মুল করে কালী ও দুর্গাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আলামত নয়? বাংলাদেশে এমন কোন শহর নেই যেখানে বিপুল সরকারী অর্থের শ্রাদ্ধ করে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে মুর্তি বসানো হয়নি।

www.pathagar.com

আইন করে প্রায় ২৫০ টি মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা ও চর্চা বন্ধ করে দেবার এ ছিল এক জঘন্য প্রয়াস। অঘোষিত ভাবে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন ভাবে ইসলামিয়াত চালুকরণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। রেডিও টি.ভিতে জনপ্রিয় ইসলামী প্রোগ্রাম বন্ধ করে বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে হিন্দুসংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের অনুকরণে প্রায় প্রতিটি প্রোগ্রাম সাজানো হয়। বিভিন্ন নাটকের মাধ্যমে টুপিওয়ালাদের হেয় প্রতিপন্ন করার ব্যবস্থা করা হয় এবং 'দালাল' 'রাজাকার' পাকিস্তানপন্থী, সন্ত্রাসী, কুচক্রী হিসাবে ইসলাম পন্থীদের চিত্রিত করে টিভি ও রেডিওর পসরা সাজানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল তাওহিদী জনতার বিরুদ্ধে ঘৃনা সৃষ্টি করে মুশরিক সংস্কৃতির স্থান করে দেওয়া। ইসলামকে নিয়ে ভন্ডামীর রেকর্ড সৃষ্টি করেছে আওয়ামী লীগ ও তার নেত্রী শেখ হাছিনা। একদিকে ইসলামপন্থীদের রাজাকার আলবদর, তালেবান, হরকাতুল জেহাদ, স্বাধীনতা বিরোধী ইত্যাদি বলে চিত্রিত করা অন্যদিকে নির্বাচন কালে ওমরাহ করা, মাজার জিয়ারত করা, মাথায় টুপি দেওয়া, হাতে তসবিহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ বলে জিগির তোলা এসবইত মোনাফেকী চরিত্রে চরম বহি:প্রকাশ।

বায়তুল মোকাররম মসজিদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় খাতীব মওলানা ওবায়দুল হককে অপসারনের লক্ষে মসজিদে দাঙ্গা বাধানো হয়। একামাসের বেশী সময় মসজিদ এলাকায় কারফিউ জারী রাখা হয়। দেশের অগনিত মাদ্রাসা ছাত্রদের বয়োবৃদ্ধ ওস্তাদ. বাংলাভাষায় বোখারী শরীফের অনুবাদকারী, খেলাফত মজলিশের সভাপতি ও ৪ দলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম স্তম্ভ শায়খুল হাদীস আলামা আজিজুল হককে মসজিদের মধ্যে পেটুয়া পুলিশ বাহিনী দিয়ে লাঠিপেটা করে কারাগারে অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যে মাসের পর মাস ফেলে রাখা শেখ হাছিনা শাসনামলের এক জঘন্য কৃত্তি। চিটাগাং-এর ৮ খুন, কোটালিপাড়ার পাতানো বোমা, উদিচী ও রমনা বটমূলের বোমা বিস্ফোরণ, নারায়নগঞ্জের বোমা হামলা সহ বহু ঘটনায় কোন প্রকার তদন্ত ছাড়াই ইসলামী দল ও বি. এন. পির উপর যাবতীয় দোষ চাপান হয় যা মৌলিক মানবাধিকার ও আইনের শাসনের চরম পরিপন্থী। শতসহস্র মাদ্রাসা ছাত্র, উলামা মাশায়েখ যারা কোন দিন রাজনীতির ছায়া মাড়াননি তাদের কারাগারের গহ্বরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

২) দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত ঃ

শেখ হাছিনা ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই সংসদকে আস্থায় না এনে গ্যারান্টি ক্লজ বিহীন ৩০ সালা গঙ্গার পানি চুক্তি করে ভারতের ইচছার কাছে নতি স্বীকার করেছেন। বাংলাদেশকে মরুভূমি করার ভারতের নীল নকসা হাছিনার হাত দিয়ে সুসম্পন্ন হল। এ সম্পর্কে আমার এক দুঃখজনক অভিজ্ঞতা রয়েছে। কুষ্টিয়া শহর গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত। শুকনা মওসুমে এই নদীর বালি বিক্রয় হয়। আমার সন্তানের পুকুর ভরাটের জন্য বেশ কিছু পরিমান বালির প্রয়োজন ছিল,

www.pathagar.com

বালি সরবরাহকারী বললেন খুব তাড়াতাড়ী করে বালি খরিদ করতে কেননা পানি চুক্তি অনুযায়ী ফারক্কা বাধ খুলে দিলে পদ্মাও গড়াইতে পানি এসে যাবে এবং পাকিস্তান আমলের মত সারা বছরই নদী প্রবাহমান থাকবে। তাড়াতাড়ি করার জন্য কিছু বেশী টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমান বালি নিতে হল কিন্তু গড়াইতে পানি এলনা। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ যারা চুক্তির পক্ষে কোরাস গাইতেন তারা বললেন ফারক্কা থেকে কুষ্টিয়ার গড়াই অনেক দুর সুতরাং পানি গড়ে গড়ে আসবার জন্য কিছু সময় দিতে হবে। অনেক দিন পার হওয়ার পরও যখন পানি গড়াইতে এলনা তখন বন্ধুবান্ধব নিয়ে গেলাম গড়াই নদীর মা পদ্মায় হার্ডিঞ্জ ব্রিজের তলদেশে কিন্তু ফারক্কার পানির কোন আগমন চোখে পড়ল না। চারদিকে ধুধু চর হার্ডিঞ্জ ব্রীজের নীচ দিয়ে ট্রাক, বাস, গরুর গাড়ী ভ্যান ইত্যাদি চলছে। এসব ছবি দেশের অনেক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। অথচ পানি মন্ত্রী বিভিন্ন সমাবেশে পানির সয়লাবের চিত্র একেছেন। এর থেকে মিথ্যার বেসাতী আর কি হতে পারে? ফলকথা ভারতের সঙ্গে পানি চুক্তি হয়েছে কিন্তু পানি আসেনি। পানি আসেনি বলে ভারতকে রুষ্ট করা বা ভারতের কৃপা থেকে বঞ্চিত হওয়া এদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

দেশবাসীর চরম বিরোধীতা সত্বেও সংসদকে ডিঙ্গিয়ে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইসতেহার বিরোধী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করে দেশের একদশমাংস অঞ্চলের সার্বভৌমত্বের উপর হুমকী সৃষ্টি করা হয়েছে। সন্তু লারমা বাংলাদেশের যে কোন স্থানে গিয়ে জমি খরিদ করতে পারবে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অংশ হওয়া সত্বেও কোন বাংলাদেশীর পক্ষে সেখানে গিয়ে জমি খরিদ করার অধিকার নাই। এমনকি শেখ হাছিনাও পার্বত্য অঞ্চলে জমি খরিদ করতে পারবেনা। অদূর ভবিষ্যতে এই পার্বত্য অঞ্চলকে ইন্দোনেশীয়ার **তিমুরের** মতস্বাধীন খৃষ্টান রাজ্যে পরিণত করার এক গোপন পরিকল্পনা রয়েছে খৃষ্টান দাতা গোষ্টি সমূহের। বিদেশী খৃষ্টান মিশনারীরা এন. জি. ও-র আবরনে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে উপজাতীয়দের ধর্মান্তকরণের কাজশুরু করে এবং বর্তমানে উপজাতীয়দের মধ্যে অধিকাংশই এখন খৃষ্টান। পার্বত্য চট্টগ্রাম সামরিক দিক দিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, পূর্বে ও উত্তরে বৈরী ভারত, দক্ষিণে মায়ানমার ও সমুদ্র এবং পশ্চিমে বাংলাদেশের ভূমি আদৌ প্রশস্ত নয়, তাইতে এই অঞ্চলে বাংলাদেশ বিরোধী যে কোন তৎপরতা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ পরিনতি বয়ে আনতে পারে। পানি চুক্তি এবং তারপর বাংলাদেশের জনগনের প্রতিরোধের মুখেও তথাকথিত পার্বত্য শান্তি চুক্তি ছিল শেখ হাচিনার জন্য প্রকাশ্য দেশদ্রোহিতার শামিল। ভারতকে খুশী করাই ছিল হাছিনা সরকারের চরম ও পরম লক্ষ্য।

১৫ই এপ্রিল ২০০১ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার বড়াইবাড়ী ছিটমহলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বি. এস. এফ বাংলাদেশের ভিতর ঢুকে হামলা চালালে ৩ জন বি.ডি.আর ও ১৮ জন বি. এস. এফের সদস্য নিহত হয়। এই লড়াই এর পর বি. ডি. আর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ফজলুর রহমান এক প্রেস

www.pathagar.com

ব্রিফিংএ বলেন" বিনা কারণে রৌমারী সীমান্তে বি. এস. এফ এর গুলিবর্ষণ ও প্রাণহানীর জন্য ভারতকে ক্ষমা চাইতে হবে, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ভারত বছরের পর বছর আমাদের জায়গা দখল করে রাখবে তা হতে দেওয়া যায়না। আমরা চাই ভারত আমাদের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুক। তারা প্রথমে আক্রমন না চালালে আমরা আক্রমন করবনা। তারা যদি আক্রমন চালায়, আমরাও তার উপযুক্ত জবাব দেবো।" এই সময়ই সিলেট সীমান্তে ৩০ বছর ধরে ভারতের বেআইনী দখলকৃত পাদুয়া গ্রামটি বিডিআর পুন:দখল করার পর বিডিআর মহাপরিচালক ১৭ই এপ্রিল বলেন" যদি বি এস এফ এর পক্ষ থেকে হামলা চালানো হয়, তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্য আমাদের বাহিনী প্রস্তুত আছে। ৩০ বছর ধরে আমাদের ২৫০ একর জায়গা করে রাখবে, ফাঁড়ি দখল করে রাখবে, সীমান্ত লাইনের ৩০ মিটারের মধ্যে রাস্তা করবে, আমরা অনেক সহ্য করেছি। গত ১৪ মাসে আমাদের ৪৭ জন লোককে হত্যা করা হয়েছে। আমরা তাদের কোন লোক মারিনি। স্বাধীন সার্বভৌম দেশের উপর এমন অন্যায় মেনে নেওয়া যায়না।"

বি এস এফের যে সব জওয়ানরা মারা যায় তাদের সবার লাশ বাংলাদেশের অনেক অভ্যন্তরে পাওয়া যায় এতে ভারত দারুন বেকায়দায় পড়ে যায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লাশ পাওয়া যাওয়ায় সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হয় যে ভারতীয় বি এস এফ ছিল অনুপ্রবেশকারী ও আক্রমনকারী। কিন্তু ভারতীয় পত্রিকা, ভারতমুখী বাংলাদেশী পত্র পত্রিকা ও ভাড়াটে কলামিষ্টরা পুরো ঘটনা বিবৃত করে বিডিআর উপর দোষ চাপাতে তৎপর হয়ে গেল এবং এই বলে প্রচার শুরু করে দিল যে শেখ হাছিনা বা তার সরকার এসব সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। নতজানু পররাষ্ট্রনীতি আর কাকে বলে। যারা যুদ্ধ করলো, যারা দখলকৃত জমি উদ্ধার করলো, যারা দেশের জন্য শহীদ হলো এবং যারা প্রতিমুহূর্তে জীবনের ঝুকি নিয়ে সীমান্ত পাহারা দিয়ে রাখে বহি:শত্রুর আক্রমন থেকে তাদের ব্যাপারে সরকার এতবড় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ভারতের করুণা কুড়াবে এবং গোটা জাতির সঙ্গে গাদ্দারী করবে তা ছিল অবিশাস্য। ১৫ই এপ্রিল ৩০ বছর পর পুর্ন:দখলকৃত ২৫০ একর আয়তনের পাদুয়া গ্রামটি ১৯শেএপ্রিল দুপুরে বি. এস. এফ এর কাছে ছেড়ে দেয়। ভারতের আজ্ঞাবাহী, কলকাতার সম্বর্দ্ধনা সভায় বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে লজ্জাস্কর খেতাব অর্জনকারিনী শেখ হাছিনার এই ত্বরিত পদক্ষেপ ছিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মি: বাজপেয়ী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী মি: যশোবন্ত সিংহের পার্লামেন্টে প্রদত্ত বক্তৃতার ক্ষোভ ও রোষাগ্নি প্রশমিত করার উদ্যোগ। শুধু দেশের সার্বভৌমত্বের উপরই কুঠারাঘাত হয়নি একই সঙ্গে ৩ জন শহীদ বিডিআর ল্যান্স নায়েক ওয়াহিদ মিয়া, সিপাহী আব্দুল কাদের ও সিপাহী মাহফুজুর রহমানের আত্মার প্রতি চরম অসম্মান ও তাদের ত্যাগ ও কেরাবানীর অস্বীকৃতি। একটি স্বাধীন দেশে এ উদাহরণ বিরল। আওয়ামী লীগ ও হাছিনার পক্ষেই এটা সম্ভব পর ছিল।

www.pathagar.com

৩) সর্বত্রই নৈরাজ্য, ভাঙ্গন ও বেইনছাফী ঃ

শেখ হাছিনার নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে দেশের আইনশৃংখলা পরিস্থিতি একবোরে ভেঙ্গে পড়ে। খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, চাঁদাবজি, ছিনতাই মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সরকারী দলে নেতা, মন্ত্রী ও এম. পির পুত্রগন প্রকাশ্য দিবালোকে বাড়ী দখল, ব্যাংক দখল, ও হত্যাকান্ডের মত ন্যাক্কারজনক ঘটনা সংঘটিত করেছে। পুলিশ বাহিনীকে অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রনের পরিবর্তে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী বানচাল করার কাজেই বেশী ব্যবহার করা হয়েছে। খুন বা অপরাধজনক কোন ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করার কোন ক্ষমতা পুলিশ কতৃপক্ষের ছিলনা। যখনই কোন নির্মম হত্যাকান্ড বা বোমবাজীর ঘটনা ঘটেছে তখনই দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বয়ং বিবৃতি দিয়েছে এই বলে যে 'কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা আমরা জানি,এসব ঘটনার পিছনে মৌলবাদীদের হাত রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি।" এসব ঘটনার সাজানো অনেক মামলারই পরবর্তী আমলে আসামী পক্ষের আইনজিবী হিসাবে নথী পর্যালোচনা করে দেখেছি এগুলো ছিল সব সাজানো নাটক। ফলে প্রকৃত খুনীরা ও সন্ত্রাসীরা পর্দার আড়ালে থেকে গেছে এবং খুনের ঘটনা বেড়ে চলেছে। এসব হত্যাকান্ডের কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী সরকার আদৌও আমল দেয়নি।

আওয়ামী সরকারের ব্যর্থতা ছিলো দলীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠতে না পারা। শেখ হাছিনা সব সময় নিজেকে দলীয় নেতৃ হিসাবে দেখেছেন। ২১ বছর ক্ষমতা থেকে বাহিরে থাকা ক্ষুদ্ধার্ত আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের উদর পুর্তি, খাহেশ পুর্তি ও মনোবাহ্যা পূরণের অবাধ উন্মুক্ত সাধারন লাইসেন্স প্রদান করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের কথাবার্তায় ও চালচলনে সব সময় আক্রমনাত্মক মন মেজাজই পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাছিনার ভাষা ছিল উগ্র, আক্রমনাত্মক, প্রতিহিংসা পরায়ন, অশ্লীল ও অরুচীকর এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রতিও এসব ভাষায় আক্রমন করতে কসুর করেননি। দেশের সর্বোচ্চ আদালত প্রধানমন্ত্রীকে পর পর দুইবার সংযত ভাষায় কথা বলার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। এর পরেও আওয়ামী সরকারের মন্ত্রীদের নেতৃত্বে বিচারপতিদের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল হয়েছে, খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিছিল ও জনসভায় উচচারণ করেছেন 'লাঠি কোথায় মারতে হয় তা আওয়ামী লীগ ভাল করেই জানে।'

দেশের প্রশাসন, বিচার ও পুলিশ বিভাগে নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা আর মাপকাঠি হিসাব গন্য হয়নি। দলীয় ক্যাডারই ছিল নিয়োগ ও পদোন্নতির মাপকাঠি, সর্বোচচ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বিসিএস পর্যন্ত দলীয়করন করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের উচচপদে নিয়োগের বাহানায় আওয়ামী লীগের ছাত্র ক্যাডারদের পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকানো হয়েছে। এসব ১৯৭৩ সনের তোফায়েল সি. এস. পির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যারা পরবর্তী যে কোন সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের গুনকীর্তন করেছে।

www.pathagar.com

মানুষ গড়ার আঙ্গিনায়, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মেধানী ও প্রাথিতযশা শিক্ষাবিদদের ডিঙ্গিয়ে শিক্ষা জীবনে তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরও আওয়ামী লীগ ভক্ত সমর্থক হবার কারণে ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এদের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী ছাত্র সংগঠনের ছাত্র নেতাদের ছিল অবাধ বিচরণ ও দৌদন্ড প্রতাপ। দলীয় ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ধর্ষনের ক্ষেত্রে ছিল উদ্যাম এবং কোন কোন নেতা ধর্ষনের সেঞ্চুরী উদযাপন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় আঙ্গিনায় প্রকাশ্যে কতৃপক্ষের নাকের ডগায় বসে। প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রীসভা বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কতৃপক্ষ কারও মুখে এসব জঘন্যতম অনাচারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষিত হয়নি দেশের সরকারী বিরোধী ও সরকার দলীয় পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরও।

আওয়ামী সরকারের আমলে দলীয় নেতা কর্মীরা দেশটাকে লুটের মাল হিসাবে গন্য করে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করে নেয়। সমস্ত হাট-ঘাট, বাজার-জলমহল, পারমিট বরাদ্দ, সমস্ত প্রকারের কনট্রাক্ট, ঋণ সুবিধা, প্লট বরাদ্দ নিজেদের দলীয় লোকদের মধ্যেই বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেশের অর্থনীতিতেও ছিল ভাঙ্গন ও নৈরাজ্যের সয়লাব। বাংলাদেশকে পরিনত করা হয়েছে ভারতীয় নিম্নমানের পন্যের বাজারে। সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চোরা চালানীর মাধ্যমে অবাধে প্রবেশ করেছে ভারতীয় পন্য। বর্ডার জেলার সর্বত্রই গড়ে উঠেছিল আওয়ামী নেতা কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত চোরাচালানী সিন্ডিকেট যাদের উপর স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের কোন কতৃত্ব ছিলনা।

অর্থনীতির প্রতিটি খাতে দুর্নীতি, আত্মসাৎ, অসাধুতার ফলে কোথায়ও কোন গতি ছিল না। ১৮ বার টাকার অবমূল্যায়ন, ভারতীয় মাড়োয়ারীদের অর্থ সহযোগিতায় শেয়ার বাজারে ধ্বস, আমদানী রফতানী বাণিজ্যে ভারসাম্যহীনতা, অপ্রয়োজনীয় ও উৎপাদনহীন কাজে সীমাহীন অর্থ ব্যয়, ব্যাংক থেকে ঘন ঘন সরকারের ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি দেশের অর্থনীতিতে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে।

শেখ হাসিনা ও রেহানার আজীবন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আইন ২০০১

আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় মেয়াদের দুঃশাসন ১৯৭২-৭৫ এর দুঃশাসন থেকে পৃথক করে দেখার অবকাশ নেই। জনসাধারণের প্রতি জুলুম, নিষ্পেষন ও অত্যাচারে; মৌলিক মানবাধিকার লংঘনে; দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টিতে; অর্থনীতি সহ সর্বক্ষেত্রে ভাঙ্গন সৃষ্টিতে; হত্যা, গুম সহ নানান রেকর্ড সৃষ্টিতে; প্রশাসন সহ সর্বত্র দলীয়করণের এবং সর্বোপরী শেখ মুজিবের জন্য জীবনের একনায়কত্বের মসনদ সৃষ্টিতে আওয়ামী লীগ স্বাধীন দেশে প্রথম সরকারের মেয়াদে যা করেছে দ্বিতীয় দফা শাসনামলে তার কোনটাই বাদ রাখেনি। পার্থক্য এইটুকু যে শেখ হাসিনার আমলের ঘটনা প্রবাহ সংখ্যায়, প্রচন্ডতায়, নির্মমতায়, বিভীষিকায় ও বেইনসাফীতে ১৯৭২-৭৫কে ম্লান করে দিয়েছে। ১৯৭৫ সনের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে গৃহীত সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী)

www.pathagar.com

আইন (১৯৭৫ সনের ২ নং আইনের) মাধ্যমে বাকশাল কায়েম করে একদলীয় শাসনের সুযোগে শেখ মুজিবর রহমান নিজেকে দেশের রাজাধিরাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মাত্র সাত মাস পর ১৯৭৫ এর সেনা বিপবে সব কিছু ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। ৫ বছরের দুঃশাসনের শেষের দিকে শেখ হাসিনা তার প্রধান মন্ত্রিত্ব ও ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কায় প্রধান বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে আজ্ঞাবহ ও অন্ধ সমর্থক সংসদ সদস্যদের দিয়ে তার নিজের ও ভগ্নি রেহানার আজীবন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আইন ২০০১ (২০-৬-২০০০) পাশ করিয়ে নিয়ে সাম্রাজ্ঞীর মর্যাদায় নিজেকে ও তার ভগ্নীকে অভিষিক্ত করলেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস মাত্র ৩ মাস ১১ দিন পর সেনা বিপ্লবে নয়, নির্বাচনে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই কলঙ্কজনক আইনের অস্তিত্বে আঘাত এল এবং আরও ৬২ দিন পর তা দেশের আইনের পৃষ্ঠা থেকে চিরতরে মুছে গেল। ক্ষমতায় না থেকেও ক্ষমতার দোর্দন্ড প্রতাপ এবং বেহিসাবী সরকারী অর্থ ভোগের যাবতীয় গৃহীত পরিকল্পনা সব খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেল। নিরাপত্তা আইনে এসএসএফ অধ্যাদেশ ১৯৮৬ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী যে নিরাপত্তা সুবিধা পান তা শেখ সাহেবের দুই কন্যার জন্য ব্যবস্থা করা হল। পার্থক্য এইটুকু কোন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র পদে থাকাকালেই এই সুবিধা পান কিন্তু শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা যতদিন বেঁচে থাকবেন, পদে থাকুন বা না থাকুন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মত এসএসএফ (সেনাবাহিনীর বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী) নিরাপত্তা ও আবাসিক সুবিধা ভোগ করবেন। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা যে কোন স্থানে যে ধরনের নিরাপত্তা চাইবেন তা আজীবন তাদের চাহিদা মত প্রদান করতে হবে এবং এসব ব্যাপারে তাদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ আইন ছিল বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী এবং সরকার, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, কেয়ারটেকার সরকার ইত্যাদির জন্য হুমকি স্বরূপ ও চ্যালেঞ্জ সৃষ্টিকারী। প্রধান বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল সংবিধানের মৌলিক কাঠামো অনুযায়ী সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান। বাংলাদেশ রাজতন্ত্র নয় প্রজাতন্ত্র, দুই জন ব্যক্তির জন্য সংবিধানে পৃথক কোন স্টেটাস নেই। উত্তরাধিকার সূত্রে এরূপ কোন অধিকার পাওয়ার সুযোগ নেই। বিএনপি ক্ষমতায় গেলে এ আইন বাতিল করবে।

নিরাপত্তা আইন ২০০১ বাতিল

২রা ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে এই আইনটি বাতিল হয়ে যায়। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় 'প্রধানমন্ত্রী না থেকেও প্রধানমন্ত্রীর দাপট ও শান শওকত দেখিয়ে জনগণকে প্রভাবান্বিত করতে চেয়েছিলেন শেখ হাসিনা। বিপুল অর্থ ব্যয়ের কথা উলেখ করে আইনমন্ত্রী বলেন শেখ হাসিনার জন্য এসএসএফ-এর নিরাপত্তা দিতে প্রতি দিন ২ লাখ ৯১ হাজার টাকা হিসাবে বার্ষিক খরচ হবে ১০ কোটি ৪৮ লাখ ৫ হাজার টাকা। বিরোধী দলীয় নেত্রী (শেখ হাসিনা) এসএসএফ-এর মহা-পরিচালক-কে পত্র দিয়ে জানিয়েছেন যে তিনি ৬ই ডিসেম্বর থেকে ৩রা জানুয়ারী পর্যন্ত ২৯ দিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন।

www.pathagar.com

ঢাকা থেকে লন্ডন, মায়ামী ও নিউইয়র্ক হয়ে তিনি ঢাকা ফিরবেন। এই ব্যক্তিগত ও বেসরকারী সফরে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। এই সফরের জন্য ৯ জন কর্মকর্তা এবং এক জন ডাক্তারকে শেখ হাসিনার সঙ্গে যেতে হবে। তাছাড়া আমেরিকায় এক জন সার্বক্ষণিক ডাক্তার তার সাথে থাকতে হবে। এর ব্যয় নির্বাহ করতে হবে বৈদেশিক মুদ্রায় এবং এই সফরের জন্য খরচ হবে ৭৮ লাখ টাকা। শেখ রেহানা-ও দেড় মাস যাবৎ বিদেশে অবস্থান করছেন। তার জন্যও অনুরূপ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। কি পরিমান অর্থ ব্যয় করতে হবে তা সহজেই বোধগম্য। এ অর্থ ব্যয় ন্যায়সঙ্গত নয়। পিতৃমাতৃ হত্যার এও ছিল এক নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আওয়ামী লীগ শাসনামলের পঙ্গু প্রায় জাতিকে গোরস্থানে পাঠানোর ঘৃণ্য উদ্যোগ।

শেখ হাসিনার ক্ষমতা হস্তান্তর

সময় বা কাল বহমান, ধরে রাখা যায় না। ক্ষমতার দম্ভ চিরস্থায়ী হয় না, অমানিশার অন্ধকারও স্থায়ী হয় না, ক্ষমতার মেয়াদ শেষে গদি ছাড়তে হয়, অমানিশার অন্ধকার ভেদ করে সোনালী প্রভাতের সূচনা হয়। শেখ হাসিনাকেও ক্ষমতার দম্ভ হস্তান্তর করতে হলো কেয়ারটেকার সরকারের কাছে। কিন্তু গদী ছাড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শেখ হাসিনা সময়টি ব্যয় করলেন ২০০১ নির্বাচনে জয়লাভকে নিশ্চিত করার জন্য নিজের ঘরকে গুছিয়ে নিতে, প্রশাসন, পুলিশ ও নির্বাচন কমিশন সহ সমগ্র নির্বাচনী প্রশাসনকে মনের মাধুরী দিয়ে সাজিয়ে নিতে। সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে দলীয় যন্ত্রে পরিণত করার লক্ষ্যে আমলাতন্ত্র ও পলিশ বিভাগের ব্যাপক দলীয়করণ করা হয়। রাজনৈতিক বিরোধীতাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আওয়ামী লীগের এক বিশাল সশস্ত্র ক্যাডার গড়ে তোলা হয়। গুরুত্বপূর্ণ অনেক এলাকার রাজনীতি আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দলের প্রধান প্রধান সন্ত্রাসীদের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে দেওয়া হল। মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই নির্বাচন দেবেন বলে বার বার ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও শেখ হাসিনা তার মেয়াদের শেষ মুহূর্তটি কাজে লাগিয়ে যখন নিশ্চিত হলেন কেয়ারটেকার সরকার, নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, পুলিশ সবাই তার অনুকূলে কাজ করবে এবং তার নীল নকসা অনুযায়ী ভোটের ফলাফল প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত সব কিছু পরিচালিত হবে তখনই এককালীন জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে পরম স্বস্তিতে পুনঃ নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতার মসনদে ফেরার প্রত্যাশা নিয়ে তিন মাসের অবসরে গেলেন।

শেখ হাসিনার পতনের কারন

কিন্তু অলক্ষে কি যেন ঘটে গেল। প্রথম রাতেই বিড়াল মারার মত ঘটনা সব কিছুকে ওলট পালট করে দিল। হাসিনার নীল নকশার নীলাভ চিত্রগুলির উপর কে যেন কাল রং ছড়িয়ে দিল - নকসাগুলি তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলল।

www.pathagar.com

এ সম্পর্কে বিশ্ব বিখ্যাত সাংবাদিক ও কলামিস্ট সিরাজুর রহমান লন্ডন থেকে ইনকিলাবের ১লা অক্টোবর ২০০১ তারিখের সংখ্যায় মন্তব্য করেন, "হাসিনার অঙ্কে কিছুটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। লতিফুর রহমান এক কালে আওয়ামী লীগের জেলা সভাপতি অবশ্যই ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি যে ন্যায় ও আইনের রক্ষক বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতিও হয়েছিলেন সে কথা হাসিনা ধর্তব্যে আনেননি। সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ এক কালে শেখ মুজিবের আইন উপদেষ্টা এবং আওয়ামী লীগের সমর্থক অবশ্যই ছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি যে ন্যায় নীতি এবং বিবেককে বর্জন করবেন না সে কথা হাসিনা ভাবতে পারেননি। তত্ত্বধায়ক সরকারের অন্য উপদেষ্টারাও সে রকম কর্তব্য বোধ ও ন্যায় নীতির প্রমাণ দিয়ে শেখ হাসিনাকে ভয়ানক হতাশ করেছেন। এটা জানা কথা যে, যারাই হাসিনাকে হতাশ করেন অথবা তাকে অন্ধ সমর্থন দিতে অস্বীকার করেন হাসিনার দৃষ্টিতে তারা সবাই রাজাকার এবং স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি। সর্বপ্রথমেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিছু সংখ্যাক দলীয়কৃত আমলাকে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে অন্যত্র সরালেন ও কিছু সংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলী করলেন। গডফাদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হল, কোন কোন ক্ষেত্রে সে কাজে সেনাবাহিনীরও সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। এসব ওয়ার লর্ডদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোর নির্বাচনী ফলাফল আওয়ামী লীগের জন্য অনিশ্চিত হয়ে দাড়ায়। আওয়ামী লীগের কর্মী ও ক্যাডাররা যথেচ্ছা ভোট কেন্দ্রগুলো দখলে রাখতে এবং ব্যালট বক্স ছিনতাই কিংবা ভূয়া ভোট দিয়ে বাক্স ভর্তি করতে পারবে বলে নিশ্চয়তাও আর রইলো না। হয়ত দলের নির্বাচনী ব্যয়ের অর্থ সংগ্রহের জন্যই হবে গদিতে থাকার শেষের কয়েক দিনে কারিগরী সম্ভাব্যতা যাচাই না করেই আন্তর্জাতিক বাজার দরে অনেক বেশি মূল্যে হাজার হাজার কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল এমন সব প্রতিষ্ঠানকে যেগুলোর আসল মালিক আওয়ামী লীগ নেতারা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেগুলোর মাত্র কয়েকটা স্থগিত করতে পেরেছেন। কিন্তু তাতেই আওয়ামী লীগের পর্বত প্রমাণ দুর্নীতির কিছু দৃষ্টান্ত ফাঁস হয়ে যায়। তবে শেখ হাসিনার নীল নকশা সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত হয়ে গেলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভোট কেন্দ্রগুলোতে সেনা মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায়। শেখ হাসিনা নেশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে তার শসস্ত্র ক্যাডারদের সকলে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে, এমনকি তাদের উপস্থিতিতেও বন্দুকবাজী করার সাহস পাবে না।"

নির্বাচনী যুদ্ধে শেখ হাসিনা তার নীল নকসা বাস্তবায়ন করার কোন সুযোগ না পেয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। স্বভাবসুলব উগ্রতা নিয়ে তিনি বিপক্ষ জোটকে স্বেচ্ছাচার, রাজাকার ও ভোট চোরের জোট হিসাবে আখ্যায়িত করে অহরহ গালিগালাজ শুরু করলেন এবং একই সঙ্গে কেয়ারটেকার প্রধান ও সদস্যদের, প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে রাজাকার হিসাবে কটূক্তি করতেও দ্বিধা করলেন না। শেখ হাসিনার সুরে সুর মিলিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা নেত্রী, সমর্থক, চাটুকার বুদ্ধিজীবীর দল প্রচার করতে থাকে যে যারাই এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরোধী তারাই

www.pathagar.com

'রাজাকার', তারাই 'মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি', তারাই '১৯৭১ সনের পরাজিত শত্রু' ইত্যাদি। এটা ছিল সমগ্র জাতির জন্য অপমান বিশেষ করে ১৯৭১ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। এসব বাক্যবান বেগম জিয়ার নিতৃত্বে গঠিত ৪ দলীয় ঐক্যজোটের বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং ১৯৭১ পরবর্তী প্রজন্ম ও নতুন ভোটাধিকার প্রাপ্ত যুবক যুবতীদের প্রচন্ডভাবে আওয়ামী লীগ বিরোধী করেছে। ভোট কেন্দ্রে উপচে পড়া নরনারী পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে নিঃশব্দে যে ব্যালট বিপ্লব ঘটিয়ে দিল তা ছিল ঐতিহাসিক, বিস্ময়কর ও অভাবিতপূর্ব। আর একটি ১৯৭৫ এর স্মরণ করিয়ে দিল ভোটের ফলাফল। পার্থক্য এইটুকুই ১৯৭৫এ ছিল সেনা বিপব আর ২০০১এ ঘটে গেল দেশবাসী আপামর জনতার নিঃশব্দ নীরব ভোট বিপ্লব যা রক্ত না ঝরিয়ে অত্যাচারী, জুলুমবাজ, দুর্নীতিবাজ ও ভারতের সেবাদাস সরকারের পতন ঘটিয়ে দিল। প্রখ্যাত বাম সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ বদরউদ্দিন ওমর যুগান্তর পত্রিকার ৫ই অক্টোবর ২০০১ তারিখের পত্রিকায় আওয়ামী লীগের ঔদ্ধত্যের নিষ্করুণ পরিণতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "আওয়ামী লীগকে দৃঢ় ও সুশৃংখলভাবে প্রত্যাখ্যান করার মূল কারণ আওয়ামী লীগের বিগত পাঁচ বছরের শাসন আমলে তাদের লুন্ঠন, দুর্নীতি, সন্ত্রাশ, দুবৃত্তসুলভ আচরণ এবং সীমাহীন ঔদ্ধত্যের মধ্যেই নিহীত ছিল। আওয়ামী লীগের পতনের পটভূমি আওয়ামী লীগ নিজেই রচনা করেছে। আওয়ামী লীগের পরাজয়ের এক নম্বর কারণ আওয়ামী লীগ।" ১৯৯৬ সনে ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯৯ সন পর্যন্ত আওয়ামী আমলে সংঘটিত অপরাধের যে চিত্র দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ৮ই অক্টোবর ২০০০ তারিখের পত্রিকায় ছাপা হয় তা নিম্নরূপ ঃ নারী নির্যাতন ২৪,২৬৩টি, শিশু নির্যাতন ৮,১১৬টি, ধর্ষণের মামলা ৮,১৩৭টি, যানবাহন চুরি ৪,৬৪৮টি, দস্যুতা ৬,১৬০টি, মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণ ২৯৩টি, ছিনতাই ৫,০১২টি।

আওয়ামী লীগের পতনের মধ্য দিয়ে বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ৪ দলীয় ঐক্যজোট বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে ২১৪টি সংসদীয় আসন (বিএনপি ১৯১, জামায়াতে ইসলামী ১৭, ইসলামী ঐক্যজোট ২, জাপা নাজিউর ৪টি) নিয়ে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং আগামী ৫ বছর দেশ শাসনের ম্যান্ডেন্ট লাভ করে। শেখ হাসিনা নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পরও চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করলেন। দেশ বিদেশে শান্তিপূর্ণ, অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন হিসাবে প্রশংসিত নির্বাচনকে স্থুল কারচুপির নির্বাচন হিসাবে অভিহিত করে খোলা মনের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হলেন এবং নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেবেন বলে বিভিন্ন সময় জাতির কাছে প্রদত্ত ওয়াদা বেমালুম ভুলে গেলেন। ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ায় উম্মত্ততার বহিঃ প্রকাশ হিসাবে তিনি প্রলাপ বকতে থাকেন। তিনি মনে করেছিলেন বাংলাদেশ তার পিতা থেকে প্রাপ্ত ওয়ারিশান সম্পত্তি এবং দেশের জনগণ তার প্রজা। সুতরাং তিনিই একমাত্র ভোট পাওয়ার অধিকারী। তিনি একবারও চিন্তা করেননি যে তিনি হেরে যেতে পারেন, একবারও তার চিন্তায় আসেনি যে পিতৃমাতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে তিনি যে দেশবাসীর বিরুদ্ধে ক্ষমতার দম্ভ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার পরিণতি হবে এতটাই ভয়ঙ্কর। নির্বাচনের এই ফলাফল সম্পর্কে জাতি ছিল নিশ্চিত কিন্তু আশঙ্কা ছিল কেয়ারটেকার সরকার ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে। বিগত কেয়ারটেকার সরকার এবং নির্বাচন কমিশনগুলি রাষ্ট্র ও নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেভাবে বিতর্কিত হয়েছেন অষ্টম জাতীয় নির্বাচন কালে সেসব বিতর্কের কোন অবকাশই ছিল না। প্রথম দিন থেকেই বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকার দেশবাসীর মনে এই আস্থা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন যে তাদের নিরপেক্ষতার শিকড় অনড় ও শক্তিশালী। ক্ষমতার অপব্যবহার করে হাসিনা ব্যক্তি ও নিজ দলের স্বার্থে যে বাগান সাজিয়েছিলেন তা ভেঙ্গেচুরে নতুন করে সাজাতে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতিবাজ ও পক্ষপাতদুষ্ট কর্মকর্তাদের সরিয়ে নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তুলতে, সন্ত্রাসীদের কালো হাত ও উদ্যত ফনাকে ভেঙ্গে দিতে, বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারে এবং সর্বোপরি যেখানেই আগ্রাসন সেখানেই সেনাবাহিনী নিয়োগ এই নীতি অবলম্বন করে কেয়ারটেকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। শুধু নির্বাচন পরিচালনায় নয়, মাত্র ৩ মাসের সরকার পরিচালনায়ও তার ও তার সহযোগীদের সুশৃংখল শাসন ব্যবস্থা, চরমনিরপেক্ষতা ও দুর্জয় সাহসিকতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি মডেল হয়ে থাকবে।

অধ্যায় ২১

আমার প্রতি আওয়ামী বিদ্বেষ

শেখ মুজিবের শাসনামলে কুষ্টিয়া জেলার আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বৈরিতা ও শত্রুতার ফসল হিসাবে কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় আমার উপর দুইটি মৃত্যুদন্ড প্রদানকারী ধারায় একটি মোকদ্দমা স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৮ মাস পর যেভাবে দায়ের করা হয় তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে সাক্ষীর তালিকা সাজিয়ে এবং মোকদ্দমার শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন স্থান থেকে ভাড়াটে সাক্ষী সংগ্রহ করে আমার জন্য কিভাবে ৩০ বছরের কারা জীবন এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের কারাভোগের ব্যবস্থা করলেন তাও এই বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। সরকার এ্যামেনেস্টি দিয়ে আমাকে ১৯৭৩ সনেই কারাগার থেকে মুক্ত করে দিলেও আমার দাখিলী আপিল মোকদ্দমা আমি প্রত্যাহার না করে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে আপিল মামলায় অংশগ্রহণ করে যে ফলাফল প্রাপ্ত হই তাও উলেখ করেছি। উক্ত রায়ের বিস্তারিত বিবরণ ৩৫ ডিএলআর ৪১, ৩ বিএলডি ৭৫ এবং ২ বিসিআর ৩৯৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে যা প্রতিটি আইনজীবীর অবশ্যই জানার কথা। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে আওয়ামীপন্থী আইনজীবীদের শেখ সাহেবের

www.pathagar.com

১৯৭৩ সনের এ্যামেনেস্টি প্রদান ও ১৯৮১ সনে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক ফৌজদারী সমস্ত ধারায় আমাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করায় তাদের প্রতিশোধ স্পৃহা বেড়ে যায় কিন্তু ক্ষমতার বাহিরে থাকায় তাদের পক্ষে কোন নতুন অভিসন্ধি গ্রহণ সম্ভব হয়নি। তাদের এ আচরণের কারণে মনে হয় ষাট দশক পর্যন্ত কুষ্টিয়া জেলায় শেখ মুজিবের মুক্তি সহ বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে কোন পদ বা গদীর লোভে নয় বরং আদর্শিক কারণে আমি ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করি। আল্লাহতাআ'লার অসীম করুণায় আওয়ামী ষড়যন্ত্রে প্রদত্ত ৩১ বছরের কারাদন্ড মাত্র পৌনে সাত শত দিনের কারাজীবনে সঙ্কুচিত হয়ে যায় এটাও ছিল তাদের জন্য মানসিক অশান্তির কারন। এত বিপর্যয়ের পরও আলাহ মেহেরবান সুদীর্ঘ ৫১ বছরের পেশা জীবনে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন এবং তারই করুণা ভোগ করে পেশায় দক্ষতা ও সুনাম নিয়ে প্রতিষ্ঠিত রয়েছি তা তাদের মনে ইর্ষা ও বিদ্বেষের আগুন সৃষ্টি করে। এসব আইনজীবী বন্ধুগণ সুযোগ পেলেই আমার ৩১ বছরের দন্ডের কথা আওড়াতে ভুল করেন না কিন্তু হাই কোর্টের রায়ের কথা আদৌ উল্লেখ করেন না। পেশাগত জীবনে এ আচরণ শুধু অন্যায়ই নয় নৈতিকতা বিরোধীও বটে।

সাংবাদিক অসাধুতার চরম বহিঃপ্রকাশ

দ্বিতীয় বার আওয়ামী লীগ শাসন আমলে ভারতীয় সাহায্যপুষ্ট ও আওয়ামী পন্থী সংবাদপত্রের মাধ্যমে শুরু হয় ১৯৭১-৭৫ দিনগুলো ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা। 'দালালরা কে কোথায়' এই শিরোনামে শুরু হয় অতীতের আওয়ামী রাজনীতির প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে চরিত্র হননের পালা এবং অপপ্রচারের মাধ্যমে ও কাল্পনিক ঘটনা প্রচার করে সরকারী যন্ত্রের সাহায্যে মিথ্যা মোকদ্দমায় জড়ানোর প্রচেষ্টা। কারাগারে বসে 'মুজিবের কারাগারে পৌনে সাতশত দিন' নামে লিখা যে বইটি ১৯৯০ সনে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছিলাম তার বিরুদ্ধে মুনতাছির মামুন আজকের কাগজ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে সমালোচনা করেছেন। এটা ছিল দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার, আমার যুক্তির সঙ্গে তাকে একমত হতে হবে এ দাবী আমি করি না। ভাষা প্রয়োগে কঠোরতা থাকলেও তিনি আমার চরিত্র হনন করেননি। কিন্তু দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক মুদ্রাকর, প্রকাশক মো: আতিকুলাহ খাঁন মাসুদ, উপদেষ্টা সম্পাদক তোরাব খাঁন এবং নির্বাহী সম্পাদক বোরহান আহমদ ৭-১-২০০১ তারিখের জনকণ্ঠ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরে একাধিক রংয়ে 'কুষ্টিয়ার সাদ আহমদের জেল হয়েছিল ৩১ বছর, এখনও সে পাকির স্বপ্নে বিভোর'- শিরোনামে একটি কুৎসিত ও বিকৃত চেহারা সহ মিথ্যা, কাল্পনিক, যোগসাজসী, বানোয়াটী ও চরম মানহানিকর যে রিপোর্ট বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হতে একযোগে প্রকাশ করেন তা হল সাংবাদিক অসাধুতার চরম বহিঃপ্রকাশ।

www.pathagar.com

দৈনিক জনকণ্ঠ প্রত্রিকার মিথ্যাচার

রিপোর্টে আমার বিরুদ্ধে যে উক্তিগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মানহানিকর তা সংক্ষেপে ছিল নিম্নরূপ ঃ 'বৃহত্তর কুষ্টিয়ার রাজাকার শিরোমনি এ্যাডভোকেট সা'দ আহমদ এখনো পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেন। পাকিস্তানপন্থী এই মানুষটি এখন পর্যন্ত মৌলবাদী সংগঠনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং স্থানীয় ইসলামী চরমপন্থীদের উপদেষ্টা। ৭১এর গণহত্যা, ধর্ষণ সহ বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত থাকার অপরাধে স্বাধীন দেশে যে তিন জনের ৩০ বছরের উর্দ্ধে শাস্তিস্বরূপ কারাদন্ড হয়েছিল সা'দ আহমদ তাদের একজন। সা'দ আহমদের রাজাকার বাহিনী ও পাকিস্তান আর্মিদের মিলিত বাহিনীর সাথে ওপেন ফাইটে কুষ্টিয়ার অনেক মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে মা-বোনেরা। ঘরবাড়ী জ্বালানো থেকে শুরু করে ধনী মহাজন ও ব্যবসায়ীদের ধন সম্পদ লুটের নির্দেশক ছিল সা'দ আহমদ। সে ছিল বৃহত্তর কুষ্টিয়ার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ..... কুমারখালী থানার পান্টি ইউনিয়নের শান্তি চেয়ারম্যান খেলাফত হোসেন তাকে চিঠি লিখেছিল এভাবে যে, "এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে রাজাকারদের সম্মুখ যুদ্ধে ৩ জন রাজাকার ও ২ জন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে। আপনি অতি সত্বর ১০০ রাজাকার পাঠান।" এ্যাডভোকেট সা'দ আহমদ ঐ চিঠির পাশে স্বাক্ষর করে সিল করে কুষ্টিয়ার তৎকালীন এসপিকে নির্দেশ দেয় - "সেন্ড ফিফটি ট্রেন্ড রাজাকার টু পান্টি ইউনিয়ন এ্যাট ওয়ান্স।" সা'দের বিরুদ্ধে '৭২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী কুষ্টিয়া কোর্টে মামলা শুরু হয়। মামলা নং-২৭/৭২ স্পেশাল ট্রাইবুনাল। তৎকালীন জেলা জজ (১ নং স্পেশাল ট্রাইবুনাল) মিঃ রবীন্দ্র কুমার বিশ্বাস ৪২ পৃষ্ঠা সংবলিত রায় ঘোষণা করেন '৭৩ সালের ২১শে মার্চ। আসামী সা'দ আহমদকে ৩১ বছর কারাদন্ড দেওয়া হয়। ... পরবর্তীতে হাইকোর্ট বিভাগের ক্রিমিনাল আপীলের (নম্বর ২২০/৭৩) প্রেক্ষিতে বিচারপতি হাবিবুর রহমান ও বিচারপতি মোস্তফা কামালের আদালতে আপীলটি আংশিক মঞ্জুর করে তার যাবজ্জীবন কারাদন্ডের বদলে ৩ বছরের জেল ও ৫০০ টাকা জরিমানা হয়। এ সময় 'মুজিবের কারাগারে পৌনে সাতশত দিন' নামে একটি বইও লিখে সে নিজেদের মহলে বিতরণ করে। সা'দ আহমদ ও তার বাহিনীর লুন্ঠনকৃত মালামাল একটি নির্দিষ্ট গুদামে রাখা হত। ঐ সময় স্থানীয় সোনালী ব্যাংকে জেলা শান্তি কমিটির নামে একটি একাউন্ট ছিল, সেখানে হিন্দু ও দেশত্যাগী আওয়ামী লীগারদের সম্পদের বিক্রয়লব্ধ টাকা জমা ছিল। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের ২ তারিখে সা'দ আহমদ ব্যাংক থেকে ১ লাখ টাকা তুলে নেয় অন্যদের অগোচরে। ব্যাংকের এসব নথিপত্র অন্য অনেক প্রমাণপত্র সহ মামলা চলাকালীন কুষ্টিয়ার চীফ স্পেশাল পিপি হাজী আমজাদ হোসেন কোর্টে দাখিল করেন। তার সম্পর্কে আরও জানা যায় হিন্দুদের বেশ কটি বাড়ী সে দখল করেছিল। এমনকি পিস কমিটির অফিস বানিয়েছিল এসব দখল করা বাড়ীতে। বর্তমানে এ্যাড: সাদ আহমদ কুষ্টিয়া জজ কোর্ট সহ বিভিন্ন জেলায় মামলা পরিচালনা করে। জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলি সেই দেখাশোনা করে।

www.pathagar.com

তার অপকর্মের স্মৃতি মনে করে কুষ্টিয়াবাসী এখনও শিউরে ওঠে। জেনারেল টিক্কা খানের নিকটাত্মীয় সা'দ আহমদ লুটের টাকায় গড়ে তুলেছে 'রিজিয়া সাদ ইসলামিক সেন্টার'। ৩৫ নম্বর ডিএলআর-এ সা'দ আহমদের অপকর্মের অনেক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

জনকণ্ঠ পত্রিকা আমি পড়ি না। ৭-১-২০০১ তারিখ সকালে ঢাকা থেকে আমার এক শুভাকাংখী আমাকে জানালেন খবরটির কথা। আমি স্থানীয় হকারের দোকান থেকে পত্রিকাটির কয়েকটি সংগ্রহ করে পড়ে বিস্মিত হলাম। মহান পেশা সাংবাদিকতার স্ট্যান্ডার্ড এত নীচে নেমে যেতে পারে এবং পরিবেশনা এত মিথ্যা ও বিদ্বেষপূর্ণ হতে পারে তা ছিল আমার চিন্তার বাইরে। খবরটিতে রিপোর্টারের কোন নাম ছিল না যদিও অন্যান্য যাবতীয় খবরে রিপোর্টারের নামের উলেখ ছিল। অনুমান করতে কষ্ট হল না যে স্থানীয় আওয়ামী আইনজীবী বন্ধুগণ এই মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক রিপোর্ট তৈরী করে জনকণ্ঠ পত্রিকাকে খোরাক জুগিয়েছেন কিন্তু তারা নিজেরা নেপথ্যে রয়ে গেছেন। ঘটনা প্রবাহ তাদের অন্ধকার জগত থেকে ময়দানে আসতে বাধ্য করল। সম্পাদকদের প্রতি নোটিস পাঠালাম আমার নিকট এক সপ্তাহের মধ্যে লিখিতভাবে দুঃখ প্রকাশ করে মাফ চাইতে, প্রতিবাদলিপি হুবহু জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশ করতে এবং কার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এই অপমানকর খবর ছাপানো হয়েছে তার নাম ঠিকানা প্রকাশ করতে। নির্ধারিত দিনের পরেও কোন সাড়া না পাওয়ায় অবশেষে ফৌজদারী আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করতে হল। ২৩-১-২০০১ তারিখে জনকণ্ঠের ৩ সম্পাদকের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আরজী দাখিল করায় আইনজবী বন্ধুরা মামলা সম্পর্কে জেনে গেলেন। ২৫-১-২০০১ তারিখে আমার জবানবন্দী প্রদানের দিন ধার্য ছিল। আওয়ামী লীগের প্রাক্তন জেলা সেক্রেটারী এবং স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচারে নিয়োজিত আমার কেসের পাবলিক প্রসিকিউটর বার বার অনুরোধ রাখলেন নালিশী দরখাস্ত তুলে নিতে এবং একই অনুরোধ রাখলেন আওয়ামী লীগের জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ যারা অনেকেই আইনজীবী। জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে মানহানীর মোকদ্দমা অথচ মামলা তুলে নেবার জন্য আওয়ামী আইনজীবীরা অনুরোধ করছেন বা চাপ সৃষ্টি করছেন তার যোগ পরম্পরা বুঝতে অসুবিধা হচেছ জানালাম। পরিশেষে বললাম জনকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদকদের দুঃখ প্রকাশ করে কাগজে ছাপতে কিন্তু আওয়ামী আইনজীবীরা একই দাবীতে অনঢ় থাকলেন যে নালিশী দরখাস্ত উঠিয়ে নিতে হবে। এই অন্যায় দাবীর প্রতি নতি স্বীকার আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। জবানবন্দী দেবার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর এক ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দাঁড়ালাম। আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পিপি এপিপি জিপি এজিপি ও আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবীরা একযোগে এসে কোর্টের চেয়ারগুলো দখল করে ফেললেন এবং ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইতে লাগলেন। এর মধ্যে অনেকেই ছিলেন আমার পেশা জীবনের সহযোগী, অনেকেই আমার সন্তানের বয়সের, অনেকেই আমার জুনিয়রদের পুত্র আর অনেকেই পেশা জীবনে আমার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করেছে

www.pathagar.com

কিন্তু আওয়ামী রাজনীতির ট্রেনিং এদেরকে অন্ধ করে দিয়েছে, এবং ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে। আমার জবানবন্দী প্রদান শুরু করলাম কিন্তু এগোনো গেল না। আওয়ামী আইনজীবী বন্ধুগণ যারা সমস্ত আসন দখল করে ছিলেন তারা হট্টগোল শুরু করে দিলেন, তাদের সংগৃহীত কর্মীরা আদালতের মধ্যে আমার বিপক্ষে শ্লোগান শুরু করে দিল আর তাদের সবার আক্রমনাত্মক চেহারা ও ভাবভঙ্গী দেখে ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুশান্ত কুমার কুন্ডু আদালতের পরিবেশ ও মর্যাদা রক্ষা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে নিজের নিরাপত্তার জন্য আসন পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। কুষ্টিয়ার আওয়ামী পন্থী 'আন্দোলনের বাজার' পত্রিকা ২৬শে জানুয়ারীর সংখ্যায় লিখা হল 'বাক বিতন্ডা ও হট্টগোল, চরম বিরোধীতার মুখে এ্যাডঃ সাদ আহমদ জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেননি' ... এই পত্রিকায় কুষ্টিয়া বারের ৩০০ আইনজীবীদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন আওয়ামী আইনজীবীদের স্বাক্ষরিত বক্তব্য ছাপিয়ে মিথ্যা করে প্রচার করা হল 'এক পর্যায়ে এ্যাডঃ সাদ আহমদ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে বিপক্ষে আপত্তিকর অসত্য বক্তব্য দেওয়া শুরু করলে আদালতে উপস্থিত স্বাধীনতা পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়'। মোকদ্দমা করলাম জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে মানহানিকর সংবাদ পরিবেশনের জন্য সেখানে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে কোন কিছু বলার আদৌ প্রয়োজন পড়ে না। যাই হোক জবানবন্দী প্রদানের জন্য পুনরায় দিন ধার্য হল ২৮শে জানুয়ারী রোববার।

স্থানীয় পত্রিকা মারফত জানলাম রবিবার আদালত প্রাঙ্গণে বিশৃংখলার আশঙ্কায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক প্লাটুন অস্ত্রধারী পুলিশ চাওয়া হয়েছে। রবিবার আদালত প্রাঙ্গনে আওয়ামী আইনজীবী বন্ধুগণ যে দৃশ্যের অবতারণা করলেন তা সত্যই দুঃখজনক এবং আমাদের পেশা জীবনে লজ্জাজনক। এজলাশের বাহিরে আদালত প্রাঙ্গণে মাইক সেট করে আওয়ামী জেলা নেতৃবৃন্দ ও আইনজীবীদের জোরালো বক্তৃতা হচ্ছে তাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষায়, জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে কর্মী সংগ্রহ করে হাতে তালি পাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আওয়ামী নেতৃবৃন্দ কেউ উপস্থিত হতে বাদ যাননি। ৮০ বছরের বৃদ্ধ জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি, প্রাক্তণ আঃ লীগ সেক্রেটারী ও সাবেক পিপি যিনি আমার বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করেছিলেন তারাও জনকণ্ঠের পক্ষে আদালতে উপস্থিত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটিয়েছেন কুষ্টিয়ার আওয়ামী আইনজীবী বন্ধুগণ, তারা যোগসাজশী করে জনকণ্ঠের সম্পাদকদের প্ররোচিত করেছেন মিথ্যা রিপোর্ট ছাপানোর জন্য। জনকণ্ঠের মাইক্রোবাসে করে ঢাকাস্থ কর্মকর্তাগণ ২৫শে জানুয়ারী ও ২৮শে জানুয়ারী দুই দিন আদালত প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় মামলা থেকে সম্পাদকদের রক্ষা করার জন্যই আওয়ামী আইনজীবীদের এই প্রয়াস। ২৮শে জানুয়ারী রোববার আদালত প্রাঙ্গণে কুষ্টিয়া এএসপি (সদর) জনাব মতিয়ার রহমানের নেতৃত্বে ২ প্লাটুন সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েনের মধ্যে দিয়ে এজলাশ কক্ষে আইনজীবী ছাড়া অন্য সবার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মি.সুশান্ত কুমার কুন্ডু

www.pathagar.com

আওয়ামী আইনজীবীদের দুর্বল বাধা উপেক্ষা করে আমার পূর্ণ জবানবন্দী গ্রহণ করেন। এ ঘটনা হয়ত অনেকেই বিশ্বাস নাও করতে পারেন কেননা আইনজীবী কর্তৃক একজন ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের বিচার পাওয়ার অধিকারকে অস্বীকার করা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বিশ্বাসযোগ্য হবার কথা নয়। কিন্তু যারা সুপ্রিম কোর্টের মত সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকদের লাঠি মারার হুমকি দেয় তাদের পক্ষে নিম্ন আদালতে এরূপ ব্যবহার করা আদৌ কঠিন নয়। এর স্বীকৃতি জনকণ্ঠ পত্রিকার ২৯শে জানুয়ারীর সংখ্যায় পাওয়া যাবে। বলা হয় 'কড়া পুলিশ পাহারায় এবং মুক্তিযোদ্ধা, আইনজীবী জনতার তীব্র ক্ষোভ, উত্তেজনা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখে অবশেষে রবিবার কুষ্টিয়া আদালতে জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। ... এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে মুক্তিযোদ্ধা, আইনজীবী জনতা সা'দ বিরোধী মুহর্মুহ শ্লোগান দিতে থাকে এবং কুখ্যাত রাজাকারদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানায়'। কুষ্টিয়ার আওয়ামী পন্থী পত্রিকা 'আন্দোলনের বাজার'-এ একই দিনের সংখ্যায় লিখা হল 'আদালত প্রাঙ্গণে সাদা পোষাকধারী সহ প্রায় ২ প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এ্যাড: সাদ আহমদ জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা দায়ের করলেন'। কোন কোন আওয়ামী নেতা ও আইনজীবী এসব অবৈধ ও আদালত অবমাননাকর কাজে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবার নাম স্থানীয় পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেত কিন্তু আমার পেশা জীবনের সহযোগীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমিচীন বোধ করি নাই।

তিন জন সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানি মোকদ্দমার সমন জারি

মোকদ্দমায় আমার পক্ষে দলিলীক প্রমাণ ও সুপ্রিম কোর্টের রায় থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতির চাপে কাল ক্ষেপণের জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য বিষয়টি প্রেরণ করলেন। প্রথম তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট একটি সূক্ষ অজুহাত তুলে তদন্ত করতে অপারগতা প্রদর্শণ করলেন। এইভাবে বিষয়টি এক তদন্তকারী বিচারক থেকে অন্য জনের নিকট হস্তান্তরের পর ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ প্রদীপ কুমার বিশ্বাস অবশেষে আমার পক্ষে রিপোর্ট প্রদান করেন এবং তার ভিত্তিতে আমলী ম্যাজিস্ট্রেট ১৮/১১/০১ তারিখে তিন সম্পাদক আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৫০০/৫০১/৫০২ ধারায় সমন জারী ও আগামী ৩/১/২০০২ তারিখে তাদের হাজির হওয়ার আদেশ প্রদান করেন। ১লা অক্টোবরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভরাডুবী হওয়ায় এসব দিনে আওয়ামী নেতা ও আইনজীবীদের কোর্ট প্রাঙ্গণে দেখা যায়নি। ইং ৮/১১/০১ তারিখে জনকণ্ঠের ৩ সম্পাদকের বিরুদ্ধে মানহানির জন্য ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করে কুষ্টিয়ার প্রথম সাব জজ আদালতে একটি দেওয়ানী মামলা দায়ের করা হয়। দেওয়ানী আদালতের সমন সম্পাদক বিবাদীগণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় মোকদ্দমার জবাব দাখিলের জন্য ১২/১/২০০২ তারিখ ধার্য হয়েছে। এ মামলার বিরুদ্ধে আওয়ামী আইনজীবী বন্ধুদের বা তথাকথিত স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিদের কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি।

www.pathagar.com

১লা অক্টোবরের ঐতিহাসিক নির্বাচনী ফলাফলে তাদের দাম্ভিকতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। আদালত অবমাননা করার স্পর্ধাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের বিচারের দুয়ারে আশ্রয় নেবার অধিকার আওয়ামী আইনজীবীরা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। এর বিরুদ্ধেই ছিল আমার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও আপোষহীন পদক্ষেপ। শেখ হাসিনা আওয়ামী আইনজীবীদের বিপথগামী করেছে আর এরা সবাই মিলে হাসিনা ও আওয়ামী লীগের ভরাডুবি ঘটিয়েছে।

অধ্যায় ২২

সুষ্ঠু সমাজ গড়ার পথ

দ্বিতীয় মিলেনিয়ামের শুরুতেই জীবন ও মৃত্যুর মালিক আলাহ রাব্বুল আলামীনের অপার করুণায় বয়সের মাপকাঠিতে পৌনে এক শতাব্দীতে পদার্পন করেছি। মহাকালের হিসাবে এ সময়টি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও আমার জীবনে আদৌ কম নয়। ঘটনাবহুল সমাজে প্রতিনিয়ত যে অগণিত ঘটনাবলীর উদ্ভব হচ্ছে তার মধ্যে যেগুলির সঙ্গে আমার জীবন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, যেগুলি আমার মন মানস চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে, হাসি কান্না, আনন্দ বিরহ বেদনার জন্ম দিয়েছে, যেসব সৃষ্টিধর্মী ঘটনা আমার মনে উল্লাস সৃষ্টি করেছে, সমাজের যে সব ভাঙ্গন আমার জীবন জোয়ারে বাধার সৃষ্টি করেছে সেই সব বৈচিত্রময় ঘটনারাজী এই বই এর পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করেছি। জীবনের এই মেয়াদে তিনটি সমাজের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সাথে পরিচিত হয়েছি। বেনিয়া ব্রিটিশ জাতির অধীনস্ত ভারতে পরাধীন নাগরিক হিসাবে ২০ বছর, বেনিয়াদের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের নাগরিক হিসবে ২৫ বছর এবং স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে ৩০ বছর। বহু ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে ব্রিটিশ বেনিয়াদের গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে মুসলমানদের পৃথক আবাসভূমি হিসাবে ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল, ওয়াদা ছিল কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্র কাঠামো কায়েম করা হবে। কিন্তু পাকিস্তান আমলা ও সামরিক শাসনের নিগড়ে আবদ্ধ থাকায় স্বেচছাচারী শাসককূল ইনছাফ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম না করে অঞ্চলে অঞ্চলে বৈষম্য সৃষ্টি করলেন। যার ফলশ্রুতিতে এ অঞ্চলের জনগণ নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়ে তুলল। বহু জান মাল ও ইজ্জতের বিনিময়ে ১৯৭১ সনে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম শাসকগোষ্ঠী দেশ শাসনের নামে কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ও সাম্রাজ্যবাদী ইহুদী, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের এজেন্টে পরিণত হয়। ভুলে যায় দুঃখ দুর্দশাগ্রস্থ গণ মানুষের কথা। বাংলাদেশের ইতিহাসে ৩০ বছরের মধ্যে ২০ বছরের অধিককাল শাসককুল ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, শোষন এবং ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সামগ্রিকভাবে ২০০১ সন পর্যন্ত বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হতাশা ও নৈরাজ্যই প্রাধান্য পেয়েছে।

www.pathagar.com

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব -

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজও বিপন্ন। প্রতিবেশী ভারত গঙ্গার পানির নায্য হিস্যা না দিয়ে দেশের বিশাল এলাকাকে মরুভূমিতে পরিণত করেছে। আঙ্গরপোতা, দহগ্রাম, তালপট্টি, বেরুবাড়ী, পাদুয়া ভারতের জবর দখলে, চুয়ান্নটি যৌথ নদীর ৫১-টির উপর বাধ, গ্রোয়েন প্রভৃতি নির্মাণ করে আমাদের পানি সম্পদ লুট করে নিয়ে আমাদেরকে শুকিয়ে মারার চেষ্টা করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীদের উস্কানী দান, তাদেরকে ট্রেনিং ও অস্ত্র দিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে হানাহানি, খুন জখম ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে সহায়তা, ভারতীয় ঘৃণ্য অগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের বহিঃপ্রকাশ। হাসিনা সরকারের আমলে অসম ও অবৈধ চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতপন্থী পাহাড়ী গ্রুপের নিকট বাংলাদেশের এক দশমাংশ অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দেশের সাধারণ পরিস্থিতি

জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে হতাশা ও নৈরাজ্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাজ করছে জুলুম, নির্যাতন নিপীড়ন। মানুষের মৌলিক অধিকার ভুলুণ্ঠিত। ইসলাম ও বিসমিল্লার দোহাই দিয়ে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের ভোট নিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে নির্বাচন পূর্ব ওয়াদার বরখেলাফ করে জনগণের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে। জনগণের সরকার দাবী করা হলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও ক্ষমতার মসনদকে দলকেন্দ্রিক স্থায়ীত্বের জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। আজ জাতি যেমন সরকারগুলো প্রতি আস্থাহীন তেমনি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিও হতাশ। সততা, যোগ্যতা ও জনসেবা আজ রাজনীতি বা নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাপকাঠি নয়। এটা কোটিপতিদের ব্যবসা কেন্দ্র, কোটিপতিদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার হাতিয়ার মাত্র।

সামাজিক অবস্থা

দেশের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ। ঘুষ, দুর্নীতি, মদ, জুয়া ও সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতা দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সমাজ চরিত্রহীন, টাউট, বাটপার, মস্তানদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। মজলুম আজ সুবিচার থেকে বঞ্চিত। প্রশাসনের সর্বত্র আজ ঘুষের সয়লাব - সৎ লোক হয়ত আছেন কিন্তু তাদের দূরবীন দিয়ে আবিষ্কার করতে হয়। বিচার ব্যবস্থাও তার মহান মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। সর্বত্রই রক্ষক আজ ভক্ষক। সমাজের এই দূর্বিষহ অবস্থা থেকে মানুষ পরিত্রাণ চায়।

মহিলা সমাজ

সমাজে নারীরাই নির্যাতীতা বেশি। যৌতুক প্রথার যাঁতাকলে নারী সমাজ নিষ্পেসিতা। যৌতুকের তাড়নায় নারী নির্যাতন, নারী হত্যা, নারীর আত্মহত্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, প্রচার ও প্রগতির নামে নারীকে পণ্যরূপে মডেলিংয়ে ব্যবহার করে, সিনেমা টিভিতে নারীর নগ্নতাকে মূলধন করে গোটা সমাজকে যেনা ও ব্যভীচারের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বেশ্যাবৃত্তি আজ ঘৃণ্য ও লজ্জাজনক কোন কাজ নয়। এনজিওদের কল্যাণে এটা এখন যৌন শিল্প।

www.pathagar.com

সমাজে নারী পুরুষের অর্ধেক। এ অবস্থা চললে সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতি কল্পনা করা যায় না।

শিক্ষাঙ্গন

দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে চলছে এক চরম নৈরাজ্য ও অব্যবস্থা। শিক্ষাঙ্গনে মারামারি, হানাহানি, অস্ত্রের ঝনঝনানী, হত্যা, সন্ত্রাস আজ নিত্যকার ঘটনা। নৈতিকতা বিবর্জিত, ধর্ম নিরপেক্ষ ও উৎপাদন বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির জন্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। সরকারের শিক্ষা বিভাগ ঘুষ ও দুর্নীতির ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনকেও হার মানিয়েছে। নিজেদের অর্থে পিতামাতার নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে গিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে আমি নিজে যে জুলুমের শিকার হয়েছি তাতে মনে হত বেসরকারী উদ্যোগে নিজেদের অর্থ ঢেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া এদেশে আজ সওয়াবের কাজ নয় অর্থ ব্যয় করে জুলুম খরিদ করার সামিল। দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষাঙ্গণে একটি দলের ছাত্র নেতারা ছাত্রীদের ধর্ষণের সেঞ্চুরী পালন করে এরপরও কেন স্রষ্টা এই জমীনটাকে ভূমিকম্প দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেননি চিন্তা করতে বিস্ময় লাগে।

বর্তমান শাসনতন্ত্র

বাংলাদেশে যে শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা বহাল রেখে প্রচলিত সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন সম্ভব নয়। ভারতের অনুকরণে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, আমেরিকার পুঁজিবাদ, চীন, রাশিয়ার সমাজতন্ত্র সহ মানব রচিত কোন মতবাদের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সার্বিক মুক্তি সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বর্তমান শাসনতন্ত্র ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন এক সেক্যুলার শাসনতন্ত্র। এতে আলাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি নেই। এই শাসনতন্ত্রে কোরআন ও সুন্নাহকে আইনের ভিত্তি বা উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। যদিও জেনারেল জিয়ার আমলে সংবিধানের ৮(১) ও (২) ধারায় "সর্বশক্তিমান আল্লাহ'র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি" এবং জেনারেল এরশাদের আমলে সংবিধানের ২(২ক) ধারায় 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' শব্দগুলি সংযোজন করা হয়েছে কিন্তু সংবিধানের ৮(২) ধারায় 'তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না' বর্তমান থাকায় এসব ধারা বা সাংবিধানিক ওয়াদা অকার্যকর রয়ে গেছে। শেখ মুজিব, শেখ হাসিনা ইসলামকে দেশের সংবিধান বা আইনে আদৌ স্থান দিতে রাজী নয় কিন্তু যারা এসব পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তারা ইসলামকে কাগজে সীমাবদ্ধ রেখে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে বা বাস্তবায়ন করতে আদৌ রাজী ছিলেন না। মূলত এই প্রকার নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোন নীতিগত পরিবর্তন নেই। বর্তমান শাসনতন্ত্র একদিকে যেমন ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কহীন, ঠিক তেমনি মানুষের মৌলিক অধিকার খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদি প্রয়োজন নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক অবস্থা

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। শোষণ, বৈষম্য, বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি, বৈদেশিক ঋণের বিপুল বোঝা, মুনাফাখোরী, মজুতদারী, চোরাকারবারী ইত্যাকার মানবতা বিরোধী কর্মকান্ড জাতীয় অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। সাধারণ জীবনযাত্রা আজ দুর্বীসহ। একদিকে সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের নিয়মিত দু'বেলা খাওয়া পরার ব্যবস্থা নেই। নেই রোগ শোকের চিকিৎসার সুযোগ, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের চরম দুর্দিন, তারা পুঁজিবাদী শোষণ ও বঞ্চনার শিকার, দেশের মানুষ আজ গুটিকয়েক রাজনীতিবীদ কাম কোটিপতিদের হাতে জিম্মি। অর্থের প্রাচুর্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রাইভেট ফোর্স লালন করে এরা শাসন ক্ষমতা চিরস্থায়ী করে রেখেছে। এজন্য নেতা বদল হচ্ছে কিন্তু নীতি বদল হচ্ছে না, নির্বাচন সমাজের কোন মঙ্গলই বয়ে আনছে না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের শতকরা ৯০ জন অধিবাসী মুসলমান। ইসলামের প্রতি দেশের মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা অত্যন্ত গভীর। ইসলামের বিরুদ্ধে শাসকদের বা কোন গোষ্ঠীর অবস্থানকে এ দেশের তাওহিদী জনতা তাদের সম্মিলিত ও আপোষহীন শক্তি দিয়ে মোকাবেলা করেছে যার বলিষ্ঠ প্রমাণ ১৯৭৫ সনের তাওহিদী জনতার সমর্থনপুষ্ট সেনা বিপ্লব ও ২০০১ সনের নির্বাচনে ধর্ম নিরপেক্ষ ও ভারতের সেবাদাস সরকারের পতনে তাওহিদী জনতার নিরব অভ্যুত্থান। ইসলামী শক্তির প্রভাব গোটা জাতি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছে। গত ৫ বছরের গড়া স্বৈরাচারী, ইসলাম বিরোধী মহল ইসলামী শক্তির অভ্যুত্থানে নির্মমভাবে ধূলিস্যাৎ হয়েছে। এখন জাতি মুক্তি চায়; ব্যক্তি, দলীয় বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে মুক্তি চায়। একথা অনস্বীকার্য আল্লাহতাআ'লার উপর পূর্ণ ঈমান ও আস্থা রেখে একমাত্র আখেরাতের জবাবদিহী সম্পন্ন রাসুল (দঃ) এর হাতে গড়া ইসলামী সমাজ ব্যবস্থাই যাবতীয় ব্যক্তি, দলীয় বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে, এছাড়া শুধু কঠোর আইন কানুন ও পুলিশ, আর্মি দিয়ে বা প্রতিপক্ষকে খুন করে এগুলো বন্ধ করা বা দূর করা যাবে না।

রাসুল (দঃ) এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ

আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে তদানীন্তন বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমে, ইউরোপ মহাদেশের মাত্র ক'মাইল দক্ষিণে ও আফ্রিকা মহাদেশের কিছু পূর্বে তাওহীদের আওয়াজ সমৃদ্ধ বালুকারাশি ও লু হাওয়ার দেশে আল্লাহ তাআ'লার সর্বোত্তম সৃষ্টি, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মোহাম্মাদুর রাসুলুলাহ (দঃ) গ্রীক, রোমান ও পারস্য সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টিকারী রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা থেকে উন্নত ও মানব কল্যাণমুখী যে নতুন ও অভিনব রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা শুধু সেকালের সমাজ ব্যবস্থার জন্য শ্রেষ্ঠ ছিল না বরং সর্ব কালের, সর্ব যুগের অনাগত ভবিষ্যতে মানব সমাজের জন্য ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ মডেল।

www.pathagar.com

এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম ছিল খেলাফত বা ইসলামী হুকুমত বা ইসলামী রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন স্বয়ং রাব্বুল আলামীন এবং আসমানের নিচে জমিনের বুকে এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাস্তবায়নের রূপকার ছিলেন মুহাম্মাদ রাসুলুলাহ (দঃ)। একথা আশ্চর্যজনক হলেও দুঃখজনকভাবে সত্য, ইসলামী রাষ্ট্রের অপরিহার্যতা ও মানব কল্যানে এর দুর্জয় লৌহশক্তি সম্পর্কে মুসলিম জাতি দুর্ভাগ্যজনকভাবে অজ্ঞ ও চরম উদাসীন থাকলেও বিশ্বের খোদাদ্রোহী শক্তি সব সময় সজাগ। বিশ্বের ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে হাজারো, লাখো ব্যক্তি ইসলামের দরিয়ায় অবগাহন করে মোমিনদের দলকে মজবুত একটি নতুন সভ্যতা বিনির্মাণে জীবন ও সম্পদের কোরবানী দিয়ে সহায়তা করে শহীদ ও গাজীর সোনালী খাতায় নাম লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তেমনি তাদের মধ্যে লাখো কোটি ইসলামের সূচনা লগ্নে হিংস্র হায়েনার মত তাদের নখর ও থাবাকে রক্তাক্ত করেছে এবং আজকের দিনেও পরাশক্তি ও খোদাদ্রোহী শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নতুন নতুন অস্ত্রে পুরানো খেলায় মেতে উঠেছে। বাতিলরা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে অবহিত তাই তারা বাধার পাহাড় রচনা করে। মুসলিম জাতির অজ্ঞতা, পরাধীনতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীনতা, সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধে চরম অনীহা, আল্লাহ'র হুকুম অবজ্ঞা করে খৃষ্টান, ইহুদী ও পৌত্তলিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন পক্ষান্তরে ইসলাম বিরোধীদের শক্তি বৃদ্ধিতেই সহায়তা করেছে এবং তাদেরকে বিশ্বের বুকে টিকিয়ে রেখেছে।

রাসুল (দঃ) এর জীবনে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কি কোন প্রয়োজন ছিল?

মোহাম্মাদ (দঃ) ছিলেন সর্বশেষ নবী ও রাসুল - মেয়াদকাল ছিল ২৩ বছর - মক্কায় ১৩ বছর এবং মদীনায় ১০ বছর। মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানেই তিনি নবী ও রাসুল ছিলেন, উভয় স্থানেই সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সহযোগিতা করেছেন, তাঁর আনুগত্য করেছেন, উভয় স্থানে নামাজ রোজার প্রচলন ছিল, উভয় স্থানে ওহী নাজিল হয়েছে এবং ওহীর শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের চরিত্র গঠনের প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু মক্কার জীবনে একটি শূন্যতা ছিল, একটি অভাব ছিল যা সেখানে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। মক্কায় তিনি অবশ্যই নবী ও রাসুল ছিলেন কিন্তু খানায়ে কাবা থেকে একটি মূর্তিও অপসারণ করতে পারেননি, আল্লাহ'র ঘরকে তাওহীদপন্থীদের জন্য খালেস আল্লাহ'র ইবাদতের জন্য হেফাজত করতে পারেননি। হযরত আবুবকরের অর্থে হযরত বেলাল (রাঃ)-কে নির্মম জুলুম থেকে মুক্ত করেছেন বটে কিন্তু অত্যাচারীদের শাস্তি বিধান করতে পারেননি, ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী তরুণ যুবক, হারিস, ইয়াসির ও তার বিবি সুমাইয়ার কোরাইশ পাষন্ডদের হাতে নির্মম মৃত্যু দেখেছেন কিন্তু পাষন্ডদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি, নিরাপত্তার অভাবে নও মুসলিমদের হিযরত করতে বলেছেন, তিনি নিজেই সাহাবায়ে কেরাম সহ 'শেব' নামক গিরিদূর্গে কঠিন বিপদ মুসিবতের মধ্যে বন্দী জীবন যাপন করেছেন, অনাহারে-

www.pathagar.com

অর্ধাহারে দিন কাটিয়েছেন কিন্তু অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বাধার পাহাড় সৃষ্টি করতে পারেননি। কিন্তু মদীনায় এসে অত্যাচারীদের মোকাবিলা, অসহায়কে আশ্রয় দান, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা, যেনা, ব্যাভীচার, চুরি ও অন্যান্য যাবতীয় অপরাধের শাস্তি বিধান এমনকি মৃত্যুদন্ড প্রদান, কাবাঘরের মূর্তি অপসারণ, হজ্বের সুষ্ঠু বিধান প্রবর্তন, কোরআনের আদেশ জারী, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, বিচার ও প্রশাসনিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা, প্রতিটি নরনারীর জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা, সুদ সহ যাবতীয় শোষণমূলক ব্যবস্থা অপসারণ করে জাকাত ভিত্তিক অর্থনীতির প্রচলন, সমাজ থেকে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র দূরীকরণ - এসবই সম্ভব হল। কি করে সম্ভব হল? আল কোরআনের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের কারণেই এসব সম্ভব হল।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার জন্য কি রাষ্ট্র ব্যবস্থা অপরিহার্য?

ইসলামের বিধি বিধানের দিকে লক্ষ্য করলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে এসব বিধি বিধানের বাস্তবায়নের জন্য এক পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দাবী জানায়। ইসলামের অনুসারীদের ঐক্য ও একাত্মতা এবং পূর্ণ শৃংখলাবদ্ধ জীবন যাপন সুখী ও কল্যাণকামী সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য। রাষ্ট্র যেহেতু ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী, তাইতে রাষ্ট্রই হচ্ছে ঐক্য সৃষ্টকারী, ঐক্য রক্ষাকারী, ঐক্য বিরোধী তৎপরতা রোধকারী এবং পরস্পরের মতবিরোধ ও পার্থক্য বিদূরণকারী। নাগরিকদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অধিকার নিশ্চিত করা, প্রতিরক্ষার পূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ, জেহাদের আহ্বান, হদ্দ কার্যকর করা, জালিমের শাস্তি বিধান, মজলুমের প্রতি ইনছাফ, সুষম অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছাড়া কার্যকর হতে পারে না। আল্লাহ তাআ'লা এরশাদ করেছেন, "রাসুলদের পাঠাইয়াছি স্পষ্ট নিদর্শন সহ এবং নাযিল করিয়াছি তৎ সহ কিতাব ও মিজান, যেন তারা প্রতিষ্ঠিত করে ন্যায় বিচার এবং দিয়াছি লৌহ যাতে রহিয়াছে ভীষণ শক্তি ও মানুষের অশেষ কল্যাণ, তা এই জন্য যে, আল্লাহ ব্যক্ত করিয়া দিবেন, না দেখিয়া কে তাকে ও রাসুলকে সাহায্য করে; আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রান্ত।" (হাদীদ - ২৫)

রাসুল (দ:) এই আয়াতে বর্ণিত সমস্ত উপায় উপকরণ প্রয়োগ করেছেন, অর্থাৎ (১) কিতাব যার মধ্যে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা লিখিত রয়েছে (২) মিজান (তুলাদন্ড) যা দিয়ে সত্য মিথ্যা পরিমাপ করা হয় ও ইনসাফের পথ নির্দেশ করে এবং (৩) লৌহ শক্তি অর্থাৎ রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি যার সাহায্যে বাস্তবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার বিনষ্টকারীদের শাস্তি বিধান করা যেতে পারে এবং প্রতিরোধকারীদের শক্তি চুর্ণ করা যেতে পারে। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির এক স্বাভাবিক দাবী। এ বিশ্ব জগতে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআ'লার, আর কারও তা নেই, হতেও পারে না, সার্বভৌমত্বে তাঁর অংশীদার হওয়ার অধিকারও কারও নেই।

www.pathagar.com

সুতরাং স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ তাআ'লার সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়ে, আল্লাহ প্রদত্ত বিধি নিষেধের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে রাজনীতি বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করা বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। বিশ্ব জাহানের যিনি স্রষ্টা, শাসক ও পরিচালক, মানুষের তিনি স্রষ্টা, শাসক ও পরিচালক। আসমানে আল্লাহ'র শাসন চলবে এবং জমিনে মানুষের শাসন চলবে এরূপ অসংগত ও অযৌক্তিক কথাকে কোরআন আদৌ স্বীকৃতি দেয় না।

রাসুল (দঃ) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

রাসুলুলাহ (দঃ) আল কোরআনের মূলনীতির ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রচলন করলেন এবং দশ বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্র হিসাবে একটি মডেল উপহার দিলেন তা ছিল অনন্য ও বৈশিষ্ট্যময়।

'ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

(১) এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হচেছ সার্বভৌমত্ব একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ তাআ'লার জন্য নির্দিষ্ট। বিশ্ব ব্যবস্থায় আল্লাহ'র নিজস্ব শক্তিতেই তার কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত। এজন্য কারও স্বীকৃতির প্রয়োজন হয় না।

(২) মানবীয় শাসনের চূড়ান্ত রূপ যেহেতু রাষ্ট্র সেহেতু আল্লাহ ও রাসুল (দঃ)-এর আইনগত কতৃত্ব স্বীকার করে তার স্বপক্ষে সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করবে এবং আসল শাসকের অধীনে খেলাফতের ভূমিকা অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বের ভূমিকা গ্রহণ করবে। প্রতিনিধির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ'র জন্য নির্ধারিত হলেও মানুষ এই দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তাআ'লার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। মানুষই মানুষকে শাসন করবে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের মাধ্যমে এবং রাসুল (দঃ) প্রদর্শিত পথে। আল্লাহ'র আইন ও বিধানের একমাত্র ব্যাখ্যাকারী রাসুল (দঃ)। অন্য কারও ব্যাখ্যা রাসুল (দঃ)-এর ব্যাখ্যার উপর কোনমতেই প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

(৩) ইসলামী রাষ্ট্রের রূপকার ছিলেন রাসুল (দঃ)। যে মূলনীতির উপর ভিত্তি করে এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত, মানুষের নিকট পৌছানোর একমাত্র তিনিই ছিলেন তাঁর মাধ্যম। রাসুল (দঃ) মানব সমাজে আল্লাহ'র আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি, সুতরাং রাসুল (দঃ)-এর আনুগত্যই হচেছ আল্লাহ'র আনুগত্য।

(৪) কোরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (দঃ)-এর নির্দেশ হচেছ দেশের মৌলিক আইন যার আনুগত্য বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্র অবশ্যই আইন বা বিধি বিধান রচনা করতে পারবে তবে তা মৌলিক আইনের সীমারেখার মধ্যে থাকবে এবং কোনক্রমেই মৌলিক আইনের পরিপন্থী হবে না। দেশের প্রচলিত যে কোন আইন এই মৌলিক আইনের বিরোধী হলে তা বাতিল গণ্য হবে।

(৫) ইসলামী রাষ্ট্র মূলতঃ আল্লাহ'র রাষ্ট্র যা মানুষ তার খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালিত করবে। শুরায়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থাৎ পরামর্শ ভিত্তিক এর শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হবে।

www.pathagar.com

আধুনিক কালের পার্লামেন্টের মত তবে পার্থক্য হল পার্লামেন্টে আল্লাহ ও রাসুল (দঃ)-এর নির্দেশত মৌলিক আইন লংঘন করে কোন আইন তৈরী করতে পারবে না। পার্লামেন্টে শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের জোরে বিরোধী মতাবলম্বীদের প্রতিশোধমূলক কোন আইন তৈরী করা যাবে না যা বর্তমান পার্লামেন্টসমূহে অহরহ হচ্ছে।

(৬) ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র। স্বাভাবিকভাবেই এই রাষ্ট্র পরিচালনা তাদের দ্বারাই সম্ভব যারা এই আদর্শে বিশ্বাসী। যারা এ আদর্শ স্বীকার করে না তাদের নেতৃত্ব দানের অধিকার না থাকলেও পূর্ণ মানবিক অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা রয়েছে।

(৭) ইসলামী রাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র নয়, শুধুমাত্র নীতি ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় বিশ্বের যে কোন স্থানে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং সাদা কালো, পূর্ব পশ্চিম, বাঙ্গালী পাঞ্জাবী সমস্ত প্রকার ভেদাভেদ ও বৈষম্য অস্বীকার করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে পারে।

(৮) এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, জনগণ শুধু ভাল ও বৈধ কাজে শাসকের আনুগত্য করবে কিন্তু পাপ, অন্যায়, অবৈধ, অশ্লীল কাজে কোন প্রকার আনুগত্য করবে না বা কোন সহযোগিতা করবে না।

সরকারের মৌলিক কাঠামো

বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ৩টি প্রধান বিভাগ লক্ষ্য করা যায় যথা নির্বাহী বিভাগ, আইন পরিষদ ও বিচার বিভাগ। আল কোরআন-এর আলোকে রাসুল (দঃ) প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রেও এই ৩টি বিভাগ বিদ্যমান ছিল। তবে অন্যান্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা বর্তমান বিশ্বে যা দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে অবশ্যই স্বতন্ত্র ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রে কোন কিছুই লাগামহীন নয়, সর্বক্ষেত্রেই আসল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর নিকট একটি জবাবদিহীর অনুভূতি ও দায়িত্ব বর্তমান।

মৌলিক মানবাধিকার

আজকের বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য জনগণ সোচ্চার। কোথায়ও মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই, জীবন ধারণের উপকরণের ব্যবস্থা নেই, নিজের ইজ্জত সম্মান সম্পদ রক্ষার পরিবেশ নেই। যুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার অধিকার নেই, সংগঠনের স্বাধীনতা নেই। কোরআন মজিদের বিভিন্ন আয়াতেও রাসুল (দঃ)-এর সুন্নাহ-তে মানুষের মৌলিক অধিকার বিবৃত করা হয়েছে তার পরিবর্তন করার ক্ষমতা ব্যক্তি, গোষ্ঠি, সমাজ বা রাষ্ট্রের নেই। এসব বিধানের ভিত্তিতে রাসুল (দঃ) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম, অমুসলিম, সংখ্যা গুরু, সংখ্যা লঘু, সাদা কালো সবার জন্য মৌলিক অধিকারকে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ও স্বাধীন বিচার বিভাগের মাধ্যমে নিশ্চিত করে সোনালী যুগের পত্তন করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রভাব

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার রূপকার মুহাম্মাদ রাসুলুলাহ (দঃ) বিশ্বমানবতার মুক্তির জন্য ঐশী বিধানের ভিত্তিতে জমিনের বুকে যে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন তার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। এ রাষ্ট্রের কর্তব্য ও দায়িত্ব শাসন ও কর আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এ রাষ্ট্র অভিভাবক, শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক ও দরদী বন্ধুর দায়িত্ব পালন করেছে। রাষ্ট্রের দায়িত্বের পরিধি যে কত ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ হতে পারে রাসুল (দঃ)-এর হাতে গড়া রাষ্ট্র তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইতিহাসের উজ্জ্বল পর্দায় আমরা কি দেখতে পাই? মানুষের মন ও চিন্তার রাজ্যে, জীবনের মূল্যবোধে, স্বভাব চরিত্রে, আচরণ ও অভ্যাসে, মনোভাব ও দৃষ্টিকোণে যে পরিবর্তন এল তা ছিল দুনিয়ার ইতিহাসে নজীরবিহীন ও বিস্ময়কর। পূর্বের মোশরেক হল তাওহিদের নিশান বরদার, জালেম শান্তির পয়গাম বাহক, ব্যাভিচারী নারীর সতিত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী, মদ্যপায়ী মাদক নিবারণে তৎপর, চোর ডাকাত খেয়ানতকারী হল বিশ্বস্ত আমানতদার, সুদখোর মহাজন শোষণের পথ পরিহার করে নিজের যথাসাধ্য আল্লাহ'র পিছিয়ে পড়া বান্দাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে সদা ব্যস্ত। যাদের জীবন ছিল কুসংস্কার ও নোংরামীতে আচ্ছন্ন, ছিল না কোন জ্ঞান ও সভ্যতার ছোঁয়া তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে এল জ্ঞান তাপস, ন্যায়পরায়ণ শাসক, নিরপেক্ষ সুবিচারক, ন্যায়নিষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ এবং গোটা বিশ্বে জ্ঞানের মশাল জ্বালাতে হাজারো জ্ঞানী গুণী।

ইসলামের এই রাষ্ট্রীয় রূপ ও সুদূর প্রসারী সুফলের মধ্যে খোদাদ্রোহী ও বাতিল শক্তিরা, বিশ্বের ক্ষমতালোভীরা নিজেদের মৃত্যু ঘন্টা শুনতে পায়। তাইতে তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে কোন উদ্যোগকে অপপ্রচার, জুলুম, নির্যাতন, নিস্পেষণ ও গণ হত্যার মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হচ্ছে জনতার আন্দোলন, গণ মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন, সমাজ থেকে অত্যাচারী ও স্বৈরাচারীদের অপসারণ করে আল্লাহ'র দাসত্ব ও নবী (দঃ)-এর নেতৃত্বের ভিত্তিতে গণ মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। 'মৌলবাদ' আখ্যা দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বর্তমান বিশ্বে স্তিমিত করা যাবে না কেননা এর থেকে উন্নত গণ মানুষের উপযোগী কোন সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা আজও আবিস্কৃত হয়নি। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নিছক কোন রাজনীতি নয় বা কোন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব সম্পদ নয় - এটা হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে নামাজ ও রোজার মতই একটি ফরজ ইবাদত। তাওহিদে বিশ্বাসী কারও পক্ষে এই ফরজ ইবাদত থেকে দূরে থাকার বা উপেক্ষা করার কোন অবকাশ নেই। ইসলাম শান্তির ধর্ম একথা বলে 'ওম শান্তি, ওম শান্তি' করে নিশ্চুপ থাকার কোন অবকাশ নেই। যারা এই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছেন আল কোরআন তাদেরকে 'আনসারুল্লাহ' বা আল্লাহ'র সাহায্যকারী (সুরা আস সফ-১৪) হিসাবে খেতাব দিয়েছে।

www.pathagar.com

অধ্যায়- ২৩

এই যুগে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়া কি সম্ভব?

আল্লাহ তাআ'লার নাযিলকৃত কোরআনী বিধান অনুযায়ী রাসুল (দঃ)-এর হাতে গড়া ও খোলাফায়ে রাশেদা কর্তৃক অর্ধ বিশ্ব ব্যাপী প্রসারিত ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র এই যুগে গড়া কি সম্ভব? সোনালী যুগের পরশমনির স্পর্শে মানব সমাজের সর্বস্তরে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসম যে নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়েছিল তা কি এই অধঃপতিত যুগে ও সমাজে সম্ভব? খোদাভীরু সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব সমাজ পরিচালনা বা সমাজ বদলের সংগ্রামে গাড়ীর ইঞ্জিনের মতই চালিকাশক্তি আর সংগ্রামের সমর্থনকারী জাগ্রত জনমত বিজয়ের পূর্ব শর্ত। আল কোরআনে নতুন সমাজ গড়ার ব্লু প্রিন্টই শুধু দেয়নি সেই সঙ্গে ব্লু প্রিন্ট বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কেও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। এই ব্লু প্রিন্টের ব্যাখাদাতা হিসাবে এবং ব্লু প্রিন্ট বাস্তবায়নে ২৩ বছর ধরে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ নির্মাতা দুনিয়ার মানুষের জন্য একটি মডেল দিয়ে গেছেন এবং যে কোন কালে যে কোন সমাজে ঐ মডেলের অনুরূপ নুতন সমাজ গড়ার জন্য কারিগরদের কি গুণাগুণ অর্জন এবং কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে তারও শিক্ষা দিয়েছেন। সে পদ্ধতির নাম কোরআন-এর ভাষায় 'জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ' আল্লাহর পথে জিহাদ। "দ্বীনের মূল সূত্র ইসলাম, উহার স্তম্ভ নামাজ এবং সর্বোচ্চ চূড়া জিহাদ (আল হাদীস)।" ইসলামী জীবনে জিহাদের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত বাতিল ও মানব রচিত মতবাদকে প্রত্যাখান করে 'ওহি'-কে চূড়ান্ত সত্য হিসাবে গ্রহণ করে কোরআন ও সুন্নাহর সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে কবুল করে নিতে হবে। জিহাদের পথে এটাই হল প্রবেশ দ্বার। ইসলামী জীবনাদর্শ নিজে মেনে চলা ও অন্যদের মেনে চলার জন্য তাগিদ দান জিহাদের দ্বিতীয় অধ্যায়। মানবীয় সার্বভৌমত্ব উচ্ছেদ করে আল্লাহ'র সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ জিহাদের তৃতীয় অধ্যায়। আর চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে মানবীয় প্রভূত্ব ও সার্বভৌমত্ব কর্তৃক পিষ্ঠ, নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত মানবতাকে মুক্তিদান। আল্লামা আব্দুর রহীম তার 'ইসলামে জিহাদ' বইয়ের ভূমিকায় সুন্দরভাবে লিখেছেন "ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়। তা একটি বিপ্লবী বিশ্বাস, একটি বিপ্লবী আদর্শ, একটি বিপ্লবাত্মক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামের প্রতি প্রথম যখন ঈমান গড়ে ওঠে তখন ইমানদারকে চিন্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হতে হয় বিপ্লবী। যা কিছু অনৈসলামী মন মগজে বাসা বেঁধে আছে আবহমান কাল থেকে তা নির্মমভাবে উৎপাটিত করার জন্য তাকে সক্রীয় ও সচেষ্ট হতে হয়। এরপর ব্যক্তির বাস্তব জীবন পরিচালিত করতে হয় ইসলামী আইন বিধান ও নিয়ম নীতি অনুযায়ী সর্ব প্রকারের প্রতিকূলতা ও বাধা বিপত্তিকে প্রতিহত করে। অতঃপর ব্যক্তিকে এগিয়ে যেতে হয় সামষ্টিকতার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন থেকে বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মহাসমুদ্রের দিকে।

www.pathagar.com

প্রতি পদে পদে মোকাবিলা করতে হয় অনৈসলামী নিয়মনীতি আইনকানুন ও সেইসবের প্রতিষ্ঠাতা পরাক্রমশালী তাগুতি শক্তির সহিত। এই মোকাবিলাই 'জিহাদ'। এই মোকাবিলার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, অনৈসলামী তাগুতি শক্তিকে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও নির্মূল করে দিয়ে তদস্থলে মহান আল্লাহ'র একক সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে তারই দেওয়া পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে জিহাদ, এই হচ্ছে জিহাদের অব্যাহত ও সার্বক্ষণিক কার্যক্রম। ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রকেই এই জিহাদে লিপ্ত হতে হয়। এই জিহাদে আন্তরিকভাবে লিপ্ত না হয়ে কোন ঈমানদারের পক্ষে 'ঈমানদার' হয়ে থাকাই সম্ভবপর হতে পারে না। তাই জিহাদ হচ্ছে 'ঈমানের ঐকান্তিক তাগিদ। জিহাদ হচ্ছে, ইমানী জীবনের বিশেষত ইসলামী জীবনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সর্বোচ্চ ধাপ'।

বাংলাদেশে কি ইসলামী সমাজ গড়ার পরিবেশ বিদ্যমান?

বাংলাদেশের ১৩কোটি জন সাধারণের মধ্যে ৯০ শতাংশ তাওহিদে বিশ্বাসী। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক বিপথগামী মানুষ ছাড়া বিপুল সংখ্যক অধিবাসী ধর্মভীরু এবং খোদায়ী বিধান পালনে তৎপর। ১৯৪৭ সনে বাংলার মুসলমানদের দাবী ও আন্দোলনের কারণে ভারতের মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয় হয়েছিল। এ অঞ্চলের তাওহিদী জনতা শাহজালাল (রহঃ), শাহ পরান (রহঃ), খান জাহান আলি (রহঃ), তিতুমীর (রহঃ), ঈসা খান, গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ-এর উত্তরসূরী হিসাবে জিহাদী মন্ত্রে উজ্জিবীত। অন্যায় ও অবিচারের ক্ষেত্রে এরা প্রতিবাদী কণ্ঠ। পাকিস্তানের শাসককূলের সর্বস্তরের বেইনসাফীর জন্য এদেশের মানুষ ভূগোল বদলে দিয়েছে। ১৯৭১ এর আন্দোলন অবশ্যই ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল না যদিও ভারতীয় শাসককূল ও এদেশের অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যার ভারতীয় সেবাদাস ও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী বার বার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে জন সাধারণকে এই কুফুরী পথে আকর্ষণ করতে। আওয়ামী লীগের প্রথম শাসানমলে কুখ্যাত দাউদ হায়দারের রাসুলুল্লাহ (দঃ) এর অবমাননাকারী কবিতার বিরুদ্ধে দেশের তাওহিদ জনতা গর্জে ওঠে। এটা ছিল তাওহিদের প্রতি আনুগত্য ও নবী (দঃ) প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। মুরতাদ দাউদ হায়দারের আর দেশের মাটিতে জায়গা হয় নি পদচারণা করবার। কুফুরী সমাজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের সেনা অভ্যুত্থানের পক্ষে শতকরা ৯৯ জন তাওহিদী জনতার সমর্থন থাকায় ভারতীয় সেবাদাসরা মাথা উচুঁ করে দাড়াতে পারেনি। ১৯৭৫ সনের ৭ই নভেম্বর এ দেশেরই তাওহিদী জনতা ইসলামের বিরুদ্ধে বিশেষ গোষ্ঠির অপপ্রচেষ্টাকে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিতভাবে নস্যাৎ করে দেয়। ইসলামের দুষমন সালমান রুশদীর 'স্যাটানিক ভার্সেস' এর বিরুদ্ধে ইরানের অবিসম্বাদিত নেতা ইমাম খোমেনী প্রদত্ত ফতোয়াকে মেনে নিয়ে এদেশের তাওহিদী জনতা অবিস্মরণীয় প্রতিবাদের স্বাক্ষর রেখেছে সর্ব প্রকারের দ্বিধাদ্বন্দ ভুলে গিয়ে।

www.pathagar.com

ইসলামের বিশ্বজনীন রূপ, আকর্ষণ ও ঐক্য সৃষ্টিকারী প্রচন্ড শক্তির এ ছিল এক ব্যাপক প্রদর্শনী। কুখ্যাত লেখিকা তাছলিমা নাসরীনের ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ও নবী (দঃ) রাসুলদের (দঃ) সম্পর্কে বিশ্বের শয়তানী শক্তির প্ররোচণায় লিখিত কুসাহিত্যের বিরুদ্ধে এ দেশের তাওহিদী জনতা এমনভাবে প্রতিবাদের ঝড় তোলে যে বাধ্য হয়ে জরায়ুর স্বাধীনতার দাবীদার ঐ লেখিকাকে মাতৃভূমি ছেড়ে পালাতে হয়েছে। ভারতের বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে বাংলাদেশের মানুষ শহীদের খাতায় স্বর্ণাক্ষরে নাম লিখিয়ে প্রতিবাদের স্বাক্ষর রেখেছে। সর্বোপরি শেখ হাসিনার ৫ বছরের কুশাসন, ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা, উলামা মাশায়েক ও দ্বিনী অনুভূতির উপর অশ্রদ্ধা, পৌত্তলিকতার আবর্তে দেশবাসীকে আবদ্ধ করার বিরুদ্ধে ২০০১ এর যে নীরব গণ অভ্যুত্থান তা এই দেশের জানা অজানা বা ঘাপটি মেরে থাকা ইসলামের শত্রুদের জন্য একটি প্রচন্ড শিক্ষা ও চপেটাঘাত। স্বস্তির বিষয় জনতার এই অভ্যুত্থান সরব ছিল না নইলে ১৯৭৫ এর দু:খজনক ঘটনার হয়ত পুনরাবৃত্তি হত।

রাষ্ট্রনায়কদের তাওহিদী জনতার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করতে হবে

এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সমাজ ও রাষ্ট্রের নেতাদের, সর্বস্তরের শাসকদের সমাজবদলের পরিকল্পনা গ্রহণের প্রশ্নে অবশ্যই গণ মানুষের, তাওহিদী জনতার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করতে হবে, নাড়ীর টান কোনদিকে তা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর ভারতীয় সংবিধানের আদলে গৃহিত ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে জেনারেল জিয়া তাওহিদী জনতার প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে বিষাক্ত নাগিনীদের ক্রুদ্ধ ছোবলকে উপেক্ষা করে কঠিন সময়ের মধ্যে যে পরিবর্তন এনেছিলেন ও সংযোজন ঘটান তা ছিল দুঃসাহসিক কাজ। 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ'র প্রতি আস্থা স্থাপন ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' এই মূলনীতি গ্রহণের মধ্যে ইসলামের ঈমানী বিষয়ের আংশিক স্বীকৃতি দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। জেনারেল জিয়া সময় সুযোগ পেলে হয়ত জনগণের আশা আকাংখা পূরণে এবং ইসলামী পূর্ণাঙ্গ সমাজ বিনির্মাণে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশের উলামা মাশায়েখ ও দ্বীনদার বুদ্ধিজিবীদের পরামর্শে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। কিন্তু তার শহিদী মত্তত এ কাজকে পিছিয়ে দিয়েছে। পরবর্তী আমলে বিএনপি'র নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে এবং দেশের শত্রু মিত্র চিহ্নিত করার ব্যর্থতায় জেনারেল জিয়ার বলিষ্ঠ ও বেগবান নেতৃত্বকে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। শেখ হাসিনার ৫ বছরের দুঃশাসন যেমন ইসলামী দলগুলির মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করেছে তেমনি বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি জেনারেল জিয়ার সর্বাত্মক ঐক্য প্রচেষ্টার নীতিকে গ্রহণ করে ৪ দলীয় জোটের সার্থক রূপায়নে প্রচন্ড অবদান রেখেছে। ইসলামী দল ও জাতীয়তাবাদী দলের মিলিত প্রচেষ্টায় নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাশার চাইতেও প্রাপ্তি ঘটিয়েছে বেশী। বিএনপি ও চার দলীয় জোটের এই প্রাপ্তি শেষ কথা নয়। চার দলীয় জোটের এই প্রাপ্তি দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা ও বাধাবিপত্তি নির্মুল করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের সমর্থনকারী ছাত্র ও যুবশক্তি তাদের চরিত্রহীনতার কারনে, উচ্ছৃংখলতার কারনে এবং বল্গাহীন সন্ত্রাসের কারনে এই দেশে আবার আওয়ামী লীগের পুনরুত্থানকে চিরদিনের মত না হলেও হয়ত বহুদিনের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে। অবশ্য এটা নির্ভর করবে বি এন পি সহ যারা ক্ষমতায় এলেন তাদের ও তাদের ছাত্র যুব শক্তির সর্বত্র উন্নত চারিত্রিক কাঠামো সৃষ্টি ও প্রদর্শনের উপর।

সুতরাং সুষ্ঠু ভিত্তির উপর দেশকে গড়তে হলে দেশের মানুষকে বিশেষকরে ছাত্র যুব সমাজকে তাওহিদের ভিত্তিতে খাঁটি চরিত্রবান মানুষে পরিণত করতে হবে। আগামী দিনের নৈরাজ্য, দুঃশাসন, ধর্মহীনতা, দেশদ্রোহিতার চির অবসান ঘটাতে হলে এবং দেশবাসীকে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে রূপান্তর ঘটাতে হলে দেশপ্রেমিকের ভূমিকা নিয়ে জেনারেল জিয়া যে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন বিএনপি ও জোটকে সেই প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে পৌছাতে হবে। ইসলামী সমাজ কাঠামো গড়তে হলে সাংবিধানিক পরিবর্তনের জন্য যে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রয়োজন তা বেগম জিয়ার নেতৃত্বে ৪ দলীয় জোটের রয়েছে। ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের লালিত এই দেশের মাটিতে শাসকদের উদাসীনতার সুযোগে গেঁড়ে বসা কিছু এনজিও এবং ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী ও পৌত্তলিক সংস্কৃতির কিছু পূজারী ও ভাড়াটিয়া সংখ্যায় অতি ক্ষুদ্র হলেও বাধার পাহাড় সৃষ্টি করবে। কিন্তু তাওহিদী জনতার ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ ও গণতান্ত্রিক শক্তি তা অবশ্যই স্তিমিত করে দেবে। সত্য প্রতিষ্ঠায় মিথ্যার আক্রমণের মুখে প্রতিরক্ষায় অর্থ্যাৎ মারুফের প্রতিষ্ঠায় ও মুনকারের উচেছদ সাধনে মোমিনদের যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও প্রয়াস প্রয়োজন এ শিক্ষা সত্যপন্থীদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। স্রোতস্বীনি নদীই কেবল পারে ময়লা আর্বজনাকে দূরে ঠেলে রাখতে। ঠিক তেমনি একটি দেশে বা সমাজে জাগ্রত জনতার স্রোতই পারে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের দূরে সরিয়ে রাখতে।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বিশ্ব মুসলিমের কর্তব্য

বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সব পার্থক্য ও দ্বন্দ ভূলে গিয়ে বিশ্ব মুসলিমকে জড়তা ও হীনমন্যতা পরিহার করে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক এক বা একাধিক রাষ্ট্র সরকার গড়ে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। গত শতাব্দীতে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্নি মুসলিম অঞ্চল ও রাষ্ট্র পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে কিন্তু মুসলিম জনতা সত্যিকারের স্বাধীনতার ফল ভোগ করতে পারেনি। রাষ্ট্রনায়ক ও শাসকদের গাদ্দারী, মোড়লদের পদলেহন, কম মূল্যে ঈমান ও দেশের সম্পদ বিক্রয় প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশের নাগরিকদের অভূক্ত রেখেছে, অধিকার বঞ্চিত করেছে এবং পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, একনায়কত্ব ও স্বৈরাচারের দাসত্ব করতে বাধ্য করেছে। এসব শাসকরা মানুষকে ভোগ, কামনা বাসনা, অশ্লীলতা সহ যাবতীয় নৈতিকতা বিরোধী কাজে উৎসাহ জুগিয়ে নিজেদের আসনকে মজবুত করেছে। গণ মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েছে বুট ও বেয়নটের জোরে এবং দেশকে মৃত্যুর উপত্যকা বানিয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশেও বেশীরভাগ সময় এই অবস্থা বিরাজ করেছে। অতি সম্প্রতি বিশ্ব পরাশক্তির সর্বাধিক ক্ষমতাগর্বী মোড়ল নূতন ক্রুসেড ঘোষণা করেছে ইসলামের বিরুদ্ধে। লজ্জা ও দুঃখের বিষয় বিশ্বের ইসলামী রাষ্ট্রগুলির প্রায় শাসকই বিশ্ব মোড়লের সুরে সুর মিলিয়ে গদী রক্ষার্থে নিজ নিজ দেশের মুসলিম নাগরিকদের জান, মাল ও আজাদী লুণ্ঠন করছে। বিশ্ব মোড়লরা মুসলমান নেতাদের মুসলমান নাগরিকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। পলাশীর আম্রকাননে সিরাজউদ্দৌলার যে কারণে পতন, দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতানের যে কারণে বিপর্যয়, বালাকোটের ময়দানে সৈয়দ আহমদ শহীদের যে কারণে পরাজয় সেই একই চিত্রের উদ্ভব হয়েছে আফগানিস্তানের মত দুর্গম পাহাড়ে ঘেরা একটি মুসলিম অধ্যুষিত জনপদে। আফগানিস্তান নিজেই একটি স্ফুলিঙ্গ। রাশিয়া একা পারেনি এ দেশটিকে কব্জা করতে। দীর্ঘ বিরতির পর পরাশক্তিধরদের নিজেদের আভ্যন্তরীন দন্দ্ব মিটে যাবার পর, বুশের যুক্তরাষ্ট্র, পুতিনের রাশিয়া, টনি ব্লেয়ারের যুক্তরাজ্য বিশ্বের বেশীর ভাগ মুসলিম ও অমুসলিম দেশের রাষ্ট্রনায়কদের সরব ও নিরব সমর্থন নিয়ে নিইউয়র্কের টুইন টাওয়ার হামলার অজুহাতে আফগানিস্তানের মুসলিম জনসাধারণের উপর বর্বরোচিত হামলা করে চলেছে। বিশ্ব মুসলিমের উঠতি শক্তি তালেবান শাসিত আফগানিস্তানের ইসলামী শক্তিকে নির্মুল করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা হিসাবে এই আক্রমণকে বিশ্ব বিবেক আখ্যায়িত করেছে। এই বর্বরোচীত অসম যুদ্ধকে বুশ নয়া ক্রুসেড হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে এবং ওসামা বিন লাদেনকে কোন দৃশ্যমান প্রমান ছাড়াই তালেবান মোজাহিদদের সহায়তা দানের অভিযোগে বিশ্বের এক নম্বর সন্ত্রাসী হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে।

পরাশক্তির আস্ফালনের বিরুদ্ধে নয়া জিহাদ শুরুর ওসামা বিন লাদেনের যুগান্ত কারী আহবান

ওসামা বিন লাদেনের অপরাধ কি? ওসামা বিন লাদেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া এক দূরন্ত কাফেলার নাম, দুনিয়া কাঁপানো সিংহ হৃদয়, বীর শ্রেষ্ঠ শার্দুলের নাম। ওসামা বিন লাদেন গত শতাব্দীর রক্তমাখা ইতিহাসের একটি দীর্ঘ অধ্যায়, চলমান দশকের সবচাইতে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। ওসামা বিন লাদেন কোন অশান্তির তান্ডব নন, কোন ভয়ঙ্কর ধ্বংসের জনক নন। তিনি প্রশান্তির সাইমুম, শোহাদায়ে কেরামের আদর্শ স্নাত তারুণ্যদীপ্ত মনের এক মর্দে মোজাহিদ, তিনি অবিস্মরণীয় ত্যাগের, সুস্থ জীবন বোধের, মানবিকতার এবং মহত্বের প্রতিকৃতি। ওসামা বিন লাদেনকে জীবিত বা মৃত ধরার জন্য বুশ ও তার দোসররা আফগানিস্তানের উচু পাহাড়গুলোকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় রত রয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বুশ অনান্য যে সব দেশে এরূপ বর্বর ও হিংস্র হামলা চালানোর কথা ঘোষনা করেছে তা সবই মুসলিম রাষ্ট্র।

যুগে যুগে দেশে দেশে মোনাফেকদের জন্য ইসলামী শক্তির সাময়িক বিপর্যয় হয়েছে, মোনফিকদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে মুসলিম দেশ দখল করে কাফেররা

www.pathagar.com

মোনাফিকদের আবর্জনার মত ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিজেরাই গদীতে আসীন হয়েছে। আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করে গদিতে বসানো হবে এই আশ্বাস দিয়ে তালেবান শাসনের দূর্গে আঘাত হানার জন্য যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। তালেবান শাসিত অঞ্চলে দিনের পর দিন নির্বিচারে বোমা বর্ষন করে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। পরাশক্তিদের যৌথ আক্রমনের মুখে তালেবান শাসকদল পরাজিত হয়েছে এবং পরাশক্তিরা আফগানিস্তানে উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে ক্ষমতায় না বসিয়ে আগামী দিনে দেশটির শাসন ক্ষমতা নিজেদের হাতে বা তল্পিবাহকদের হাতে রাখার জন্য জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাঁচমিশালী শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর এখনই উত্থিত হচ্ছে। অসম যুদ্ধ শেষ হয়েছে কিন্তু পরাশক্তিদের সৈন্য বাহিনী আফগানিস্তানের দখল ছাড়বে না একথা তারা স্বগর্বে ঘোষনা দিচ্ছে। ভাড়াটিয়া উত্তরাঞ্চলীয় জোটের তালেবান বিরোধী নেতাদের, পরাশক্তিদের তল্পিবাহক শাসকদের মোহ শিঘ্রই কাটবে কিন্তু তারা নিজেদের ও নিজেদের স্বাধীন মাতৃভূমিকে যে দাসত্বের শংখলে আবদ্ধ করে ফেলল তা অতি সহজে ঘুচবে বলে মনে হয় না। ওসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমরের খোজ পরাশক্তিরা পায়নি - অনেকের ধারনা তারা হয়ত আর বেঁচে নেই। পরাশক্তির কাঁপন সৃষ্টি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভিত কাঁপানো জিহাদী নেতৃত্বের হয়ত মৃত্যু হতেও পারে কিন্তু আফগানিস্তানের ইসলামী কাফেলা বা তাওহিদী শক্তির জিহাদ থেমে যাবে না। ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানের মাটিতে বসে বিশ্ব মুসলিমের কাছে জিহাদের যে বানী দিয়ে গেছেন, যে প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন , কোরবানী ও ত্যাগের যে জযবায় উদ্বুদ্ধ করেছেন তা শুধু আফগানিস্তানকে উজ্জীবিত করেনি বিশ্বের নির্যাতিত অথচ ঈমানদীপ্ত মুসলিমদের জিহাদের শৃঙ্গকে অনেক উঁচুতে তুলে দিয়েছে। বিশ্বের বহু মুসলিম দেশের তরুণ যুবক ও বয়স্করা এই জিহাদে যোগদান করে জিহাদের খুনে রাঙা পথকে আরও শানিত করেছেন। আমেরিকা ও বৃটেন থেকে নও মুসলিমরা নিজ নিজ সরকারের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের প্রতিবাদে আফগানিস্তানের ভাইদের সঙ্গে জিহাদে শামিল হয়ে বিশ্বে তাওহিদের ঝান্ডাকে সমুন্নত করেছে। বাংলাদেশের তরুণ যুবক বৃদ্ধ সর্বস্তরের নর নারী ওসামা বিন লাদেনকে তাদের হৃদয়ের মনিকোঠায় স্থান দিয়েছে ইসলামী বিপ্লবের প্রাণ পুরুষ হিসাবে। এসব কিসের ইংগিতবহ ? আগামী দিনের বিশ্ব সন্ত্রাসী , বিশ্বগ্রাসী শয়তানী শক্তি, মানবতার চরম দুষমন, খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিশ্বের মুসলিম জনতার ঐক্যবদ্ধ নয়া জিহাদ শুরুর একটি উজ্জল ইঙ্গিত। এ জিহাদ কোন বিশেষ দেশের মুসলিম জনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। গোটা বিশ্বের তাওহিদী জনতা বিশ্বজয়ী নতুন নেতৃত্বে জিহাদের দূর্গম পথে দৃঢ় পদে অগ্রসর হয়ে সমস্ত পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলবে। বিশ্বের বড় মোড়ল হুমকি দিয়েছে আফগানিস্তানেই তাদের হামলা শেষ নয় - বিশ্বের তাবত উঠতি মুসলিম দেশগুলির উপরও আক্রমন হবে, তারা নয়া ক্রুসেড শুরু করবে। ১৩ কোটি মুসলিম জনতার আবাসস্থল , তাওহিদের আওয়াজে সমৃদ্ধ, আওলিয়া দরবেশ ও অগনিত মুমেনদের পদচারনায় ধন্য

www.pathagar.com

বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপদ বাংলাদেশও এই হুমকি থেকে মুক্ত নয়। তাইতে এসব হুমকির মুখে বিশ্বের তাওহিদী জনতার , কালেমার আওয়াজে উজ্জীবিত ইসলামের অনুসারীদের এখনই সময় নয়া ক্রুসেডের মোকাবিলায় বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ নয়া জিহাদ শুরু করার। এই নয়া জিহাদে প্রয়োজন এক সিংহ পুরুষ অমিততেজী সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর উত্থান। এই নয়া জিহাদ ইসলামের উত্থান ও সংরক্ষনের জন্য অপরিহার্য। ইসলামের বানীকে সমুন্নত করা, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, ইসলামী সাংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বিজয় দান করা , নির্যতিত মানবতাকে রক্ষা করা পৃথিবী থেকে ফেতনা ফ্যাসাদ নির্মুল করে শান্তি শৃংখলা ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি অর্জনের জন্য তাঁর দ্বীনকে , নবী (দঃ) কতৃক প্রদর্শিত ও প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী করা।

বাংলাদেশের তাওহিদী জনতা, সংগ্রামী মানুষেরা, আল্লাহর পথের পথিকেরা, শৈর্যদীপ্ত ও ঈমানদীপ্ত তরুণ ও যুবকরা - এই নয়া জিহাদে তোমরা কি পিছিয়ে থাকবে ? হে বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যবদ্ধ নতুন জিহাদী কাফেলা- নয়া জিহাদের পথে তোমাদের যাত্রা শুরুর আর কত দেরী ?

নিজে পড়ুন ও অন্যকে পড়তে দিন

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

আলহাজ্ব এ্যাডভোকেট সা'দ আহমদ বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনে এক সুপরিচিত নাম। বাংলাদেশে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় সিনিয়র আইনজীবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯২৭ সনের ১লা মে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারায় তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মরহুম আলহাজ্ব ডাঃ মনির উদ্দিন আহমদ ও মাতা মরহুমা হালিমা বেগম।

জনাব সা'দ আহমদ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৪৭ সনে বি.কম এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, ১৯৪৯ সনে এম. এ (অর্থনীতি) তে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় এবং একই বছর এল এল. বি তে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৯ সনে লাক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আইন বিষয়ক আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান, একই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজী বিতর্কে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ছাত্র জীবনেই তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রীয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

কর্মজীবনে জনাব সা'দ আহমদ ১৯৫০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫০-৫২ পর্যন্ত তিনি জগন্নাথ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯৫২ সনে এ্যাডভোকেট হিসাবে তিনি অবিভক্ত কুষ্টিয়া জেলা বারে যোগদান করেন এবং ১৯৫৭ সনে সুপ্রিম কোর্টের এ্যাডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। তিনি অবিভক্ত কুষ্টিয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জুট এ্যাডভাইজারী বোর্ডের সদস্য, পাকিস্তান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স করপোরেশনের ডাইরেকটর এবং বাংলাদেশ বার কাউসিলের সদস্য ছিলেন।

তিনি মুসলিম ছাত্রলীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আমলে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ষাটের দশকে যাবতীয় আন্দোলন - কপ, পিডিএম, ডাক ইত্যাদির সঙ্গে সক্রীয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯৫৩, ১৯৫৯ ও ১৯৬২ সনে নিবর্ত্তন মূলক আইনে বিভিন্ন মেয়াদে কারাবরণ করেন। শেখ মুজিবের দালাল আইনে ৩১ বছর কারাদন্ড প্রাপ্ত হয়ে ৬৭৫ দিন কারাজীবন যাপনের পর মুক্তিলাভ করেন।

১৯৭৮ সনে করাচীতে রাবেতা আলম আল ইসলামীর বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৭৯ সনে ইরান সফরে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ইমাম খোমেনীর (রহঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৮০ সন থেকে কয়েকবার তিনি ইরান সফর করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর প্রবন্ধ পাঠ করেন ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। জনাব সা'দ আহমেদ ১৯৮১ সনে ও ১৯৯৬ সনে সস্ত্রীক হজব্রত পালন করেন।

জনাব সা'দ আহমদের দীর্ঘ কারাজীবনে সুলিখিত বই মুজিবের কারাগারে পৌনে সাতশ দিন সূধী ও রাজনৈতিক মহলে প্রশংসিত। এছাড়া তাঁর লিখিত অন্যান্য বই- হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর দাওয়াত ও আজকের মুসলমান, ইসলামের অর্থনীতি, সূরা আল আছরের আলোকে আমাদের সমাজ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় মোহাঃ রসুল (সঃ), ইসলামে মসজিদের ভূমিকা, আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ), কোরবানীর শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচনে জাকাতের ভূমিকা ইত্যাদি।

জনাব সা'দ আহমদ কুষ্টিয়ার ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান রিজিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবং ভেড়ামারায় তাঁর পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত আলহাজ্ব ডাঃ মনির উদ্দিন ট্রাষ্ট ও মাতার নামে প্রতিষ্ঠিত হালিমা বেগম একাডেমীরও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান।